স্বাধীনতার আবোল তাবোল

(ইতিহাস)

তৃতীয় সংস্করণ

"হেলায়ে মাথা দাঁতের আগে মিষ্ট হাসি টানি
বলিতে আমি পারিবনা তো ভদ্রতার বাণী।
উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি,
প্রকাশহীন চিন্তারাশি করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই বাঁচিয়া যাই তবে,
ভব্যতার গণ্ডিমাঝে শান্তি নাহি মানি।"

—রবীন্দ্রনাথ

সুনীল কুমার গুহ

১৯৫৮

যুগানুশীলন সাহিত্য সংঘ
পি ৫২৯, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা-২৯

প্রকাশ করেছেন :
সুনীল কুমার গুহ
"কণীনিকা"
পি-৫২৯, রাজা বসন্ত রায় রোড,
কলিকাতা-২৯।

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন :
বিভূতি সেনগুপ্ত

ব্লক করেছেন :
স্টাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

প্রচ্ছদপট ছেপেছেন :
মোহন প্রেস

ছেপেছেন :
দেবেন্দ্রনাথ নাথ
বাসন্তী আর্ট প্রেস
৬।১ কলেজ রো
কলিকাতা-৯।

প্রাপ্তিস্থান :

১। "জিজ্ঞাসা"
১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৯

২। "জিজ্ঞাসা"
৩৩ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

পাঁচ টাকা

ভূমিকা

আমি একজন লেখক বা সমালোচক নই, আর বিদ্বান বা চিন্তাশীল ত নই-ই। ওসব হবার সখও আমার কখনও ছিল না। তবু চারদিকে যতসব আবোল তাবোল কাণ্ডকারখানা দেখে আবোল তাবোল কিছু না লিখে পারলাম না। এ লেখাটি যে একেবারেই আবোল তাবোল তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, আর সন্দেহ নেই যে, ভারত এবং পাকিস্থানে আজ দশ বৎসর ধরে যা চলেছে তাও আবোল তাবোল ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

ইংরেজের অধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে একজন স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক হিসাবেই কাজ আরম্ভ করেছিলাম। ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে যেতে আমার উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছে তাতে কোন ভুল নেই, কিন্তু আরও নির্ভুল সত্যটি হচ্ছে এই যে, ইংরেজ অধীনতা মুক্ত হয়েও আমরা স্বাধীন হতে পারিনি, আবোল তাবোল হয়ে গেছি।

অবশ্য ভারতবাসী যে স্বাধীনতাই চেয়েছিল তাও বলা কঠিন। কি যে চেয়েছিল তা বলা আরও কঠিন। অন্ততপক্ষে আজ বিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা মানে যা বুঝা যায়, তা যে ভারতীয়েরা চায়নি সেটা খুবই সত্যি কথা। সত্যিকথা এই কারণেই যে, ভারতের বৃহৎ জীবন আদর্শের সঙ্গে বা ভারতীয়দের ভাবধারায় ওটা ঠিক খাপ খায় না। বাইরের পৃথিবীর সম্পর্কে এসে সত্যিকারের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যা ভারতে জেগেছিল এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই, এবং এগিয়েও যাচ্ছিল শক্তি থেকে আরও শক্তির পথে; ইংরেজ তাকে প্রায় শেষ করে দিয়েই দেশ ছেড়েছে। আর বিগত দশ বৎসরের আবোল তাবোলের ফলে সেই সত্যিকারের স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার শেষ মূলটিও বোধ হয় নির্মূল হয়ে গেছে।

আজ দেশে যা চলছে তা শুধুই আবোল তাবোল নয়, অতি উদ্দেশ্যমূলকভাবেই আবোল তাবোল,—জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার জন্যই এ আবোল তাবোল। কারণ স্বাধীনতার নামে ক্ষমতা আহরণ করে আজ যাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁরা কখনই স্বাধীনতা চান নি; চেয়েছিলেন ক্ষমতা, পেয়েছেনও সেই ক্ষমতাকেই। কাজ যা হচ্ছে তা ঐ ক্ষমতা দেখবার জন্যই, ক্ষমতাকে আরও নূতনতরভাবে উপভোগ করবার জন্যই এবং ক্ষমতাকে

বজায় রাখবার উদ্দেশ্যেই ; অন্য কিছুই নয়। স্বাধীনতার নামে আজ যে ক্ষমতার প্রদর্শনী দেখান হচ্ছে, ক্ষমতাকে নিজেদের মুঠোর মধ্যে রাখবার জন্য যে চেষ্টা হচ্ছে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই এই আবোল তাবোল লেখা। লেখাটি অবশ্য হাল্কাভাবেই লেখা হয়েছে ; তাহলেও উদ্দেশ্য মোটেই হাল্কা নয়। আর যে প্রশ্নগুলো উপস্থাপিত করা হয়েছে সেগুলো ত হাল্কা নয়ই, বরং তার উল্টোটাই।

আজকাল এ ধরণের লেখার বিশেষত্বই হচ্ছে সংখ্যাতত্ত্ব সমাবেশ দ্বারা সবকিছু প্রমাণ করা। সেটা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না এই জন্যই যে, যেখানে বসে আমাকে এটি লিখতে হয়েছে, সেখানে ঐ সব সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। আর সম্ভব হলেও, আমার পক্ষে সেগুলো উপস্থিত করা সম্ভব হ'ত না, কারণ তাহলে এ লেখা আর কখনই শেষ হ'ত না। এই আবোল তাবোলে যত বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়েছে, সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে প্রমাণ করে লিখতে হলে তার যে কোন একটির উপরই ৫০০ বা ১০০০ পৃষ্ঠার বই লেখা প্রয়োজন হ'ত। তাই এই 'আবোল তাবোলে' অতি সংক্ষেপে—আলোচিত হয়েছে প্রধানত সেই ব্যাপারগুলোই, যেগুলো প্রায় স্বতঃসিদ্ধ—মানে, প্রমাণের ধার ধারে না। অবশ্য সংখ্যাতত্ত্ব সমাবেশ করে লিখতে পারলেই যে বেশী কিছু প্রমাণ করা যায়, সে রকম কিছু ধারণাও আমার নেই। লোককে ধোঁকা দেবার পক্ষে সংখ্যাতত্ত্ব যত দরকারী আসল কাজে ততটা মোটেই নয়। উপরন্তু ভারত বা পাকিস্থানের মত দেশে, যেখানে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করবার প্রায় কিছুই ব্যবস্থা নেই সেখানে ঐসব সংখ্যাতত্ত্বেরও কোন মানেই হয় না। এই লেখাটি প্রায় সবটাই শুধুমাত্র স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করেই শেষ করতে হয়েছে—ঘটনাগুলো ত বটেই, এমনকি একটু আধটু সংখ্যাতত্ত্ব যা সমাবেশ করা হয়েছে, তাও ঐ স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করেই। তবুও আশাকরি ভুল বিশেষ কিছু হয় নি।

এই 'আবোল তাবোলে' এইটুকুই বুঝাবার চেষ্টা হয়েছে যে আজ যাঁরা দেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁরা ক্ষমতাই চেয়েছিলেন, স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের নামে যে সব আস্ফালন তাঁরা করেছিলেন সেগুলোও ঐ আস্ফালন ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। আর স্বাধীনতার দশ বৎসরে যা তাঁরা করেছেন বা এখনও করে চলেছেন তাও ঐ একই বস্তু। ক্ষমতা আহরণ করা, ক্ষমতার দাপট প্রদর্শন করা এবং ক্ষমতা বজায় রাখবার চেষ্টা করাই

হচ্ছে তাঁদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ইতিহাস, এবং ইতিহাসের ইঙ্গিত ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। শুধু তাই নয়, এ ভিন্ন অন্য কিছু করবার ক্ষমতাও তাঁদের নেই বা ছিলনা, এবং সম্ভবত সততারও অভাব রয়েছে আগাগোড়াই।

এইটুকু বুঝাবার জন্যই এই 'আবোল তাবোল' লেখাটি প্রধানত চারটি অংশে ভাগ করে লেখা হয়েছে। প্রথম অংশে আলোচিত হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস এবং তার ধারা,—যার ভেতর কিছু কিছু সম্পূর্ণ নূতন তথ্যও সমাবেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে গত দশ বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলোর আলোচনা। তৃতীয় অংশে করা হয়েছে স্বাধীনতার সাফল্যের হিসাব নিকাশ। আর শেষ অংশে টানা হয়েছে ঐ হিসাব নিকাশেরই মোট ফল।

জানিনা, এই 'আবোল তাবোল' পড়বার মত ধৈর্য্যশীল পাঠক দেশে কেউ আছেন কি না; তবে বিশ্বাস রাখি যে, যদি কেউ শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখেন তাহলে অবশ্যই দেখতে পাবেন যে গত দশ বৎসরের ঘটনাগুলো এবং স্বাধীনতার সাফল্যের হিসাব পূর্ববর্তী ইতিহাসের সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ, একেবারে একদিল।

আমার স্বভাব যে খারাপ, আমি যে হিংসুটে এবং নিন্দুক তাতে কোন সন্দেহ নেই; তা না হলে ইংরেজ চলে যাবার পর দেশ যখন স্বাধীন হয়েই গেছে, তখন আবার এসব বাজে কথা বলে বিরক্ত করবার কীই-বা মানে হতে পারে। তাই অস্বীকার করেও উপায় নেই যে এ 'আবোল তাবোল' আমার স্বভাব দোষেই লেখা। এখন ভুল করে এক আধজনও যদি এটা পড়ে ফেলেন তাহলেই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব। এ বই একখানিও বিক্রী হবে সে রকম আশা রেখে ছাপাবার চেষ্টা হচ্ছে না; ছাপান হচ্ছে শুধুমাত্র আমার নিজের একটা খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যই,—ঠিক যেমন ভারত আর পাকিস্থানের নেতারা আজকাল শুধুমাত্র তাঁদের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যই অনেক কিছু কাজ কর্ম করে চলেছেন। আর তাঁদেরই মত আমিও এই টাকা অপব্যয়ের হিসাব নিশ্চয়ই কাউকে দেব না—মা বা দাদাদের কাছেও না। সুবিধা অবশ্য আমারও একটু আছে, মা এবং দাদারা জানেন যে আমি পাগল, লম্বা চুল আর দাড়ি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই।

আমার খেয়ালী জীবনে মা এবং দাদাদের উপরই সবচেয়ে বেশী অত্যাচার করেছি, এখনও করছি এবং ভবিষ্যতেও করবার আশা রাখি, তাই এই 'আবোল তাবোল' লেখাটি তাঁদের নামেই দিচ্ছি,—আশা অবশ্য একটু আছে যে তাহলে আমার লেখার পাঠক অন্তত কয়েকজন ঠিকই থাকবেন। আর সহকর্মী এবং বন্ধু শ্রীমান সিতাংশুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এই জন্যই যে তাঁর উৎসাহ না থাকলে এই 'আবোল তাবোল' আমার প্রলাপ বকার মধ্যেই থেকে যেত।

বইখানাতে ছাপার ভুল বেশ একটু বেশী মাত্রায়ই রয়ে গেছে। আমার স্বাভাবসিদ্ধ তাড়াহুড়োই তার জন্য দায়ী, ছাপাখানার কর্মী বন্ধুরা মোটেই নন। তবে সংশোধনী যোগ করে ঐ ভুলগুলোর একটা গতি করবার ইচ্ছাও নেই কারণ, যাঁরা ঐ ভুল ধরে আনন্দ লাভ করেন তাঁরা তাহলে আমার বইটি থেকে কোন আনন্দই পাবেন না।

১লা জুন, ১৯৫৭ লেখক

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই 'আবোল তাবোল' লেখাটি প্রথম প্রকাশের সময় মোটেই আশা করা যায়নি যে এ বই একখানিও বিক্রী হবে; কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যেতে বুঝা যাচ্ছে যে দেশে প্রলাপ শ্রোতার সংখ্যা নেহাৎ কম নেই। হয়ত তাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। বেড়ে বেড়ে অসংখ্যে পৌঁছে গেছে কিনা জানিনা, তবে বেশ মোটা সংখ্যায় যে এসেছে তাতে বোধ হয় বিশেষ ভুল নেই! তাই লক্ষণ শুভ বলেই মনে হয়। যাই হোক, বই-গুলো বিক্রী হওয়ায় কিছুটা রেস্ত সংগ্রহ হোল বলেই আবার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাবার ব্যবস্থা করা গেল। যদি এগুলোও বিক্রী হয়ে যায় তাহলে আবারও তৃতীয়, এবং ঐভাবেই আরও পরবর্তী সংস্করণ সমূহও প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

বইখানি অনেকের ভাল লেগেছে জেনে লেখক খুবই উৎসাহিত হয়েছেন। উৎসাহিত হয়েছেন এইটুকু জেনে যে পাগল তিনি একলাই নন, আরও আছে। তবে কেউ কেউ যে পাগল না হয়েও এবং অতি সুস্থ মস্তিষ্কেই বইখানির বিষয় যে-কোন পাগলের চেয়েও বেশী প্রলাপ বকেছেন, সেটাই লেখককে আনন্দ দিয়েছে সবচেয়ে বেশী,—সম্ভবত পাগলের-গোবধানন্দ, তাই।

ঢাকা এবং কলকাতার সরকারী মুখপত্রেরা বইখানির বিষয় যেরকম বেসামাল উত্তেজনা প্রকাশ করেছেন, তাও কম আনন্দদায়ক হয়নি—মনে হয় বইখানি স্বার্থবুদ্ধি এবং অন্ধবিশ্বাসের উপর আঘাত করবার অন্তত কিছুটা ক্ষমতা রাখে।

বন্ধুরা অনেকে বইখানির বিষয় অনেকরকম প্রশ্ন তুলেছেন। সেগুলিরই যথাসম্ভব উত্তর দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কারও কারও মতে বইখানি নাকি অতি 'সিরিয়াস,' তাই এ বইয়ের 'আবোল তাবোলে'র মত হাল্কা নাম দেয়া নাকি মোটেই ঠিক হয়নি। ওতে নাকি বইখানির গুরুত্ব কমে যাবে। জানিনা, কোন বইয়ের গুরুত্ব ঐ বইয়ের নামের উপর ঠিক কতখানি নির্ভর করে। তবে এটুকু ভালভাবেই জানি যে এ বইকে 'সিরিয়াস' মনে করবার মত 'সিরিয়াস' লোক আজ আর দেশে অনেক নেই। আজকের ভারত বা পাকিস্থানের অধিবাসীরা বইখানিকে সাধারণতঃ যেভাবে গ্রহণ করবে, বইখানির নাম সেই ধরণেরই দেয়া হয়েছে। আরও পঞ্চাশ বৎসর পরে, যখন হয়ত ভারত বা পাকিস্থানের অধিবাসীরা আবার তাদের জীবনের 'সিরিয়াসনেস' ফিরে পাবে, আবার হয়ত তাঁরা আত্মস্থ হবে, তখন যে এ বই-ই অতি সিরিয়াস ইতিহাস হিসাবেই গণ্য হবে—তাতে কোন ভুল নেই। তখন যে অনেক বিদ্বান এই ইতিহাস লিখেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাবিদ্বান উপাধিতে ভূষিত হবেন, এবং ছাত্রেরা এই ইতিহাস পাঠ করতে করতে লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্ষোভে এবং নিষ্ফল আক্রোশে নিজেদের কেশ উৎপাটন করবেন, তাতেও হয়ত কোন সন্দেহ নেই। তবুও আজকে, বড্ডই পঞ্চাশ বছর আগের আজ; তাই এ বই আজ শুধুই আবোল তাবোল—অতি হাল্কাভাবে লেখা, হাল্কা নামের 'আবোল তাবোল'।

দু'একজন আবার এমনও মত প্রকাশ করেছেন যে বইখানিতে নাকি সব জায়গায় সাহিত্যিক সংযম রক্ষা করা হয়নি। এই সাহিত্যিক বন্ধুদের শুধু এইটুকুই বলা যায় যে তাঁরা বইখানিকে ভুল বুঝেছেন। এ বই সাহিত্য নয়—আবোল তাবোল। আবোল তাবোলের অতি নির্মম, সত্য এবং নগ্ন ইতিহাস। ইতিহাসের চরমতম ভণ্ডামি এবং বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। লক্ষ কোটি মানুষের রক্ত আর তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসের ইতিহাস। লক্ষ লক্ষ নারীর দেহ বিক্রয়ে বাধ্য হবার ইতিহাস। এ সাহিত্য নয় এ শুধুই ইতিহাস। একে যদি সাহিত্য বলা হয় তবে এ হচ্ছে 'ময় ভুখা হু' সাহিত্য,—যে সাহিত্যে সংযমের স্থান খুব উচ্চে কখনই নয়।

আর সংযমই যে জীবনের শেষ কথা তাও মোটেই নয়। সৃষ্টির ধারাকে

অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে সময় বিশেষে যে সংযম ভঙ্গের একান্তই প্রয়োজন, তাও অজানা নয়—সমাজ ব্যবস্থায়ই সে বিধান দেয়া আছে। শুধু মনুষ্য সৃষ্টির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য সংযম ভঙ্গের বিধান শিরোধার্য করব, আর সমাজ, রাষ্ট্র বা অন্য সব সৃষ্টির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার বেলায় সংযমের কৌপিন এঁটে বসে থাকব—এটা কোন সংযম নয়, হয়ত দুর্বলতা ঢাকবার অতি সস্তা অপপ্রয়াস মাত্র। এটা কোন যুক্তিও নয়—যুক্তি হতে পারেনা। যুক্তি হতে পারেনা বলেই, এবং ঐ অযৌক্তিক যুক্তির পথে চলবার ফলেই আজ এসেছে চরম বিশৃঙ্খলতা,—সমাজ এবং রাষ্ট্র হারিয়ে ফেলেছে তাদের ভারসাম্য। চারিদিকে আজ শুধুই আবোল তাবোল। তাই 'আবোল তাবোলই' আবার সংযম ভঙ্গ শুরু করেছে—সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার সৃষ্টির ধারাকে নূতন ভারসাম্যে ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যেই।

কয়েকজন আবার বইখানি ভাল লাগলেও, বইখানার নিরাশাবাদিতায় হতাশ হয়েছেন। জানিনা, সুস্থমস্তিষ্ক ভদ্রমহোদয়গণের পক্ষে পাগল বা প্রলাপবক্তাদের চেয়ে বেশী আশাবাদী হওয়া আদৌ সম্ভব কিনা। তবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সুস্থমস্তিষ্ক কাউকেই আশাবাদী হতে দেখেছি। বলেও মনে পড়ে না। বিশেষ বিশেষ কারণে এবং নিজেদের অতি বিশেষ দুর্বলতা ঢেকে রাখবার জন্য অনেককে অবশ্যই আশাবাদী সাজতে দেখেছি। তবে তাদের আশাবাদিতা যে আশাবাদিতার ভাণ ভিন্ন অন্য কিছুই নয়, তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয়নি। বইখানি 'আবোল তাবোল' তাই একেবারেই আশাবাদিতায় ভরপুর। তবে এ আশাবাদিতা নেতিবাচক—কিছু করতে হবেনা সব ঠিক হয়ে যাবে, আশাবাদিতা নয়; ইতিবাচক—কিছু করে সব ঠিক করতে হবে, আশাবাদিতা। গান্ধীজির অহিংসা বাণী গ্রহণ না করলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, শ্রীনেহেরু না থাকলে ভারত অচল হয়ে যাবে, হিন্দি রাষ্ট্রভাষা না হলে ভারতের একতা গড়ে উঠবে না, প্ল্যানিং না হলে কোন কাজ হবেনা, বিশেষ বিশেষ মতবাদ (ism) প্রচার না হলে সাম্য আসবে না ইত্যাদি আরও শত রকমের একান্ত নিরাশাবাদিতা, অতি উদ্দেশ্য-মূলকভাবে আজ যা প্রচারিত হচ্ছে; সেই শত নিরাশাবাদিতার না-য়ের বিরুদ্ধে বইখানি একান্ত আশাবাদী কথা বলতে চেষ্টা করেছে। চেষ্টা করেছে বলতে যে কিছু করলে তবেই সব ঠিক হবে;—চেষ্টা করেছে আশাবাদীর ইতিহাসকে রূপ দিয়ে ফুটিয়ে তুলবার। নিরাশাবাদিতার চিহ্নমাত্রও বইখানার কোথাও নেই।

দু'একজন আবার এমনও বলেছেন যে বইখানিতে গঠনমূলক প্রস্তাব বিশেষ নেই। এই 'গঠনমূলক প্রস্তাব' কথাটির মানে প্রলাপবক্তা লেখকের বিশেষ জানা নেই। আজকাল বিশেষ বিশেষ মহল থেকে "ধ্বংসাত্মক সমালোচনার কোন মানে হয় না; গঠনমূলক সমালোচনা কর, গঠনমূলক প্রস্তাব দাও" ইত্যাদি কথাগুলো এত বেশী বলা হচ্ছে যে ব্যাপারটা একেবারেই তালগোল পাকিয়ে গেছে—মানে কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। কারণ, যুক্তির সাহায্যে যখনই কোন সমালোচনা করা হয়, তখনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটি প্রস্তাবও আপনা থেকেই এসে যায়। যুক্তির সেই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রস্তাবটি কি গঠনমূলক নয়? গঠনমূলক প্রস্তাব মানে যদি এইরকমই হয়, 'ইহার পরিবর্তে ইহাই করা উচিৎ ছিল, এইরূপ না করিয়া ঐরূপ করিলে অত টাকা অত নয়া পইসা কম লাগিত', তাহলে সম্ভবত বইটিতে গঠনমূলক প্রস্তাব খুব বেশী নেই। শুধু তাই নয়, ঐ ধরণের গঠনমূলক প্রস্তাব দেবার উদ্দেশ্যে বইখানি মোটেই লেখাও হয় নি; লেখা হয়নি নয়া পইসা বাঁচাবার প্রস্তাব দেবার জন্য। রাজনীতির আদি এবং অন্ত-তেই যে মানুষ (Starting point and the goal of politics is man), তাকেই বাঁচাবার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে বইখানিতে। স্বামী বিবেকানন্দের একটি মৃতসঞ্জিবনী বাণী উদ্ধৃত করেই বইখানি আরম্ভ করা হয়েছে, এবং শেষও করা হয়েছে ঐ বাণীটি দিয়েই। তাই গঠনমূলক প্রস্তাব বইটিতে নেই বলে খুব বেশীদূর এগোন যায় না। তবে যাঁরা ঐ ক্ষুদ্র মনুষ্যটিকে বাদ দিয়ে বৃহৎ নয়া পয়সা বাঁচাবার গঠনমূলক প্রস্তাব পেতে চান তাদের কথাই আলাদা, এবং আলাদা বলেই ঐ স্বামীজীই তাদের উদ্দেশ্য করে বলে রেখেছেন "ফাঁকি দিয়ে কোন মহৎ কর্ম সিদ্ধ হয় না।"

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস অংশটির (প্রথম ভাগ) আর একটু ডিটেল আলোচনা দেবার জন্য অনেকে অনুরোধ জানিয়েছেন। সম্ভবত আরও একটু ডিটেল আলোচনা দিতে পারলে ভালই হ'ত, তবে ইতিহাসের যে ধারাটিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য ওটি দেয়া হয়েছে তার জন্য আরও বেশী প্রয়োজন আছে মনে হয় না। আর ঐ কাজে একটু অসুবিধাও ছিল, কারণ অনেক অসুবিধার মধ্যেই বইটি লেখা শেষ করতে হয়েছে,—অনেকটাই লিখতে হয়েছে শুধুমাত্র স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করেই। শুধু স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করে বেশী ডিটেলে না যাওয়াটাই বোধ হয় ভাল।

কয়েকটি বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয়েছে বলেও কেউ কেউ জানিয়েছেন—

কথাটি খুবই সত্যি। তবে এ ধরণের বইয়ে কিছু পুনরাবৃত্তি না করেও বোধ হয় উপায় নেই। দু'একটি পুনরাবৃত্তি বাদ দেয়া অবশ্যই কঠিন নয় কিন্তু তাড়াহুড়োতে এবারও ওগুলো বাদ দেয়া সম্ভব হোল না, যদি আবারও নূতন সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয়, তাহাল সে চেষ্টা অবশ্যই হবে।

বন্ধুরা অনেকে বইখানি ইংরেজী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁদের শুভেচ্ছা থাকলে অনেক কিছুই অসম্ভব হবে না; তবে সবই নির্ভর করে রেস্ত সংগ্রহের উপর, রেস্ত সংগ্রহ হলে অনেক কিছুই হতে পারবে। আপাতত এক বন্ধু বইখানির ইংরেজী অনুবাদ করবার ভার নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছেন।

নানা রকমের উৎসাহ বাণী বহন করে কয়েক শত চিঠি যা লেখকের হস্তগত হয়েছে, সেগুলো লেখককে খুবই উৎসাহিত করেছে, এবং সেজন্য লেখক একান্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। চিঠিগুলো যা লেখক কলকাতা উপস্থিত থাকাকালে এসেছে, সেগুলোর প্রায় সবই নিজেই উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। অন্যগুলোর উত্তর দিয়েছে শ্রীমান বুদ্ধদেব (ভাইপো) কুমারী ইলা (ভাইঝি) এবং কুমারী জয়া (ভগ্নী)। তা সত্ত্বেও যদি কেউ উত্তর না পেয়ে থাকেন তাহলে লেখকের দুর্ভাগ্য বলতে হবে। কিংবা হয়ত পোষ্ট অফিসের কর্মদক্ষতার জন্যও হতে পারে। আর কয়েকজন যারা গালাগালি করে চিঠি দিয়েছেন, তাঁরা কেউই ঠিকানা দেননি, তাই তাদের কোন উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি। তাদেরও লেখক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এই জন্যই যে, তাদের চিঠিগুলি অন্তত বিভিন্ন মহলে বইখানি প্রকাশের reaction বুঝতে সাহায্য করেছে।

কাগজের কালোবাজারী ভদ্রমহোদয়গণের কল্যাণে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিয়ে বের করতে অনেক বেশী দেরী হয়ে গেল। খরচও লাগল অনেক বেশী। শুধু তাই নয়, বইখানি ছাপতে তিন রকমের (২৮ পাউণ্ড, ৩২ পাউণ্ড এবং ৩৬ পাউণ্ড) কাগজ ব্যবহার করতে হল, তাই ঐ ভদ্রমহোদয়গণকেও বাহাদুরী দেয়া হচ্ছে, এই জন্যেই যে, সাদা কাগজের সাদাবাজার বলে তারা আর কিছু অবশিষ্ট রাখেন নি,—কালোবাজারী ভারতের ঐতিহ্য তাঁরা পুরোভাবেই রক্ষা করে চলেছেন। 'আবোল তাবোলের' দ্বিতীয় সংস্করণ বইটি গান্ধীবাদী ভারতের কালোবাজারী ঐতিহ্যের নিদর্শন হিসাবেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকুক।

"কণীনিকা" ইতি—

২৫শে মার্চ, ১৯৫৮ **লেখক**

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'আবোল তাবোলের' তৃতীয় সংস্করণও শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হোল। পুরো এবং ডবল মাত্রার দুটো সংস্করণ বিক্রী হবার পর বাংলা বইয়ের বাজারে আবারও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা কিছুটা দুঃসাহসের কথা হলেও, 'আবোল তাবোল' আবারও প্রকাশিত হচ্ছে এই ভরসায় যে, দেশে আবোল তাবোল ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আবোল তাবোল কার্য্যকলাপ ত বটেই, সেই সঙ্গে 'আবোল তাবোলে'র পাঠকও। আবোল তাবোল কার্য্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে 'আবোল তাবোলের' পাঠক সংখ্যাও যে ক্রমেই বেড়ে যাবে বা বাড়তে বাধ্য তাতে আর সন্দেহ কি! কি অনুপাতে বাড়ছে সেটুকুই শুধু বুঝতে পারা কঠিন। তবে আবোল তাবোলও যে ক্রমেই বাড়ছে এবং এক আধজন যে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে পাগলামিও সুরু করেছেন সেইটুকুই আশার কথা। যেদিন ঘরে ঘরে ছেলেরা আত্মকেন্দ্রিক সুস্থ মস্তিষ্কের কপালে লাথি মেরে পাগলামি করবার জন্ম রাস্তায় নেমে আসবেন, সেই সুদিনের আশায়ই 'আবোল তাবোল' আবারও প্রকাশিত হচ্ছে। 'আবোল তাবোল' ইতিহাস ঠিকই ; তবে শুধুমাত্র বিদ্যা ফলাবার উদ্দেশ্য নিয়েই এ ইতিহাস যে লেখা হয়নি তাও নিশ্চয়ই অনেকেই বুঝতে পেরেছেন। এ ইতিহাস লেখা হয়েছে নূতনতর ইতিহাস সৃষ্টির আশা নিয়েই,—যে ইতিহাস হবে শুধুই পাগলদের পাগলামির ইতিহাস। তাই আবারও নয়, প্রয়োজন হলে আরও বহুবার 'আবোল তাবোল' প্রকাশিত হবে।

তবে নূতনতর ইতিহাস সৃষ্টির আশা নিয়ে লেখা ইতিহাস বলেই 'আবোল তাবোল' যে শুধুই উদ্দেশ্যমূলক বাজে কথার ইতিহাস নয় তাও ইতিমধ্যেই অনেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। আর মৌলানা আজাদের 'India Wins Freedom' বইখানি প্রকাশিত হবার পরে 'আবোল তাবোলের' প্রেস্টিজ ত অনেকটাই বেড়ে গেছে। তাই, গান্ধী-জহরলালের ভণ্ডামি এবং বিশ্বাসঘাতকতাকে প্রকাশ করে দিয়ে তাদের বিষয় কিছু সত্যিকথা সোজাভাবে লিখবার জন্ম যারা অনেকে 'আবোল তাবোল' লেখকের উদ্দেশ্যে নানারকম গালিগালাজ করেছিলেন, তাঁরা আজ 'India Wins Freedom' বইখানা পড়ে কি বলেন সে প্রশ্নও তুলতে চাইনা। শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, 'আবোল তাবোলের' সমর্থনে আরও অনেক অনেক বই এবং ঘটনা প্রকাশিত হবে। মৌলানা আজাদের বইয়ের যে ৩০ পৃষ্ঠা এখনও প্রকাশ

করা হয়নি. সেই ৩০ পৃষ্ঠা প্রকাশ পেলেও 'আবোল তাবোলের' সমর্থনেই আসবে।

গান্ধী মহাত্মা যে কি চীজ ছিলেন তা মৌলনা আজাদ ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। জহরলালকেও প্রকাশ করে দিয়েছেন পুরোপুরিভাবেই,—তবে বাকি ৩০ পৃষ্ঠা প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত জহরলালের বিষয় পুরোটা জানবার সৌভাগ্য সকলের হবে না। জহরলালের বিষয় পুরোটুকু আপাতত 'আবোল তাবোল' মারফৎই জানতে হবে, কারণ বাকি ৩০ পৃষ্ঠায়ও মৌলনা সাহেব 'আবোল তাবোলের' মতামতকেই পুরোপুরি সমর্থন জানিয়েছেন।

কংগ্রেস সভাপতি হিসাবেই তিনি জানিয়েছেন যে গান্ধী নেতৃত্বে কংগ্রেসী রাজনীতি ভাঁওতা এবং ভণ্ডামি ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। ১৯৪২ সালের 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাবও যে প্রস্তাব পাশ করা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছিল না, তাও তিনি অতি পরিষ্কারভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর, গান্ধী-জহরলালই যে ভারত বিভাগের আসল কর্ম্মকর্তা, সে কথাও বুঝিয়ে বলতে তিনি ভুল করেননি। এমনকি গান্ধী যে ঋষি টলষ্টয়ের অহিংসা দর্শনটিকে চুরি করে নিজ নামে চালিয়ে দিয়েছেন সে কথাও তিনি 'আবোল তাবোলের' সুরে সুর মিলিয়েই বলেছেন। উপরন্তু গান্ধী-জহরলালের স্বরূপ প্রকাশ করাই যে তাঁর বইখানি লিখবার উদ্দেশ্য, তাও বইখানি যে পড়েছে তারই বুঝতে ভুল হয়নি। তা হলেও, অন্ধবিশ্বাসের মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পৌত্তলিকতা আজও যাদের জীবনকে ঘিরে রয়েছে, যাদের আজও ঐ পঞ্জিকা দেখে 'বর্ত্তাকুভক্ষন নিষেধ' বা 'পূর্ব্বদিকে গমনং নাস্তি' মেনে চলতে হয়, সেই ভারতীয়দের মনের গহন থেকে ঐসব অন্ধবিশ্বাসকে টেনে নামান অত সহজ হবে না কখনই। তাই 'আবোল তাবোল'কে হয়ত আরও বহুবার প্রকাশিত হতে হবে, এবং মৌলনা আজাদের মত আরও অনেককেই এগিয়ে আসতে হবে 'আবোল তাবোলের' সমর্থনে।

'একটু সংযম রক্ষা করে লেখা হলে বইখানি ভদ্র সমাজেও বেশ ভাল চালু হতে পারত' এ ধরণের উপদেশ বন্ধুদের কাছ থেকে ছাড়াও আরও অনেকের কাছ থেকেই পাচ্ছি—এমনকি যাদের জীবনের সঙ্গে সংযমের কোনই সম্পর্ক নেই, এমনও অনেকের কাছ থেকেই। তাই, সংযমকে সম্মান দেখাবার কোন প্রয়োজনবোধ করিনি। ঐসব ভদ্র সমাজ থেকে অনেক দূরেই থাকি এবং তাদেরকে যথেষ্ট ভয় করেই চলি, সেই কারণেই সেখানে প্রবেশ করবার কথাও

উঠতেই পারে না। 'আবোল তাবোল' আপাতত ঐসব ভদ্রসমাজের বাইরে থাকলেও 'আবোল তাবোলের' বিশেষ অসুবিধা হবে না।

বহু রকমের প্রস্তাব এবং প্রশ্ন উত্থাপন করে বহু চিঠি 'আবোল তাবোল' লেখকের নামে এবারও এসেছে। প্রাপ্তি স্বীকার পত্র অনেকেই পেয়ে থাকলেও অনেকেরই প্রস্তাব এবং প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি। এখানেও সব উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। 'আবোল তাবোলে' কেন 'বিনোবা ভাবে এবং ভূদান যজ্ঞের' বিষয় কিছুই আলোচনা করা হয়নি? প্রশ্নটি অন্তত ৫০ জনের কাছ থেকে এসেছে, তাই শুধু ঐ বিষয়েই এইটুকু জানাচ্ছি যে, বিনোবা এবং ভূদান বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষভাবে এত খবর জানা আছে যে ঐ বিষয়ে কিছু লিখতে গেলে তা মহাভারত না হয়ে পারে না, এবং সেই ভয়েই ওটিকে বাদ দিয়ে এসেছি। ভূদান মারফৎ বিনোবাকে যে একটি অলৌকিক ভণ্ডে পরিণত করবার চেষ্টা হচ্ছে তা বুঝতে বেশী সরু বুদ্ধির দরকার হয় বলে মনে হয় না। গান্ধী মহাত্মা শিখিয়ে দিয়ে গেছেন ভারতে বাজার মাৎ করতে হলে গেরুয়া বা কৌপিন ধরতেই হবে। কিন্তু ক্ষমতা, এরোপ্লেন বা 'চিকেন রয়াল' ছেড়ে ত আর গেরুয়া কৌপিন ধরা চলে না। তাই সকল কুকর্ম্মের সাফাই দেবার জন্য কৌপিনধারী এক অলৌকিক ভণ্ডের সৃষ্টি করা হয়েছে। বিনোবা লোকটিও যে একটি অতি বাজে লোক, এ ব্যাপারটিও আমার ব্যক্তিগত ভাবেই জানা।

ভাইঝি এবং ভাগ্নী যাদের উপর চিঠির উত্তর দেবার ভার ছিল, তাদের হঠাৎ বিয়ে হয়ে যাওয়ায়, এবং আমি নিজেও বহুদিন কলকাতা অনুপস্থিত থাকায়, শেষের দিকে অনেকগুলি চিঠির উত্তর ত দূরের কথা প্রাপ্তি স্বীকার পত্রও দেয়া হয়ে উঠেনি। সেজন্য একান্তই লজ্জিত। আগামীতে চিঠির উত্তর দেবার ভার থাকল কুমারী বীথি (ভাই ঝি), শ্রীমান বিশ্বজিৎ (ভাইপো) এবং শ্রীমান ইন্দ্রজিৎ (ভাইপো) দের উপর।

"রংপুর গার্ডেনস"
কোনচৌকি
ডায়মণ্ড হারবার রোড,
২৪ পরগণা।

ইতি—
লেখক

সূচীপত্র

স্বাধীনতার আবোল তাবোল

প্রথম ভাগ

প্রারম্ভিক

আমরা আজ দশ (চৌদ্দ) বছর হ'ল স্বাধীন হয়েছি। পৃথিবীর যে-কোন দেশের লোকের সাথেই আজ আমরা সমান তালে ইয়ার্কি করবার ক্ষমতা রাখি। পরাধীন বলে অবজ্ঞা করবার অধিকার আর কারুর নেই। তবে স্বাধীনতার ফলে আমরা কেউ-বা হয়েছি পাকিস্থানী আর কেউ-বা সেই সনাতন ভারতীয়ই র'য়ে গেছি, এই যা একটু অসুবিধা। অসুবিধা এই জন্যই যে মাঝে মাঝে আমাদের স্বাধীন হিন্দুস্থানীত্ব বা স্বাধীন পাকিস্থানীত্ব প্রমাণ করবার জন্য পরস্পরের প্রতি খাঁটি হিন্দি সংস্কৃতির অনুকরণে নানারকম খিস্তি করবার প্রয়োজন হয়। যদিও আমাদের অনেকেরই বাপ-মা, ভাই-বোন, হয়ত হিন্দু-স্থানী আর নিজেরা পাকিস্থানী, এবং অনেকেরই হয়ত ছেলে-মেয়ে, ভাইপো-ভাইঝি এরা পাকিস্থানী আর নিজেরা হিন্দুস্থানী। ব্যাপারটা যে সত্যিই একটু অসুবিধার তা ত বুঝতেই পারা যায়।

শুধু যদি হিন্দুরা হিন্দুস্থানী আর মুসলমানেরা পাকিস্থানী হ'ত, তাহলেও হয়ত ব্যাপারটা একটু সোজা মনে হ'ত। প্রায় সাড়ে চার কোটি মুসলমান আজও ভারতে আছে, আর পাকিস্থানেও হিন্দুর সংখ্যা আজও সওয়া আশি লক্ষের কম হবে না। এরা যে সবাই নেহাৎ দায়ে ঠেকেই ভারতে বা পাকিস্থানে আছে, তাও মোটেই সত্যি মনে হয় না। টাকা-পয়সা, ধন-সম্পত্তির আশা ছেড়ে অজানা পরিবেশের মধ্যে রিক্ত হস্তে এসে দাঁড়ান খুবই কঠিন কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই ব'লে জন্মভূমির মায়াটাও যে খুব কম জোরাল আকর্ষণ তাও ঠিক নয়। যদি জন্মভূমির জন্য ভালবাসাটা কিছুই না হ'ত, তাহলে ইংরেজ তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করারও কোন মানে হ'ত না। যাই হোক, আমি হিন্দু পূর্ববঙ্গে আমার জন্মভূমিতেই থাকি এবং সেইখানেই থাক্‌বার আশাও রাখি। স্বাধীনতার এই দশ (চৌদ্দ) বছরের থাকাটা যে খুব সহজসাধ্য হয়েছে তাও বলি না, তবুও আছি এবং থাক্‌ব। পুত্র কলত্রের উৎপাত নেই, ঝঞ্ঝাট বা চিন্তাও নেই, তাই হয়ত এত

জোর গলায় বলছি থাকলে হয়ত অন্যরকম করতাম। তবে এটুকু ঠিক যে, আমাকে যদি কখনও দেশত্যাগ করতেই হয়, তবে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে যাব না। ভারতের সাথে আমার যেটুকু সম্পর্ক তা ত ঐ জন্মভূমি পূর্ববঙ্গের মাধ্যমেই। যদি সেই জন্মভূমিকেই পরিত্যাগ করতে হয়, তবে যাবার জন্য পৃথিবীতে অনেক ভাল ভাল দেশ আছে—অনেক স্বাস্থ্যকর এবং সমৃদ্ধিশালী পরিবেশও আছে।

আমি পূর্ববঙ্গে রংপুরে থাকি। ওই জায়গাই হচ্ছে আমার নিজভূমি। রাজনীতি কখনও করেছি কিনা জানিনা, তবে হ্যাঁ, স্বাধীনতার জন্য লড়াই করাটাও যদি রাজনীতির পর্যায়ে পড়ে, তাহলে অবশ্যই রাজনীতি কিছু করেছি এবং অনেকের চেয়ে বেশিই করেছি। রাজ্য শাসন করবার যে রাজনীতি—সে রাজনীতি করবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার হয়নি, বা হবার যে কোন আশা আছে তাও মনে করবার কোন কারণ ঘটেনি। তবে, রাজনীতি করিনা ব'লেই যে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তাও নয়! এদিকে ওদিকে আমার যত বন্ধুরা আছেন, তাঁরা ত প্রায় সবাই আজ ঐ করেই উদরান্নের সংস্থান করছেন। কেউ কেউ ত বেশ গুছিয়েও নিয়েছেন দেখতে পাই। আর আমি নিজেও ত একটা রাজনৈতিক সংস্থার, মানে, পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট সদস্য। তবুও সত্যিকথা এই যে, আমি রাজনীতি করি না। আমাদের পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেস রাজনীতি করে, সেটাও একটা মস্ত ভুল ধারণা। অনেকদিনের নেশা, তাই একটা গালভরা নাম নিয়ে চলতে ভাল লাগে, এই পর্যন্ত।

আজ নয় বৎসর পূর্বে যখন পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেস গঠন করা হয়েছিল তার পরে পাকিস্থানে বা ভারতে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। পাকিস্থানে মুস্‌লিম লীগের লালবাতি জ্বলে গেছে, আর ভারতে জাতীয় কংগ্রেস বিজাতীয় কংগ্রেসের পর্যায়ে নেমে এসেছে কিন্তু পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেসের কোন পরিবর্তন হয় নি। সদস্যরা যাঁরা মরে বেঁচেছেন তাঁদের ত কথাই নেই, আর যাঁরা ভারতে চলে গেছেন, তাঁরা অবশ্যই বিজ্ঞ ব্যক্তি। আর তারপরও যাঁরা এখনও পাকিস্থানে আছেন, তাঁরা যে কারা, বা কে কে সে-কথা জিজ্ঞেস করলে লজ্জা পেতে হবে কারণ পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেসের এমন কোন কাগজপত্র নেই, যার থেকে বলা যাবে, অমুক অমুক লোককে নিয়ে এই বিরাট রাজনৈতিক সংস্থাটি সংগঠিত হয়েছিল। একজন সভাপতি এবং একজন সম্পাদক অবশ্যই

আছেন, আর আছেন আইনসভায় ঐ দলীয় কয়েকজন সদস্য; এবং কয়েকটি জেলায় জেলা-কংগ্রেস সভাপতি বা সম্পাদক। কি উদ্দেশ্যে যে এটির জন্মদান করা হয়েছিল, সে কথা আজ আর বিশেষ কারও মনে আছে বলেও মনে হয় না, এবং সেই জন্যেই বোধ হয় কোন কাজও হয় না। অত্যুৎসাহী দু'একজন এবং আইন-সভার সদস্যরা যখন কোন উপলক্ষে ঢাকায় মিলিত হবার সুযোগ পান, তখন অবশ্য দু'একটি প্রস্তাব পাস করে রাখা হয়। যাক্‌গে ওসব। আমি রাজনীতি করি না কারণ, করা সম্ভব নয়,—মুসলমানেরা আমাদের বিশ্বাস করে না, আর হিন্দুরা আমাদের ভয় পায়। অবশ্য এরকম কোন ইঙ্গিত করাও আমার উদ্দেশ্য নয় যে আমার কর্মক্ষমতা বা উদ্যম সীমাহীন, প্রায় শরৎচন্দ্রের সব্যসাচীর মতই, শুধুমাত্র ঐ অসুবিধাগুলির জন্যেই কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না।

পাকিস্থানে থেকে আজ আমার মত লোকের পক্ষে ঠিক যা করা সম্ভব সেইসব কাজই করছি,—ফল মূল আবাদের মাধ্যমে কৃষিকাজ, আর সখের বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে মাঝে মাঝে একটু বন মহোৎসব; অন্য আর কিছুই নয়। খেয়ে দেয়ে ঘুরে বেড়াই, কোথাও একটু আড্ডা জমাতে পারলে সহজে উঠিনা। তবে দিনের বেলায় আড্ডা জমান খুব সহজ হয় না,—সবাই ত আর আমার মত ভবঘুরে বা ভ্যাগাবণ্ড নয়। সন্ধ্যার পর থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত আমাদের আড্ডা একেবারে গুলজার। ডাঃ মৈত্র আমাদের কংগ্রেস সভাপতি, আমি, কয়েকজন বন্ধু, আর তাঁর ডিসপেন্সারী। আমাদের আড্ডায় আলোচ্য বিষয়ের সীমা বা সংখ্যা কিছু নির্দিষ্ট করা নেই,—এবিষয়ে আমরা অনেকটা ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর বক্তৃতার বিষয়ের মতই উদার। সুস্থ সমাজ-জীবনে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কি হওয়া উচিত, তা থেকে হাইড্রোজেন বোমা এবং তারও পরবর্তী সব-কিছুই আমরা আলোচনা করি। ভারত বা পাকিস্থানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা অন্য সব বিষয়ে অগ্রগতির যে-সব ফিরিস্তি খবরের কাগজে বের হয়, তাও আলোচনা করি। দুদেশেরই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বা অন্য যে কোন ধরণের পরিকল্পনার যে-সব কল্পনা প্রকাশিত হয়, তাও আমাদের আলোচনা থেকে বাদ পড়ে না। তবে শুধুই আলোচনা করি আর কিছুই নয়। আলোচনার মধ্যে হয়ত কোন বন্ধু বলে বসলেন, "Politics is the last resort of a scoundrel" তখন আমরা ঐ কথাটা নিয়েও আলোচনা করি এবং শতবৎসর পূর্বে যে জ্ঞানী মহাপুরুষ এই মহাসত্যটি আবিষ্কার করেছিলেন, সকলে মিলে তাঁকে আমাদের নমস্কার

জানাই। অবস্থার বিবর্তনে আমাদের আলোচনা বা সমালোচনা অবশ্যই যে নিষ্কাম এবং নিরপেক্ষভাবেই হয়, তাতে আর সন্দেহ কি!

একটা কাজ আরও করেছি। আমার বাড়ির পেছনে যে জঙ্গলটা ছিল সেটা পরিষ্কার করে সেখানে আশ্রম নাম দিয়ে একটা ইস্কুল খুলেছি। খুব বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে সেখানে পড়ে, আর আমাদের 'পাগলা ফকুদা' পড়ান। মনে করবেন না যে মস্ত একটা গঠনমূলক কর্মকেন্দ্র গ'ড়ে তুলে আমার নিজের রাজনৈতিক গোড়াপত্তনের ফিকিরে আছি। তবে ঠিক কেন যে ওটা চালাচ্ছি তা বোধ হয় আমি নিজেও জানিনা। অনেক সময় মনে হয় আমার ঐ স্কুলটা চালাবার ভেতরে কোন সৎ উদ্দেশ্য নেই, ওটা চালাচ্ছি অনেকটা বর্তমান রাজনৈতিক বন্ধুদের বিদ্রূপ করবার জন্যই ;—"আরে, ইচ্ছে করলে আমরা সেই স্বাধীনতা-পূর্বযুগের কর্মীরাই অনেক কিছু করতে পারি, শুধু বক্তৃতা করাই আমাদের কাজ ছিল না" ভাবটা অনেকটা এই ধরণের আর কি!

অনেক হিন্দু এসে সময়ে অসময়ে পরামর্শ জিজ্ঞেস করে, "কি বলেন, থাকা কি যাবে? চারদিকে প্রতিবেশীদের দিন দিন যেরকম ব্যবহার দেখছি তাতে থাকা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে, আর সবাই ত চলে গেল। আপনি এ বিষয়ে কি বলেন? আপনি ত অনেক খবর রাখেন, একটা পরামর্শ দিন।" এই পরামর্শ বিষয়ে আমি আগাগোড়াই খুবই পরিষ্কারভাবে কথা বলি। অবশ্য যাকে বলি সে কতটা পরিষ্কার বুঝে বা কি বুঝে, সে কথা জানবার আগ্রহ আমার কোনদিনই নেই। আগে বলতাম, "যদি এখানে থাকা একান্তই অসম্ভব মনে করেন এবং ওদিকে গেলে কিছু সুবিধা হবে আশা রাখেন, তাহলে আপনার চলে যাওয়াই ভাল, তবে একবার ভিটে ছাড়লেই রাস্তায় দাঁড়ালেন সেকথাটা বুঝে নিয়েই মন ঠিক করবেন।" আর ইদানীং ভারত এবং পাকিস্থানের রাজনীতির বিষয় জ্ঞান-বৃদ্ধির ফলে, ঐ বিষয়ে পরামর্শ দিতে হলে যা বলি তাও খুবই পরিষ্কার। কিন্তু সুবিধে হচ্ছে এই যে আমার বুদ্ধির দৌড় বুঝতে কেউই ভুল করে না, তাই যে-সব লোক রাস্তায় পড়ে মরবে বলেই জন্মেছে, তারাও আমার পরামর্শের বিশেষ কোন মূল্য দেয় বলে মনে হয় না। আজকাল বলি, "প্রাণ বাঁচাতে প্রাণান্ত হয়ে হিন্দুস্থানের রাস্তায়, গাছতলায়, বাস্তুহারা শিবিরে, শিয়ালদহ স্টেশনে, জঙ্গলে এবং মরুভূমিতে, পূর্ববঙ্গের যত লক্ষ লোক মারা গেল বা নিহত হল, তত হাজার হিন্দু পূর্ব-বাংলায় মুসলমানদের হাতে মারা পড়ে নি। হিন্দুস্থানে গিয়ে যত সহস্র

পূর্ববাংলার মেয়েকে উদরান্নের জন্য পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে শত শত হিন্দু তরুণীকে পূর্ববাংলার মুসলমানেরা ধর্ষণ করেছে বলে আমার মনে হয় না। আর বিহার এবং আসামে আজ বাঙ্গালীর সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করা হয়, সে তুলনায় পূর্ববাংলার মুসলমানদের ব্যবহার অনেকটাই সভ্য। তবে থাকবেন কি যাবেন সে বিষয়ে শেষ মত আপনার হাতে; আপনাদের সুবিধা-অসুবিধা বুঝে আপনাকেই ঠিক করতে হবে।" অবশ্য আমার মত জিজ্ঞেস করে বলেই যে তারা আমার মত শিরোধার্য করবে, এরকম কথা আমি কখনও মনে করি না, তারা ত নয়ই। যে যার সুবিধা-অসুবিধা বুঝেই থাকে বা যায়, পরামর্শ করাটার বিশেষ কোন মূল্য নেই। আর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন,—"কেমন আছেন?" তাহলে হেসে উত্তর দেই, "পাগলের গোবধে আনন্দ, ভালই আছি। খারাপ থেকে লাভ কি?" বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলেন; "পাকিস্থানে তুমিই একমাত্র সুখী।" উত্তরে বলি, "হিন্দুস্থানে গেলেও কোন শালা আমাকে দুঃখী করতে পারত না, এটা ঠিক, কিন্তু মেজাজটা বোধ হয় সবসময় ঠিক রাখা যেত না। যাই বল, এত ভণ্ডামি এখানে নেই।" এখানে নীচতা আর ক্লৈব্যতাকে একটা বড় আদর্শের মুখোস পরিয়ে বাজীমাৎ করবার চেষ্টা হয় না। শত্রু এখানে শত্রুভাবেই আসে, মিত্রের ছদ্মবেশে দেশের জনগণের রক্তশোষণের চেষ্টা করছে না। অহিংসার বুলি আর রাইফেলের গুলিও এখানে একসঙ্গে চলে না। তবে হাঁ, পাগল আমরা একটু তাতে কোন ভুল নেই। আমি পাগল, 'ফন্তুদা' পাগলা আর যদি তাই না হব তবে আজ বন্ধুরা করে খাচ্ছেন কিভাবে? অনেক পাগল থাকে বলেইত কেউ কেউ করে খায়,—মানে রাজনীতি করে খায়। কে একজনত বলেই রেখেছেন, "Politics is the madness for many and gain for the few." আমরা অনেকেই যে সেই মেনি বেড়ালদের দলে।

কাজ আরও একটা জুটেছে, বর্তমানের মাপকাঠিতে খুব সম্মানিত কাজও বটে, তবে করবার সুযোগ হয় না। কলকাতার কতকগুলো সংবাদপত্রের সংবাদদাতার কাজ জুটেছে। 'একে একে যবে নিভিল দেউটী'র মত— এক এক করে যখন তাদের নিজস্ব সংবাদদাতারা ওপার হলেন, তখন তাঁরা ঐ কাজের জন্য আমাকে বেছে বের করলেন। আমিও উৎসাহের সঙ্গেই কাজটি আরম্ভ করলাম। সংবাদদাতার কাজ, কেন জানিনা, একটা ধারণা ছিল, মহাসম্মানের কাজ। কিন্তু এভুল ভাঙতে খুব বেশি দেরি হয়নি।

সাধারণের দিক থেকে যেটা একটা জরুরী খবর কাগজওয়ালাদের কাছে হয়ত সেটা ছাপবার উপযুক্ত নাও হতে পারে। যে খবর ছাপলে কাগজের কাটতি বাড়তে সাহায্য করে না, সেটা আবার খবর নাকি! যাহোক, ও হাঙ্গাম আমার আর বিশেষ নেই,—পূর্ববঙ্গ সরকারের এক আদেশ অনুসারে আমি কলকাতার একখানি কাগজ ভিন্ন অন্য কোন কাগজে সংবাদ পাঠাতে পারি না। যেখানেতে এখনও সংবাদ পাঠাতে বাধা নেই, সেটি আবার আমার প্রেরিত খুব কম সংবাদই ছাপে। বেশি ছাপতে গিয়ে পূর্ববঙ্গের বাজার নষ্ট করাটা ত আর বুদ্ধিমানের কাজ নয়! বুদ্ধিমান আমিও হয়েছি, সংবাদ আর পাঠাই না, বিনি পয়সায় একখানা কাগজ অবশ্য এখনও পাই।

আমার ইংরেজ ঠেঙ্গাবার সখ

আমার জন্মদিনের কথা আমার কিছুই মনে নেই, আপনাদেরও নিশ্চয় নেই, কারণ ওটা কারুরই মনে থাকবার মত কথা নয়। তবে শুনেছি, বছর চল্লিশেক আগে, প্রথম মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি, যেদিন আমি জন্মেছিলাম সেদিনটা ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের একটা বিশেষ ঘটনাবহুল দিন। জার্মানরা নাকি ঐ দিন ইংরেজদের খুব ঠেঙ্গিয়েছিল, আর সময়টা ঠিক বিষ্যুদবারের বারবেলা নাহলেও শনিবারের কালবেলা ছিল ঠিকই। তিথি, নক্ষত্র, বারবেলা, আর ঠেঙ্গাঠেঙ্গি মহাযুদ্ধ—এ সব মিলিয়েই আজ আমার আমিত্ব লাভ কিনা কে বলতে পারে! পঞ্জিকাকার—যাঁরা এসব বিষয় ঠিক ঠিক মত বলে দিতে পারেন তাঁদের জিজ্ঞেস করবারও সময় হয়নি, সময় পেলে এসব তাঁদের কাছ থেকে জেনে নিতে ভুল করব না। হিন্দুর ছেলে যখন, ঐ জন্মের জের যে আমাকে জন্মান্তরেও টেনে বেড়াতে হবে! তাই ব্যাপারটা জেনে নিয়ে বুদ্ধিমানেরই মত কাজ করে রাখব।

তবে ওসব কিছু না জানলেও যেটুকু জানি, তা হ'চ্ছে আমার ইংরেজ ঠেঙ্গাবার সখ। আমার এই সখ যে জার্মানদের ইংরেজ ঠেঙ্গাবার তারিখে জন্মের ফলেই হয়েছিল সে বিষয়েও আমার কোন সন্দেহ নেই। যখন খুব ছোট ছিলাম, স্বাধীনতা ইত্যাদির মত বড় বড় কথার বিশেষ-কিছুই বুঝতাম না,—অবশ্য বড় হয়ে এখনও যে ওসব কথার মানে খুব ভাল বুঝি তাও বলছিনা। আর স্বাধীনতা—যা ভারত এবং পাকিস্থানে দেখছি, এই যদি সত্যিকারের স্বাধীনতার রূপ হয়, তাহলে যে কি করতাম, তাও এখন আর

বলতে পারব না। যাই হোক, তখনও ইংরেজ ঠেঙাবার ইচ্ছেটা ছিল প্রবল। ঠিক ঐ কারণেই, যারা ইংরেজকে ঠেঙানি দেয় তারা ছিল আমার কাছে পরম বন্ধুর মত। যেদিন তাই ইংরেজ ঠেঙাবার দলে ভিড়ে পড়লাম, সেদিন আমার আনন্দ দেখে কে! আমরা ছোট ছিলাম, তাই রাজনীতি-টিতির ধার ধারতাম না, বিদ্যাচর্চা, স্বাস্থ্যচর্চা এবং ইংরেজ ঠেঙাবার প্লান চর্চা করতাম। আমাদের যাঁরা নেতা ছিলেন, মানে—দাদারা, তাঁরাও রাজনীতি করতেন কিনা জানিনা, তবে তাঁদের কারুর নাম কখনও খবরের কাগজে ছাপা হতে দেখেছি বলে মনে হয় না। খবরের কাগজে নাম না ছাপিয়ে রাজনীতি করা সম্ভব, একথা কোন মূর্খই বিশ্বাস করবে না, তাই মনে হয় তাঁরাও রাজনীতি করতেন না।

গান্ধী আন্দোলনের ধারা

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের কথা কিছুই মনে পড়ে না, কারণ তখন বড়ই ছোট ছিলাম। যেটুকু জানি তা হচ্ছে বড় হয়ে শোনা কথা বা বইয়ে পড়া কথা। শুনেছি ঐ আন্দোলনের নাম নাকি ছিল 'Non-co-operation Movement'—যার মানে হচ্ছে কিনা অসহযোগ আন্দোলন। ইংরেজ আমাদেরই সাহায্য এবং সহায়তায় আমাদের দেশের উপর রাজত্ব করছে, সে সাহায্য-সহায়তা আমরা আর তাদের দিচ্ছি না। তবে ইংরেজকে সোজাসুজি বিদায় অভিনন্দন দেবার জন্য আপাতত লাঠিসোটা বা ফুলের মালারও ব্যবস্থা করছি না। এই জন্যেই করছি না যে, আমাদের দেশের জনগণ অতখানির জন্য তৈরি হয় নি। বেশি কিছু করতে গেলে তারা পারবে না। যতটুকু তাদের দিয়ে সম্ভব ততটুকুই করাতে হবে। তাই এই নেতিবাচক আন্দোলনের ব্যবস্থা।

গান্ধীজীর প্লানটা যে নিখুঁত ছিল না, এরকম বলবার মত বিদ্যাবুদ্ধি হয়ত আমার আজও গজায় নি, কারণ দেশের সব লোক একসঙ্গে একদিল হয়ে একটা কাজ ক'রলে যে সিদ্ধ হবে না, তা আমি আজও বিশ্বাস করি না। তবে আমার চেয়েও অনেক বিদ্বান এবং বুদ্ধিমানকে বলতে শুনেছি যে গান্ধীজীর কথামত 'নয় মণ তেলও পুড়বে না, আর রাধাও নাচবে না'। মোটকথা, দোষ প্লানের নয়, দোষ দেশের হতভাগা জনগণের। তারা যদি

ঠিকমত এক হ'তে পারত, তাহলে ইংরেজকে দেশ-ছাড়া করা কেন, আমরা হয়ত পৃথিবীটাই জয় করে ফেলতে পারতাম।

১৯৩০ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনটা অবশ্য বেশ খানিকটা মনে আছে। কংগ্রেসী ভলান্টিয়ারে নাম লেখাবার মত বয়েস না হলেও কংগ্রেস অফিসে যাতায়াত এবং ঝাণ্ডা উঁচিয়ে চীৎকার করবার মত বয়েস হয়েছিল। রংপুরে দেখেছি দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক গাঁজা আর মদের দোকানে পিকেটিং করেছে, আর পুলিশ এসে যখন তাদের গ্রেপ্তার করেছে তখন "বন্দেমাতরম্" আর "গান্ধীজীকী জয়" বলে তারা জেলে গেছে। খবরের কাগজেও দেখেছি, সারা দেশময় ঐ ধরনের আন্দোলন আর জেলে যাওয়া হয়েছে। যদিও লবণ তৈরি করে লবণ আইন ভঙ্গ করাই এই আন্দোলনের প্রধান অঙ্গ ছিল, তাহলেও সমগ্র দেশে গাঁজা আর মদের দোকানে পিকেটিং করাটাই আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশের সব জায়গাতে ত আর সমুদ্র ছিল না, তাই হয়ত গাঁজা আর মদের দোকানে পিকেটিংটাই প্রাধান্য লাভ করেছিল। খবরের কাগজে অবশ্য আরও দেখেছি, অতি উৎসাহীরা অনেক জায়গায় তাড়ি খাওয়া বন্ধ করবার জন্য তালগাছ কাটতে লেগে গেছেন। কিন্তু তালগাছ কেটে, গাঁজা-মদ খাওয়া বন্ধ করে বা লবণ তৈরি করে যে কিভাবে ইংরেজকে বিদায় করা যাবে, তা আমি কখনও বুঝতে পারতাম না। এখনও যে বুঝি তাও নয়। অনেক সময় মনে হয় আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি, তা হচ্ছে ঐ তালগাছ-কাটা-স্বাধীনতা—আমার বোধগম্যের বাইরে। তবে ঐ তালগাছ-কাটা পলিটিসিয়ানদের হাতেই যে ক্ষমতা পড়েছে তাতেও কোন ভুল নেই।

বিজ্ঞদের মুখে ১৯৩০ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বরূপ সম্বন্ধে যে সব ভাষ্য শুনেছি, সেগুলোও মোটেই কম মুখরোচক নয়। তিরিশের আন্দোলনটা ছিল Civil Disobedience Movement,—মানে হচ্ছে কিনা আইন অমান্য আন্দোলন। এবার কিন্তু এটা আর নেতিবাচক নয়—রীতিমত ইতিবাচক। ১৯২১ সালের negative approach থেকে একেবারে positive approach-এ চলে এসেছি। তখন ছিল শুধু অসহযোগ, যার মানে হচ্ছে কিছু না করা আর এবার হচ্ছে disobedience to civil laws—কিছু করা, আইন অমান্য করা। আগের বার জনগণ যতটুকু জেগেছিল তাতে নাকি অসহযোগ করা ছাড়া আর বেশি কিছুই করা সম্ভব ছিল না। আর এবারের জন-জাগরণ যে

রকম, তাতে অনেক কিছুই করা চলে সেইজন্যেই আইন অমান্যের ব্যবস্থা। গান্ধী-দর্শনে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের যে পদ্ধতি আছে এটা হচ্ছে নাকি তারই দ্বিতীয় ধাপ। প্রথম ধাপ গেছে ১৯২১ সালে আর দ্বিতীয় ধাপ এলো ১৯৩০ সালে। বিজ্ঞদের মতে, এই দুই ধাপে আমরা স্বাধীনতার পথে যে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিলাম, তাতে সন্দেহ করবার কিছুই নেই। মোটকথা, এই সব আন্দোলন আমারও মন্দ লাগত না। এতে ইংরেজকে ঠেঙ্গাবার ব্যবস্থা না থাকলেও অন্তত সুরসুরি দিয়ে বিরক্ত করবার ব্যবস্থা ছিল। যে পন্থায়ই হোক-না-কেন গান্ধীজী যখনই ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতেন, আমাদের ভালই লাগত। কিন্তু সংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে প্রতিবারই যখন তিনি আপোষ-রফার পথে কিছু ক্ষমতা হাতড়াবার চেষ্টা করতেন তখনই তাঁকে আর বুঝতে পারতাম না।

কথাবার্তা বলে আপোষ-রফার ছলে কিছু ক্ষমতা সংগ্রহ করাটা যে খুব অন্যায় কাজ, ইতিহাস তা বলে না। বরং এই পথে ক্ষমতা সংগ্রহ করে পরবর্তী সংগ্রামে তাকে কাজে লাগান হয়েছে এরকম নজির ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। দুটো যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়টা যদি ঠিক মত কাজে লাগান না যায় তাহলে পরবর্তী সংগ্রামে শক্তি আসবে কোথা থেকে? মিলিটারীয় ভাষায় একেই বলা হয় 'regrouping and re-organization'এর সময়। এই সময়ে আবার নিজের শক্তিকে সংহত করতে হবে, তাকে আবাব নূতন করে সাজিয়ে নিতে হবে। আর এই কাজের অবসরে কথাবার্তা বলে, ভুলিয়ে ভালিয়ে শত্রুর কাছ থেকে যদি কিছু আদায় করা যায় তবে ত আরও ভাল। তাই রাজনীতিক্ষেত্রে seizure of power through negotiation কিছু একটা নিন্দার ব্যাপার নয়,—ওটা চালু এবং বুদ্ধিমানেরই মতবাদ। তবুও মনে হয় গান্ধীজী যখনই ঐ seizure of power through negotiation-এর পথে গেছেন, তখনই সব গুলিয়ে ফেলেছেন। মনে হয়েছে যে ঐটিই তাঁর সত্যিকারের এবং একমাত্র পথ, তাঁর সংগ্রামটা শুধুই লোক দেখানোর। ফলে সংগ্রাম করে তিনি দেশকে যতটুকু এগিয়ে দিয়েছেন, আপোষে ক্ষমতা হাতড়াতে গিয়ে তার ডবল পেছিয়ে দিয়েছেন।

১৯৩০ সালের আন্দোলনের ব্যর্থতার পর তিনি যখন আপোষ-রফার টেবিলে গিয়ে বসলেন, এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন ক্ষমতাটুকু পাবার জন্য শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (communal award) পর্যন্ত মেনে নিলেন

তখনই যে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করলেন, সে বিষয়ে বিজ্ঞ আর মূর্খেরা সবাই একমত। যে গান্ধীজী 'হিন্দু-মুসলমান এক না হলে ভারত কখনই স্বাধীন হবে না' এই শ্লোগান তুলেছিলেন, তিনিই শেষপর্যন্ত ঐ একটু ক্ষমতার লোভে হিন্দু-মুসলমানকে চিরতরে ভাগ করে দিলেন। এর চেয়ে আশ্চর্য এবং রহস্যজনক আর কি হতে পারে! গান্ধীজীর ঐ অসংযত ক্ষমতা লোভ ১৯৪৭ সালে নয়, ১৯৩৭ সালেই ভারতকে ভাগ করে রেখেছিল।

১৯৩৭ সালে কংগ্রেস বাংলা, পাঞ্জাব এবং সিন্ধু বাদে প্রায় সব প্রদেশ-গুলোতেই গদি দখল করে মন্ত্রী হল। ক্ষমতা হাতে পাবার পর তারা গঠনমূলক বা অন্যরকম কি কাজ করেছিল তা আমার মনে নেই, হয়ত মনে রাখবার মত কোন কাজই তারা করেনি। কিন্তু ঐ ক্ষমতা যতই সীমাবদ্ধ হোক-না-কেন, তাকে পরবর্তী কালের সংগ্রামে কাজে লাগাবার কোন প্লান যে কংগ্রেসের ছিল না সেটা খুবই পরিষ্কার। তা নাহলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বাজে অজুহাতে মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে আসবার কোন মানেই হয় না। অবশ্য ইংরেজের দুর্দিনে, তাদের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে দেশ স্বাধীন করবার মত ছোটলোকি কাজ গান্ধী-দর্শনে স্থান পায় না ঠিকই; তবুও ১৯৪২ সালে ঐ গান্ধীর নেতৃত্বেই কংগ্রেস আবার কেন যে সংগ্রাম করবার ভয় দেখিয়ে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, সেটাও এখনও অনেকেরই কাছে দুর্বোধ্য হয়ে রয়েছে। জাপানীদের অগ্রগতির গতিবেগ লক্ষ্য করেই হয়ত ওটা কররার দরকার হয়েছিল। মাস তিনেকের মধ্যেই যেভাবে ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম এবং বার্মা দখল শেষ হয়ে গেল, তখন ভারত দখল হতেও যে খুব বেশি দেরি হবে এরকম মনে করবার কোন কারণই ছিল না। বর্ষার আগে যদিও সম্ভব না হয়, তাহলেও বর্ষার পরে ভারতদখল বাকি থাকবে না,—এই মনে করেই হয়ত বর্ষার মধ্যেই ভারতের অহিংস নেতারা 'ইংরেজ ভারত ছাড়' শ্লোগান তুলেছিলেন। ফলও যা হওয়া সম্ভব তাই হয়েছিল। সত্যি-সত্যিই যদি লড়াইয়ের সময়ে ইংরেজের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁদের দেশছাড়া করবার ইচ্ছা কংগ্রেসের অহিংস নেতাদের থাকত, তাহলে অবশ্যই তাদের সংগ্রাম এবং তার প্রস্তুতি অন্যরকম হ'ত। যতই সীমাবদ্ধ ক্ষমতা হোক-না-কেন, মন্ত্রীত্বের গদী তাঁরা কখনই ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতেন না। এবং তারও আগে যখন তাঁরা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিলেন তখন থেকেই তাঁদের কাজ কারবার অন্যরকম হ'ত।

আসলে ১৯৩৭ সালে ক্ষমতা গ্রহণের সময় থেকে তারা যে রাজনীতি করে আসলেন, সেটা শুধু অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনকই নয়, রীতিমত রহস্যাবৃত। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর বাংলাদেশে যদিও কংগ্রেসের এককভাবে মন্ত্রীত্ব গঠন করা সম্ভব ছিল না, তবুও অনুমতি পেলেই বাংলা কংগ্রেস ফজলুল হক সাহেবের কৃষক-প্রজা-পার্টির সাথে হাত মিলিয়ে বাংলা দেশেও গদী দখল করতে পারত। ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি ত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল, কিন্তু কংগ্রেসের বড় কর্তারা তাতে রাজী হ'লেন না। এবারও ফল যা হওয়া উচিৎ ছিল, সেই রকমই হ'ল। ফজলুল হক মুসলিম লীগের সাথে হাত মেলা'লেন এবং আরও শেষ পর্যন্ত, ইংরেজ আর সাম্প্রদায়িকতার চাপে কৃষক-প্রজা-পার্টিই মুসলীম লীগে ডুবে গেল।

কংগ্রেস বড়কর্তারা সেদিন বাংলা কংগ্রেসকে কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট গঠন করতে অনুমতি কেন দেননি, আজ তার উত্তর কে দেবে? হয়ত অনেকেই বলবেন যে, ওটা সত্যিই একটা মস্ত ভুল হয়েছিল, ঠিক যেমন হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের শ্লোগান বাজী করতে করতে সম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মেনে নেওয়া। দার্শনিকদের অভাব নেই। তাঁরা হয়ত আরও বলবেন, "মনুষ্যমাত্রেরই ভুল হয়ে থাকে।" ফলে আমার মত অপগণ্ড এবং মূর্খদের আর কিছুই বলবার থাকে না। শুধু মনে প্রশ্ন জাগে যে ইংরেজী প্রবচন মতে না হয় বুঝলাম মনুষ্যমাত্রেরই ভুল হয়, কিন্তু বড় বড় ভুল করলেই বড় নেতা হওয়া যায় এরকম প্রবচন কিছু আছে বলেও শুনিনি।

আর ইতিমধ্যে গান্ধী-নেতৃত্ব আর সুভাষ বাবুর মধ্যে যে সব কাণ্ড-কারখানা হয়ে গেল সেগুলোও সাধারণ লোকের বোধগম্য নয়। বুঝতে পারলে সাধারণ লোক অবশ্যই সমঝে নিত যে গান্ধীবাদ ক্ষমতা-লোলুপতায় হিংস্র জানোয়ারদেরও হার মানায়। 'সীতারামিয়ার হার মানেই আমার হার', একথা গান্ধীজী নিজমুখেই বলেছিলেন, কিন্তু যখন সত্যি সত্যিই দেশের লোক সুভাষ বাবুকেই ভোট দিলে, তখন কিন্তু গান্ধীজীকে নেতৃত্ব ছেড়ে সরে দাঁড়াতে দেখা গেল না। সোজা পথ ছেড়ে তখন তিনি বাঁকা পথ ধরলেন এবং সেই চোরাগুপ্তির পথেই সুভাষ বাবুকে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে তবে ছাড়লেন। যে গান্ধীজী শত্রু ইংরেজের দুঃসময়ের সুযোগ নিয়ে তাকে বিপদে ফেলতে চান নি, সেই গান্ধীজীর সুভাষবাবুর সঙ্গে এই ব্যবহার সামঞ্জস্যবিহীন মনে করলে আমাকে মূর্খ প্রতিপন্ন করবার লোকেরও হয়ত অভাব হবে না, কিন্তু গান্ধীজীর

এই কাজটি সত্যিই কি তাঁর উপযুক্ত হয়েছিল? 'আমি যে মত প্রচার করছি একমাত্র সেই পথেই কল্যাণ নিহিত আছে, তাই যে-কোন উপায়েই হোক, সেই মত প্রচার করবার জন্য আমাকে ক্ষমতাসীন থাকতেই হবে। এই যে মনোভাব এটাকে আমরা সত্যি সত্যিই ঘৃণা করি—কখনও বা একে কমিউনিজম্ বলি, কখন বলি ফ্যাসিজম্। কিন্তু সেদিন সুভাষবাবুর সাথে অহিংস গান্ধীইজম্ যা করেছিল, সেটা আমাদের পাশ কাটিয়ে চলতে হয়, তা না হলে গান্ধী মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা প্রচুর। আর আজ ভারতের ঘাড়ে চেপে বসে গান্ধীশিষ্যরা যা করছেন সেটার দিকে কাউকে নজর দিতে দেওয়া হয় না। কাঞ্চন-মূল্যের পরিবর্তে যতসব বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ আর বিশেষজ্ঞরা, তার যত-রকমের ভাষ্য বের করেছেন, সে সব কথার ফুলঝুরি দেখেই সবাই ঠাণ্ডা। আমার মত কাঞ্চন-মূল্যের পরিধির বাইরে বহুদূর বিদেশ থেকে দেখবার সৌভাগ্য ত আর বেশি লোকের হয় না, তাই!

বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা

আমার কিন্তু সেই জন্মের সখ ইংরেজ ঠেঙ্গানোর। তাই গান্ধীজীর ঐ সব প্রেমা-প্রেমির রাজনীতি কোনদিনই আমার ভাল লাগত না। ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়াবও, আবার তাদের সাথে একটু প্রেম করব, তার বিপদে সহানুভূতি জানাব, তার দুঃসময়ের সুযোগ নেব না—এ সব যেন কেমন কেমন লাগ্‌ত,—যেন একটু ঢং ঢং'মত। অনেকটা ঠিক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার'মতই দুর্বোধ্য। ইংরেজকে তাড়াতে হয় ঠেঙ্গা দেও, তাকে বিপদে ফেল, তার বিপদের সুযোগ নিয়ে তাকে লাথি মার। ক্ষমতায় না কুলোয় তার শত্রুর সাথে মিতালি কর, নিজে শক্তি সঞ্চয় কর, তারপর ইংরেজের দুর্যোগকে নিজের সুযোগ জেনে একবার মার জোয়ানা হেইও বলে লাগাও ধাক্কা। একবারেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে, অত আশা করবার দরকার কি? প্রথম মহাযুদ্ধে চেষ্টা হয়েছিল সফল হয় নি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আশায় বুক বেঁধে কাজ কর। মোটকথা, এই হচ্ছে স্বাধীনতার সনাতন পন্থা—এ ব্যাপারে আমি অনেকটা সনাতনপন্থী। যে-কোন কাজ করতে হলেই শক্তির প্রয়োজন হয়। ইংরেজের মত একটা শক্তিশালী জাতিকে উচ্ছেদ করতে হলে ত প্রয়োজন মহাশক্তির। তাই যারা শক্তি সাধনা করত আমার টান ছিল তাদেরই উপর।

বহুশত বৎসরের পরাধীনতার ফলে ভারতে শক্তির কিছু অবশিষ্ট ছিল কিনা জানিনা, তবে শক্তির সন্ধান দিতে যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁকে জানি। বৌদ্ধযুগের অধঃপতনের পরে এই অধঃপতিত ভারতে শক্তির সন্ধান এনেছিলেন দাক্ষিণাত্যের শঙ্করাচার্য। সমগ্র দেশকে তিনি আবার নূতন করে গড়ে তুলেছিলেন, গড়ে তুলেছিলেন দেশে নূতন জ্ঞান এবং শক্তি। আর এবার যিনি শক্তির সন্ধান নিয়ে এসেছিলেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দ উত্তর ভারতের বাংলার লোক হলেও তিনিও আবিষ্কৃত হয়েছিলেন প্রথমে ঐ দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীদের দ্বারাই। অন্ততঃ এই দিক থেকে দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীরা ভারতের নমস্কার দাবি করতে পারে।

দেশ যে দুর্বলতার শেষ সীমায় পৌছে গেছে, ভারতবাসীদের অবস্থা যে মুমূর্ষু, তা স্বামী বিবেকানন্দই সবচেয়ে প্রথমে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্রও বাৎলে দিয়েছিলেন, "তমগুণে আচ্ছন্ন এই জাতিকে রজগুণের পথে নিয়ে যাও, জাতি তার পথ নিজেই করে নিতে পারবে। জাতির এই মুমূর্ষু দেহে শক্তির সঞ্চার কর, তবেই জাতি উঠে বস্‌তে পারবে, তার নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে।" অতি সরল এবং খাঁটি ব্যবস্থাপত্র। শুধু কাজে লেগে যাও। কাজও হয়েছিল—বাংলায়, মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে এবং ভারতের আরও অনেক স্থানে গড়ে উঠেছিল শত শত শক্তিচর্চাকেন্দ্র। পরে এইগুলো থেকেই বেরিয়ে এসেছিল বিপ্লবী এবং বিদ্রোহী ভারতের প্রথম সেনাদল। ঐ স্বামীজীর কপালেই তাঁরা তাদের আঙুল কেটে পরিয়ে দিয়েছিল রক্ততিলক, আর শত্রুর রক্ত দিয়ে চেয়েছিল বহু শতাব্দীর সঞ্চিত পাপকে ধুয়ে দিতে। ১৯০৫ সালের আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল এই শক্তির বলেই। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অতি অল্পপরিসর জীবনকালের মধ্যেই দেশে যতটুকু শক্তির সঞ্চার করতে পেরেছিলেন, সেই শক্তির বলেই ভারতের বিপ্লবীরা ইংরেজের কামান বন্দুকের সম্মুখীন হতে পেরেছিল। মরেছিল হয়ত তারা অনেক বেশি, কিন্তু মেরেও ছিল। ফাঁসীর মঞ্চকে তারা করেছিল নূতন তীর্থক্ষেত্র। দেশের কবিত্বে ফুটে উঠেছিল ফাঁসীর মঞ্চের গান, সাহিত্যে প্রকাশ পাচ্ছিল ফাঁসীর মঞ্চের স্তুতি। গ্রামের বাউল আর মাঠের রাখালেরা ভিক্ষে করে বেড়াত বা গরু চরাত সেই গান গেয়ে। যুবক আর ছাত্রেরা পড়ত ফাঁসীকাষ্ঠের নূতন সাহিত্য। শক্তি থেকে আরও শক্তির পথে এগিয়ে গিয়েছিল দেশ।

নিজেদের সীমাবদ্ধ শক্তি দিয়েই যে প্রবল প্রতাপ ইংরেজকে ঠেকিয়ে দেশ-

ছাড়া করা সম্ভব নয়, এ কথাও নূতন ভারতের বিপ্লবীরা বুঝতে ভুল করেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভে তাই বিপ্লবীরা চেষ্টা করল, জার্মানীর সাথে মিতালি করতে। সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করতে। জার্মানীতে তৈরী হল স্বেচ্ছাসেবক দল ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য। প্রতিষ্ঠা করা হল স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্ট। যতীন মুখার্জীর নেতৃত্বে একদল জার্মানী থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর কাজে নিযুক্ত হল। রাসবিহারী বোসের নেতৃত্বে আর একদল ভারতীয় সৈন্যদলে বিদ্রোহ করাবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপের নেতৃত্বে তৈরী হ'ল স্বাধীন ভারতের সরকার। সমানে সমানে যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুতি চলতে থাকলো। যুদ্ধও হল, খুব বড় বড় না হোক, ছোট ছোটই। সামনা সামনিও হল। বিপ্লবীরা মরল অনেক বেশি, আর মেরেও গেল। ফাঁসীতে ঝুললো আরও অনেক বেশি, কিন্তু ইংরেজের শক্তিকে তারা ভয় করলনা মোটেই। শক্তির জোয়ার আসলো দেশে। দেশের লোক বুঝতে ভুল করলো না যে পরাধীন ভারতে আবার স্বাধীন মানুষ জন্মাতে শুরু করেছে। লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক আর বিপিন পালের নেতৃত্বে যাঁরা গণসমুদ্রে বিপ্লবের ঢেউ নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, তাদের কাজও অনেক সোজা হয়ে গেল।

এই বিপ্লবের ধারা, শক্তির প্রবাহ আরও পরিস্ফুট হ'য়ে উঠে ১৯৩০ সালের গান্ধী আন্দোলনের সময় চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ব্যাপারে এবং আরও নানা সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জার্মানীতে স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা, এবং পরে ব্রহ্মদেশে এসে আজাদ-হিন্দ-ফৌজ গঠন করে, সম্মুখ সমরে ইংরেজকে হটিয়ে দিয়ে ভারতের মাটিতে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলনও ঐ শক্তিপ্রবাহেরই পরিণত ফল। ইংরেজ যে ভালমানুষ সেজে ভারত ছেড়ে বিদেয় হয়েছে তারও কারণ ঐ শক্তির প্রদর্শনীই, অন্য কিছু নয়।

গান্ধী-নেতৃত্ব ও কংগ্রেস

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বহুদিন আগেই কিন্তু তার সঙ্গে দেশের জনগণের বা সংগ্রামী শক্তির সম্পর্ক বিশেষ কিছুই ছিলনা। সে কংগ্রেসের এমন কোন আদর্শও ছিল না, যা থেকে বলা যেতে পারে যে ভারতের

স্বাধীনতা অর্জন করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ইংরেজের কাছ থেকে দয়া ভিক্ষা করাই ছিল কংগ্রেসের কার্যসূচী। ১৯২১ সালে গান্ধী নেতৃত্বে যাবার পর থেকে অবশ্য কংগ্রেসের সঙ্গে গণসংযোগ হয়েছিল খুব বিপুলভাবেই, কিন্তু কংগ্রেস যে কখনও সত্যিকারের সংগ্রামী সংস্থা হিসাবে দেশের সম্মুখে আসেনি, সে অতি সত্যি কথা। প্রচারকার্যের ধূম্রজালে এই সত্যটিকে যতই ঢেকে রাখবার চেষ্টা করা হোক-না-কেন, সত্যটি সত্যই থেকে গেছে। ইংরেজের সাথে প্রেম-পিরীতি এবং আপোষ-রফার অবসরে ১৯২১ সালে, ১৯৩০ সালে এবং ১৯৪২ সালে কংগ্রেস যে অন্দোলন করেছে, তাকে যারা স্বাধীনতার আন্দোলন বলতে চায় তাদের কথা স্বতন্ত্র; আর যারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করবে তাদের কথা হবে স্বতন্ত্র। গান্ধী, জহরলালের মৃত্যুর আরও পঞ্চাশ বছর পরে যাঁরা ইতিহাস লিখতে বসবেন তাঁরা সত্যিকথা সোজাভাবেই লিখতে পারবেন যে, ভারতে গান্ধী-নেতৃত্ব এসেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শক্তিকে আরও শক্তিশালী করে সম্মুখে এগিয়ে দেবার জন্য নয়। গান্ধী-নেতৃত্ব এসেছিল বিবেকানন্দের শক্তির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশে যে শক্তির সঞ্চার হয়েছিল, তাকেই বাধা দেবার জন্যে। ১৯০৬ সালে ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম লীগও যে উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল, ভারতে গান্ধী-নেতৃত্বও আমদানী হয়েছিল ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে।

কোন মানুষের উপর প্রভুত্ব করা কখনই সম্ভব নয়, বেশীদিন ত নয়ই। যদি কারও উপর প্রভুত্ব করতে হয় তাহলে আগে তার মনুষ্যত্ব নষ্ট করে দিতে হবে—তাকে আধা-পশু, আধা-মানুষে পরিণত করতে হবে। ঠিক এই জন্যেই ইংরেজ চেষ্টা করেছিল আফিম খাইয়ে সমগ্র চীন দেশটাকে নষ্ট করতে। চীনেদের পেটপুরে আফিম খাওয়াবার অধিকার ইংরেজের আছে এবং সেই অধিকার বজায় রাখতে গিয়েই ইংরেজ সেখানে একটা লড়াই করেছিল, ইতিহাস যার নাম দিয়েছে আফিম যুদ্ধ (Opium War)। বহু শত বৎসরের পরাধীনতার ফলে ভারতে মনুষ্যত্বের অবশিষ্ট প্রায় কিছুই ছিল না, ফলে ইংরেজ এখানে আফিম খাওয়াবার অত হাঙ্গামা করতে যায়নি; কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মাধ্যমে অতি সুকৌশলে এখানে যা চালু করেছে তার ফল যে চীনের আফিমের চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। ধর্মপ্রাণ ভারতের মাটিতে অহিংসা আর অধ্যাত্মের বুলি

আফিমের চেয়েও অনেক জোরাল কাজ করেছে। শক্তির স্রোতকে বন্ধ করে দিয়ে ফিরিয়ে এনেছে দেশে দুর্বলতা আর ক্লৈব্যতা, ভেঙ্গে দিয়েছে দেশের বিপ্লবী ভাবধারা, চুরমার করে দিয়েছে শক্তি-কেন্দ্রগুলিকে। ইংরেজের বাহাদুরী প্রমাণ হয়েছে, প্রমাণ হয়েছে এই জন্যই যে, দেশে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল ১৯০৫ সাল থেকে, যে আগুনের খেলা চলেছিল প্রথম মহাযুদ্ধের আমলে, এমনকি ১৯৩০ সালেও, যে আগুনের শিখা দেখা গিয়েছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মধ্যে, ভারতে সে আগুনের অবশেষ আর দেখা যায় নি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুভদিনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজকে অতি মুমূর্ষু অবস্থায় পেয়েও তাকে কিঞ্চিৎ লগুড়াঘাত করবার কোন চেষ্টাও দেশের মধ্যে বিশেষ দেখা যায়নি। একমাত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে যতদূর সম্ভব কাজ করেছিলেন। তাই অনেক সময় মনে হয়, ভাগ্যিস সেদিন ঐ অহিংসাজীবীরা তাদের কাথা চাপা দেওয়া অতিক্রূর হিংসা প্রবৃত্তিকে সংযত রাখতে পারেনি; ভাগ্যিস সেদিন তারা নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে লাথি মেরে কংগ্রেস থেকে বের করে দিয়েছিল; তা না হলে আজও আমরা কোথায় থাকতাম, কে জানে! কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া মানে যে ক্লৈব্যতা থেকে মুক্তি দেওয়া, সেদিন হয়ত সেটা অনেকেই বুঝতে পারেননি।

গান্ধীজী যে, ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করবার জন্য নেতৃত্ব দান করতে এসেছিলেন না, এসেছিলেন বিপ্লবী ভারতকে ধ্বংস করতে, ধ্বংস করতে এসেছিলেন ভারতের নবসঞ্চারিত শক্তিকে; এ একটা মহাসত্য। আর সত্য বলেই একে আর বেশি দিন চেপে রাখাও সম্ভব হবে না, চেপে রাখা সম্ভব হয়ওনি। এইত সেদিন, ভারতের মাটিতে গান্ধীজীর প্রথম শিষ্য এবং প্রধান বন্ধু শ্রীরাজাগোপালাচারী বি. বি. সির প্রচারের জন্য গান্ধীজীর বিষয় এক বক্তৃতায় বলে ফেল্লেন, "গান্ধীইজম্ ভারতে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করেনি, ধ্বংস করেছে ভারতের সন্ত্রাসবাদকে"। এখনও গান্ধীজীর মানসপুত্র জহরলাল ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত; এখনই যদি শ্রীরাজাগোপালাচারীর মুখ থেকে এহেন সত্য বের হতে থাকে, জহরলালের ক্ষমতা শেষে আরও অনেক সত্য প্রকাশের আশা করা নিশ্চয়ই খুব অন্যায় হবে না।

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হাতে পাবার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল একদিন বলেছিলেন যে ইংরেজ যাবার সময় অনেক গোপন ফাইল নষ্ট করে দিয়ে

গেছে; এমনকি রাজনৈতিক নেতাদের ফাইলগুলোও রাখেনি। তাই, বিশেষ ইচ্ছা থাকলেও রাজনৈতিক নেতাদের বিষয় গোপন ফাইলে কি থাকত, সেটা তিনি দেখতে পাননি। রাজনৈতিক নেতাদের ফাইল নষ্ট করে যাওয়াই ইংরেজের পক্ষে স্বাভাবিক। স্বাভাবিক এই কারণে যে তথাকথিত অনেক রাজনৈতিক নেতাই ত বাইরে যেসব কাজকর্ম করেন আর তলে তলে গবর্নমেন্টের সঙ্গে তার উল্টোটাও করেন। এসব রেকর্ডের ফাইল দেশের জনসাধারণের হাতে না পড়াই উচিত। তাই গোপন ফাইল কারুরই ছিল না, সব নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর মত অহিংস অবতার নেতার ফাইলও নষ্ট থেকে বাদ পড়েনি। কিন্তু আজ যদি কেউ বলে যে, সর্দার প্যাটেল ভুল দেখেছিলেন, সব রাজনৈতিক নেতার ফাইল মোটেই নষ্ট করা হয়নি; তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধব, গুরুদেব যাঁদের ফাইল দেখবার জন্য খুঁজেছিলেন, তাদের অনেকেরই ফাইল শুধু তিনি পাননি; নষ্ট করা হয়েছিল। তাহলে ব্যাপারটা একটু কি রকম কি রকম মনে হয় না কি? নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বা অন্য কোন বিপ্লবী নেতার ফাইল ত নষ্ট করা হয়নি, নষ্ট করা হয়েছিল মহাত্মা গান্ধী, জিন্না সাহেব, আর ঐ ধরণের অন্য অনেক বড় বড় নেতার ফাইল। নেতাজীর মৃত্যু প্রমাণ করবার জন্য যে এনকোয়ারী কমিশন বসানো হয়েছিল, তারই রিপোর্টে পাওয়া যাবে যে, সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে বিরাট ফাইলটি ভালভাবেই আছে, এমনকি পোকায়ও বিশেষ কাটবার সুযোগ পায়নি।

[এই 'আবোল তাবোল' লেখাটিতে গান্ধীজীর মহামানবতার বিষয় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে, গান্ধী রাজনীতিও ঐ সন্দেহ থেকে বাদ পড়েনি, এবং আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, সময় এবং সুযোগমত আরও অনেক গোপন খবর প্রকাশ পাবে। ফলে, বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অহিংস গান্ধীভক্তদের কাছ থেকে অতি হিংস্র এবং অশ্লীল মন্তব্যসহ চিঠি লেখকের হস্তগত হতেও দেরি হয়নি। ব্যাপারটি যে খুবই স্বাভাবিক সে ত এই বইতেই প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়েছে; তাই আশ্চর্যেরও কিছু নেই। যে মহাত্মার তিরিশ বৎসরের সত্য, প্রেম এবং অহিংসা প্রচারের ফলে, সত্য আজ ভারতের উপকূল ছেড়ে চিরতরে বিদায় নিয়েছে, আর অতি ক্রূর হিংসা এবং দুর্নীতিতে ভারতের আকাশ বাতাস বিষাক্ত সেই মহাত্মার মাহাত্ম্যে সন্দেহ প্রকাশ করা ধৃষ্টতা বৈকি! শুধু তাই নয় ঐ কারণেই বাংলাভাষায় প্রকাশিত একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'দেশ', বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে,

লেখকের সমালোচনা করেছেন, ঠিক অশ্লীল ভাষায় নাহলেও প্রায় সেমি-অশ্লীল ভাষাতে ত বটেই। তাতেও আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কারণ, রাজনৈতিক ক্ষমতাশীলদের বা তাদের আত্মীয়-স্বজন বা গুরুদেবদের গুণমহিমা কীর্তন করাই বর্তমানে অনেকের ব্যবসায়ের প্রধান মূলধন। আশ্চর্য শুধু এইটুকুই যে গত ১০ই আগস্ট সংখ্যা 'দেশে' লেখকের আত্মশ্রাদ্ধ করবার পরই ১৭ই আগস্ট সংখ্যায় ঐ বিখ্যাত দেশ সাপ্তাহিকেই ভি. এম. চাওজী নামক বোম্বাইয়ের জনৈক পুলিশ অফিসারের লিখিত 'সেবাগ্রামে পুলিশ' শীর্ষক একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ঐ লেখাটিতে লেখক চাওজী—যিনি বহুদিন ওয়ার্দা থানাতে দারোগা ছিলেন এবং যাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর বিশেষ জানাশুনাও ছিল, গান্ধীজীর মহানুভবতা প্রকাশের ছলে বেশ পরিষ্কারভাবেই, গান্ধীজীর বিষয়ে দুটি অতি গোপন খবর প্রকাশ করে দিয়েছেন। খবর দুটির প্রথমটি হচ্ছে, গান্ধীজী কিভাবে একজন বিপ্লবী কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশকে সাহায্য করেছিলেন, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে সদাশয় ইংরেজ সরকার মহানুভব গান্ধীজীর প্রাণরক্ষার্থ কিভাবে একজন গোয়েন্দা পুলিশকে গান্ধীজীর কুটিরের নিকট সব সময়ের জন্য মোতায়েন করেছিলেন। ঐ বিপ্লবী কর্ম্মীটিকে গ্রেপ্তারে সাহায্য করবার জন্যই, ইংরেজ সরকার গান্ধীজীর জীবন বিপন্ন হতে পারে সন্দেহ করেছিলেন কিনা, সেটা অবশ্য লেখক চাওজী বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন নি। এই সংবাদ দুটি প্রকাশের ব্যাপারের উপরও নূতন কোন টীকা একান্তই নিষ্প্রয়োজন। শুধু ভাবি, ঐ লেখাটি 'দেশ' হেন গান্ধীভক্ত পত্রিকাতে প্রকাশিত হল কিভাবে? অতিবিদ্যা এবং বুদ্ধিরসাগর 'দেশ'-পরিচালকেরা কি চাওজীর লেখাটিকে 'গান্ধী প্রশস্তি গায়ন' মনে করেই ছেপে বসেছেন নাকি? ব্যাপার কি? পত্রিকা সম্পাদনার স্টানডার্ড আজকাল এই পর্যায়েই এসেছে। 'দেশ' পত্রিকার আবার মালিক নিজেই এবং মালিকানা খাতিরেই সম্পাদক হয়ে বসেছেন তাই ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার। তবে গান্ধীজীর বিষয় এই ধরনের আরও অনেক অনেক গোপন খবর ক্রমেই প্রকাশ হতে থাকবে, তা সে চাওজীর মহানুভবতা প্রকাশের ভাষায়ই হোক বা 'আবোল তাবোলের' মূর্খজনের ভাষায়ই হোক সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।]

গান্ধীজীর শুভাগমন—

আসলে, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যে কে ছিলেন এবং কি করতেন সে

বিষয়ে ভারতের লোকেরা খুব কমই খবর রাখত। তিনি কবে ব্যারিস্টারী পাস করে ভাগ্য অন্বেষণে দক্ষিণ আফ্রিকাতে গিয়েছিলেন বা সেখানে তাঁর পসার কি রকম হয়েছিল, সে খবর ত নয়ই। তবে শুনেছি সেকালের 'Statesman' এবং 'Englishman'-এর মত দু'একখানি কাগজে নাকি তাঁর বিষয় মাঝে মাঝে খবর বের হ'ত। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি নাকি টাকা রোজগার বাদেও অনেক কিছু করেছিলেন। আর তাঁর ঐ অহিংসা মতবাদ এও তিনি ঐখানে থাকতেই আয়ত্ত করেছিলেন। ভারতের রঙ্গমঞ্চে তাঁকে প্রথম দেখা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের আমলে, এবং একজন সৈন্য সংগ্রহকারী হিসাবেই। ইংরেজ-জার্মান যুদ্ধে ইংরেজই যে ন্যায়পক্ষ তাতে তাঁর কোন ভুল ছিল না; ঠিক যেমন ছিলনা তাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ যে, যুদ্ধে জয় হলেই ইংরেজ ভারতকে তার প্রাপ্য স্বাধীনতা বুঝিয়ে দিয়ে অতি ভাল মানুষের মত নিজের দেশে চলে যাবে। ইংরেজ-জার্মানদের এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যেরা গিয়ে অংশগ্রহণ করলেও, তাঁর অহিংসাতে সেদিন কোনও দ্বিধা দেখা যায়নি। ঠিক যেমন আজকে তাঁর মানসপুত্র জহরলাল কথায় কথায় দেশের নিরস্ত্র জনগণের উপর গুলি চালাতে দ্বিধা করেন না। তবে অহিংস তাঁরা দু'জনেই, একজন ঐজন্য দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শত্রু ইংরেজের রক্তপাত পছন্দ করেননি; আর অন্যজন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কেউ কারও রক্তপাত করে এটা পছন্দ করেন না। গান্ধী নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে থাকাকালে চৌরীচৌরা ক্ষেত্রে অধৈর্য জনগণ কিঞ্চিৎ শত্রু রক্তপাত করবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী তাই তাঁর আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন, এটা যেমন ঠিক গান্ধীসুলভ হয়েছিল, গোয়া ভারতের অংশমাত্র হলেও তার স্বাধীনতার জন্য জহরলাল কিছুই করবার ক্ষমতা রাখেন না, অথচ ভারতের অভ্যন্তরে গোয়া আন্দোলনের সমর্থকদের উপর গুলি চালাতে তাঁর কখনই কিছু অসুবিধা হয় না—এটাও ঠিক জহরলালসুলভই বটে! তবে গান্ধীজীর দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রথম জীবনে বুয়োর যুদ্ধে গান্ধীজী যে ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে এম্বুলেন্স ভলান্টিয়ারের কাজ করেছিলেন এবং ঐ বাবদ ইংরেজদের কাছ থেকে অনেক প্রশংসা এবং পুরস্কারও পেয়েছিলেন, সে কথাটাও ভুললে চলবে না; কারণ তাঁর পরবর্তী জীবনের কার্যকলাপের সাথেও ঐ ভলান্টিয়ারী মনোভাবের কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করবার পুরস্কার হিসাবেই 'কাইজার-ই-হিন্দ' মেডেলও তিনি পেয়েছিলেন ঐ ইংরেজদের কাছ থেকেই।

হঠাৎ দক্ষিণ-আফ্রিকা ছেড়ে এসেই গান্ধীজী যে কি করে অত বড় বিশাল ভারতবর্ষের নেতা হয়ে দাঁড়ালেন সেটা বুঝবার মত বিদ্যেবুদ্ধি আমার আছে মনে করিনা; আর কার যে আছে তাও জানা নেই। তিনি ত দেশে এসে ইংরেজের যুদ্ধজয়ে সাহায্য করবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন, ঠিক যে সময়ে ভারতের বিপ্লবী আর বিদ্রোহী ছেলেরা ইংরেজকে লাথি মেরে 'এদেশ থেকে তাড়াবার জন্য নিজেদের বুকের রক্তে ভারতের মাটি লাল করে তুলছিল। এইরকম পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে, কিভাবে যে গান্ধীজী বিশাল ভারতের নেতা হয়ে বসলেন, এটা বুঝা খুবই কঠিন। ইংরেজই কি তাঁকে এনে ভারতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল? সেও কি সম্ভব? জানি না। তবে দক্ষিণ-আফ্রিকায় এবং ভারতে আসবার পরও তাঁর কার্যকলাপসমূহের প্রচার অন্তত প্রথম দিকটায়, ইংরেজ-পরিচালিত কয়েকখানি ইংরেজী সংবাদপত্রেই বের হ'ত। খাস ইংরেজদের দেশেও তাঁর বিষয় অনেক প্রচারকার্য চালান হ'ত, যার ফলে রাজনীতির বাজারে তাঁর দর অনেকটাই উঁচুতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আর তিনি রাজনীতি করতে আরম্ভ করতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে যে স্পেশাল ট্রেণযোগে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হ'ত, সেত সবারই খুব ভালভাবেই জানা আছে। এসব করেও তাঁর দর অনেক উঁচুতে তুলে দেওয়া হয়েছিল নিশ্চয়ই। অবশ্য ইঙ্গিত থাকলেও প্রমাণ এর চেয়ে বেশি দেওয়া আজ আর সম্ভব নয়, তাই আমিও একথা বলতে চাই না যে, গান্ধীজীকে ইংরেজের দালালি করবার জন্যই ভারতে আনা হয়েছিল। হয়ত তিনি তাঁর নবলব্ধ অহিংসামন্ত্রের প্রচারকার্যের জন্যই স্বেচ্ছায় ভারতে এসেছিলেন, ভারতভূমিকেই তাঁর উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র বিবেচনা করেই। তিনি যে, বিবেচনায় ভুল করেননি সে খুবই ঠিক কথা; আরও ঠিক কথা এই যে ইংরেজ তাদের কূটবুদ্ধির বলেই অতি সহজে বুঝতে পেরেছিল যে, বহুশত বৎসরের পরাধীন ভগ্ন-মেরুদণ্ড এই জাতির সম্মুখে, আধা-ধর্ম আধা-রাজনীতি মার্কা এই অহিংসবাদের মত একটি চীজ যদি ছাড়া যায় তাহলে তাঁরা এটিকে লুফে নেবে, এবং আপাতত তাদের উদ্দেশ্যও খানিকটা হাসিল হবে। হাসিল হয়েওছে।

ইংরেজ যে গান্ধীজীর অসিংসামন্ত্রের নেশা দিয়ে ভারতের বিপ্লবী এবং বিদ্রোহী আত্মাকে, ভারতের নবলব্ধ শক্তির চেতনাকে ধ্বংস

করতে চেয়েছিলেন সে বিষয়ে অনেক বিজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞেরও আমার সাথে মতের মিল আছে জানি। তবুও অনেককে বলতে অবশ্যই শুনেছি যে, দুটো ভাঙ্গা পিস্তল আর দু'চার ডজন হাতবোমা দিয়ে কখনও ইংরেজকে তাড়ান বা দেশে বিপ্লব আনা কোন মতেই সম্ভব ছিল না। বিপ্লব আন্‌তে হলে দেশের জনগণের মধ্যে জাগরণ আনা চাই। বোমা-পিস্তলওয়ালাদের সাথে গণসংযোগ ছিলনা মোটেই, তাই তাদের পথও ছিল অবাস্তব। তাদের মতে গান্ধীজীই স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে গণসংযোগ করে সেই আন্দোলনকে সত্যিকারের বিপ্লবী-পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রচুর পরিমাণ বোমা পিস্তলের অভাবটাই যদি গান্ধীজীর অহিংস রাজনীতির কারণ হ'ত তাহলে অবশ্য বলার কিছুই থাকে না, কিন্তু গান্ধীজীর অহিংসা যে ঐ অভাববশতই হয়েছিল না তাও খুবই পরিষ্কার। সেইজন্যেই ঐ গণসংযোগের মুখরোচক কথাগুলোর বিশেষ কোন মানেও নেই। ওগুলো সবই অতি বাজে প্রপাগাণ্ডা বা অতি মিথ্যা প্রচারকার্য ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। তাই প্রশ্ন হচ্ছে যে, গান্ধী-যুগের আগে ভারতের রাজনীতিতে কি কোন গণ-আন্দোলনের ব্যবস্থা ছিল না? ছিল। ১৯০৫ সালের আন্দোলন গণ-আন্দোলনই ছিল, এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অন্য আন্দোলনগুলোর চেয়ে বড় ছাড়া ছোট মোটেই ছিল না। এই আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর নেতৃত্ব ত দূরের কথা তাঁর নামও কেউই শোনেনি, তিনি তখন এদেশেও ছিলেন না। ভারতের বিপ্লবীদের সাথে যে জনগণের সংযোগ ভালভাবেই ছিল তাও সে সময়ের সাহিত্য বা কবিতার ধারা দেখলেই খুব ভালভাবেই বুঝতে পারা যায়। "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি" এ গানটি নিশ্চয়ই শুধু বোমা পিস্তল-ওয়ালাদের জন্যই লেখা হয়েছিল না, বা তারাই শুধু এ গান গেয়ে বেড়াত না। বাংলাদেশের কোন হতভাগা যে এ গান শোনেনি, আমি জানি না। আর কোন ক্লীবই-বা ক্ষুদিরাম এবং অন্য শহীদদের ফাঁসির গল্প শুনে নিজেকে গর্বিত অনুভব করেনি সে খবরও আমার জানা নেই। গান্ধীওয়ালারাও সেরকম লোকের সন্ধান দিতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। জনগণের একান্ত সাহায্য এবং সহানুভূতিতেই ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল,—তাদের বাদ দিয়ে নয়।

অহিংসাবাদ, গান্ধীজী ও টলষ্টয়

গান্ধীজীর অহিংসামন্ত্র বা গান্ধীদর্শন যে কি বস্তু সে-বিষয়ে সাধারণের খুব পরিষ্কার ধারণা নেই। অবশ্য পরিষ্কার ধারণা রাখবার মত সহজ বস্তুও সেটা মোটেই নয়। এ বিষয়ে আমার যেটুকু ধারণা তা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রের মূলই যখন হচ্ছে কিনা শক্তি, তখন রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে একমাত্র শক্তির দ্বারাই তা সম্ভবপর। ফলে হবে এই যে রাষ্ট্র থাক্‌লেই থাক্‌বে একদল শাসক এবং একদল শাসিত। রাষ্ট্রের শক্তি যাদের হাতে থাক্‌বে তারা শাসন করবে, আর যাদের হাতে শক্তি থাক্‌বে না তাদের চলতে হবে ঐ শক্তিধরদের আদেশ অনুযায়ী। ন্যায়, শান্তি বা সাম্য কখনই এই পথে আসতে পারে না। অতএব, সত্যিকারের ন্যায়, শান্তি বা সাম্য আন্‌তে হলে তুলে দিতে হবে ঐ রাষ্ট্রকে, এবং তার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে স্বাধীন মানুষের সমাজ, তবেই শান্তি আস্‌বে। কিন্তু সাময়িকভাবে রাষ্ট্রে যাঁরা ক্ষমতাসীন হয়ে বসে আছেন তাঁরা ত আর বিনীত অনুরোধ জানালেই সব ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে সকলের সাথে পথে নেমে আসতে চাইবেন না। তাই রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে দেবার উপায় কি হবে? একদল বলবেন—কেন, লাঠি মেরে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রওয়ালাদের ভেঙ্গে দাও, তবেই রাষ্ট্র উপে যাবে। আর গান্ধী দর্শন সেখানে বলবে, না না, তা কখনই হয় না। যদি বলিষ্ঠতর শক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রকে ভাঙ্গতে যাও, তাহলে ভুল করবে; কারণ শক্তির সাহায্যে যে রাষ্ট্রকে ভাঙ্গবে তাকে ভাঙ্গা অবস্থায় রাখতে হলেও তোমাকে ঐ শক্তিই ব্যবহার করতে হবে। ফলে হবে নূতন শক্তিধরের শাসনে নূতন রাষ্ট্রের পত্তন। এক রাষ্ট্রের বদলে আসবে আর এক রাষ্ট্র। তাই রাষ্ট্রকে ভাঙ্গবার পন্থা অবশ্যই হতে হবে অহিংস এবং অসহযোগের পন্থা। সমগ্র জনগণকে এজন্য তৈরি করতে হবে। তারপর এক শুভদিনে, শুভমুহূর্তে, সবাইকে দিয়ে বলিয়ে দিতে হবে যে, আমরা শাসক ও শাসিতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা চাই না। আমরা রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে দিয়ে, ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে গ'ড়ে নিলাম আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা। আজ থেকে আমরা, সকলের স্বার্থে, সকলের সাথে পরামর্শ করে এবং সকলে মিলে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা চালিয়ে নেব। ব্যাপারটা যে সত্যিই ভাল তাতে আর সন্দেহ কি! কে আর অন্যের শাসনে থাক্‌তে ভালবাসে! এই সমাজ-ব্যবস্থা যাতে সুন্দর এবং সুস্থভাবে চলতে পারে, তারই জন্যে গান্ধীদর্শনে এক বিশেষ অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ব্যবস্থাপত্র দেওয়া

আছে। মোটামুটিভাবে যাকে বলা যায় অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীয়করণের ব্যবস্থা। রাষ্ট্রক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীয়করণের দ্বারা সাধারণের মধ্যে বণ্টনের মাধ্যমে এক সুস্থ সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করাই হচ্ছে গান্ধীদর্শনের উদ্দেশ্য। হয়ত জিনিসটা অনেকেরই কাছে অবাস্তব ব'লে মনে হবে। সমস্ত জনসাধারণ একদিল হয়ে ঐভাবে রাষ্ট্রকে বরবাদ করে ফেলবে—একথা নিশ্চয় কেউই বিশ্বাস করতে পারেন না। হয়ত অনেকেই বলবেন, 'নয় মণ তেলও পুড়বে না, আর রাধাও নাচবে না', এও সেই ঢংয়ের। কিন্তু অবাস্তব যতই হোক-না-কেন, আদর্শ হিসাবে এটাকে উচ্চস্থান দিতে বাধা কি! সত্যিকথা বলতে গেলে অবশ্যই স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের আদর্শমাত্রই ত অবাস্তব কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

রাজনীতি দর্শনের ইতিহাসে গান্ধীজীর এই অহিংসনীতি বা গান্ধীদর্শন Philosophic Anarchism বা দার্শনিক নৈরাষ্ট্রবাদ নামে পরিচিত, এবং আদর্শ রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে বেশ উচ্চ সম্মানের সাথেই প্রতিষ্ঠিত। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, গান্ধীজীই এই দর্শনের প্রথম দার্শনিক তা ঐতিহাসিকেরা কেউই স্বীকার করেন না। করবার কোন কারণও নেই। গান্ধীজীর অনেক আগেই ঋষি টলস্টয় এই দার্শনিক ভাবধারা পৃথিবীতে প্রচার করে তাঁর মনীষী নাম সার্থক করে গেছেন। গান্ধীজী নিজেও যে ব্যাপারটা অস্বীকার করেন, তাও নয়। দক্ষিণ-আফ্রিকাতে গান্ধীজীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে যাঁরা কিছু খবর রাখেন তাঁরাই জানেন যে গান্ধীজী ঋষি টলস্টয়ের মন্ত্রশিষ্য হিসাবেই সেখানে তাঁর কাজ আরম্ভ করেছিলেন, এবং সেখানে গঠনমূলক কাজে যেসব পুস্তকাগার, সমবায়সমিতি ইত্যাদি তিনি গ'ড়ে তুলেছিলেন, তা তিনি গুরু টলস্টয়ের নামেই করেছিলেন। গুরু টলস্টয় তখনও বেঁচে ছিলেন এবং গান্ধীজীর সাথে যে তাঁর পত্রবিনিময়ও হ'ত তারও অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু যে মুহূর্তে গান্ধীজী নেতৃত্ব করবার জন্য এই মূর্খ-ভারতভূমিতে পদার্পণ করলেন, সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি ঋষি টলস্টয়কে ভুলে গেলেন। এ ব্যাপারটা কি করে সম্ভব হল, কি করে সম্ভব হল তাঁর প্রচারকার্য যে তাঁর অহিংসাবাদ তাঁর নিজেরই আবিষ্কার। ভারতে এসেও তিনি গঠনমূলক অনেক কিছুই করেছিলেন, কিন্তু কারও সঙ্গে ঐ টলস্টয়ের নাম জড়িত করতে দেখা যায়নি। ভারতভূমিতে তিনি তাঁর দীর্ঘ নেতৃত্বজীবনে বহু লক্ষ কোটি শব্দের বক্তৃতা করেছেন, কিন্তু ঐ টলস্টয় শব্দটি তিনি কোথাও উচ্চারণ করেছেন বলে ত কেউ

জানে না। ব্যাপার কি? কোন লোককে জান্‌তে হলে তাঁর ভেতরটা যদি জানা না হয়, তাহলে তার কিছুই জানা যাবে না। তাই এই কথাগুলোর অবতারণা। মহাত্মা এই সম্মানসূচক পদবীটি তাঁকে কে দিয়েছিল তা আজও আমার জানা নেই, তবে তিনি যে ঐ মহাত্মা কথাটির সম্মান রাখেননি বা তার উপযোগী ছিলেন না, তা ত তাঁর ভারতভূমিতে পদার্পণের পর টলস্টয়ের সাথে ব্যবহারেই দেখতে পাচ্ছি। নেশা আমাকে কোন দিনই মাতাল করেনি, ক্ষমতার প্রসাদে যাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন তাঁদের নেশাও আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে, অন্যদেরও কেটে যেতে আর খুব বেশী দেরি হবে মনে হয় না।

ভারতীয় কমুনিস্ট পার্টি

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে কমুনিস্ট পার্টির আবির্ভাব আর এক বিভ্রান্তিকর ব্যাপার। এঁরা যে হঠাৎ কোথা থেকে এসে উদয় হলেন বুঝা খুবই কঠিন। দেশে যে পুঁজিবাদী শোষণ ছিল না, তাও নয়; কিন্তু ইংরেজের শোষণের কাছে তা ছিল নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর। আর মজা হচ্ছে এই যে, এঁরা এসেই শুধুমাত্র জার্মানী আর জাপানের বাপান্ত শুরু করে দিলেন। তাই বুঝা আরও কঠিন যে সত্যি সত্যি তাঁদের উদ্দেশ্যটা কি ছিল।

অনেকদিন আগে যখন খুব ছোট ছিলাম, কেবল নূতন খবরের কাগজ পড়তে শুরু করেছি, সেই সময়ে খবরের কাগজে অনেকদিন ধরে মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলা নামে একটা খবর দেখেছি বলে মনে হয়। কয়েকজন ইংরেজ সাহেব এবং ভারতীয় সেই মামলায় আসামী ছিলেন। তাঁরা কি ষড়যন্ত্র করেছিলেন বা কেন করেছিলেন, তা আমার আজ কিছুই মনে নেই। পরে অবশ্য শুনেছি ঐ ষড়যন্ত্রটা নাকি ছিল কমুনিস্টদের ষড়যন্ত্র। ভারত থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্য উৎখাত করাই নাকি ছিল তার উদ্দেশ্য। ইংরেজ বৃটিশসাম্রাজ্য উৎখাত করবার জন্য ভারতে এসে কমুনিস্ট হয়ে ষড়যন্ত্র করেছে—এগুলো গাল-গল্পের চেয়ে বেশি কোন দিনই মনে হয়নি। আর তা নিয়ে মাথাও ঘামাইনি। কিন্তু ১৩৩৬—৩৭ সালের কাছাকাছি সময়ে যখন প্রায়ই কলকাতার পার্কে পার্কে এই লালঝাণ্ডাওয়ালাদের সভা আর রাস্তায় রাস্তায় লালঝাণ্ডাওয়ালাদের মিছিল দেখতে লাগলাম, তখন আর এঁদের আবির্ভাব চাপা থাকল না। তবে এঁরা যে কি চান, এদের রাজনীতির যে কি উদ্দেশ্য, তা আজও যেমন বুঝতে

পারিনা, তখনও বুঝতে পারিনি। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ যা আমাদের বুকের রক্ত চুষে খাচ্ছিল তার বিরুদ্ধে এদের আমি বিশেষ বক্তৃতা করতে শুনিনি। কমিউনিস্টদের যত গালাগালি করতে শুনেছি তা হচ্ছে জার্মানী আর জাপানের বিরুদ্ধে আর আমাদের দেশী পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে ত বটেই। তাঁদের মতে দেশী বিলাতি বলে কিছু নেই—পুঁজিপতি ইংরেজ আর ভারতীয় সব এক, সব রক্ত শোষক, কথাটা মিথ্যে কিছু নয়। তবে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁদের প্রথম আক্রমণের লক্ষ্য না হয়ে জার্মানী, জাপান আর দেশী পুঁজিপতিরা কেন হল, সেটাই প্রশ্ন। হিটলার, টাটা, বিড়লা প্রভৃতি শব্দগুলো যে আজকাল অনেকটা অসৎ অর্থবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা এই কমুনিস্টদেরই কৃপায়। কমুনিস্টদের মতে জাতীয়তাবাদ ব্যাপারটাও একটা বিরাট পুঁজিবাদী ভাঁওতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই সব কারণেই সন্দেহ হ'ত।

১৯৩৭ সালের নূতন শাসন প্রবর্তনের পর যখন বহু বহু বিপ্লবী দাদাকে জেল থেকেই প্রায় লাল ঝাণ্ডা হাতে করে বেরিয়ে আসতে দেখলাম এবং আরও দেখলাম যে বেরিয়ে এসেই তাঁরা ইংরেজ নয়, জার্মানী আর জাপানকে বাপান্ত শুরু করে দিলেন তখনি কিছুটা জ্ঞানের সঞ্চার হতে থাক্‌লো। তারপর লড়াইয়ের সময় যখন তাঁরা "জাপানকে রুখতে হবে" শ্লোগান দিয়ে জীবন পণ করে 'জনযুদ্ধে' অবতীর্ণ হলেন, তখন অনেকেরই দিব্যচক্ষু খুলে গেল, এবং অনেকেই ভেতরের ব্যাপারটা আঁচ করে নিতে পারলেন। কমুনিস্টদের বিষয় একটা সুবিধা ছিল যে, তাঁরা কতকগুলো ব্যাপারে পরিষ্কার কথা বলতেন, ভণ্ডামি করতেন না। ইংরেজের বুটের তলা থেকে ভারতকে স্বাধীন করতে হবে, এরকম কথা তাঁরা কখনই বলতেন না। ক্ষুদ্র ভারতের স্বাধীনতা অতি তুচ্ছ ব্যাপার, তাঁদের আদর্শ হচ্ছে, তামাম দুনিয়ার সব মেহনতী মানুষের মুক্তি ; এবং রাশিয়ার কবলস্থ হওয়াই তার একমাত্র উপায়। ইংরেজের কূটবুদ্ধিকে তারিফ আজও না করে উপায় নেই, কারণ আজও ঠিক বুঝতে পারিনি যে ঠিক কি উপায়ে কমুনিজম হেন আদর্শটিকে তাঁরা ভারতের জল হাওয়ায় ভারতের মাটিতে বসিয়ে দিয়েছিলেন। মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলাকে অবশ্য অনেকেই ইংরেজের ষড়যন্ত্র বলেই সন্দেহ করেন। ইংরেজের জেল থেকে যে বহু রাজবন্দী কমুনিস্ট ধর্মের দীক্ষা নিয়ে লালঝাণ্ডা হাতে বেরিয়ে এসেছিলেন, এবং জেলের ভিতরে এই দীক্ষাকার্যের ব্যাপারে মীরাট মামলার আসামীদের অবদানও যে মোটেই কম নয়, তাও অনেকেই জানেন, তবুও ব্যাপারটা যেন পরিষ্কার হয় না।

এক বন্ধু অবশ্য একটা থিওরী আবিষ্কার করেছেন। সে থিওরী অনুযায়ী ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের মধ্যেই নাকি এদেশে কমুনিস্ট উপদ্রব সৃষ্টি করবার ব্যবস্থা ছিল। ঐ শাসন আইন অনুযায়ী প্রদেশগুলোতে যে সব আইনসভার ব্যবস্থা ছিল, এবং ঐ আইনসভার সদস্যদের যেভাবে বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের অনুকূলে বিভক্ত করে আসন বণ্টন করা হয়েছিল, তাতে আনুপাতিক হিসাবে কুলী-মজদুরদের জন্যে অনেক বেশীসংখ্যক আসন সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল। বাংলাদেশের আইন-সভার মোট ২৫০টি আসনের মধ্যে সাধারণের জন্য যেখানে দুইশতটির মত আসন ছিল, সেখানে শ্রমিকদের জন্য ৮টি আসন সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল। অথচ বাংলাদেশের সাধারণ লোকসংখ্যা যেখানে ছিল প্রায় সাড়ে ছয়কোটি, সেখানে মোট শ্রমিকদের সংখ্যা কখনই আড়াই লক্ষের বেশি ছিল না। ইংরেজ অবশ্যই জানত যে ৮টি মজদুর আসন থাকলে অন্তত ৮০টি মজদুর নেতা গজাবে, এবং ভোট ঠিক রাখতে গেলে মজদুরদের তোষামোদ এবং পুঁজিপতিদের বাপান্ত শুরু হতেও বেশি দেরি হবে না। অতএব ফলং কমুনিস্ট পার্টিং। অঙ্ক কষে রাজনীতি বুঝবার মত মগজ বা ধৈর্য আমার নেই, বুঝিওনি কিছু। শুধু ইংরেজের কূটবুদ্ধির আবারও তারিফ করছি।

কমুনিস্টদের মতিগতিতে এমন-কিছু দেখা যায়নি যাতে ভুল হতে পারে যে তাঁরাও ইংরেজের অধীনতা থেকে ভারতকে স্বাধীন করতে চান, বরং এ ব্যাপারে তাঁদের কথাবার্তা খুবই পরিষ্কার ছিল, ঠিক তেমনি মেঘাচ্ছন্ন এবং অপরিষ্কার ছিল তাঁদের মতিগতি, যা থেকে কিছুই বুঝা যেত না যে, তাঁরা কি চান। কমুনিজমের আদর্শ বলতে যা বুঝায় তারই বা কতটুকু তাঁরা চান তাও মোটেই পরিষ্কার নয়, কারণ তাঁরা কমুনিজমের সাথে রাশিয়াকেও চান। অথচ এটা আজ কোন গোপন খবর নয় যে, কমুনিস্ট আদর্শের অবশিষ্ট আজ আর রাশিয়াতেও বিশেষ কিছুই নেই। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২২ সালের মে মাস পর্যন্ত হয়ত লেলিন রাশিয়াতে কমুনিজম বলে কিছু চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। তারপর ১৯২২ সালের মে মাস থেকে 'New Economic Policy' বা নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নাম দিয়ে রাশিয়াতে যা চালু হয়েছে, তাকে আর যাই বলা হোক না কেন, কমুনিজম বলা চলে না। লেনিনের পর স্টালিন রাশিয়াকে আরও উল্টোপথে নিয়ে গেছেন, এবং শেষপর্যন্ত ১৯৩০ সালের পর Piece Way System—মানে কাজের পরিমাণ অনুযায়ী মজুরি দেবার যে

ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন, তাতে তিনি সোজাসুজি রাশিয়াকে পুঁজিবাদের পথেই পরিচালিত করেছেন। তফাৎটা শুধুই হচ্ছে এই যে, অন্য সব দেশে যে কেউই পুঁজিপতি হতে বাধা নেই, আর রাশিয়াতে একমাত্র রাষ্ট্রই পুঁজিপতি হতে পারে। উপরন্তু অন্য সব দেশের মত রাশিয়ার মজদুরেরা শ্রমিক সংঘ গঠন করে তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করবার অধিকারে বঞ্চিত। আর রুশসাম্রাজ্য ত আজকাল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যতেই পরিণত হয়েছে। এই রুশ সাম্রাজ্যের অধীনতামূলক মিত্রতা আর State Capitalism বা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদই কি ভারতীয় কমুনিস্টদের আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ নাকি? শুধুমাত্র ঐটুকুর জন্যই কি তাঁরা যে-কোন উপায়ে যে-কোন পথে ক্ষমতা দখল করাটাকে ন্যায়সংগত মনে করেন নাকি?

কমুনিস্টদের এই যে-কোন উপায়টা যে কতদূর অদ্ভুত ধরণের হতে পারে সে বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান হয়ত অনেকেরই নেই, তাই একটা গল্প বলি। কমুনিস্টদের দল ভারী করবার অনেক অদ্ভুত, এমনকি অশ্লীল উপায়ের গল্পও হয়ত অনেকে শুনে থাক্‌বেন। আমি যেটা বলছি সেটাও তারই মধ্যে একটা আর কি! আজকাল সারা ভারতেই এবং পাকিস্থানেও, বিশেষ করে বাংলা দেশে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব এবং উচ্ছৃঙ্খলতা খুবই বেড়ে গেছে। ছেলেরা আজকাল পড়াশুনায় মন দেয় না, সব সময়েই বাজে কাজে ব্যস্ত থাকে, আর পরীক্ষার হলে অসৎ উপায় অবলম্বন করাটাকে তারা একটা বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় আর্টে পরিণত করেছে। ঐ কাজে তারা যে পরিশ্রম এবং সময় নষ্ট করে, তার অর্ধেক সময় পড়াশুনার পিছনে খরচ করলে হয়ত তারা সহজেই পরীক্ষায় পাস হতে পারে। কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না যে, কমুনিস্টরা তাঁদের হাতের ছেলেদের এসব বিষয় সাহায্য করবার জন্য তাঁদের পার্টি অফিসে প্রচুর ব্যবস্থা রাখেন। ছেলেরা পরীক্ষা দিতে থাকাকালে পরীক্ষা হলের অনেক দূর থেকে বড় বড় চোঙ্গা ফুকিয়ে প্রশ্ন পত্রের উত্তর বলে দেওয়ার ব্যাপারটা আজকাল একটা সর্বভারতীয় ছাত্র সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবেই দেখা দিয়েছে। এই বিজ্ঞানসম্মত সাংস্কৃতিক উন্নতিটি কোথা থেকে বার হয়েছে জানেন? এটি হচ্ছে স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের ভারতীয় কমুনিস্ট পার্টির রংপুর শাখার সবচেয়ে বড় অবদান।

তাই, কমুনিস্টদের বিষয়টা একটা খুব বড় ভাবনার কিছু বলে মনে হয় না। তাঁরা অনেক কিছুই প্রকাশ্যভাবেই করেন। আজ না হোক, দুদিন

পরে জনসাধারণ তাঁদের ঠিকমত বুঝতে ভুল করবে না। পূর্ব-জার্মানী, পোলাণ্ড এবং হাঙ্গারীতেও জনসাধারণ তাঁদের ভালভাবেই চিনে ফেলেছে। কমুনিস্ট পার্টি আর যাই হোক, একটা রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি পাবার কোনই যোগ্যতা রাখে না। একটা সুসংবদ্ধ দল হলেই রাজনৈতিক দল হয় না। আর তাঁদের সাথে নিজেদের দেশের ত কোন সম্পর্কই নেই। (বর্ত্তমানে কমুনিস্ট চীন কর্ত্তৃক ভারত আক্রান্ত হবার পর ভারতীয় কমুনিস্ট পার্টি যে মনোভাব প্রকাশ করেছে, তার পর তাদের চিন্‌তে ভুল হবার আর কোন কারণই নেই।) কমুনিস্ট পার্টি বলতে আমি এখানে রাশিয়াওয়ালা অফিসিয়াল কমুনিস্ট পার্টিকেই লক্ষ্য করেছি। তবে একটা কথা এই যে, কমুনিস্ট পার্টিতেও যে কিছু কিছু বেশ ভাল কর্মী রয়েছেন, সে কথা অস্বীকার করবার মত বাজে ফালতু প্রপাগেণ্ডিস্ট আমি কখনও নই। ঠিক যেমন ভারতের কংগ্রেস দলের মধ্যেও এখনও দু'চারজন আত্মভোলা পাগলকে দেখতে পাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় রাজনীতি ও সুভাষবাবু

অবশেষে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সত্যি সত্যিই আরম্ভ হ'ল। কয়েক দিনের মধ্যেই পোলাণ্ড শেষ হয়ে গেল। আর দিনের পর দিন জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণে যেভাবে বৃটিশ জাহাজ সব ডুবতে লাগল, তাতে আমাদের আর আনন্দের সীমা থাকল না। গান্ধীজী অবশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হতেই লণ্ডন শহরের কোন্ কোন্ প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়বে বা ইংলণ্ডের আরও কি কি ক্ষতি হবে, কল্পনানেত্রে এ সব দেখে নিয়ে এক বিরাট দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন, ইংরেজকে সহানুভূতি জানিয়ে এক বিরাট বিবৃতি ঝাড়লেন। এ সব ঢংয়াঢংই কোনদিনই পছন্দ হোত না, মেজাজটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। আরে বাবা, ইংরেজের বাড়িঘর ভেঙ্গে পড়বে ত তোমার কি? ইংরেজ যে তোমার বুকে বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছে, রক্ত চুষে খাচ্ছে, কত লক্ষ কোটি লোকের জীবন ধ্বংস করছে, আনছে কত সুখের সংসারে ছারখার—সেটা কিছুই নয় নাকি? ইংরেজের বাড়িঘর ধ্বংস হবে এই ত স্বাভাবিক—আমরা ত তাই চাই। তা না হলে তার সঙ্গে এঁটে উঠব কেমন করে! গান্ধীজী তখন ভারতের রাজনীতিতে প্রায় একচ্ছত্র অধিপতি, বিরাট লোক, তাঁকে হাতের কাছে পাওয়া ত আর খুব সোজা নয় যে, তাঁর এই ব্যবহারের একটা কৈফিয়ৎ চাইব। তবুও চেপে থাকতে পারলাম না,—মনের ঝাল মেটাবার জন্য

গান্ধীজীর নামে বেনামীতে একটা সেমি-অশ্লীল চিঠি লিখলাম। চিঠিতে মনের সুখে গালাগালি দিলাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উৎসাহ ক্রমে কমে আসতেও বেশী দেরি হ'ল না। অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে আমাদের দলগুলো আর আস্ত নেই, সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। ইংরেজের অত্যাচারের তাল সামলাতে না পেরে একদল গান্ধী-বাদী সেজে চরকা ঘুরাতে লেগে গেছেন, আর একদল ইংরেজের জেল থেকে লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে জার্মানী-জাপান ধ্বংস করতে লেগে গেছেন। দ্বিতীয় দল অবশ্য যুদ্ধের প্রথমটাতে রিবেনট্রফ-মলোটফ্ চুক্তি, আর রাশিয়ার মতিগতি বুঝতে না পেরে একটু থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। মোটকথা, এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধটাকে নিজেদের স্বাধীনতার কাজে লাগাতে অবশিষ্ট আর বেশি কেউই ছিলেন না। যাঁরাও দু'একজন ছিলেন তাঁরাও অতি বিশৃঙ্খল অবস্থায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন; কারও সঙ্গে কারও যোগ ছিলনা।

কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে অবশ্য সুভাষবাবু প্রথম থেকেই এই যুদ্ধটার সুযোগ নেবার চেষ্টা করছিলেন। একটা আপোষহীন সংগ্রামের পথে এই যুদ্ধের দুদিনে ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তাই সুভাষবাবুই তখন ভারতের স্বাধীনতাকামীদের কাছে একমাত্র আশার আলোক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভরসা তখন একমাত্র সুভাষবাবুর উপরেই। সুভাষবাবুও যে সেটা বুঝতে পেরেছিলেন, তাও খুবই স্পষ্ট— কংগ্রেসের ভেতরে তাই আপনা থেকে গড়ে উঠেছিল সংগ্রামী আর আপোষ-কারী দুটো দল। বহুদিনের এবং বহু চেষ্টার প্রচারকার্যের দ্বারা গান্ধী মহাত্মাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে যে একটা অতিমানবে পরিণত করা হয়েছিল,—সে ফানুষের গায়েও সেদিন ফুটো দেখা যাচ্ছিল। গান্ধী মহাত্মার আপোষ প্রেমের খেলা খেলবার জন্য, তাঁরই হাতে খেলার পুতুল হয়ে থাকতে সুভাষবাবুও তাই আর রাজী ছিলেন না। কংগ্রেসকে বিপ্লবী এবং বিদ্রোহী সংস্থা হিসাবে গ'ড়ে তুলবার চেষ্টাই তিনি সেদিন করেছিলেন। গান্ধীজীর বিরাট আত্মম্ভরিতাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে জেনেও তাই সেদিন তিনি গান্ধী-মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামিয়ার বিরুদ্ধে কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য দ্বিতীয়বার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মনস্থ করেছিলেন। দেশের বিদ্রোহী আত্মারা সহায় ছিল তাঁর। হারিয়েও দিয়েছিলেন তিনি সীতারামিয়াকে অতি পরিষ্কারভাবেই।

জয় হয়েছিল সেদিন স্বাধীনতাকামী ভারতের। কিন্তু অহিংসগান্ধীর আত্মম্ভরিতাকে হার মানান সম্ভব হয়নি কখনও। 'সীতারামিয়ার হার মানেই আমার হার' একথা নিজমুখে প্রকাশ্য ঘোষণা করবার পরও গান্ধীজীকে কংগ্রেস নেতৃত্ব ছেড়ে সসম্মানে সরে দাঁড়াতে দেখা যায়নি। শেষপর্যন্ত স'রে যেতে হয়েছিল সুভাষবাবুকেই। আবেদন-নিবেদন করে দয়া ভিক্ষা করার কর্মসূচী নিয়ে যে কংগ্রেস জন্মগ্রহণ করেছিল সে তার কর্মপন্থা ঠিকই রেখেছিল।

সুভাষবাবুকে বিদেয় করবার পর নিশ্চিন্ত হয়ে কংগ্রেস-নেতৃত্ব অনেক অনেক ঢং দেখিয়েছেন, কিন্তু ইংরেজকে বিদায় করবার কিছুই করেন নি। না বিদায় অভিনন্দনের ফুলের মালা, না লগুড়; এ সবের ব্যবস্থা তাদের দিয়ে সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মত একটা সুযোগ, যা একটা পরাধীন জাতির জীবনে অনেক আসেনা; সম্ভবত কোন শতাব্দীতে এরকম অবস্থা দু'টো তিনটের বেশি আজও আসেনি। সেই সময়ে তাঁরা করছিলেন একক সত্যাগ্রহের ব্যবস্থা। একজন ফুলের মালা গলায় দিয়ে সং সেজে নানা রকম জিন্দাবাদ ধ্বনি শুনতে শুনতে কোথাও কোন শুভলগ্নে আইন অমান্য করবে। পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেলেই তার কাজ শেষ হ'ল আর তিনি হলেন হিরো। এই গান্ধীবাদী একক সত্যাগ্রহের প্রথম এবং প্রধান হিরো হয়েছিলেন আমাদের বিনোবা ভাবেজী, যাঁকে আজ আবার সেই পুরান গান্ধী ঢংয়ে ভূদান যজ্ঞ করে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। এগুলোকে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে দেখবার মত হতভাগা কেউ ছিল কিনা জানিনা। আমার ত মনে হয়েছে গান্ধী ঢংয়ে চলাফেরা করবার জন্য যে stage-free, মানে নির্লজ্জ ভাবটা দরকার হয় এগুলো ছিল তারই একটা পরীক্ষা। শুধু ক্লীব হলেই চলবেনা, গান্ধী ঢংয়ে চলতে হলে বেশ খানিকটা নির্লজ্জও হওয়া চাই। ভারতের রাজনীতিতেও আজকাল এই ভাবটাই বেশি চোখে পড়েছে।

সুভাষবাবু অবশ্য এসব ঢং দেখবার জন্য বসে থাকলেন না। এসব ঢং নিশ্চয়ই তিনি আরও অনেক ভালভাবেই দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। নানাভাবে তিনি চেষ্টা করতে থাকলেন, যদি কোন রকমে ছিন্ন ভিন্ন বিপ্লবী কর্মীদের আবার সংঘবদ্ধ করা যায়। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে ভুল করলেন না যে গান্ধীইজম এবং কমিউনিজম তাঁকে এমন কোণঠেসা করেছে, আর ইংরেজের পুলিশ তাঁর পেছনে এমনভাবে লেগেছে যে, দেশের

ভেতরে থেকে তাঁর পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। অগত্যা তিনি দেশ ছেড়ে বাইরে যাওয়াই ঠিক করলেন। হঠাৎ একদিন প্রকাশ পেল যে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। সম্ভবত রাজনীতিতে বিতৃষ্ণা হওয়ায় তিনি সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে গেছেন, কিংবা গেছেন সোজা পণ্ডিচেরীতে। দুটো জায়গার উপরই নাকি তাঁর সমান টান ছিল। একটা সোজা উত্তর আর অন্যটা সোজা দক্ষিণে,—পূর্বে বা পশ্চিমে তিনি যান নি। গুজবগুলো অবশ্য উদ্দেশ্যমূলকভাবেই রটান হয়েছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা খবর পেলাম যে গঙ্গাসাগরের মেলার পথে তিনি একখানা জাপানী জহাজ চড়ে ভারত ছেড়ে নিরুদ্দেশের যাত্রায় বের হয়েছেন। যুদ্ধশেষে অবশ্য কাবুল-ওয়ালা এক উত্তমচাঁদ একখানা বই লিখে জানালেন যে, স্নভাষবাবু কাবুলের পথে জার্মানীতে গিয়েছিলেন। উত্তমচাঁদের কথাই আজ স্নভাষবাবুর ভারত ত্যাগের পথের প্রামাণ্য বিবরণ বলে গৃহীত হয়েছে।

জার্মানীতে গিয়ে সেখানে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র এবং অল্পসংখ্যক যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে তিনি প্রথমে 'স্বাধীন ভারত সরকার' স্থাপন করলেন। কিন্তু পূর্ব রণাঙ্গনে জাপানের হাতে অনেক ভারতীয় সৈন্য বন্দী থাকায় কাজের স্নবিধা হবে মনে করে তিনি সাবমেরিনে ব্রহ্মদেশে এসে হাজির হলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের আমলের বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বস্থ ইতিমধ্যে পূর্ব-রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন কার্যে লেগে গিয়েছিলেন। স্নভাষবাবু এসে তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ করে সেটাকে সত্যিকারের স্বাধীন ভারতীয় সেনাদলে পরিণত করলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজেরা কি করেছিল না করেছিল, তা আজ কারুর আর বিশেষ অজানা নেই। তারা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং আসামের কোহিমা শহর দখল করেছিল, এবং তাদের স্বাধীন পতাকাও সেখানে তুলেছিল। ইম্ফল শহরও তারা ঘেরাও করেছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত দখল করতে পারে নি। প্রত্যক্ষ সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মতৎপরতা ভারতকে ইংরেজ অধীনতা থেকে মুক্ত করতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু তাদের এই কর্ম-তৎপরতাই যে শেষপর্যন্ত বৃটিশশক্তিকে চরম আঘাত হেনেছিল এবং ভারত ত্যাগে বাধ্য করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করবার মত ঔদ্ধত্য একমাত্র ঐ অহিংসাজীবীদের পক্ষেই সম্ভব, আর কারও নয়। তারাই আজকাল প্রপাগাণ্ডা চালিয়ে বেড়ায় যে অহিংস উপায়ে যুদ্ধ করে ভারতের স্বাধীনতা লাভ এক অতি অভিনব ব্যাপার। ভারতের স্বাধীনতা অতি অভিনব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে এই

অভিনব অহিংস যুদ্ধটা কোথায় হয়েছিল বা কিভাবে হয়েছিল তা কারুর জানা নেই। আর অহিংস নেতৃত্ব তাদের নিজেদের হাতে ক্ষমতা পাবার লোভ করতে গিয়ে যে কত লক্ষ কোটি লোকের সর্বনাশ করলেন, সে হিসাব রাখবার মত লোক এই অভিনব স্বাধীনতার যুগে আর জন্মায় না। জন্মালে এসব অভিনবত্ব অনেক আগেই ঘুচে যেত। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে আর কারুর যে কিছু দান আছে সেটা অহিংসাওয়ালারা স্বীকার করে না। অস্বাভাবিক অবশ্য কিছুই নেই, গান্ধীজী ত অনেক আগেই ঋষি টলস্টয়কে অস্বীকার করে অহিংস মন্ত্রটা তাঁর নিজেরই আবিষ্কার বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন। অহিংসাওয়ালাদের বীরত্বের বিশেষত্বও এইখানেই।

১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে একটা আন্দোলন অবশ্যই হয়েছিল, কংগ্রেসের নেতৃত্বে না হোক, কোন কোন কংগ্রেসী নেতার উস্কানীতে ত বটেই। কিন্তু এ হেন কাজটি কংগ্রেস যে কেন করতে গিয়েছিল, তা আশা করি আমার মত অনেকেরই বোধগম্যের বাইরে। 'জাপানকে রুখতে হবে' বলে কংগ্রেস থেকে কোন শ্লোগান তোলা হয়েছিল না ঠিকই, তবে কমুনিস্টরাও তখন কংগ্রেসের মধ্যেই ছিল, তাদেরকে ঐ শ্লোগানবাজী করে বেড়াতেও কেউই বাধা দেয় নি। উপরন্তু গান্ধীজীর মানসপুত্র শ্রীজহরলাল ত বলেই রেখেছিলেন যে, জাপানীরা কেন, সুভাষ বাবুও যদি আসেন, এমন কি ভারতীয় জাতীয় পতাকা হাতেও যদি এগিয়ে আসেন, তবে আর রক্ষা রাখবেন না। প্রয়োজন হলে একাই তরবারি হস্তে বাধা দিতে এগিয়ে যাবেন। আজকাল শ্রীজহরলাল বাৎচিৎসেই দুনিয়াকে যেভাবে কাৎ করে এনেছেন, তাতে মনে হয় সেদিন যদি তিনি তরবারি ধরতেন তাহলে জাপান-জার্মানীর আর রক্ষা ছিল না,— হিরোসীমাতে এটম বোম ছুঁড়বার কোন দরকারই হোত না। যাহোক জাপানীরা ইংরেজকে যুদ্ধে হারিয়ে দেয়, এটা যদি কেউই মনে মনে চেয়ে না থাকেন, তবে আর ওসব হাঙ্গামার প্রয়োজন কি ছিল। তবুও, ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে যে একটা হল্লা হয়েছিল সেটা ঠিকই।

১৯৩৯ সালে যুদ্ধ লাগবার পর থেকে অনেক জল গঙ্গা দিয়ে বয়ে গেছে। আপোষ-আলোচনা, মান-অভিমানের পালা শেষ হয়েছে। সুভাষবাবু কংগ্রেস

থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, এবং আরও কত কি সব ঢং হয়েছে, শুরু হয়নি শুধু সংগ্রামের জন্য কোন প্রস্তুতি। সত্যি কথা বলতে কি কংগ্রেস যে শেষ পর্যন্ত ইংরেজের সাথে কোনরকম একটা গোলমাল করতে পারে, তার কিছু মাত্র আভাষই দেশের লোককে দেওয়া হয়নি। আমরা ত তখনও কংগ্রেসের আওতায়ই ছিলাম, কিছুই জানতে পারিনি (ঐ সময়ের কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ তার 'India wins freedom' বইখানাতে অতি পরিষ্কার-ভাবেই স্বীকার করেছেন যে, একটি প্রস্তাব পাশ করা ভিন্ন অন্য কোন কর্মপন্থা গ্রহণ কববার কোন ব্যবস্থাই কংগ্রেস করেনি)। কিছুমাত্র প্রস্তুতি ত দূরের কথা আগেই বলেছি ১৯৩৭ সালে যে ক্ষমতাটুকু কংগ্রেস দখল করেছিল, কংগ্রেস সেটুকুও অতি বাজে একটা অজুহাতে ছেড়ে দিয়ে বসেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে গান্ধীজী যেভাবে সোজাসুজি ইংরেজকে সাহায্য করবার জন্য সৈন্যসংগ্রহ করতে লেগে গিয়েছিলেন, এবারে ঠিক অতটা সাহস করেন নি। তবে অপ্রত্যক্ষভাবে তাঁর কার্যকলাপ যে ইংরেজের যুদ্ধকার্যে সাহায্য করেছিল, তা বলাই বাহুল্য। এদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ লোককে সেনাদলে ভর্তি করে নেওয়া হচ্ছিল তাতে কোন বাধা কেউই দেয়নি। প্রতি বৎসর শত শত কোটি টাকার মালপত্র এদেশ থেকে যুদ্ধের সাহায্যের জন্য বিদেশে পাচার হচ্ছিল, কোন বাধা দেবার কথা কেউ ভাবেনও নি। কোন একটা কল-কারখানায় কাজ বন্ধ হয়নি বা কেউ কোন টু শব্দও করেনি। বরং কংগ্রেসের স্তম্ভস্থানীয় অনেকেই সুযোগ বুঝে বেশ টু পাইস রোজগার করে নিচ্ছিলেন। ঠিক এই পরিস্থিতিতে ১৯৪২ সালের আন্দোলনটাকে তাই কোন মতেই যুক্তিসহ বলে মনে হয় না।

জাপান যুদ্ধে নামবার পর অবস্থা অবশ্যই বেশ খানিকটা বদলে গিয়েছিল। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই অনেকগুলো দেশ নামমাত্র বাধা দিয়ে বা প্রায় বিনা যুদ্ধেই জাপানের ট্যাকস্থ হ'ল। ইংরেজের গর্বের ব্যাটলশিপ 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস্' আর 'রিপালস্' যেভাবে সমুদ্রের তলায় আশ্রয় নিলে, তাতে আর বিশেষ কারও সন্দেহ থাকল না যে, বর্ষা শেষ হয়ে শরতের রদ্দুর আরম্ভ হতে না হতেই আসাম সীমান্ত থেকে এগিয়ে এসে জাপানীরা ভারতকেও বৃটিশ আওতা থেকে তাদের নিজেদের হেপাজতে নিতে ভুল করবে না, এবং সেকাজে তাদের বিশেষ বেগও পেতে হবে না।

ইতিমধ্যে বৃটিশ মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে Staffords Cripps এলেন,

ভারতকে স্বাধীনতা দানের জন্য। দর কষাকষি অনেক হ'ল, কিন্তু আর একটু না পাবার জন্য গান্ধীজী রাজী হলেন না। ইংরেজ আর একটু দিতে রাজী হলেই তিনি নিশ্চয়ই কোমর বেঁধে জাপানীদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী এবং কংগ্রেস জাপানীদের বিরুদ্ধে নয়, খাস ইংরেজের বিরুদ্ধেই একটা কিছু করবেন, ঠিক করলেন। জাপানীরা যখন এসে পড়বেই, তখন তাদের সাথে কথা বলবার মুখ থাকা চাইত! কিন্তু কি যে করবেন সেটা অপ্রকাশ্যই থাকল, কেউ বুঝতে পারল না যে সেই কাজটি কি ধরনের হবে। অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, না আবার সেই একক সত্যাগ্রহের নাটক! কাউকে বা কোন কংগ্রেস কমিটিকেও কোন রকম প্রস্তুতির নির্দেশ দেওয়া হল না। কংগ্রেস এবং দেশ 'যথাপূর্বং তথা পরং' অন্ধকারেই থাকল।

অবশেষে আগস্ট মাসের প্রথম দিকে বোম্বাইতে কংগ্রেসের এক অধিবেশন ডাকা হ'ল এবং অতি বোম্বা বোম্বা বাৎচিৎ সহকারে এক বিরাট প্রস্তাব পাশ করা হ'ল। ঐ অধিবেশনে যেরকম লম্বাই লম্বাই কথাবার্তা হয়েছিল, তার চোটেই যে ইংরেজ দেশ ছেড়ে পালাল না এটাই হচ্ছে দুঃখ! এক বিরাট প্রস্তাব, তার প্রথম অংশে থাকল আবারও সেই আপোষ উমেদারীর কথা। আপোষমীমাংসা যাতে বন্ধুভাবেই হতে পারে তারই জন্য গান্ধী নেতৃত্বে কয়েকজন হোমরা চোম্‌রা নেতা বড়লাটের সাথে দেখা করতে যাবেন। আর দ্বিতীয় অংশে থাকল যে, যদি বড়লাট বাহাদুর ঐ সব নেতাদের ওজন মত খাতির মহব্বৎ না করেন, বা আপোষ না করেন, তাহলে দেশের লোক যা করবে তার দায়িত্ব যেন কংগ্রেসী নেতাদের দেওয়া না হয়। আপোষের কথা তুলবার যে কি মানে হয় বুঝা কঠিন, কংগ্রেসের সাথে ত ইংরেজের কোন লড়াই বা অসদ্ভাব ছিল না। আর দেশের লোক যদি কিছু করেই বসে তার দায়িত্বই বা তাঁদের ঘাড়ে যায় কিভাবে! তাঁরা ত ঐ প্রস্তাবেও দেশের লোককে কিছু করবার নির্দেশ দেন নাই।

বড়লাট বাহাদুর অবশ্য বিশেষ ব্যস্ত থাকায় কাউকে আর চায়ে নিমন্ত্রণ করতে পারেন নি, তবে নেতাদের সসম্মানে রাজবন্দী করে রাজভোগের ব্যবস্থা ঠিকই করেছিলেন। কোন অসুবিধা যাতে না হয় সেই জন্য গান্ধীজীকে তাঁর স্ত্রী আর সেক্রেটারীসুদ্ধই এক রাজপ্রাসাদে থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন। দেশের লোকেরা অবশ্য বড়লাট বাহাদুরকে এবং ঐ নেতাদেরও

ভুল বুঝে কিনা জানি না, এক মহা হল্লা শুরু করে দিলে। দেশের লোকদের অনেকেই ত এই দুরবস্থায় পেয়ে ইংরেজকে কিলটা চড়টা দিতে না পেরে হাত-পা সুড় সুড় করছিল। শুধু নেতারাই তাদের নানাভাবে বিভ্রান্ত করে অকর্মণ্য করে রেখেছিলেন। বোম্বেতে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, মাদ্রাজে, বিহারে, ইউ, পি-তে, বাংলাতে, উড়িষ্যাতে এবং আরও অনেক জায়গাতেই, বেশ কিছু হৈ হল্লা হ'ল। কিন্তু ঐ হৈ হল্লা পর্যন্তই, আর বেশি কিছু নয়। অপ্রস্তুত এবং অসংবদ্ধ অবস্থায় জনসাধারণের পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব, এও তাই, তার বেশি কিছুই নয়। অন্যান্য সব আন্দোলনে দেখা গেছে বাংলাতেই হল্লাটা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এবারের আন্দোলনে কিন্তু বাংলা অনেকের পেছনে চলে গেল। বাংলার এই দুরবস্থার কারণ খুঁজতেও বেশিদূর যেতে হয় না। বাংলার কর্মীদের একটা বড় অংশ ইতিমধ্যে লালঝাণ্ডা হাতে 'জাপানকে রুখতে হবে' কাজে লেগে গেছে। আর একটা অংশ নির্ঝঞ্ঝাটে রাজনীতি করবার আশায় অহিংসদলে মিশে গিয়ে চরকা ঘোরাতে আরম্ভ করেছে। আর ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বাকি যাঁরা ছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই তখন ইংরেজের জেলে আটক পড়েছেন।

বোম্বেতে, বিহারে এবং অন্য সব জায়গায় যখন হল্লা বেশ জমে উঠেছে তখন একদিন কিরণ বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন বলে সংবাদ এল। বাংলায় কিছুই হচ্ছেনা কিছু করা দরকার। কিরণ বাবু মানে কিরণশঙ্কর রায়, এবার কিছু করবেন। কথাটা শুনে কি রকম যেন লাগল, তাঁর আবার হঠাৎ এসব মতিগতি কেন? যাহোক দেখা করলাম এবং কিরণবাবু ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, যার মোট মানে হচ্ছে যে, অন্য সব প্রদেশে হৈ হল্লায় এবার এগিয়ে গেল, বংলায় কিছুই প্রায় হ'ল না। বাংলার প্রেস্টিজ একেবারে নষ্ট হয়ে গেল ইত্যাদি। অতএব কিছু করা দরকার। বাংলার প্রেস্টিজ নষ্ট হয়ে গেলে বাংলার নেতারা যে আর কংগ্রেসের উচ্চ আসনে কল্কে পাবেন না! আজ যদি তাঁর এসব করবার মতলবই ছিল, তবে তিনি কেন সুভাষ বাবুর সাথে হাত মেলালেন না, আগে থেকে প্রস্তুতির কোন চেষ্টাও করলেন না, আমাদের ডেকে পাঠিয়ে আগে থেকে কিছু বললেন না কেন— এসব অনেক প্রশ্নই সেদিন তাঁকে করবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হয়নি। কয়েক বৎসর পরে অবশ্য তাঁর সাথে আবারও সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তিনি নিজেই এ বিষয়ে কিছু কিছু বলেছিলেন, যার সোজা মানে হচ্ছে এই যে, কংগ্রেস ওপর-

ওয়ালাদের ঐ সময়ে কোন রকম হাঙ্গামা করবার কিছুমাত্র ইচ্ছাই ছিলনা। তবে জাপান যে এসে গেল তাই লোক-দেখাবার জন্ত একটা গালভরা প্রস্তাব পাশ করেছিলেন। আর হাঙ্গামা যেটুকু হয়েছিল, তা ঐ মূর্খ জনগণের, ঐ অহিংস আপোষ রফার পন্থার উপর আস্থা না থাকার জন্যই।

বাংলার যখন প্রেস্টিজ থাকে না, তখন ত কিছু করতেই হবে। দু'এক জায়গায় রেললাইন তোলা, টেলিগ্রাফের তার কাটা কিংবা নিদেনপক্ষে দু'চারটে চিঠির বাক্সে আগুন দিতেই হবে। ইনকাম ট্যাক্স অফিসগুলোতে আগুন দিতে পারলে নাকি মারোয়াড়ী ভদ্রলোকেরাও এই আন্দোলনের সাহায্যে টাকা দিতে কসুর করবেন না, সেরকম আশ্বাসও নাকি পাওয়া গেছে। ইংরেজ তাড়াতে হবে এ প্রশ্ন তখন আর তুলে লাভ নেই,—বাংলার প্রেস্টিজ বাঁচাতে হবে!

আমার উপর ভার পড়ল সমগ্র উত্তর-বঙ্গকে সংঘবদ্ধ করবার, অনেকটা ঠিক রাশিয়াতে যেমন দেয়া হয়েছিল এম. এন. রায়ের উপর,—প্রায় সেই রকমই আর কি! আমার নিজের জেলা রংপুরের রাজনীতি তখন প্রায় পুরোপুরিই কমুনিস্টদের হাতে। কমুনিস্ট-বিরোধীদের নিয়ে একটা সংস্থা গড়ে তুলবার চেষ্টা ইতিপূর্ব্বেই করেছিলাম, বিশেষ সুবিধা হয় নি। বরং পুলিশের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। অন্য সব জেলার সঙ্গেও সংযোগ তখন প্রায় নেই। এই অবস্থায় আমার উপর ভার দেওয়া হ'ল সমগ্র উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহ করাবার—ব্যাপারটা ব্যঙ্গ-রসাত্মক, কি হাস্যরসাত্মক তখন ঠিক বুঝবার সময় পাইনি। যেসব জায়গায় আমার একজনও পরিচিত কেউ আছেন কিনা বলতে পারলাম না, সেরকম দু'তিন জায়গার জন্য কিরণবাবু খানতিনেক পরিচয়পত্রও আমাকে দিলেন। পরিচয়পত্র নিয়ে বিদ্রোহ করাবার চেষ্টার ইতিহাস আর কোন দেশে আছে কিনা জানিনা, তবে আমরা করেছিলাম। সাফল্য ঠিক যতটুকু হওয়া উচিত ছিল ঠিক ততটুকুই হয়েছিল, বেশি নয়।

সমগ্র উত্তরবঙ্গ ঘুরে অনেকের সাথে আলাপ এবং পরামর্শ করে আমি ফিরে এলাম, কিন্তু কিরণবাবুকে আর পেলাম না। তিনি নাকি তখন মধুপুর না কোথায় একটু স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনে গেছেন। বোধহয়, তিনি আমার মত কয়েকটা হতভাগাকে উস্কানি দিয়েই ভেবেছেন যে, বিদ্রোহের আগুন ত জেলেই দিলাম, এবার একটু স্বাস্থ্য ভাল করে নিই। আমার ত

দেশের নেতৃত্বের হাঙ্গামা পোয়াতে হবে! কি করব বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল উপেনদার (সিরাজগঞ্জের উপেন রায়) সঙ্গে। উপেনদা বুড়ো হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু অনেক যুদ্ধের হিরো ছিলেন তিনি। তাই তাঁর উপর আস্থা ছিল। তিনি বল্লেন, কাজ চালিয়ে যাও, আমি কলকাতা থেকে যথাসম্ভব সাহায্য করব। দ্বিতীয়বার কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আবার যখন জেলায় জেলায় গেলাম, তখন আগের বারে যাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এসেছিলাম, তাঁদের অনেকেরই আর পাত্তা পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে তাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন কিংবা গ্রেপ্তার এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তৃতীয়বার আবার যখন গেলাম তখন অবস্থা একেবারেই চরমে, দেখা করবার মত অবশিষ্ট আর প্রায় কেউই ছিলেন না। রংপুর গিয়েও বুঝতে পারলাম যে পুলিশ আমার জন্যও তৈরি হয়েই আছে। ঘাপ্‌টি মেরে দুদিন রংপুরেই থাকলাম, তারপর অন্ধকারে ব্লাকআউটের ট্রেনে চড়ে রওনা হলাম। পার্বতীপুর জংসনে গাড়ী বদল করবার সময় পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া কঠিন হ'ল, তারা ত আমাকে ধরেই ফেলল্ আর কি! তবুও সেদিন আমি ধরা দেইনি, ব্লাকআউটের অন্ধকারের সুযোগে আর লোকের ভিড়ের মধ্যে এমন এক দৌড় দিলাম যে, প্লাটফরম, ইয়ার্ড ছাড়িয়ে জলকাদা ভেঙ্গে, ধানক্ষেতের আল দিয়ে প্রায় মাইল তিনেক গিয়ে তবে থাম্‌লাম,—যদিও প্লাটফরম্ ছেড়ে ইয়ার্ডে আর পুলিশকে আমার পেছনে দেখতে পাইনি। ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার পুলিশের সাথে দৌড়াদৌড়ি আমাকে করতে হয়েছে। এবারের দৌড় কিন্তু একেবারে রেকর্ড। আমার নিজেরই ধারণা ছিলনা যে, আমি অত জোরে এবং একসঙ্গে অতদূর দৌড়াতে পারি। তারপর আরও কিছু ঘোরাঘুরি করেছি, কিন্তু কাজ কিছুই হয় নি। লাভ হয়েছে শুধু আমার লম্বা চুল আর দাড়ি, যার দৌলতে স্বাধীন পাকিস্থানের রাস্তাঘাটে আজকাল হামেসাই, 'সেলাম আলেকুম' পাই।

ভারতে আজাদ হিন্দ ফৌজ আন্দোলন

নির্বিঘ্নেই যুদ্ধ শেষ হল। জার্মানী হারল, জাপান হারল, এটম বোমা ফাটল, আর পৃথিবীতে ফিরে এল শান্তির বন্যা। শান্তি-পিপাসুরা প্রাণভরে শান্তি পান করতে লাগলেন। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাস, আত্মপ্রকাশ করব কিনা ভাবছি। শুধু ভয়, ইংরেজ যুদ্ধে জিতেছে, দু'চারটে

জালিয়ানওয়ালাবাগ না করে তাদের মাথা ঠাণ্ডা হবে না। তাই আত্মপ্রকাশ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি না কে জানে! কলকাতায় নেতাদের সঙ্গে দেখা হ'ল, তাঁরা বললেন, এখন আর লুকিয়ে বেড়ালে চলবে কেন! সম্মুখে যে ইলেক্‌সন, এই ইলেকসনের উপরেই আমাদের সব নির্ভর করছে। সত্যিই ত! এখন ভয়ে ভয়ে পালিয়ে বেড়ালে চলবে কেন! দাদারা তাহলে খাবেন কি? অগত্যা আত্মপ্রকাশ করলাম, এ ভিন্ন উপায়ই বা কি ছিল? পালিয়ে বেড়ানটা ত আর খুব সুখের ব্যাপার নয়!

রংপুর ফিরলাম। কমুনিস্টরা তখন কংগ্রেস থেকে বের হয়ে গেছে, কংগ্রেসের দখল পেতেও বেশি দেরি হ'ল না। যদিও ইলেক্‌সন-রাজনীতিতে কিছুমাত্র আস্থা ছিলনা কোনদিনই, তবুও এবং নিজে নমিনেশন প্রার্থী না হয়েও আবার মাঠে বের হলাম। কংগ্রেসের ছোট বড় সবাই তখন ইলেকসনে মেতে উঠেছেন। হঠাৎ একদিন কাগজে দেখলাম শ্রীজহরলাল ইউ, পি-তে বালিয়া জেলায় না কোথায় ইলেক্‌সনের বক্তৃতা করতে করতে শ্লোগান তুলেছেন 'দিল্লী চলো', এবং 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' গানটিও খানিকটা গেয়ে শুনিয়েছেন। ব্যাপারটা কি রকম কি রকম বোধ হল,—'একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে'—ভাবটা অনেকটা এই ধরণের আর কি! পলাতক জীবনে মাঝে মাঝে কলকাতায় থাকবার সময়ে সাইগন বা ফ্রি ইণ্ডিয়া রেডিও শুনবার একটু আধটু সুবিধা ছিল। তাই জান্‌তাম যে ওসব কথাগুলো ছিল জহরলালের শত্রুপক্ষের কথা—আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা, যাঁদের তিনি তরবারি হস্তে বাধা দেবেন বলে শাসিয়েছিলেন।

আজাদ হিন্দ সরকার আর তাঁদের ফৌজের যাঁরা ধরা পড়েছিলেন, ইংরেজ তাঁদের বিচার শুরু করে দিল। গোপনে গোপনে বিচার হয়ে অনেকের ত ফাঁসির হুকুমও হয়ে গেল। দেশে আবার ঐ হল্লা শুরু হতেও দেরি হ'ল না। ছাত্ররা ক্ষেপে উঠল। তাদের রক্তে লাল হয়ে গেল কলকাতার রাস্তা। বোম্বাইয়ের ছাত্ররাও পেছিয়ে থাক্‌ল না, তারাও রক্ত দিলে। কলকাতার ছাত্ররা আবারও রক্ত দিলে। এইভাবে রক্ত দেবার জন্য রেষারেষি পড়ে গেল। সারা ভারতে আবার গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠল। কংগ্রেসের পক্ষেও আর চুপ করে থাকা সম্ভব হ'ল না। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যের জন্য কংগ্রেস থেকেও ফাণ্ড খোলা হল। বিচারালয়ে তাদের পক্ষ সমর্থন করবার জন্যও ব্যবস্থা হ'ল। এমনকি শ্রীজহরলাল পর্যন্ত উকিলের

কুর্তা গায়ে দিয়ে কোর্টে গিয়ে হাজির হলেন। ইলেক্‌সন-রাজনীতিতে কত নাটকই না করতে হয়, তার আর ইয়ত্তা নেই! তবে জহরলাল এবং কংগ্রেস এ ব্যাপারগুলো তাঁদের ইলেক্‌সনের জন্যই করুন আর নাই করুন, কাজ হ'ল। ইংরেজ একটু থমকে দাঁড়াল—আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকদের আর ফাঁসিতে চড়ালি না,—অনেককে ত ছেড়েই দিলে। ফলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে ইংরেজের ভারতীয় সৈন্যদলে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিলেন, তা আরও চরমে উঠল। ভারতীয় সৈন্যরা বুঝতে ভুল করল না যে, দেশের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের পক্ষ ছেড়ে বিপক্ষে গেলেও, ইংরেজ আর ফাঁসি লটকাবার সাহস রাখে না।

গোলমাল কিছু কিছু আরম্ভও হ'ল ঐ সৈন্যদলের মধ্যেই। প্রথমে দেরাদুনে, তারপর জব্বলপুরে এবং কলকাতার আশেপাশে সৈন্যদের মধ্যে বেশ গোলমাল পাকিয়ে উঠতে থাকৃল। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ যা ঘট্‌ল, তা হচ্ছে কলকাতার নেভাল ব্যারাকের স্ট্রাইক এবং পরে বোম্বাইতে ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজের সশস্ত্র বিদ্রোহ। বোম্বাইতে বিদ্রোহীরা একখানা যুদ্ধ জাহাজই দখল করে বসল। ইংরেজ সরকার তাদের আত্ম-সমর্পণ করবার জন্য চরমপত্র দিলেন। তাদের সায়েস্তা করবার জন্য কলম্বো থেকে বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ ছুটে আস্‌তে থাকৃল। আবারও, তাদের এরোপ্লেন থেকে বোমা মেরে ডুবিয়ে দেওয়া হবে বলে ভয় দেখান হল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার আশা দেখা গেল না; বিদ্রোহীরা ভয় পেল না। এইভাবেই ব্যাপার যখন চরমে উঠেছে, তখন দেশের অনেকেই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কি করা যায়! কেউ কেউ কংগ্রেসের বড় নেতাদের এগিয়ে এসে মধ্যস্থতা করবার অনুরোধও জানালেন, তা না হলে অনেকগুলো ছেলে যে বেঘোরে মারা যায়।

এ-ব্যাপারগুলোকে উস্কানি দিয়ে বাড়িয়ে তুলে কাজ হাসিল করবার মত নেতা বা রাজনীতি কংগ্রেসের ছিল না। তবুও সেদিন ঐ কংগ্রেসেরই একজন বড় নেতা সর্দার প্যাটেল এগিয়ে এসে এমন একটা কাজ করেছিলেন যার ফল হয়েছিল খুবই সুদূরপ্রসারী। সর্দার প্যাটেল এগিয়ে এসেছিলেন, ঐ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করবার জন্য নয়, নেতার মতই সেই বিদ্রোহী জাহাজের ছেলেদের হুকুম করবার জন্যই। তিনি হুকুম করেছিলেন, "ছেলেরা, তোমরা তোমাদের দেশের নেতার কথা শোন, তোমরা অস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং আত্ম-

সমর্পণ কর, বিনা সর্তেই কর।" সেদিন সর্দার প্যাটেলের এই হুকুম যে সত্যিকারের নেতার মতই হয়েছিল, তাতেও কোনই ভুল নেই। ছেলেরাও নেতাকে মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল, বিনাসর্তেই। আর সঙ্গে সঙ্গে ধ্বসিয়ে দিয়েছিল তারা ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি।

ভারতীয় সৈন্যদের দিয়েই ইংরেজ ভারত জয় করেছিল, ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য পরিচালিত হ'ত তাদের সাহায্যেই। তাই ইংরেজ যখন বুঝতে পারলে যে, সেই ভারতীয় সৈন্যদের উপর তার হুকুমের জোর আর অবশিষ্ট নেই। ভারতীয় সৈনিকেরা আজ ইংরেজ প্রভুদের চেয়ে তাদের দেশের নেতা সর্দার প্যাটেলকেই বেশি মানে। সৈন্যদলে বিদ্রোহ করবার অপরাধ যে মৃত্যুদণ্ড তা জেনেও সেদিন তারা সর্দার প্যাটেলের কথা শিরোধার্য করে বিনা সর্তেই আত্মসমর্পণ করেছিল। শুধু জানিয়ে দেবার জন্য ইংরেজকে, জানিয়ে দেবার জন্য পৃথিবীকে যে, ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের দিন শেষ হয়ে গেছে। যাদের কিছুমাত্র বুঝবার ক্ষমতা আছে, তারাই সেদিন বুঝেছিল যে এবার ইংরেজের বিদায় অভিনন্দনের পালা। ইংরেজও বোধ হয় ঐদিনই ভারত ছাড়বার জন্য তাদের মন ঠিক করে ফেলেছিল। শুধু কংগ্রেস হাইকমাণ্ড বুঝতে ভুল করেছিলেন, তা নাহলে তাঁরা আর একটু ধৈর্য ধরতেন। তাঁদের বেশির ভাগই ত সেই তাল-গাছ-কাটা পলিটিসিয়ান কি না, তাই!

১৯৪৬ সালের ইলেক্‌সন

১৯৪৬ সালে ইলেক্‌সন হ'ল, খাটলামও খুব। আমাদের রংপুর জেলাটা ত সমস্ত যুদ্ধের বাজারটা ঐ কমুনিস্টদের একচেটিয়া দখলেই ছিল। রাজনীতির ভাষায় যাকে বলে পকেট জেলা (Pocket borough), কমুনিস্টদের মতে রংপুর নাকি তাদের কাছে প্রায় সেইরকমই ছিল। সারা ভারতের মধ্যেই নাকি কমুনিস্টদের কাছে রংপুর তখন একটা বিশেষ স্থান লাভ করেছিল। কমুনিস্টরা নাকি রংপুরের উল্লেখ করতে হলে 'রেড রংপুর' কথাটি ব্যবহার করত। প্রথম প্রথম গ্রামে গিয়ে ব্যাপার-স্যাপার দেখে বেশ ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। রাস্তাঘাটে লালঝাণ্ডা আর লাল টুপির যেরকম ছড়াছড়ি, বাড়িতে বাড়িতে ঠিক সেই রকম কমুনিস্ট পোস্টারের বাড়াবাড়ি। ভোটাভুটি হয়ে যাবার পর যখন ফল বের হ'ল, তখন অবশ্য বুঝতে পারা গেল যে আমাদের দেশের

সাধারণ লোক যতই দরিদ্র এবং মূর্খ হোক না কেন, একেবারে নির্বোধ কখনই নয়। স্লোগানবাজী আর ভাঁওতা দিয়ে তাদের বেশি ঠকান যায় না।

কমুনিস্টরা যে দুজন তপশীলি হিন্দু প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলেন, তারা হেরে ঢোল হ'ল। শুধু তাই নয়, তারা কেউ জামানত বাজেয়াপ্ত না হবার মত ভোটও পেল না। কমুনিস্টদের 'লাল রংপুর' ভোটের পরে বেগুনী বা অন্য কোন রং হয়েছিল কিনা জানিনা, তবে ঐ এক ভোটাভুটিতেই রংপুরের কমুনিস্ট পার্টি একেবারেই কুপোকাৎ হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা জাতীয়তাবাদী হিসাবে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের কেউই সুবিধা করতে পারেন নি। এক আবুহোসেন সরকার বাদে অন্য সকলেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে ১৯৪৬ সালের ভোটযুদ্ধের ফল সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রেও ঐ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অনুযায়ীই হয়েছিল। হিন্দুদের ভোটের বেশ বড় অংশই কংগ্রেস পেয়েছিল আর মুসলমানদের ভোট প্রায় সবটাই পেয়েছিল মুসলিম লীগ। কেন্দ্রীয় আইন সভার সব ক'টি আসনই দখল করেছিল মুসলিম লীগ। ১৯৩৫ সালের শাসন ক্ষমতাটুকু হাতে পাবার জন্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মেনে নিয়ে গান্ধীজী যে কুকার্য করেছিলেন তারই ফল ১৯৪৬ সালের ইলেকসনের ফলের মধ্যে পাওয়া গেল। কিন্তু ঘাবড়াবার পাত্তর মহাত্মা গান্ধী কোনদিনই ছিলেন না, তাই বাৎচিৎসেই সব ঠিক করে নিলেন। প্রত্যহ প্রার্থনা সভার ব্যবস্থা আরও ডবল উৎসাহে বাড়িয়ে দিলেন। ধর্মপ্রাণ ভারতবাসী আমরা, তাই মহামানব বা অতিমানব একজনকে হাতের কাছে না পেলে কিছুই করতে পারি না; গান্ধীজীকে ছেড়ে আর কোথায় যাব!

নূতন সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে আসলেন, নূতন আইনসভা আবার আরম্ভ হ'ল; মন্ত্রী উজির সব তৈরী হলেন। বৃটিশ-সাম্রাজ্যের রথ আবার চলতে লাগল, পুরোদমে না হোক আধাস্টিমে। দেশী মন্ত্রীরা আবার প্রদেশগুলোতে জাঁকিয়ে বসলেন। সিন্ধু, বাংলা আর পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ আর অন্য প্রদেশ-গুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব পেল। কংগ্রেস কাজ শুরু করল, তাদের নেতিবাচক কর্মপন্থার মাধ্যমে গাঁজা, মদের মাত্রা কমিয়ে দিয়ে। আর মুসলিম লীগ যে কি করেছিল তা আজ আর বিশেষ মনে নেই।

কলকাতা, নোয়াখালি এবং বিহারের দাঙ্গা

ভারতের সৈন্যবাহিনীতে গোলমাল শুরু হওয়ায় বৃটিশ শক্তির অবস্থা যে শোচনীয়, কায়দা মত চেপে ধরতে পারলে অনেক কাজই আজ হাসিল হতে পারে, সেসব কথা আর বিশেষ কারুর মনে থাকল না। এতগুলি প্রদেশে ক্ষমতা হাতে পেয়েও কংগ্রেসের, 'ইংরেজ ভারত ছাড়' দাবি জোরদার হয়ে উঠতে দেখা গেল না। বরং শ্রীরাজাগোপালাচারীর ফর্মুলা অনুযায়ী দেশ ভাগ করে নেবার কথাটাই নানাপ্রসঙ্গে নানা জায়গায় আলোচিত হতে থাকল। মুসলিম লীগ কিন্তু বসে ছিল না। মাত্র তিনটি প্রদেশের ক্ষমতা তাদের হাতে থাকলেও তারা পাকিস্থান দাবির আন্দোলন ক্রমেই বাড়িয়ে যেতে লাগল। রাজাগোপালাচারীর দেশ-ভাগের ফর্মুলা প্রচারিত হবার পর থেকে তারা ত পাকিস্তান পাওয়া বিষয়ে একরকম নিশ্চিন্তই হয়েছিল,—শুধু সময়মত একটা লাথি মেরে আদায় করে নেয়াটাই যা বাকি। সে লাথি মারবার প্রস্তুতিও তারা ভালভাবেই করে চলেছিল।

ইংরেজ যে তার ভারত-সাম্রাজ্যের ভাঙ্গা হাটে একটা মরণকামড় না দিয়েই সরে যাবে এরকম মনে করবারও কিছুই কারণ ছিল না। দু'চারটে জালিয়ান-ওয়ালাবাগের পুনরাবৃত্তি ত করবেই, এবং তার কি ফল হয় তাও দেখবে। করেও ছিল তাই, তবে ঠিক সোজাসুজি প্রত্যক্ষভাবে নয়, অপ্রত্যক্ষভাবেই করেছিল। যার ফলে সম্ভব হয়েছিল কলকাতার, নোয়াখালির এবং বিহারের দাঙ্গা। ইংরেজের এগুলো করিয়ে কি লাভ হয়েছিল বলা কঠিন, তবে কংগ্রেসের অহিংস নেতারা যে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন এবং এই ভয়েই ভারত-বিভাগে সম্মতি দিয়েছিলেন সে ত খুবই পরিষ্কার। আপাতত ইংরেজ হয়ত ঐটুকু করাতে পারলেই ভবিষ্যতের বিষয় অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে ফিরতে পারেন, এইটুকুই ছিল তাদের মতলব। তাদের মতলব যে ভালভাবেই সিদ্ধ হয়েছে, তাও ত বেশ দেখা যাচ্ছে,—ভারত বা পাকিস্থানে তাদের স্বার্থ ত বেশ নিরাপদেই আছে।

কংগ্রেসকে দিয়ে পাকিস্থান দাবি স্বীকার করিয়ে নেবার জন্য মুসলিম লীগ নেতা জিন্না সাহেব যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসেই (direct action day) কলকাতার বিরাট দাঙ্গা হয়েছিল, যার নাম হয়েছে Great Calcutta Killing। এই দাঙ্গায় কম পক্ষে দশ হাজার লোক হিন্দু এবং মুসলমান প্রাণ হারিয়েছিল। ১৯৪৬ সালের

১৬ই আগস্ট তারিখে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের জন্য মুসলিম লীগ অনেক আগে থেকেই ফতোয়া জারী করেছিল, আর তার জন্য প্রস্তুতিও চলছিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ব্যাপারটা যে কি হতে পারে তা ঐ ১৬ই তারিখের আগে কেউই আঁচ করতে পারে নি। অনেককাল থেকে দেশের লোক গান্ধী সংগ্রামের ন্যাকামি দেখে দেখে সংগ্রাম কথাটার গুরুত্বই ভুলে গিয়েছিল। তাই মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামও যে ঐ অহিংস ঢংয়েরই কিছু একটা হবে, সে বিষয়ে কারুর কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু ১৬ই তারিখে সকাল বেলায় যখন টেলিফোনের মাধ্যমে সারা কলকাতায় খবর ছড়িয়ে গেল যে প্রকাশ্য রাস্তায় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে, হিন্দু দোকান লুঠ হচ্ছে বা তাতে অগ্নি সংযোগ করা হচ্ছে, অথচ পুলিশের কোন পাত্তা নেই তখন সবাই আঁৎকে উঠলেন। পাড়ায় পাড়ায় সাজ-সাজ রব পড়ে গেল, এবং এই রকম অপ্রস্তুত অবস্থায় যা হওয়া সম্ভব বিকেলের দিকে তাই শুরু হ'ল। যত নিরীহ মুসলমান হিন্দু পাড়ার মধ্যে থাকে তাদের ধরে ধরে কোতল করা শুরু হ'ল। রক্তের বন্যা বয়ে গেল, তিন দিন ধরে। হাজার হোক কলকাতা হিন্দু-প্রধান শহর। প্রত্যক্ষ সংগ্রামটা এখানে খুব সুবিধার হ'ল না। মারা পড়ল হিন্দুর চেয়ে মুসলমানেরাই অনেক বেশি। হিন্দুদের ভয় দেখিয়ে কাবু করবার প্লান মোটেই সফল হ'ল না; বরং ফল হ'ল উল্টো, মুসলমানরাই ভয় পেয়ে কলকাতা ছেড়ে দেশে যেতে লাগল।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর তক্তে বসে যে সুরাবর্দী সাহেব এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্লান এঁটেছিলেন, তিনি বেশ একটু বেকায়দায় পড়লেন। কিন্তু ঘাবড়াবার পাত্তর তিনি কোন দিনই ছিলেন না। হিন্দুপ্রধান কলকাতায় যা সুবিধা হ'ল না, সেটা তিনি মুসলমান-প্রধান নোয়াখালিতে অনায়াসেই পুষিয়ে নিলেন। বহু হিন্দু কোতল হ'ল, বহু হিন্দুকে মুসলমান করা হ'ল, আর বাকি সব হাজারে হাজারে নোয়াখালি ছেড়ে পালাতে লাগল। আবার এই প্রতিশোধের প্রতিশোধ আসতেও বেশি দেরি হ'ল না। আরও নৃশংস হত্যাকাণ্ড হ'ল বিহারে। এই তিনটে হত্যাকাণ্ডে যত লোক নিহত হয়েছে তার হিসাব কেউ রাখে নি ঠিকই; কিন্তু হিসাব রাখলে জানা যেত যে বিগত দু'টো বিশ্বযুদ্ধ ছাড়া, ইদানিং কালের ইতিহাসে এত নরহত্যা অন্য কোন লড়াইতে বোধহয় হয়নি।

"আপনি জানেন না, আপনি কি হারিয়েছেন'

ইতিমধ্যে অবশ্য ক্ষমতা হস্তান্তর করে যাবার জন্য গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের লোকদের নিয়ে কেন্দ্রে এক অস্থায়ী সরকার গঠন করেছিলেন। সেই অস্থায়ী সরকারের কংগ্রেসী জহরলাল, প্যাটেল বা লীগ দলীয় লিয়াকৎ আলি, গজনফর আলি এইসব হত্যাকাণ্ড বন্ধ করবার জন্য কিছুই করতে পারেন নি। শুধু ইংরেজ কবে তাঁদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে বিদায় হয়ে যাবে সেই সুদিনের স্বপ্ন দেখেছেন। ইতিপূর্বে বৃটিশ সরকার ক্যাবিনেট মিশন নাম দিয়ে এক মিশন এদেশে পাঠিয়েছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের হাতে কিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় তারই উপায় উদ্ভাবন করা। তাঁরা এদেশে আলাপ-আলোচনা করে দু'টো প্রস্তাব রেখে গিয়েছিলেন। একটি হচ্ছে মুসলিম লীগের দাবি অনুযায়ী ভারতকে দুভাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তর। আর অন্যটি ছিল এক দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে হিন্দুপ্রধান প্রদেশ, মুসলমানপ্রধান প্রদেশ, আর দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে কতগুলি আধা-স্বাধীন প্রদেশ গঠন করা।

কংগ্রেস প্রথম প্রস্তাবটি তার কল্পনার বাইরে বলেই মনে করেছিল, আর দ্বিতীয়টিও মান্‌তে পারছিল না এইজন্যেই যে আসাম প্রদেশটিকে মুসলমান-প্রধান প্রদেশ বাংলার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস বা দেশের কাছে এ দুটি প্রস্তাবের কোনটিই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা, তা অতি সত্য কথা, দুটোই ছিল অতি সর্বনাশকর। কিন্তু প্রস্তাব দুটিকে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করে ঠিক জিনিস আদায় করবার জন্য চাপ দেবার ইচ্ছা বা ক্ষমতাও কংগ্রেসের ছিল না। ভয়, পাছে ইংরেজ বেশি চাইতে গেলে কিছু না দেয়। আরও ভয় ছিল, বেশি চাপ দিতে গেলে ভারতীয় সৈন্যদলে যদি গণ্ডগোল শুরু হয়, যদি সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ হয়, তাহলে কি হবে! তাহলে ক্ষমতা ত কংগ্রেসের হাতে আস্‌বেই না, যারা জোর করে দখল করতে পারবে তাদের হাতেই যাবে। ক্ষমতা যদি আমাদের হাতেই না পড়ল তাহলে দেশ স্বাধীন হ'ল কি না হ'ল তাতে কি আসে যায়—ভাবটা অনেকটা এই ধরনের আর কি। এইজন্যই কংগ্রেস হাঁ, না—কিছুই না বলে বা কোন কর্মপন্থা না নিয়ে শুধুমাত্র যেন তেন প্রকারেণ অস্থায়ী সরকারের গদি আঁকড়ে বসেছিলেন। আর ঘুস ঘুস করে কেবল সময় কাটাবার আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পর পর এইরকম তিনটি বিরাট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হবার

ফলে গবর্ণমেন্ট যে আসলে ভেঙে পড়েছিল, অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছিল, সেটুকু বুঝবার বা কাজে লাগাবার সময় সুযোগ তাদের কখনই হয় নি। দেশের স্বাধীনতা ত নয়, চোরাই পথে চুপেচাপে, ভিক্ষে করে বা মূল্যের বিনিময়ে যা পাওয়া যায় তাই তাদের নীট লাভ।

অভূতপূর্ব এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলো যে ভারতে বৃটিশ শাসন ভেঙে দিয়েছিল, তা কিন্তু সাধারণ অনেকেরই বুঝতে দেরি হয় নি। তাই সুযোগটাকে যারা কাজে লাগাতে চায়, হাজারে হাজারে তারা কাজে লেগেও গিয়েছিল। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং নানারকমের বোমা তৈরির কাজটা এই সময়ে বেশ বৃহৎ আকারেই আরম্ভ হয়েছিল। বিগত যুদ্ধ আর আমেরিকান সৈন্যদের কল্যাণে দেশে তখন বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্রেরও অভাব ছিল না। কাজটা অবশ্যই ছাড়াছাড়িভাবেই আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ করবার চেষ্টাও হচ্ছিল বিশেষভাবেই। ঐ সময়ের খবরের কাগজ খুললে এমন একদিনও প্রায় বাদ যেতনা, যেদিন এখানে ওখানে, কলকাতার আশেপাশে দু'চারটে বোমা ফাটবার সংবাদ থাকত না। অশিক্ষিত হাতে বোমা তৈরি করতে গিয়ে অনেক ছেলে হতাহত হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু সেই অনুপাতে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল প্রায় নগণ্য, দু'একজন মাত্র। সরকারী শাসন হিন্দু ও মুসলমান দুই ভাগে এমন ভাগ হয়ে গিয়েছিল যে আগের মত একটা বোমার খবর পেলে তাড়াহুড়া করে দেশসুদ্ধ লোককে গ্রেপ্তার করা আর মোটেই সম্ভব ছিল না। ভারত সরকারের পুলিশের বুদ্ধিমান বিভাগ—মানে I. B. departmentকে প্রধানত হিন্দু-বিপ্লবীদের নিয়েই কারবার করতে হ'ত, তাই ঐ বিভাগটিও প্রায় আগাগোড়াই হিন্দুদের দ্বারাই পরিচালিত হ'ত। দাঙ্গার ফলে যখন সেই বুদ্ধিমানদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পড়ল, তখন শাসনক্ষমতা যে কত অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিল তা বেশি না বললেও বুঝা যায়। একটা ঘটনার কথা আমার জানা আছে, যেটি বললে অনেকেই বুঝতে পারবেন যে সত্যিকারের স্বাধীনতার কাজ করবার কি বিরাট সুযোগ তখন এসেছিল, আর আমরা কি সুযোগ হারিয়েছি। ঐ সিজার্স সিগারেটের প্রচার ছবির মতই বলতে ইচ্ছা যায়, "আপনি জানেন না, আপনি কি হারিয়েছেন।" লড়াই করে ইংরেজ তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করবার কিছুমাত্র ইচ্ছা যে ভারতের অহিংস নেতাদের ছিল, এ অপবাদ তাঁদের পরম শত্রুও যেন না দেয়।

খনিতে পাথর ফাটাবার কাজে যে অতি বিস্ফোরক 'জেলিগনাইট' নামক পদার্থটি ব্যবহার করা হয়, তারই একটা খণ্ড একটি ঢালাই লোহার খোলের মধ্যে ডিটোনেটারসহ পুরে দিয়ে ফিউজ সাহায্যে আগুন দিতে পারলে যে একটি অতি বিস্ফোরক হাতবোমা তৈরি করা যায়, এ সত্যটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৪২ সালের হৈ-হল্লার সময়, কিন্তু তখন ঐ জিনিসটাকে বিশেষভাবে কাজে লাগাবার সুযোগ হয়নি। এবার কিন্তু ঐ পদ্ধতিতে অসংখ্য বোমা তৈরি হয়ে জমা হতে থাকল। প্রচুর পরিমাণে ঐ 'জেলিগনাইট স্টিক' পদার্থটি সংগ্রহ করবার জন্য বহু ছেলে, অনেক অনেক হাঙ্গামা করে বাংলা আর বিহারের খনি-এলাকাগুলোতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। জিনিসটি সংগ্রহ করাও হ'ল অতি প্রচুর পরিমাণেই।

একদিন দুটি ছেলে বিহারের কোন খনি-এলাকা থেকে ঐভাবে সংগ্রহ করা প্রভূত পরিমাণ (৮০ পাউণ্ডেরও বেশি) জেলিগনাইট স্টিক এবং প্রয়োজনীয় ডিটোনেটর ও ফিউজ নিয়ে কলকাতা ফিরে আসছিল। তখন পথে আসানসোলে তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। গাঁজা আফিম চোরাই চালান বন্ধ করবার জন্য আসানসোলে Excise Department-এর যেসব লোক তল্লাশী চালায়, প্রথমে তারা তাদের হাতেই ধরা পড়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের বামালসুদ্ধ পুলিশ অফিসে হাজির করা হয়। এবং শুনে নিশ্চয়ই আজ অনেকে আঁৎকে উঠবেন যে, সে ছেলে দুটোকে সেদিন পুলিশ গ্রেপ্তার না করেই ছেড়ে দিয়েছিল, সসম্মানেই ছেড়ে দিয়েছিল এবং মালসুদ্ধই। কোন ঘুষও সেদিন পুলিশকে দিতে হয়নি, বরং পুলিশ এবং Excise-এর লোকেরা এসব জিনিস আসানসোল দিয়ে নিয়ে যাবার সময় কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত সেবিষয়ে অনেক পরামর্শও সেই ছেলে দুটিকে দিয়েছিল।

বাহাদুরী দেখাতে পারলে প্রমোশন, আর ব্যাপারটা জানাজানি হলে যে নিজেদেরই জেলে যেতে হবে একথা ভারতীয় পুলিশ সেদিন বিশেষ ভাবেনি। ব্যাপারটা অবশ্য সম্ভব হয়েছিল এই জন্যেই যে, ঐ সময়ে পুলিশ অফিসে বা Excise-দলে একজনও মুসলমান কেউ উপস্থিত ছিলেন না। তাই বলছিলাম যে ইংরেজের শাসন ভেঙে পড়েছিল;—ইংরেজের পুলিশও আর সেদিন তার হাতে ছিল না। এরকম ঘটনা একটি মাত্রই নয়, অনেক হয়েছে। পুলিশের মধ্যস্থতায় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারও হয়েছে। কিন্তু ভারতীয়েরা সুযোগের

সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেনি, আর কংগ্রেসী নেতারা ত ঐ অস্থায়ী সরকারের ক্ষমতাটুকু পেয়ে, রক্তের স্বাদ পাওয়া ব্যাঘ্রের মতই হিংস্র এবং অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন, বাকিটুকু পাবার জন্য। এইত হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সত্যিকারের ইতিহাস। কাজের কোন প্রয়োজন নেই, বোলচাল মেরে, টালিবালি করে ক্ষমতাটুকু আমাদের হাতে আস্‌লেই হ'ল, তবেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আজও ভারতে যা হচ্ছে তা ঐ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

অহিংস উপায়ে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে, বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা আনা হবে। এই ভণ্ডামির ঢং দেখাতে গিয়ে ভারতের মাটিতে আজ পর্যন্ত যত রক্তপাত হ'ল, যত লোককে ভিটেমাটি ছেড়ে রাস্তায় আসতে হ'ল, যত মেয়েকে পতিতাবৃত্তি করে উদর পূর্তি করতে হ'ল, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কতগুলো আছে জানিনা, মনে হয় বিগত দুটো মহাযুদ্ধ বাদে এতবড় ধ্বংস পৃথিবীতে আর আসে নি। মহাযুদ্ধ দুটোও একদিন শেষ হয়েছে, আবার নূতন করে পুনর্গঠিত হয়েছে দেশগুলো। কিন্তু ভণ্ডামি আর ক্লৈব্যতার ফলে ভারতে যে ধ্বংসের আবির্ভাব হয়েছে, তার শেষ ত আজও দেখা যাচ্ছে না। তবুও বলতে হবে গান্ধী মহাত্মা অহিংস এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা এনে কি এক অপূর্ব চীজ পয়দা করেছেন। ক্ষমতা হাতে থাকলে কি না প্রচার করা চলে!

দেশ-বিভাগে সম্মতি ও COMMIT করে বসে থাকা

১৯৪৭ সাল আরম্ভ হতে না হতেই শোনা যেতে লাগল দেশ ভাগ করে ক্ষমতা আহরণ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। প্রকাশ্যভাবে মত স্থির করতেও খুব বেশি দেরি হ'ল না। মাস দু'য়ের মধ্যেই অতি প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত হ'ল, বাংলা আর পাঞ্জাব সমেত ভারত ভাগ করে নেওয়া হবে। এভিন্ন নাকি অন্য উপায় আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। উপায় ত নেইই, উপায় থাকৃতে হলে যে সততা, সাহস এবং কর্মক্ষমতা থাকা দরকার, তাই যখন নেই তখন উপায় থাকবে কোথা থেকে! কিন্তু ক্ষমতা হাতে পাবার লোভে কংগ্রেস নেতারা দেশভাগ করতে রাজী হলেই যে দেশের লোক সেটা মেনে নেবে এরকম নিশ্চয়তা কিছুই ছিলনা। বরং বহু যায়গায় দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন স্বতস্ফূর্তভাবেই প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছিল।

তবে ডবল 'ঘ'—মানে ঘুঘু এবং ঘোড়েল অহিংস নেতাদের মিথ্যা রোলচাল আর ভাঁওতাবাজীর সম্মুখে সে আন্দোলন ব্যাপক হতে পারেনি কোনক্রমেই, স্তব্ধ হয়ে গেছে আন্দোলন। এসব ব্যাপারে যে অহিংসা কোম্পানী খুবই সিদ্ধহস্ত তাত আজ সবাই হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছেন। কিন্তু তাদের এই মিথ্যাচারিতা এবং ভাঁওতাবাজী যে কতদূর নীচুস্তরের হতে পারে তা আর বলে শেষ করা যায় না। দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন যাতে দানা না বাঁধতে পারে এবং জনসাধারণ যাতে বিভ্রান্ত হয়, এই ডবল উদ্দেশ্য নিয়েই নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশ বিভাগের প্রস্তাবটিকে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে মুখরোচকভাবেই উত্থাপন করা হয়েছিল। প্রস্তাবটী ছিল "Under no circumstances we will recognize any part of India as Pakisthan; but to facilitate the withdrawal of the British forces from India, we will recognize it as a temporary phase." মোটকথা, যে কোন উপায়েই হোক ক্ষমতাটা একবার হাতে পেতেই হবে—দেশ থাক আর নাই থাক।

গান্ধীজী কিন্তু ভাঙ্গেন, তবু মচকান না। তিনি হুঙ্কার দিলেন দেশ ভাগ করতে হলে আমার মৃতদেহের উপর দিয়েই করতে হবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁর এই কথাটা সত্যিই ফলেছিল, তবে দুঃখ এই যে দুষ্কর্ম তখন হয়ে গেছে। তবে তাঁর ঐ হুঙ্কার পর্যন্তই—বেশি কিছু করবার প্রয়োজন নেই। তিনি হুঙ্কার দিয়েই চুপ মেরে থাকলেন। আর তাঁর মানসপুত্র এবং অন্য সব সাগরেদরা দেশমাতার অঙ্গচ্ছেদ কার্যটি নির্বিঘ্নেই করে ফেল্লেন। সত্যিই যদি গান্ধীজী মনে করে থাকতেন যে দেশ ভাগ করাটা উচিত হবে না বা দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক হবে, তাহলে অবশ্যই তাঁর উচিত ছিল সাধারণকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা। তাঁর উচিত ছিল নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে সরে আসা। তিনি উচিত কিছুই করলেন না, শুধুই এক হুঙ্কার ছেড়ে বসে থাকলেন, আর দুনিয়ার যত বাজে কথা বলে প্রার্থনা-সভার ভিড় বাড়াতে লাগলেন। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে, ক্ষমতাও হাতে এসে যাবে, আর দেশ ভাগ করবার কলঙ্কও তাঁর মহাত্মা নামে স্পর্শ করবে না। তাঁকে অনেকভাবে দেখেছি কিনা, তাই তার মস্তিষ্ক যে এসব ব্যাপারে বেশ পরিপক্ক ছিল, তা বেশ বুঝতে পারি।

[গান্ধীজীর যে দেশ বিভাগে পুরো সম্মতি ছিল, তিনিই যে সত্তায় ক্ষমতা

লাভের পন্থা উদ্ভাবনের প্রধান দার্শনিক, এটুকু বিশ্বাস করতে এখনও অনেকেরই বেশ কষ্ট হয় বলেই মনে হয়। তিনি প্রার্থনা সভায় যে সব কথাবার্তা বলতেন, দেশবিভাগের বিরুদ্ধে যে সব জেহাদী শ্লোগান আওড়াতেন, সেগুলোই যে এই অবিশ্বাসের প্রধান কারণ তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তাঁর ঐ কথাগুলোর ভেতর যে সততার লেশমাত্রও ছিল না সেটুকু কেউই তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছেন বলেও মনে হয় না। একটু চেষ্টা করলেই যে কেউ বুঝতে পারেন যে তাঁর ঐ কথাগুলো সাধারণকে বিভ্রান্ত করবার চালবাজী ভিন্ন অন্য কিছুই ছিলনা। "Under no circumstances we will recognize any part of India as Pakisthan......" কথাটিও কংগ্রেসের প্রস্তাবে ঠিক যে উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল, গান্ধীজীর দেশ বিভাগ বিরোধী কথাগুলোও বলা হ'ত ঐ একই উদ্দেশ্যে—উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা। ঐ সময়ের রাজনীতির একমাত্র প্রমাণ্য দলিল Allen Campbell-Johnson লিখিত "Mission with Mountbatten" বইখানি একটু তলিয়ে পড়লে যে কেউই গান্ধী মহাত্মার দেশ বিভাগ বিরোধিতার স্বরূপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পারেন।

২রা জুন ১৯৪৭ সালে, মাউন্টব্যাটেনের সাথে কংগ্রেস এবং লীগ নেতাদের যে বৈঠক হয়, সেই বৈঠকেই কংগ্রেস এবং লীগ নেতারা দেশ বিভাগে তাদের সম্মতি জানায়। ঐ সম্মতি লাভের পর, অতি শঙ্কিত হৃদয়ে মাউন্টব্যাটেন গান্ধীজীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ঐ বিষয়ে তাঁর মত জানবার জন্য। শঙ্কিত হৃদয়ে, কারণ, সাধারণের মতই মাউন্টব্যাটেনেরও ধারণা হয়েছিল যে গান্ধী সত্যি সত্যিই দেশ বিভাগের বিপক্ষে। তাঁর সন্দেহ ছিল যে শেষ মুহূর্তে গান্ধীই হয়ত দেশ বিভাগের প্লান ভণ্ডুল করে দেবেন। কিন্তু গান্ধী কিছুই ভণ্ডুল করেন নি। মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে গান্ধীর ঐ সাক্ষাৎকারের যে বর্ণনা বইখানিতে আছে, নীচে হুবহু সেইটুকুই তুলে দেওয়া হচ্ছে। আশাকরি এটুকু থেকেই সমজদারেরা বুঝে নিতে পারবেন যে ভারত বিভাগের মূলে কে।

"গান্ধীজী কতকগুলি পুরোন ও ব্যবহৃত খামের টুকরো সম্মুখে রেখে বসেছিলেন। প্রথমেই একটি টুকরোর উপর লিখে গান্ধীজী জানিয়ে দিলেন—আজ তার মৌনতার দিবস। একথা জানামাত্র মাউন্টব্যাটেনের শঙ্কাকুণ্ঠিত মন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। যাক গান্ধীজীর বক্তব্যের সম্মুখীন আজ আর হতে হবে না। নীরব সাক্ষাৎ সমাপ্ত হল। কাগজের টুকরোগুলি মাউন্টব্যাটেন কুড়িয়ে জমা করলেন। মাউন্টব্যাটেন মনে করেন, তিনি আজ পর্যন্ত যে সব

ঐতিহাসিক নিদর্শন বস্তু সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে ঐ কাগজের টুকরো-গুলিই সব চেয়ে মূল্যবান। কাগজের টুক্‌রোগুলিতে গান্ধী লিখে দিয়ে গেছেন: "আমি আজ কথা বলতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আমি সোমবারের মৌন ব্রত গ্রহণের আগে ভেবে ঠিক করে রেখেছিলাম, কি ধরণের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে এই ব্রত ভঙ্গ করতে আমি দ্বিধা করব না। যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উচ্চস্থানীয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন হয়, এবং যদি কোন রোগীর সেবাকার্যের জন্য প্রয়োজন হয়, তবে আমি ব্রত ভঙ্গ করে কথা বলব, এই সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলাম। কিন্তু, আমি বুঝেছি আজ আমি মৌনব্রত ভঙ্গ করি, এটা আপনি চান না। **জিজ্ঞাসা করছি আমি আমার বক্তৃতাগুলিতে আপনার বিরুদ্ধে কি একটি কথাও বলেছি? যদি আপনি বুঝে থাকেন যে আপনার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিনি তবে আপনার আশঙ্কা নিরর্থক।** দু'একটি বিষয় আছে যে সম্বন্ধে আমাকে অবশ্যই আপনার কাছে কিছু বলতে হবে। তবে আজ নয়। যদি আবার আমাদের দু'জনের দেখা হয় তবে এবং সেই সময়েই বলবো।"

ব্যাপারটা এতই পরিষ্কার যে কোন টিকা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। গান্ধী সেদিন তাঁর মৌনব্রত ভঙ্গ করেন নি কারণ, মাউণ্টব্যাটেন সেটা চান নি; আর, সম্ভবতঃ ঐদিনের আলোচনাটিকেও গান্ধী তাঁর মৌনব্রত ভঙ্গ করবার মত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নি। এবং এই ভাবেই মৌনব্রত ভঙ্গ না করেই দেশভঙ্গ করে তিনি অতিমানব মহাত্মা থেকে গেছেন।

মৌলানা আজাদের "India Wins Freedom" বইখানিতেও আজাদ সাহেব গান্ধী-জহরলালকেই দেশ বিভাগের জন্য দায়ী করেছেন। তিনি পরিষ্কার ভাবেই বলেছেন যে জিন্না সাহেব শেষ পর্যন্ত পাকিস্থানের দাবী ত্যাগ করতে রাজী হয়েছিল কিন্তু জহরলালের হঠকারিতাপূর্ণ কথাবার্তায়ই সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে। জহরলালের হঠকারিতাপূর্ণ কথা যে প্লান করেই বলা হয়েছিল এবং গান্ধীসহ অনেক অহিংস নেতাই যে ঐ ব্যাপারে জহরলালের সমর্থক ছিলেন তাও তিনি বেশ পরিষ্কার ভাবেই বুঝিয়ে বলেছেন।]

কংগ্রেস যখন স্বীকার করেই নিয়েছে তখন আর আটকায় কে! মুসলিম লীগ আর ইংরেজ প্রভুরা ত ছোরা উঁচিয়েই বসে ছিলেন, দু'ভাগ করে দিতে আর বেশি দেরিও হবে না। তাই আবার একটা হল্লা শুরু হল। বাংলা আর পাঞ্জাব ভাগে কে কতটা লুটে নিতে পারবে, মানে কতটা হবে কংগ্রেস রাজত্ব

আর কতটা যাবে লীগ শাসনে। মাউন্টব্যাটেন সাহেব নূতন বড়লাট হয়ে আসবার পর থেকে এই ভাগের কাজ খুবই তাড়াতাড়ি চলতে থাকল। তিনি এক ঘোষণায় জানিয়েও দিলেন, বাংলা আর পাঞ্জাব মোটামুটি কিভাবে ভাগ করা হবে। মোটামুটি হিন্দু মুসলমান হিসাবে যে ভাগ হল, তাতে আমাদের রংপুর, মুসলমান-প্রধান জেলা হিসাবে যে লীগশাসনে পাকিস্থানেই কায়েম হবে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকল না। ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। লীগ শাসনের যে নমুনা দেখছি, তাতে না ঘাবড়াবারই বা কি ছিল! মনটাও ভীষণ দমে গেল,—এত হাঙ্গামা করে শেষপর্যন্ত কিনা দেশটাকে ভেঙ্গে ফেললাম! আটকাবার যখন উপায় নেই তখন ভাগ্য বলে মেনে না নিয়ে আর কিইবা করা যাবে! তবু আবার একটু চেষ্টা করে দেখলাম যদি রংপুরটাকে কোন রকমে পশ্চিম বাংলার ভাগে ফেলা যায়। কিন্তু এ দাবি তুলব কিভাবে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। দেশটা যখন ভাগ হচ্ছে হিন্দু-প্রধান অংশ আর মুসলমান-প্রধান অংশ হিসাবে, তখন মুসলমান-প্রধান রংপুরের পশ্চিম বাংলায় যাবার কি দাবি থাকতে পারে? যদি থানা হিসাবে সীমারেখা টানা যায় তাহলে অবশ্য রংপুরের উত্তর দিকের তিন চারটি হিন্দু-প্রধান থানা জলপাইগুড়ির সাথে যুক্ত হতে পারে। সব রংপুরটা যাবার কোন উপায়ই দেখছিনা।

ভারতের অন্য অংশ থেকে আসামে যাবার কোন পথ নেই এই অজুহাতে রংপুরের মধ্য দিয়ে যে রেল লাইনটি আসামে গেছে, সেটা ধরে সীমানা নির্ধারণ করা হোক, এরকম একটা দাবি তুললে কেমন হয়! মনে হল দাবিটা একেবারে ফেলনা নয়, কারণ আসামের সাথে বাইরের যোগাযোগের যে তিনটি মাত্র পথ আছে; তার প্রথমটি চট্টগ্রাম বন্দর অবশ্যই পাকিস্থানে যেতে বাধ্য; দ্বিতীয়টি ব্রহ্মপুত্র নদী—সেটিরও বাইরে যাবার কোনই সম্ভাবনা নেই, আর তৃতীয় হচ্ছে ঐ রংপুরের মধ্য দিয়ে রেল লাইনটি। এটি যদিও পাকিস্থানেই পড়া উচিত তাহলেও এই রেল লাইনের উত্তরের রংপুর এবং দিনাজপুর জেলার মোট ছয় সাতটি মুসলমান-প্রধান থানা যদি কোন প্রকারে পশ্চিম বাংলায় দেওয়া সম্ভব হয়, তবে আমার রংপুরের অন্তত খানিকটা যায় এবং আসামেরও একটা যাতায়াতের পথ থাকে। দাবিটা যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হল, কারণ যেখানে ভারতে খুব কম করেও চার কোটির উপর মুসলমান থাকতে বাধ্য হবে, তখন ঐ ছয় সাতটি থানার আরও লাখখানেক বেশি মুসলমান ভারতে গেলে এমন

কি অন্যায় হবে! অথচ একটা সম্পূর্ণ প্রদেশ বাকি দেশের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার অবস্থা থেকে বেঁচে যাবে।

কলকাতা ছুটলাম, নেতাদের সাথে দেখা করবার জন্য,—দেখা যাক কি করা যায়। প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি সুরেন ঘোষের বাড়িতে এসে দেখি কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী স্বয়ং উপস্থিত। খুব আশা হল, সোজাসুজি কথাটা পাড়লাম। কিন্তু আসামের যে একটা যাতায়াতের পথ থাকা দরকার, এ ব্যাপারটা নেতাদের বুঝাতে গিয়ে হয়রাণ হয়ে আমি নিজেই অনেক কিছু বুঝে ফেললাম। সুরেন ঘোষ বিশেষ আপনার লোক, আমাদের মধুদা, তাই নিরিবিলি ডেকে বুদ্ধি দিলেন, "এই দাবিটা সত্যিই খুব যুক্তিসঙ্গত। তুমি আসামে যাও এবং সেখানের কংগ্রেস আর গবর্ণমেণ্টকে দিয়ে দাবি দেওয়াও, তবেই হয়ে যাবে।" বুঝলাম এঁরা সবাই খুব ব্যস্ত, এখানে এখন এসব কথা বলে বিশেষ লাভ হবে না। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, সুরেন ঘোষ না প্রফুল্ল ঘোষ তাই নিয়ে ভীষণ রাজনীতি হচ্ছে। আসামের রাস্তা থাকল কি না-থাকল, সেসব তুচ্ছ বিষয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করবার মত সময় এঁদের নেই। মধুদা অবশ্য দয়া করে আসামের মুখ্যমন্ত্রী এবং আরও কয়েকজনের নামে কয়েকখানা পরিচয়পত্র লিখে দিলেন।

ছুটলাম আসাম। গৌহাটিতেই অনেকের সাথে দেখা হয়ে গেল। অনেকেই কথাটা বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং সায়ও দিলেন। শ্রীসিদ্ধনাথ শর্মা তখন আসাম কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী। আমার প্রস্তাবে তিনি খুবই আনন্দিত হলেন এবং তক্ষুণি শিলং গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবারদলৈএর সাথে দেখা করবার পরামর্শ দিলেন। শিলংয়েও বারদলৈ এবং অন্য সকলেও আমার সাথে একমত হলেন এবং শীগগিরই দিল্লীতে গিয়ে এবিষয়ে দাবি জানাবেন কথা দিলেন। এমন কি আমার কাছে থেকে কয়েকখানা মানচিত্র এবং সংখ্যাতত্ত্বের কাগজপত্রও গোপীনাথ বাবু রেখে দিলেন, দিল্লীতে কথাবার্তা বলবার সময় কাজে লাগাবেন বলে। খুবই উৎসাহিত হয়ে আমি আসামের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত জেলায় জেলায় গিয়ে যত রকমের সংস্থা আছে তাদের দিয়ে বা নিজেই তাদের নামে, এই রেললাইন ধরে দেশ ভাগের সীমানা নির্ধারণ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে কংগ্রেস নেতাদের এবং মাউণ্টব্যাটেনের নামে টেলিগ্রাফ পাঠাতে লাগলাম।

কয়েকদিন পরে আবার যখন শিলং গেলাম তখন শুনলাম গোপীনাথ বাবু দিল্লী গেছেন এই দাবি নিয়েই। উৎসাহ আরও অনেকগুণ বেড়ে গেল। তাই ঘুরে ঘুরে আরও বহু টেলিগ্রাফ পাঠাতে লাগলাম। তারপর আবার কয়েকদিন পরে শিলং গিয়ে গোপীনাথ বাবুর সাথে দেখা করলাম। দিল্লীর খবর কি, জিজ্ঞেস করতেই তিনি জানালেন যে, তিনি যতদূর সম্ভব জোরের সাথেই দাবিটি পেশ করেছেন এবং এই রেল লাইনটির সংযোগ নষ্ট হলে যে আসামের পক্ষে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা তাও নেতাদের ভালভাবেই বুঝিয়েছেন, কিন্তু তবুও খুব ভরসা পাননি। কারণ কথাবার্তা বলে তাঁর নাকি এই রকমই ধারণা হয়েছে যে, নেতারা আগে থেকে ভাগাভাগি বিষয়ে একটা Commit করে বসে আছেন। তাই এখন আর এসব যুক্তি শুনতে চাচ্ছেন না। নেতারা যে ভাগাভাগি ব্যাপারে একটা Commit করে বসেছিলেন এবং গোপীনাথ বারদলৈয়ের মত একজন ভাল মানুষেরও সে ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি, শুধু সেটুকু জানাবার জন্যই এই কথাগুলোর অবতারণা করতে হয়েছে। অবতারণা করতে হল এই জন্যেই যে, গান্ধী আমলে তালগাছ-কর্তনকারী পলিটিশিয়ান এবং বটবৃক্ষতল উজ্জ্বলকারী উকিলদের পক্ষে, দুটো কায়দামাফিক বাতচিৎ, আর দু'চারটে নাটকীয় ঢং দেখাতে পারলেই দেশের বিরাট নেতা সেজে বসাটা যে কত সহজ হয়ে গিয়েছিল, তাই বুঝাবার জন্যই। আজও ভারতে সেই তালগাছ-কর্তনকারীরাই বিরাট, বিপুল, সুমহান হয়ে বসে আছেন এবং পৃথিবীকে নূতন ন্যায় নীতি পরিবেশন করতে লেগে গেছেন, ভারতের ভয়ও সেইখানেই।

মোটকথা, আসামের একটি যাতায়াতের পথ না রেখেই, গোপনে একটা ভাগের লাইনে ঐ তথাকথিত নেতারা স্বীকৃতি দিয়ে বসেছিলেন। আসাম ভারতের মধ্যে একটা খুব ফেলনা জায়গা কিনা! ঐ অতি—বুদ্ধিমানেরা তখন জানতেন কিনা জানিনা, আর আজও যে জানেন সেরকম বুঝাবারও কোন কারণ ঘটেনি যে, ভারতের বহির্বাণিজ্যে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে আসামের স্থান খণ্ড, বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র পশ্চিম-বঙ্গের পরেই ভারতের দ্বিতীয় স্থান। আসাম কুলি-প্রদেশ নয়, কুলি-খাটান প্রদেশ, তাই তার দর বুঝতে নেতাদের একটু অসুবিধা হয় বইকি!

"দেশের স্বাধীনতা ত নয়, এ যে লটারীতে টাকা পাওয়া"

বাংলা আর পাঞ্জাবসুদ্ধ ভারত ভাগ করে নেয়া হবে এইটুকুই কথা ছিল, কিন্তু কি করে যে আসাম তার ভেতর ঢুকে গেল, তার উত্তর ঐ ভাগাভাগির নেতারা আজও দিয়েছেন বলে জানি না। আসামের সিলেট জেলা মুসলমান-প্রধান বলেই কি অটোমেটিক্যালি ভাগের লিস্টে পড়ে গেল নাকি? যাই হোক সিলেট পাকিস্থানে যাবে কিনা সে বিষয়ে একটা ভোটাভুটির ব্যবস্থা হয়েছিল, ঠিক যেমন হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। সে সময় সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি যে অবস্থা ধারণ করেছিল, তাতে ভোটাভুটি হলে যে, যে-কোন মুসলমান-প্রধান অঞ্চলই পাকিস্থানে যেত সে বিষয়ে সন্দেহ করবার হয়ত কিছুই নেই। তবুও খটকা লাগে যে, আসামে কংগ্রেসী সরকার কার্যকরী থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস সিলেট রেফারেণ্ডামে একেবারে হেরে ঢোল হল কিভাবে?

ঐ সময়ে আসামের জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াবার ফলে সিলেট রেফারেণ্ডামে ব্যর্থতার ব্যাপারে আমার যা মনে হয়েছিল তা মোটামুটি এই রকম: কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালিনীর মত কংগ্রেসের অন্য সব মহান নেতারা তখন কে কোথায় মন্ত্রী হবেন বা কাকে কোথায় মন্ত্রী করা হবে এই সব বৃহৎ ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় সিলেট রেফারেণ্ডামের মত তুচ্ছ ব্যাপারে নজর দেবার মত অবসর তাঁদের ছিল না। দেশ স্বাধীন করা ত নয়, এ যে লটারীতে টাকা পাওয়া, যা পাওয়া যায় তাই লাভ। আর আসামীরাও বাঙালী-প্রধান সিলেট জেলাকে দূর করে দিতে পারলে বেঁচে যায়। সিলেট যাতে পাকিস্থানে যায় সেই উদ্দেশ্যে আসামে বেশ প্রকাশ্যভাবেই রাজনীতি আর আন্দোলন চালান হচ্ছিল। তাই কংগ্রেসের পক্ষে ভোট যুদ্ধের জন্য বিশেষ কোন প্রস্তুতিই ছিল না। যেটুকু হয়েছিল তা ঐ লোক-দেখানোর চেয়ে বেশি কিছুই নয়। সিলেটের হিন্দুদের চেষ্টায়ই সেটুকু হয়েছিল। ভোটে জিতবার জন্য যে সব রাজনীতি—মানে কাজ-কারবার, করবার প্রয়োজন হয় কংগ্রেসী সরকার তার কিছুই করেননি, উপরন্তু মুসলমানরা যাতে ঠিকমত ভোট দিতে পারে, তারই জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন।

সিলেট রেফারেণ্ডামের মত একটা জীবন-মরণ প্রশ্নে সিলেটিরা অবশ্য খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। তাই যাঁরা সিলেটের বাইরে থাকেন তাঁরা সবাই ভোট দেবার জন্য নানা পথ দিয়ে সিলেটে ফিরে আসছিলেন। সিলেটিরা যে সারা আসামেই সব

চেয়ে বেশি ছড়িয়ে রয়েছেন তাও অজানা নয়, তাই আসাম থেকেও তাঁরা নানা পথে দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঠিক এই সময়েই আসাম রেলের হিল সেক্সনে এক বিরাট ধ্বস নামার ফলে ঐ লাইনটি বন্ধ ছিল, তাই সবাইকে গৌহাটী থেকে শিলং হয়ে বাসে সিলেট যেতে হচ্ছিল। আমিও ঠিক এই সময়েই এক চক্কর আসামের জেলায় জেলায় ঘুরে মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বাবুর সাথে দেখা করবার জন্য শিলং রওনা হয়েছি। গৌহাটী এসে শুনতে পেলাম শিলংয়ের টিকিট পাওয়া যাবে না, কারণ সিলেটের ভোটারদের এই পথে দেশে ফিরবার জন্য এত ভিড় হয়েছে যে বাসে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। ভোটারদের যাবার ব্যবস্থা করে তবে অন্য সকলকে যেতে দেওয়া হবে। বাঙালী বাস কোম্পানী গৌহাটিতে কয়েকজন সিলেটি ভদ্রলোকের সাথে এই বন্দোবস্ত করেছেন যে, তাঁরা ভোটার বলে পরিচয়পত্র দিলে তবেই বাসের টিকিট দেওয়া হবে। আমারও শিলং যেতেই হবে, তাই ঐ পরিচয়পত্র দানকারী ভদ্রলোকদের সাথে দেখা করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম, এবং একটি সার্টিফিকেট পেয়ে যেতেও আমার বেশি দেরি হল না; অনায়াসেই পেয়ে গেলাম। অথচ ঐ সার্টিফিকেট না পাবার জন্য গৌহাটিতে বেশ ভিড় জমে গেছে। পরে অবশ্য বুঝতে ভুল করিনি যে, সার্টিফিকেট দান কার্যটি বাঙালীদের ভোটাভুটি পলিটিক্সের একটা খেলা মাত্র। মুসলমান ভোটারদের ভোটের তারিখ পর্যন্ত আটকে রাখাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। ভালই লাগল, ভোটের পলিটিকস্ এই রকম না হলে চলবে কেন! এইভাবে বেশ কিছু মুসলমান ভোটারকে গৌহাটিতে আটক করাও সম্ভব হয়েছিল, এবং মনে হয় যদি গভর্নমেণ্ট হাতে থাক্‌বার সুযোগটা ঠিকমত গ্রহণ করা যেত, তাহলে আরও অনেক পন্থায় বহু ভোট নষ্ট করে দেওয়া সম্ভব হ'ত; কিন্তু কিছুই সম্ভব হয় নি। এমন কি সদাশয় কংগ্রেস সরকার গৌহাটিতে আটক করা এই ভোটারদেরও বিশেষ বন্দোবস্ত করে ভোটের আগেই সিলেটে পৌছে দিয়েছিলেন। এই ভোটারদের সিলেটে পৌছে দিয়ে গভর্ণমেণ্ট অন্যায় কাজ করেছিলেন তা কেউই বলবে না, আমিও না। কিন্তু কংগ্রেসীদের এই সৎ-মানুষী ও সদাশয়তা যে সেদিন বিশেষ কোন দুর্বলতার জন্যই দেখাতে হয়েছিল না তা কে বলতে পারে! আজকাল অবশ্য ভারতের নেতাদের ভাব-গতিক আর সেরকম ভালমানুষী ধরনের দেখা যায় না। কাশ্মীরের ভোটাভুটিটা আজ তাঁরা পাশ কাটিয়েই চলতে চাচ্ছেন। কারা যেন আশি বছরে সাবালক হয়, এঁরাও তাই! আস্তে আস্তে সাবালক হচ্ছেন।

ইংরেজের ভারত ত্যাগ ও গান্ধিইজিমের ডাইনামিক তত্ব

অবশেষে ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে দেশীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ইংরেজ বিদায় হয়ে যাবে ঠিক করল। গান্ধীইজিমের এবার সত্যিই জয় হল। একটি দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই আরম্ভ করে গান্ধীজী একেবারে দুটো দেশ স্বাধীন করে তবে ছাড়লেন। এইজন্যেই না লোকে গান্ধীজীকে মহামানব বলে! কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন, আর গান্ধীজীর আপোষনীতির জয় জয়কার করে দেশ স্বাধীন হল। ইংরেজ ফুলের মালা গলায় দিয়েই ভারত ছাড়ল। শুধু থেকে গেল এক বিরাট প্রশ্ন যে গান্ধীনীতির মূল আদর্শ (Fundamental Principle) তাহলে কি ছিল? দেশের স্বাধীনতা, না যেন-তেন-প্রকারেণ নিজেদের হাতে খানিকটা ক্ষমতা সংগ্রহ করা? যদি ঐ ক্ষমতা সংগ্রহ করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য বলবার কিছুই থাকে না। শুধুই মেনে নিতে হয় যে, অতি মুর্খ এবং নির্বোধ ভারতবাসীদের তুলনায় তিনি অতি চতুর ছিলেন, তাই অতি সহজেই ভাঁওতা মেরে তাঁর নিজের কাজ হাসিল করে নিয়েছেন। কিন্তু দেশের স্বাধীনতাই যদি তাঁর মূল আদর্শ ছিল বলা হয়, তাহলে তিনি এ আপোষে রাজি হলেন কিভাবে? মূল আদর্শকে বিকিয়ে দিয়েও কি আপোষ করা চলে নাকি? এর উত্তর কে দেবে?

তাঁর মানসপুত্র জহরলাল আজকাল ক্ষমতা হাতে পাবার ফলে এক অতি-মহামানবে পরিণত হয়েছেন, এবং অতি-মহামানবসুলভ কাজকর্ম হামেশাই করে চলেছেন, কিছুই পরোয়া করছেন না। আর এই বেপরোয়া কাজের সাফাই হিসাবে সবসময়েই তিনি একটি শব্দ ব্যবহার করছেন যেটি হচ্ছে কিনা গতিশীল বা পরিবর্তনশীল, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় ডাইনামিক (Dynamic)—মনে হয় গান্ধীজীর আদর্শও ঐ গতিশীলতা লাভ করে দেশের স্বাধীনতা থেকে ক্ষমতা আহরণে পর্যবসিত হয়েছিল। গান্ধীজীর আদর্শ পরিবর্তন হলেও তিনি নিজে কিন্তু মহাত্মাতেই আটকে ছিলেন। কখনই দুরাত্মা হয়ে যাননি। বাৎচিৎসেই যাঁরা দুনিয়া মাৎ করে রাজা উজির মেরে বেড়ান, তাঁরা সবসময়েই হাতের কাছে ডাইনামিক-এর মত কতকগুলো শব্দ বাছাইকরে রাখেন এবং প্রয়োজনমত ঐ শব্দবাণেই প্রতিপক্ষকে ভূতলশায়ী করেন। মূর্খ সাধারণও যেদিন এই ডাইনামিক তত্ত্বের রস আয়ত্ত করে গতিশীল হয়ে উঠবে সেদিন এই ডাইনামিকওয়ালাদের, এই অতিমানব বা

মহামানবদের কি অবস্থা হবে জানিনা, তবে আজকের মজা তারাই লুটবে।

ফুলের মালা গলায় নিয়েই ইংরেজ এদেশ ছেড়ে গেছে, যা রেখে গেছে তা আমাদেরই রয়েছে। ইংরেজ ঠেঙ্গাবার সখ নিয়ে আমার জন্ম হয়েছিল, সেও শেষ হয়েছে। তারা যা করে গেছে, তা তারা তাদের নিজেদের স্বার্থেই করে গেছে, তাই অস্বাভাবিক কিছুই নয়, অন্যায়ও নিশ্চয়ই নয়। ভারতীয়েরা তাদের নিজেদের স্বার্থ বুঝে নেবার চেষ্টা করেনি, তার দোষও তাদের দেয়া চলে না। বরং ভারতীয়েরা তাদের স্বার্থ বুঝেই দেশ ভাগ করে নিতে সম্মতি দিয়েছে,—ভালভাবে স্বার্থ-সিদ্ধি করবার জন্যই। তবুও দেশ ভাগ করার ব্যাপারে যে জিনিসটা অনেক সময় মনে খোঁচা দিয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, স্বাধীনতা দানের নামে এই ছোটলোকী কুকাজটি যাঁরা করে গেলেন তাঁরা হচ্ছেন ইংরেজদের দেশের একটি প্রগতিশীল দলেরই সরকার। বৃটিশ লেবার পার্টিই তখন সে দেশে গবর্ণমেণ্ট চালাচ্ছিলেন,—এঁরাই বৃটেনের প্রগতিশীল এবং সমাজতান্ত্রিক দল হিসাবে পরিচিত। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসনের আইনে যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার (Communal award) ব্যবস্থা ছিল—যার ফলে ভারতের হিন্দু এবং মুসলমানকে আইনত পৃথক করে পৃথক ধরনের মনুষ্য বলেই তৈরি করা হয়েছিল, ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগ যার পরিণত ফল—সেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দান কার্যটিও হয়েছিল ঐ লেবার পার্টির বিখ্যাত প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের দ্বারাই।

হামেশাই দেশের নেতাদের প্রগতিশীল কার্যকলাপ দেখতে দেখতে ভারতীয় জনসাধারণ যে প্রগতি-প্রেমিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে আর সন্দেহ কি! এবং এই প্রগতিশীলতার অভাবের ফলেই যে বৃটেনের রক্ষণশীল দল ভারতীয়দের কাছে বিশেষ ঘৃণার পাত্র তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তাই আবার অনেক সময় মনে হয়, প্রগতিশীলতাটা একটু কম থাক্‌লেই বোধ হয় ভাল হ'ত। বৃটিশ রক্ষণশীলদল ভারতের মিত্র ছিল একথা কেউই বলে না। তবে তারা মুখোস পরে বন্ধুবেশে আসত না কখনও, তাই বেশি ক্ষতি করবার সুযোগও পায়নি! শত্রুরা ক্ষতি করে, কিন্তু যে শত্রু ভণ্ডামির মুখোশ পরে বন্ধু বেশে আসতে পারে, সেই করে বেশি সর্বনাশ। ভণ্ডের দেশি বিলাতিও কিছু নেই; ভণ্ড ভণ্ডই, শুধুই সর্বনাশকারী।

এইত হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, অতি পরিষ্কার এবং সরল।

বুঝতে একটুও হাঙ্গাম নেই, হাঙ্গাম নেই বুঝতে যে, যাঁদের হাতে আজ ভারতের বা পাকিস্থানের ক্ষমতা পড়েছে, তাঁরা কোন দিনই স্বাধীনতা চান নি। চেয়েছিলেন ক্ষমতা, পেয়েছেনও সেই ক্ষমতাকেই। আর ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে বেড়ানই হয়েছে তাঁদের একমাত্র কাজ।

দ্বিতীয় ভাগ

স্বাধীনতার সূচনা

পরাধীনতার কালরাত্রি শেষে স্বাধীনতা সূর্য উদয় হল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। আমরা স্বাধীন হলাম। বৃটিশ পার্লামেন্টের আইনের ধারা অনুযায়ী আমরা ঐদিন স্বাধীন ব'নে গেলাম;—ইংরেজের এ আইন আমরা আর কখনও অমান্য করব না। ভারতের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত, থুরি, ভারত এবং পাকিস্থানের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ফুর্তির রোল পড়ে গেল। খানাপিনা, নাচনা, গাহ্‌নার আর শেষ নেই। ক্ষমতা যাদের হাতে এসে পড়ল তাদের ত কথাই নেই,—তারা কি করবে, কিভাবে তাদের এই ক্ষমতা দেখাবে, ঠিক বুঝেই উঠতে পারছিল না। মূর্খেরাও খুব ফুর্তি করে নিলে, মূর্খজনসুলভই বটে! অনেক জিন্দাবাদ হল, অনেক নিশান উড়ল, অনেক বাতি জ্বলল। শুধু ভারতের সাড়ে চার কোটি মুসলমান তাদের বুদ্ধি দোষে আর পাকিস্থানের পৌনে দু'কোটি হিন্দু তাদের কর্মদোষে এই আনন্দের অংশীদার হতে পারল না। সম্ভবত আরও কিছু মূর্খ এবং অপোগণ্ড, যারা স্বাধীনতার নামে বৃটিশ পার্লামেন্টের এই আইনকে চিরকালের জন্য শিরোধার্য করবার তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারছিল না, তারাও আনন্দ থেকে বাদ পড়ল। যাদের ভোগ করবার ক্ষমতা নেই তাদের বঞ্চিতই থাক্‌তে হয়, তাই বলে ক্ষমতাবানেরা শিবঠাকুর হয়ে বসে থাকবেন এরকম ধারণা করবার কোনও মানে হয় না। স্বাধীনতা ভোগ শুরু হল—হাঁ, রসগোল্লা ভোগেরই মত।

সেদিন আমার মনের কি অবস্থা হয়েছিল, আজ আর ঠিক মনে নেই,—ভাল যে নয় তাত বলাই বাহুল্য। খারাপ, খুবই খারাপ। ঠিক কতটা খারাপ সে আন্দাজ দেওয়াও কঠিন। সারা পাকিস্থানে ঐদিন হিন্দু নিধন যজ্ঞ হবে এরকম একটা গুজব ভালভাবেই ছড়িয়েছিল। বুদ্ধিমানেরা অনেকেই তাই অন্তত ঐ সময়টা ওপারে বাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার মত যারা মূর্খ বা নিরুপায় তারাই শুধু নিজ ভিটেয় থেকে স্বাধীনতা সূর্য্য অবলোকন করবার জন্য বসেছিল। অবশ্য রংপুরে যে গুজবটা ঠিক সত্যি হওয়া সম্ভব হবে না, সে বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্তই ছিলাম; কারণ রংপুরের মুসলমানরা লম্বাই চৌরাই আর যাই করুন না কেন ঐ রক্তারক্তি ব্যাপারটা

যে তাদের ধাতে বিশেষ সয়না, সেটা জানা ছিল। আর রংপুর পুলিশ লাইনে তখনও যেসব সশস্ত্র পুলিশ ছিল, তারা সবাই নেপালী বা বিহারী হিন্দু, হিন্দুস্থানে যাবার জন্য অপসন দিয়ে বদলীর অপেক্ষায় ছিল। তাদের সাথে গুজবের বিষয় আলাপ আলোচনা করেও কিছু ভরসা পাওয়া গিয়েছিল। তাই সেদিনটা বেশ নিরিবিলিতেই কাটিয়ে দিয়েছিলাম, স্বাধীনতা উৎসবের অনেক দূরে দূরেই।

তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই যখন ঐ হিন্দু পুলিশরা চলে গেল আর পাঞ্জাবের দাঙ্গা-হাঙ্গামার সংবাদ আসতে থাকল তখন আর নিজের বীরত্বে বিশেষ আস্থা খুঁজে পেলাম না। পাঞ্জাবের পরিস্থিতি যে, যে-কোন মুহূর্তেই বাংলায় আবির্ভূত হতে পারে সে বিষয়েও কোন বিশেষ সংশয় থাকল না। এবং অবস্থা যদি পাঞ্জাবের পর্যায়েই নেমে যায়, তাহলে হতাবশেষ লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমানকে যে ঐ পাঞ্জাবেরই মত, পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার সীমানা পার হয়ে বৃক্ষতলের স্থায়ী অধিবাসীতে পরিণত হতে হবে, সে বিষয়েও বিশেষ কোন সন্দেহ থাকল না। কিন্তু পথ যখন নেই, তখন দিন গোনা ছাড়া উপায়ই বা কি! যাহোক শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাংলা বাংলাই থাকল, পাঞ্জাব হল না। বাঙালী মনিষ্যিদের জয় হল! হাজার হোক বাঙালী বাঙালীই। তাই তাদের দিয়ে ওরকম রক্তারক্তি কাণ্ড করান কখনও সম্ভব নয়। পাঞ্জাবীদের মত ইদানীং কালের সামরিক ঐতিহ্য বাঙালীদের নেই ঠিকই; তাতে লজ্জা পাবারও বিশেষ কিছু নেই বলেই মনে হয়, কারণ, মনুষ্যত্বের ঐতিহ্য বাঙালীর কারও চেয়ে কম নয়, বরং অনেকের চেয়ে বেশিই আছে। পাঞ্জাব এবং পশ্চিম পাকিস্থানের সাথে ভারতের লোক বিনিময় হয়ে হিন্দু হিন্দুর এবং মুসলমান মুসলমানের—যার যার দিকে চলে এলেন বা গেলেন। আর বাঙালীরা বাংলা দেশেই থাকল।

বাঙালীরা বাংলাদেশেই থাকল, তাই বলে খুব যে নিশ্চিন্ত বা নিরুপদ্রবে থাকল, তা মোটেই নয়, পূর্ববাংলার হিন্দুরা ত নয়ই। বাঙালী মনিষ্যিদের দিয়ে পাঞ্জাবের মত রক্তারক্তি সম্ভব না হলেও, ছিচকে বদমাইসিতে বাঙালী মনিষ্যিরা কিছু কম পরিপক্ক নন। পূর্ববাংলা থেকে হিন্দুদের উদ্বাস্তু করে তাড়াবার পক্ষে ঐ ছিচকেমিই যথেষ্ট। আর যে সব স্লোগানের উপর পাকিস্থান অর্জিত হয়েছিল, সেগুলোও পাকিস্থানে হিন্দুদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে মুসলমান বদমাইসদের মনোবল বৃদ্ধির পক্ষে খুবই অনুকূল ছিল। তাই আজও হাজারে

হাজারে হিন্দুকে ভিটেমাটি ছেড়ে হিন্দুস্থানের গাছতলায় আশ্রয় নিতে হচ্ছে। অবশ্য হিন্দু বদমাইসদের উৎপাতের ফলে কিছু কিছু মুসলমানও যে উদ্বাস্তু হয়ে এদিকে আসেনি তাও নয়। তবুও মোটামুটি বাঙালী এখনও বাংলায়ই আছে। পাকিস্থান আমরা চাইনি ঠিকই, কিন্তু কপালে যখন জুটল তখন ভাগ্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি ছিল। দুর্বলদের ভাগ্যই ত একমাত্র সান্ত্বনা!

অতঃপর ভারত এবং পাকিস্থানে সাড়ম্বরে স্বাধীনতার গোড়াপত্তন শুরু হল। ভারত এবং পাকিস্থানে দুজন জাতির পিতা হলেন, পাকিস্থানে একজন মাতাও (মাদার এ মিল্লাত) হলেন। জাতির পিতার পুত্র হিসাবে শ্রীজহরলাল নেহেরু ভারতের ভ্রাতারূপে দেখা দিলেন। আর কেউ কিছু হলেন কিনা জানি না, তবে জাতির শ্যালক বলে কাউকে অভিনন্দিত হতে দেখিনি, এটা মনে আছে। বোধ হয় ওটা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয়া হয়েছিল এই ভরসায় যে, সময় এবং সুযোগমত মূর্খ সাধারণ অনেককেই ঐ মধুর সম্পর্কটির অভিনন্দনে অভিনন্দিত করবে। ভবিষ্যতের এ আশা যে একেবারে ব্যর্থ হয়নি, সেত দেখতেই পাচ্ছি।

ভারত এবং পাকিস্থানের দুটো গণপরিষদে, পুরো স্টিমে গঠনতন্ত্র গঠনের কাজ শুরু হল। মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদ নিয়ে ভারতীয় গণপরিষদ শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে যেতে লাগল। ভারতীয় গণপরিষদে যে সমস্ত বক্তৃতা হতে থাকল, তাতে নূতনত্ব বিশেষ দেখা গেল না। পাকিস্থানে কিন্তু জিন্না-সাহেবের কথাগুলো বেশ নূতন নূতন মনে হতে থাকল। "আমি একজন ভারতীয়, পাকিস্থানের সেবা করবার জন্যই পাকিস্থানে এসেছি," বা "হিন্দুরা আর হিন্দু থাকবে না এবং মুসলমানরা আর মুসলমান থাকবে না, সব হয়ে যাবে পাকিস্থানী।" এসব কথা জিন্না সাহেবের মুখে রীতিমত নূতন বৈকি! এই জিন্না সাহেব বা তাঁর রাজনীতিকে কোনদিনই ভাল চক্ষে দেখিনি, অবশ্য ভাল চক্ষে দেখবার মত কোন কারণ যে ছিল তাও নয়। খুটার জোর থাকলে একজন Stenographer এবং Type-Writer-এর সাহায্যেই যে কত বিরাট রাজনীতি করা যায়, জিন্না সাহেবই ত তার প্রমাণ। তাই তাঁকে সেইভাবেই দেখেছিও। পাকিস্থান অর্জিত হবার পর তাই তাঁর কথাগুলো একটু বেশ নূতন নূতন বোধ হল। মনে হল পাকিস্থান তিনি যেভাবেই অর্জন করুন না কেন, ওটা তাঁর নিজস্ব জিনিস। তাই বোধ হয় তিনি জিনিসটি

ভালভাবেই তৈরি করে নিতে চান। তিনি আজ বেঁচে থাক্‌লে ব্যাপারটা কি যে দাঁড়াত সে কল্পনা করা আজ বৃথা, তবে তাঁর সাগরেদেরা তাঁর কথাগুলি থেকে যে কিছুই গ্রহণ করতে পারেন নি, তা দিনের আলোর মতই পরিষ্কার।

ভারত এবং পাকিস্থানে লাট, বড়লাট, মন্ত্রী, উজির গজিয়ে উঠলেন। সরকারী স্টিম রোলার আবার চলতে শুরু হল। ক্ষমতা ভাগাভাগি হল গান্ধী-জিন্নার মধ্যে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে গান্ধীজী ভারতের বড়লাট হয়ে বসলেন না। বিনয়ে অবনত হয়ে তিনি সরকারের বাইরেই থাক্‌লেন। তবে বাইরে থাক্‌লেন বলেই যে একেবারে শিবঠাকুর হয়ে বসে থাক্‌লেন, তাও নয়। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উপায়ে নানা রকমের খবরদারি করতে থাক্‌লেন। আর সব জায়গায় সব ক্ষমতাটুকু যাতে নিজ ভক্তবৃন্দ বা হাতের লোকদের হাতেই থাকে, তার জন্য নানারকমের চেষ্টাও করতে থাক্‌লেন। '৫৭ সালের ইলেক্‌সনের মাত্র কয়েকদিন আগে, শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষের কাছে লিখিত তাঁর যে চিঠিখানি প্রকাশ পেয়েছে, সেটা তাঁর ঐ কার্য্যকলাপের প্রদর্শনী ভিন্ন আর কিছুই নয়। ভারতের মন্ত্রী যাঁরা হলেন তাঁরা অনেকেই খ্যাতনামা ব্যক্তি,—মানে খবরের কাগজে নাম-ছাপা বিশিষ্ট লোক। পাকিস্থানের মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকেই ততটা পরিচিত ছিলেন না। ভারতের মন্ত্রীসভায় হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃস্টান, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের এবং প্রায় সকল দলের লোকেরাই স্থান পেলেন। পাকিস্থান এ ব্যাপারে অতটা উদার হতে পারল না। ভারতের অতি-বুদ্ধিমান নেতাদের সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা, কাজের চেয়ে গণতন্ত্রে ভোটের মূল্য যে অনেক বেশি সে ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেম, পাকিস্থানের নেতারা বোধহয় ততটা পারেন নি।

পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে আসীন হলেন বহু পুরাতন নাজিমুদ্দিন সাহেব, আর পশ্চিমবাংলার গদিতে আসীন হলেন মহান গান্ধীভক্ত নেতা শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ। স্বাভাবিক দাবী অনুযায়ী যাঁর পশ্চিম বাংলার গদি পাওয়া উচিত ছিল, তিনি হচ্ছেন বাংলার আইন সভায় কংগ্রেসী দলের নেতা কিরণশঙ্কর রায়। অথচ গদিসীন হয়ে বসলেন শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ। কারণ গান্ধীজীর উপদেশ অনুযায়ী কিরণবাবু পাকিস্থানের খেদমৎ করবার জন্য পাকিস্থানে আসাই মনস্থ করলেন। কিরণবাবু এবং প্রফুল্লবাবু দু'জনেই পূর্ব-বাংলার ঢাকা জেলার লোক, কিন্তু প্রফুল্লবাবুর কর্মকেন্দ্র ঢাকাতে হলেও, কিরণবাবুর কেন্দ্র ছিল কলকাতাতেই।

এই অবস্থায় কিরণবাবুকে উপদেশ দিয়ে পাকিস্থানে পাঠিয়ে প্রফুল্লবাবুকে কলকাতার গদিতে বসাবার কি কারণ থাকতে পারে—এ ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কেউ চিন্তা করবার সময় পাননি; স্বাধীনতা নিয়ে সবাই বড় ব্যস্ত ছিলেন। বিধানবাবুকে ত আগে থেকেই উত্তর প্রদেশের গভর্ণরী দিয়ে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। আর প্রফুল্লবাবু, যিনি দেশ ভাগ হবার মাত্র কয়েকদিন আগেও সাড়ম্বরে বলে বেড়ালেন যে, "I will be the last man to leave East Bengal," তিনিই বা কোন লজ্জায় সর্বপ্রথমে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চিম বাংলার গদি দখল নিলেন! ক্ষমতা জিনিসটা যে গান্ধীজী খুবই ভাল বুঝতেন এবং কখনই নিজের হাতের লোকদের বাইরে যেতে দিতেন না, প্রফুল্লবাবুকে যেন-তেন-প্রকারেণ পশ্চিম বাংলার গদিতে বসাবার মধ্যেই তার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাহোক, স্বাধীনতার কাজ শুরু হল। আমরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম দেখবার জন্য যে, স্বাধীনতার জাঁতাকলে কি কি জিনিস পয়দা হয়। স্বাধীনতার জাঁতাকলে কি কি জিনিষ পয়দা করা হবে, সে বিষয়ে পাকিস্থানী নেতারা বিশেষ করে কোন ফিরিস্তি জাহির করে বসেছিলেন না। পাকিস্থান আদায় করতে হবে, 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান.' এই শ্লোগান নিয়েই তাঁরা বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় নেতারা কালনেমীর লঙ্কা ভাগের মত, আগে থেকেই বাৎলে রেখেছিলেন যে আজাদী পেলেই তারা কি কি করবেন না, বা কি কি করবেন। তাই আজাদীর পরের অবস্থাটা দেখবার জন্য পাকিস্থানের চেয়ে ভারতের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম বেশি। তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ খারাপ হয়ে গেছে, তাও ঠিক বলি না। তবুও এটুকু খুব জোরের সাথেই বলতে পারি যে, যা দেখেছি তা খুবই আবছা আবছা, এবং স্বাধীনতার কল্পনার সাথে যা সব দেখব বলে আশা করেছিলাম, প্রায়ই তার উল্টো।

সত্যিকারের স্বাধীনতার কল্পনাটা যে আমার কি ছিল, তা আজও যে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি তাও বলি না। তবে স্বাধীনতার মানে যে ডবল পরাধীনতা বা ইংরেজের চেয়ে শতগুণ বেশি ঔদ্ধত্য নিয়ে জনসাধারণের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে লাথি মারবার চেষ্টা, এরকম নিশ্চয়ই কখনও কল্পনা করিনি। ছোটবেলায় অবশ্য ইংরেজ তাড়িয়ে স্বাধীনতার যে রূপ হবে, সে বিষয় একটা বেশ পরিষ্কার ধারণা ছিল। সেটা হচ্ছে যে, দু'ট্যাঁকে দুটো পিস্তল নিয়ে, সম্ভবত কাঁধের উপর একটা রাইফেলও নিয়ে, যত্র তত্র ঘুরে

বেড়াতে পারব, আর সাক্ষাৎমাত্রই দুনিয়ার যত বদ, অসৎ এবং বদমাইসকে দু'হাতে গুলি চালিয়ে সায়েস্তা করব, বুলেট খরচার কথাও ভাবব না। বড় হয়ে জ্ঞানবৃক্ষের ফল পেটে যেতে না যেতেই সেই পরিষ্কার স্বাধীনতার রূপটি ক্রমে অপরিষ্কার হয়ে, আবছা হয়ে মিলিয়ে গেছে; আর সে জায়গায় অন্য কোন রূপও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠছে বলেও মনে হয় না। তবুও আবছা অপরিষ্কার যেটুকু মনের মধ্যে স্বাধীনতার রূপ বলে মনে করেছি—আর আজ যা দেখছি, তা সম্পূর্ণ উল্টোউল্টি ব্যাপার।

স্বাধীনতা পাবার পর বন্দুক, রাইফেল বা পিস্তলের লাইসেন্স বাতিল বা শিথিল হওয়া ত দূরের কথা, আজ স্বাধীন ভারতে কালীপূজোর পট্‌কা পোড়ান বন্ধ করবার জন্য প্রতি বৎসর যে রকম নূতন নূতন আইন-কানুনের ব্যবস্থা হচ্ছে তাতে মনে হয় সে দিন আর খুব বেশি দূরে নয় যে-দিন লাইসেন্স নিয়েই ছেলেদের পট্‌কা পোড়াতে হবে। আজ স্বাধীন ভারতের ভাগ্যবিধাতারা পট্‌কা পোড়ানটাকেও ভয়ের চোখে দেখতে সুরু করেছেন। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ব্যাপারে পাকিস্থানে, অন্তত মুসলমানদের জন্য কিছুটা সুবিধা করা হয়েছে, মুসলমানেরা বেশ সহজেই ওই অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করতে পারছে। পাকিস্থানী নেতারা মুসলমানদের অন্তত কিছুটা বিশ্বাস করতে পারছেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর পুত্রদের দেশ ভারতে আজ একি অবস্থা! তাঁরা যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান—কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না; ব্যাপার কি?

ভারত-ভাগ্যবিধাতাদের দর্শন লাভ আজ শুধু বাইনাকুলারের সাহায্যেই সম্ভব। আজ ঐ ভাগ্য-বিধাতাদের যাতায়াতের পথে যত পুলিশ আর মিলিটারী সমাবেশ করা হয়, তা দেখলে পৃথিবীর জঘন্যতম অত্যাচারী শাসকও না হেসে থাকতে পারতেন না। ওই তানাদের যাতায়াতের পথ সুগম রাখবার জন্য যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাধারণের পথে চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন কি লজ্জায় কারও মাথা নত হয়ে যায় না? এই কি স্বাধীনতার স্বরূপ? কিন্তু সোজাকথা মোটাভাবে বলবার লোক কোথায়—সব যে স্বাধীনতার খপ্পরে শেষ হতে চলেছে। সোজা কথা মোটাভাবে কে আজ বলবেন যে, দেশের লোক হয়েও যাঁরা দেশের লোকের থেকে এত দূরে, তাঁদের হাতে শাসিত হবার জন্যই ইংরেজকে তাড়াবার দরকার ছিল না। আমার স্বাধীনতার কল্পনা কোনদিনই এ ধরনের ছিল না,—এর ধারে-কাছেও না। কালোবাজারী ব্যবসাদারদের নিকটতম আলোর খুঁটিতে ফাঁসি ঝোলানো হবে বলে একটা স্লোগান তোলা

হয়েছিল, সেটাও হয়নি। কালোবাজারীরা বেঁচে গেছেন। কালোবাজারী ব্যবসাদার আর কালোবাজারী রাজনীতিওয়ালারা সব এক হয়ে গেছেন। এটা তাদেরই স্বাধীনতা। তাই ভাগ হয়ে পাকিস্থানের অংশে পড়েছি বলে আজ আর বেশি দুঃখও নেই।

যাকগে, বাজে কথায় কাজ নেই, আবার কাজের কথায় আসা যাক। জাতির পিতা বা ভ্রাতার প্রগতিশীলতাবোধের সৌজন্যে ভারতে মেয়ে মন্ত্রী, মেয়ে গভর্ণর, মেয়ে এম্বেসাডার হয়ে প্রগতিশীলতায় ভারত পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে নিয়ে গ্যাট হয়ে বসল। আর নেতিবাচক কর্মপন্থা লবণ শুল্ক রদ, মদ্যপান নিষেধ ইত্যাদির সাহায্যে স্বাধীন ভারতের গোড়া পত্তন শুরু হল। ভারতের অগণিত জনসাধারণের প্রত্যেককে প্রতিদিন কত হাজার ক্যালোরী খাদ্য সরবরাহ করা হবে, এবং ঐ পরিমাণ খাদ্য দিতে হলে দেশে কত খাদ্য ঘাটতি পড়বে, তাও হিসাব কষে বের করা হল। কমপক্ষে জনপ্রতি কত গজ কাপড় দরকার, কত জুতা, লাঠি, ঔষধপত্র, বই পুস্তক, তেল, কয়লা, কালিকলম, এমনকি সাবান, তরল আলতা ইত্যাদি দরকার। তার কতখানি দেশে তৈরী হচ্ছে, আর কতখানি বাইরে থেকে আমদানি করতে হবে বা কলকারখানা বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, তার সবেরই হিসাব ঠিকমতভাবেই কষা চলতে থাকল। হিসাবে ভুল হলে চলবে কেন!

তিন বৎসর শেষে ১৯৫০ সালে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে, এ ঘোষণাও অতি প্রকাশ্যভাবেই হল। এখন কোন রকমে তিনটি স্বাধীনতার বছর কাটিয়ে বেঁচে থাকতে পারলেই হয়, তবেই আর কোন ভয় নেই। ১৯৫০ সালে ত দেশ একেবারে 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' হয়েই যাবে। জানিনা, বোধ হয় হয়েওছিল, কেবল ঐ দৈবদুর্বিপাক আর প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর বাঁদরামির জন্যই ঠিকমত একটু বেঠিক হয়ে গেছে। আজকাল যত কিছু খারাপ হয়, সব ঐ প্রকৃতিদেবীর বেয়াদপির জন্যই, স্বাধীনতার গার্জেনদের গাফিলতির জন্য কখনই নয়। আজকাল নাকি বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি দুর্যোগগুলোও বড় ঘন ঘন আসছে; ইংরেজ আমলে নাকি এত ছিল না। আজকাল সবকিছুরই সংখ্যা হিসাব করে কথা বলা হয়, আর জল মাপা হয় কিউসেক হিসাবে। তাই বুঝতেও অসুবিধা হয় না মোটেই যে, প্রকৃতির বদামিই হচ্ছে যত নষ্টের মূল! মূর্খ সাধারণ ত বুঝেই রেখেছে যে, এটম বোমা

আর হাইড্রোজেন বোমা ফাটাবার জন্যেই আজকাল এত বৃষ্টি হচ্ছে। যদিও ভারতের rainfall record-এ সারা ভারতে কোথাও বৃষ্টির গড় পরিমাণ গত দশ বছরে বৃটিশ আমল থেকে বেশি হয়েছে বলে জানা যায় না। বরং বোধ হয় কিছু কমেছে।

ভারতের প্রধান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নাকি পররাষ্ট্র ব্যাপারে বিশারদ, তাই তিনি পররাষ্ট্র চর্চায় নিমগ্ন হলেন। হু হু করে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত, দেশে দেশে ভারতের 'এম্বিসি হাউস' গজিয়ে উঠতে লাগল। আত্মীয়, বন্ধু এবং আশ্রিতজনেরা নূতন নূতন চাকরি পেয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন। 'অহিংসা বহুৎ বড়ী চীজ,' প্রচারকার্য দুনিয়াময় ফেঁপে উঠল। সারা দুনিয়া ভারতের অহিংসা গ্যারাকলের বাহাদুরী দেখে বোকা ব'নে গেল।

নূতন নূতন শিল্প গড়ে তুলতে হবে, খাল কাটতে হবে, ডাম বাঁধতে হবে, রাস্তা তৈরি করতে হবে, পাহাড় উড়াতে হবে; তাই দেশ ও বিদেশ থেকে বিজ্ঞ আর বিশেষজ্ঞরা আসতে থাকলেন। দিল্লীর হোটেলে স্থান অকুলান হল, রাস্তায় ভিড় বেড়ে গেল। আর তাদের উপদেশের ফিরিস্তির চোটে খবরের কাগজের রস আস্বাদন কঠিন হয়ে উঠল। প্রায় সবরকম কাজের জন্যই বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আর উপদেষ্টা আসতে থাকল, কেবল একমাত্র শাসন বিভাগের কাজের জন্য বাদে। ও ব্যাপারটাতে ভারতবাসীমাত্রেই ভীষণ পরিপক্ক কিনা, তাই। আর গণতন্ত্রের দেশে ভোট পাওয়াটাই যা একটু কঠিন, ভোট পেয়ে আসতে পারলে ত শাসনকার্য যে কেউই চালাতে পারেন! যে কেউরাই শাসনকার্য চালাতে থাকলেনও!

পাকিস্থান কিন্তু এসব হিসেব-কষাকষি এবং অন্য অনেক ব্যাপারেই পেছিয়ে যেতে থাকল। হঠাৎ করে যেভাবে পাকিস্থান পয়দা হল, তাতে যে তার কোন কেন্দ্রীয় সংস্থাই ছিল না। সেটুকু ত গুছিয়ে নিতে হবে, তাই। একবার টেবিল চেয়ার যোগাড় করে কতকগুলো অফিস খুলে বসতে পারলেই ওসব আরম্ভ করতে তারও বেশি দেরি হবে না।

দেশীয় রাজ্য সমস্যা ও কাশ্মীর

এদিকে ভারতের পেটের ভেতর যে অসংখ্য দেশীয় রাজ্য ছড়িয়ে রয়েছে, ইংরেজ চলে যাবার ফলে যাদের অবস্থা তখন অনেকটা ঐ

অভিভাবকবিহীন বাউণ্ডুলে ছেলের মত। তাদের কুড়িয়ে নিয়ে একসঙ্গে করে ভারতকে একটা সুসংবদ্ধ দেশে পরিণত করবার কাজও চলতে থাক্‌ল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার প্যাটেলের আওতায়। সর্দার প্যাটেল কিন্তু কাজটা যেটাকে আগে খুবই কঠিন ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল, বেশ সহজেই সুরাহা করে আন্‌লেন্‌। দেশীয় রাজ্যের প্রায় সব রাজারাই বেশ ভদ্র এবং সুবোধ বালকের মতই তাঁদের রাজ্যগুলো সর্দার প্যাটেলের হাতে তুলে দিলেন। এ কাজের জন্য সর্দার প্যাটেলকে অবশ্যই বাহাদুরী দিতে হবে, কিন্তু তাই বলে ঐ হতভাগা রাজাগুলোর জাতীয়তাবোধের ব্যাপারটাকেও খুব খাটো করে দেখলে অন্যায় হবে। তাঁরা যে শুধুই বৃহৎশক্তির ভয়েই রাজ্য ছেড়ে দিয়ে বনবাসে গেলেন এরকম মনে করলে খুবই ভুল করা হবে। আগে তাঁদের বিষয় যে একটা ধারণা ছিল যে, তাঁরা সবাই ইংরেজের দালাল এবং ভারতের স্বাধীনতা এবং ঐক্যের শত্রু, ঠিক সেই রকমই ভুল করা হবে। কয়েকটি প্রগতিশীল দেশীয় রাজ্য ত ভারতের সঙ্গে এক হয়ে গেলে তাদের উন্নতি বিশেষভাবে ব্যাহত হবে, তা জেনেশুনেই ভারতে যোগদান করেছিল। কিন্তু গোলমাল বাধল দুটো বৃহত্তম দেশীয় রাজ্যকে নিয়ে, তারা বাগ মানলেন না। আর একটি ছোট দেশীয়রাজ্য ভারতের পেটের মধ্যে থেকেও পাকিস্থানে যোগ দিয়ে এক গোলমালের সৃষ্টি করল।

পাকিস্থানও তার এলাকার কাছাকাছি দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিজের মধ্যে মিশিয়ে নেবার চেষ্টা করতে থাক্‌ল, এবং নিয়েও ফেললে প্রায় সবকটিকেই। তারও গোলমাল বাধল এক কাশ্মীরকে নিয়ে। কাশ্মীর না-ভারত, না-পাকিস্থান—কারুর তাঁবেই আস্‌তে রাজি হল না। কাশ্মীর রাজ্যটির অবস্থান এবং সীমারেখা যেরকম তাতে তার বেশ সুবিধাও ছিল। কাশ্মীরের একদিকে ভারত আর অন্যদিকে পাকিস্থান, আবার উত্তর সীমানায় চীনের সঙ্গেও তার সংযোগ রয়েছে; রুষ-ভাল্লুকও সীমানা থেকে বিশেষ বেশিদূরে নয়। কাশ্মীরের মহারাজা তাই সত্যি সত্যিই, অভিভাবকবিহীন বাউণ্ডুলে ছেলের মতই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। মহারাজার পরে শ্রীজহরলালের বন্ধু সেখ আবদুল্লা যে খোয়াব দেখেছিলেন, তাও ঐ একই বস্তু।

কাশ্মীরকে নিয়েই গোলমাল বাধল, রাজনীতির দাবা কোর্টে চাল আরম্ভ হল। হিন্দু মুসলমানের সংখ্যানুপাতের ভিত্তিতেই যখন ভারত ভাগের সীমারেখা টানা হয়েছে, তখন মুসলমান-প্রধান কাশ্মীর রাজ্য স্বভাবতই

পাকিস্থানীরা দাবি করতে পারে। কিন্তু বৃটিশ পার্লামেণ্টের যে আইন বলে ভারতকে ভাগ করে স্বাধীনতা দান করা হয়েছে, সেই আইনের ধারা অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণ নয়, রাজারাই নির্ধারণ করবে যে তারা কোথায় যাবে—ভারতে যাবে, পাকিস্থানে যাবে, না স্বাধীন থাকবে; এসব তাঁদের ইচ্ছামতই হবে। তাঁরা যা করবেন তাই হবে আইনসিদ্ধ। ভারত এবং পাকিস্থান দু'পক্ষ থেকেই তাই কাশ্মীরের মহারাজার খোসামোদ করা চলতে থাকল, কিছু কিছু ভয়ও যে দেখান হল না তাও নয়। কিন্তু মহারাজ টল্‌লেন না। তিনি কোন দিকেই ভিড়তে রাজী হলেন না। তবুও শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের সাথেই এক স্থিতাবস্থা চুক্তি স্বাক্ষর করে কাজ গোছাবার জন্য সময় নিলেন। হিন্দু মহারাজা চাপে পড়লে শেষপর্যন্ত যে ভারতের দিকেই ঝুঁকবেন, এটুকু আন্দাজ করে নিতে জিন্না সাহেবেরও দেরি হল না। তিনি কাজের লোক, তাই বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে কাজ আরম্ভ করে দিলেন—কাশ্মীর পাকিস্থানের চাই-ই। রাজনীতির দাবা কোর্ট ছেড়ে সামরিক দাবা কোর্টে চাল শুরু হল।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির দু'মাস না যেতেই, অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে হঠাৎ শোনা গেল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে উপজাতিরা কাশ্মীরের উপর হাম্‌লা করেছে; ঠিক মিলিটারী কায়দায় এবং মিলিটারী অফিসারদের নেতৃত্বেই। রয়ালপিণ্ডি শ্রীনগর রাস্তা ধরে তারা হু হু করে কাশ্মীরে ঢুকে পড়ল। মাহেরাতে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দখল করে নিলে উপজাতি হানাদারেরা, শ্রীনগরে অন্ধকার নেমে আস্‌ল। মাহেরার পরে বারমুল্লা দখল করে আক্রমণকারীরা খাস কাশ্মীর উপত্যকায় এসে উপস্থিত হল। রাজনীতিক হিসাবে জিন্না সাহেবের উপর যে একটা বিরূপ ভাব ছিল সেটা অনেকটা কেটে গেলে; বুঝতে পারলাম জিন্না সাহেব বাস্তবধর্মী রাজনীতিক, তিনি কাজ বুঝেন। কাশ্মীর পাকিস্থানের চাই, কাশ্মীর পাকিস্থানের পক্ষে অপরিহার্য, তাই যে কোন প্রকারেই হোক ওটা পাকিস্থানে নিতে হবে। যে সময়টাতে তিনি কাশ্মীর দখল করবার প্ল্যান করেছিলেন, সামরিক দিক থেকে সেটাও তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ, কাশ্মীর উপত্যকায় শীত নেমে এসেছে। ভারত থেকে কাশ্মীর যাবার যে দুটো পথ ছিল, তার একটা রয়ালপিণ্ডির পথে, আর অন্যটা জম্মুর পথে। রয়ালপিণ্ডির রাস্তাটি বারো মাসই খোলা থাকে, কিন্তু দেশ ভাগ হবার পরে সে রাস্তার মুখ সম্পূর্ণভাবেই পাকিস্থানে পড়েছে। জম্মু থেকে

অন্য রাস্তাটির মুখও যদিও পাকিস্থানেই পড়েছে, তাহলেও ঘুরে ফিরে, কোন রকমে, ঐ পথে ভারত থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত যাওয়া যায়; কিন্তু জম্মুর পথে আবার ৯০০০ ফিট উঁচু বানিহাল গিরিবর্ত পার হয়ে যেতে হয়। নভেম্বর মাসের প্রথম থেকেই বরফে ঐ রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যায়। আক্রমণ হচ্ছে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে; তাই ইচ্ছা থাকলেও ভারত থেকে সাহায্য পাঠান খুবই দুষ্কর হবে। ইতিমধ্যে কাশ্মীর দখলের কাজটাও বোধ হয় শেষ হয়ে যাবে। এই আক্রমণের সময়টার আরও একটা বিশেষ সুবিধা ছিল এই যে, পাঞ্জাবের দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর ভারত এবং পাকিস্থানের মধ্যে যে লোক-বিনিময়ের ব্যবস্থা হয়েছিল সে কাজ তখনও চলছে এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ঐ ব্যাপারেই বিশেষ ব্যস্ত রয়েছে। পরে অবশ্য প্রমাণ হয়েছে যে আজকালকার সামরিক প্রশ্নে ঐ হিসাবগুলোর মূল্য খুব বেশী নয়।

যাই হোক, পাকিস্থানের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে সেদিন জিন্না সাহেব যে কাজে নেমেছিলেন তা রাজনীতির বাজারে মোটেই নিন্দনীয় ব্যাপার নয়, বরং বেশ বাহাদুরীরই কাজ। নিজের দেশের স্বার্থ বজায় রাখতে গিয়ে বহু দেশের বহু রাজনৈতিক নেতা এই ধরনের কাজ করে ইতিহাসে তাঁদের নাম রেখে গেছেন। জিন্না সাহেবের আশা পুরোপুরি সফল হয়নি ঠিকই, কিন্তু আজও যে পাকিস্থান কাশ্মীরের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ দখলে রাখতে পেরেছে, সে ঐ জিন্না সাহেবের দৌলতেই। জিন্না সাহেবের আশা পুরোপুরি সফল হতে পারেনি; তার কারণ, কাশ্মীরের মত একটা ভাল জায়গাকে ভারতও মোটেই ছেড়ে দিতে রাজী ছিল না। কাশ্মীর আক্রান্ত হয়েছে, এই সংবাদ দিল্লীতে এসে পৌঁছতেই ভারত সরকার তাঁদের কর্তব্য নির্ধারণ করে ফেল্লেন, যেকোন উপায়েই হোক কাশ্মীরকে রক্ষা করতেই হবে। কাশ্মীরের মহারাজা সাহায্য চেয়েই বসেছিলেন, তাই তাঁকে দিয়ে ভারতে যোগদানের এক অঙ্গীকারপত্র সই করিয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁরা এরোপ্লেন করে শ্রীনগরের দিকে সৈন্যসামন্ত পাঠাতে শুরু করলেন।

শ্রীনগরের আশেপাশে, বারমুল্লায় এবং অন্য অনেক জায়গায় ছোটখাট, মাঝারি, বড়, নানা রকমের যুদ্ধ হয়ে কাশ্মীর উপত্যকা ভারতের দখলে আসল। মাহেরা দখল করে নিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু করে দিলে। শ্রীনগরে আবার আলো জ্বলে উঠল।

পাকিস্থানের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে কাশ্মীর দখল করতে গিয়ে জিন্না

সাহেব সেদিন যে কাজ করেছিলেন, সেটাও যেমন তাঁর পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল, ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে, ভারতীয় নেতারা সেদিন কাশ্মীর রক্ষা করতে গিয়ে যা করলেন সেটাও তেমনি ন্যায়সঙ্গতই হয়েছে। অহিংসা-বাদী ভারতীয় নেতারা যে রাজনীতি করতে গিয়ে অতখানি ঝুঁকি নিতে পারেন, মিলিটারী পাঠিয়ে দিয়ে লড়াই করে কাশ্মীর রক্ষা করবেন, এ ব্যাপারটা সেদিন না দেখলে কখনই বিশ্বাস করতাম না। জিন্না সাহেবও বোধহয় এই রকমই বিশ্বাস করতেন। অহিংস অবতার মহাত্মা গান্ধী ত একদিন তাঁর প্রার্থনা-সভায় বলেই বসলেন, "ভারতের যুবকবৃন্দ, তোমরা কাশ্মীরে গিয়ে রক্ত দাও।" সত্যি সত্যি গান্ধী-জহরলাল একি করলেন! তাঁরা যে দেখছি রাজনীতির ঢং করতে করতেই রাজনীতি শিখে ফেললেন, ব্যাপার কি! একাজ তাঁরা তাঁদের নবলব্ধ ক্ষমতা দেখাবার জন্যই করলেন কিনা জানি না, তবে বদলোকেরা অবশ্য এখনও বলাবলি করে যে, সেদিন গান্ধী, জহরলাল যে অতখানি বুদ্ধি এবং সাহস দেখাতে পেরেছিলেন, এবং ঝুঁকিও নিয়েছিলেন, তার কারণ হচ্ছে যে, ভারতের মন্ত্রীসভায় তখন কংগ্রেসীরা বাদেও অন্যান্য দলের অনেকে ছিলেন। জানিনা, ঐ অন্যদের চাপে পড়েই গান্ধী, জহরলালের এই বুদ্ধি-টুকু খুলেছিল কিনা, বা ঝুঁকি নেবার সাহস হয়েছিল কিনা। তবে এটুকু সত্যি যে, বুদ্ধি-সাগর শ্রীজহরলাল এককভাবে নিজ দায়িত্বে সেদিন যে কাজ করেছিলেন তার ফলেই কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্থান আজও ভোগ করতে পারছে। কাশ্মীরের মহারাজা ভারতে যোগদানের অঙ্গীকারপত্র সই করে দেওয়া সত্ত্বেও শ্রীজহরলাল সেদিন সেটা পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করেননি। বরং সেই অঙ্গীকারপত্রের সঙ্গে একটু লেজুড় জুড়ে দিয়ে তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। সেই লেজুড়টি মোটামুটি এই যে লড়াইয়ের হাঙ্গামা মিটে গেলে কাশ্মীরের জনগণকেই বেছে নিতে দেওয়া হবে, তারা কি করতে চায়। আর তার পরের দিন দিল্লী থেকে যে রেডিও বক্তৃতা শ্রীজহরলাল করে-ছিলেন তাতেও তিনি ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি করে আবারও বলেছিলেন যে যুদ্ধের হাঙ্গামা মিটে গেলে U. N. O.-র তত্ত্বাবধানে ভোটাভুটি করে কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ধারণ করতে তিনি রাজী আছেন। বোলচাল মেরেই ত তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন, তাই ঐ ব্রহ্মাস্ত্রটিকে ভুলতে পারেন নি; ভেবেছিলেন, ভোটাভুটির ছুটো চাল ঝেড়ে দিলেই পাকিস্থান শান্ত হয়ে কাশ্মীর ছেড়ে যাবে, আর হাঙ্গামা করতে হবে না। তারপর পরেরটা পরে দেখা যাবে।

এখন সেই পরেরটাই দেখা যাচ্ছে। ভোটাভুটিতে তিনি তখন রাজী ছিলেন, অনেক কিছুতেই তিনি রাজী থাকেন; তবে আর আজ ভোটাভুটির কথায় এত পেছপা কেন? ভোট নিয়ে কাশ্মীরটা পাকিস্থানকে দিয়ে দিলেই ত হয়! অসংযমী লোকদের নিয়ে বিপদ অনেক, একবার মুখ খুললে কি যে বলেন আর কি যে না বলেন তার আর ঠিকানা থাকেনা,—কথা বলেই দুনিয়া মাৎ করতে চান। জিন্না সাহেবের কাশ্মীর দখল করবার প্ল্যান ভেস্তে গেছে, কাশ্মীর দখল করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাঁর এই প্ল্যান ভেস্তে যাবায় আর যে কারণই থাকুক না কেন তাঁর নিজের গাফিলতি বা নির্বুদ্ধিতা কখনই নয়, বরং আইনের দিক থেকে কিছুমাত্র দাবি না থাকা সত্ত্বেও আজও যে কাশ্মীরের অনেকটা পাকিস্থানেই রয়েছে, এ বাহাদুরী তাঁরই প্রাপ্য।

কাশ্মীরের লড়াই চলতেই থাকল পুঞ্চে, নওসেরায়, মুজাফরাবাদে, আরও অন্য অনেক জায়গায়। ভারত সরকার সোজাসুজি আইনসঙ্গত পথে কাশ্মীর রক্ষায় এগিয়ে গিয়েছিলেন, তাই ভারতীয় বিমানবাহিনীও ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্যে লড়াই করে এগিয়ে চলেছিল। পাকিস্থান কিন্তু বেসরকারীভাবে এই আক্রমণ চালিয়েছিল, তাই তাদের বিমানবাহিনীকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারেনি। এবং শেষপর্যন্ত এই কারণেই পাকিস্থানকে ক্রমেই পিছু হটতে হয়েছিল।

জুনাগড় সমস্যা ও সমাধান

কাশ্মীরের এই গোলমাল আরম্ভ হতে না হতেই ছোট্ট আর একটি দেশীয় রাজ্য জুনাগড় আবার এক বেকায়দামাফিক কাজ করে আর এক হাঙ্গামা বাধিয়ে বসেছিল। জুনাগড় গুজরাটের মধ্যে অবস্থিত অনেকগুলি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে একটি ছোট্ট রাজ্য। ভৌগোলিক দিক থেকে পাকিস্থানের সঙ্গে যোগাযোগশূন্য। প্রজারা প্রায় সবই হিন্দু আর নবাব মুসলমান। সেই জুনাগড় পাকিস্থানে যোগদান করে বসল। ব্যাপারটা যে ভারতের পক্ষে খুবই অসুবিধার কারণ হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে নিলে এরকম অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে, সে কথা আগে কে কতটা ভেবে দেখেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। যাই হোক, জুনাগড়ের ব্যাপারটা সর্দার প্যাটেলের আওতায় থাকায় ওটার একটা ব্যবস্থা হতে বেশি দেরিও হল না। সর্দার প্যাটেল সত্যিই

কর্মীলোক ছিলেন। তাই কাজ বেশি করে কথা কম বলতেন। প্রথমে তিনি জুনাগড়ের নবাবকে খোসামোদ করে দেখলেন, কিন্তু বিশেষ ফল হল না। পরে জুনাগড়ে প্রজা বিদ্রোহ হল, এবং নবাব তাঁর কুড়িজন না চল্লিশজন বিবিকে নিয়ে করাচীর কোন এক আস্তানায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। জুনাগড়ের এই প্রজা বিদ্রোহে বাইরে থেকে সাহায্য এসেছিল, সশস্ত্র সাহায্যই। ভারতীয় সৈন্যরাই সাদা পোশাকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছিল কিনা জানা যায় নি। সেরকম হয়ে থাকলেও অবিশ্বাসের কোন কারণ ছিল না; কারণ সর্দার প্যাটেল কাজের লোক ছিলেন। জুনাগড়ের নবাব পাকিস্থানে যোগদানের পর ভারত তাকে কবলস্থ করবার জন্য আইন বাঁচিয়ে যে অজুহাত তৈরি করেছিল সেটা বোধ হয় মোটামুটি এই রকম যে, জুনাগড়ের নবাব যে দিকেই যোগদান করবেন সেটাই হবে আইনসঙ্গত ঠিকই; কিন্তু কোন আইনে এমন কথা নেই বা থাকতে পারে না যে, প্রজারা বিদ্রোহ করে নবাবকে বিতাড়িত করতে পারবে না। বিদ্রোহের ফলে নবাব যখন পালালেন তখন সব ক্ষমতাই প্রজাদের হাতে এসে গেল, এবং সেই ক্ষমতাবলেই প্রজারা ভারতে যোগদান করেছে। বিচারের ধোপে এই অজুহাত কতখানি টিকতে পারে বলা কঠিন, তবে অজুহাতটা যে একেবারে ফেলনা নয়, সেটা যে-কেউই স্বীকার করবেন।

জুনাগড়ের ব্যাপারে পাকিস্থান কিছুই করল না কেন, বাধাই-বা দিতে এগিয়ে আসল না কেন, তাও বলা কঠিন। মনে হয় জিন্না সাহেব জুনাগড়টাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে কাশ্মীরের উপর তাঁর দাবি জোরাল করবার চেষ্টা করেছিলেন, এবং সেই জন্যই ওখানে তিনি কোন বাধা দিতে আসেন নি।

কাশ্মীর সমস্যার U. N. O.-তে গমন

কাশ্মীরের লড়াই কিন্তু মিটলনা, চলতেই থাকল। অবশ্য পাকিস্থান বিমানবাহিনীর সাহায্যের অভাবে ক্রমেই পিছিয়ে আসতে লাগল। অবস্থা যে রকম দেখা যাচ্ছিল, তাতে আর সন্দেহ করবার প্রায় কিছুই ছিল না যে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পাকিস্থানকে সম্পূর্ণভাবেই কাশ্মীর ছেড়ে আসতে হবে। কিন্তু হঠাৎ কি হল! কথা নেই বার্তা নেই ভারত সরকার কাশ্মীরের ব্যাপারটা U. N. O.তে নিয়ে হাজির করলেন। ব্যাপার কিছুই বুঝা গেলনা। ভারত যে কাশ্মীরের ব্যাপারটা নিয়ে কেন U. N. O.-তে

গিয়েছিল সে রহস্য এক শ্রীজহরলাল ছাড়া আর কেউ যে আজও বুঝতে পেরেছে, তা মোটেই মনে হয় না। কেন রে বাবা, নিজেরা নিজেরা সম্পত্তির দখল নিয়ে লড়াই মারামারি করছিলে, নিজেরাই তার একটা ফয়সালা করে নিতে পারতে। এ নিয়ে আবার বিদেশী মামাদের আসরে নালিশ দরবার করতে যাওয়া কেন? কৈ, জুনাগড় নিয়ে ত পাকিস্থান কোন নালিশ দরবার করতে যায়নি! ব্যাপারটা অবশ্য পাকিস্থানের পক্ষে শাপে বর হওয়ার মতই হল। প্রথম প্রথম পাকিস্থানের পক্ষে কাশ্মীরের ব্যাপার নিয়ে কথা বলা একটু অসুবিধার থাকলেও, বাক্যবিশারদ শ্রীজহরলালের অসংযমী কথাবার্তার ফলে মামলাটা এমন অবস্থায় এসে গেল যে, শেষপর্যন্ত ভারতই আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল। কাশ্মীরীরা ভোট দিয়ে তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে এ ধরনের কথা দিয়েও শ্রীজহরলালকে আজ ভোটের কথায় পেছিয়ে আসতে হচ্ছে। অতি-বুদ্ধিমানদের অবস্থা এই রকমেরই হয়।

গান্ধীজী ও জিন্না সাহেবের মৃত্যু

কাশ্মীরের লড়াই চলতে থাকাকালে ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী রাত্রে হঠাৎ রেডিওতে খবর পেলাম আততায়ীর পিস্তলের গুলিতে মহাত্মা গান্ধী নিহত হয়েছেন। খবরটাতে সত্যিই ভীষণ আঘাত পেলাম; এবার মহাত্মা গান্ধী সত্যিই শহিদ হলেন! অনেকদিন থেকে মহাত্মা গান্ধী, মহাত্মা গান্ধী আর তাঁর মহামানবতার এবং অতিমানবতার গল্প শুনতে শুনতে মনের কোনে কেমন যেন একটা ধারণা মত হয়েছিল যে, তিনি পিস্তল বোমায় হত হবার মত নশ্বর দেহ ধারণ করেন না। সেই মহাত্মা গান্ধীও যখন পিস্তলেই সাবাড় হলেন তখন বুঝলাম, পিস্তল বড় কঠিন চীজ; তার সম্মুখে সবাইকে সমান হতে হয়; মহাত্মাতেও কুলায় না। সারা ভারতে শোকের ছায়া নেমে আসল, পাকিস্থানেও বাদ পড়ল না। মুসলমানরা মুখে স্বীকার করুক আর নাই করুক, মনে মনে যে তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করত তা বেশ বুঝতে পারলাম। এই লোকটি না থাকলে তাদের পাকিস্থানও হয়ত কোনদিনই আদায় হ'ত না, প্রায় সবাই তা বিশ্বাস করত। খুব সমারোহ করে রংপুরেও আমরা তাঁর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করলাম। অনেক টাকা উঠল, অনেক খাওয়া দাওয়া হল। এমন বিরাট ব্যাপার করলাম যে রংপুরের রাজনৈতিক জীবনে আর কখনও এত বড় কোন কাণ্ড হয়েছে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর সাক্ষাৎ যে কারণ, সে একটা খুবই মজার ব্যাপার! দেশ ভাগাভাগির পর পাকিস্থানের দৈনন্দিন খরচ চালাবার মত চালু টাকা (currency) হাতে ছিল না। তাই ভারতের সাথে একটা বন্দোবস্ত হয়েছিল যে, আপাতত এই খরচ চালাবার জন্য ভারত পাকিস্থানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা ধার দেবে। এই ধার দেওয়া-দেইইর ব্যাপারে লেখাপড়ার কাজও হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু পাকিস্থান হঠাৎ কাশ্মীরে হাঙ্গামা বাধিয়ে বসায় পাকিস্থানকে জব্দ করবার জন্য ভারত সরকার ঐ টাকাটা দিতে নারাজ হলেন। টাকাটা বন্ধ করে যে ভারত সরকার একটা খুব বাহাদুরীর কাজ করেছেন সেটা জাহির করবার জন্য শ্রীজহরলাল এবং সর্দার প্যাটেল মহাউৎসাহে লম্বাই লম্বাই বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন। পাকিস্থান বেশ বেকায়দায় পড়ে গেল, কারণ পাকিস্থানে তখন পর্যন্ত কোন টাকা ছাপবার কলও ছিল না।

তবে মজা হচ্ছে এই যে, টাকা ছাপাবার কল না থাকলেও করাচী এবং লাহোর ব্রাঞ্চে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বহু কোটি টাকা আটকা পড়েছিল। ও টাকাটা সরিয়ে না এনেই জহরলাল এবং প্যাটেল, টাকা না দেবার লম্বাই চওড়াই হাঁকতে লাগলেন। পকিস্থান যখন ধমক দিলে যে টাকাটা না দিলে তাঁরা করাচী এবং লাহোর ব্রাঞ্চ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সব টাকা জোর করে কেড়ে নেবেন, তখন তাঁদের টনক নড়ল। তখনই শুধু অতিবুদ্ধিমানেরা বুঝতে পারলেন যে কাজটা বড়ই কাঁচা হয়ে গেছে। ওভাবে টাকা সংগ্রহ করলে পাকিস্থান আর শোধও করবে না, আর নাকও কাটা যাবে। তাই এখন কি করা যায়! গান্ধীজীকে আবার উপোস করতে হল, শিষ্যদের বদন রক্ষা করবার জন্যই—যাতে সসম্মানে টাকাটা পাকিস্থানকে দিয়ে দেওয়া যায়। টাকা শেষ পর্যন্ত সসম্মানেই পাকিস্থানকে দেওয়া গেল, শিষ্যদের বদনও নিশ্চয়ই রক্ষা পেল, কিন্তু গান্ধীজীকে আর রক্ষা করা গেল না।

দেশ ভাগ করে নিজ হাতে ক্ষমতা আহরণ করতে গিয়েই গান্ধীজী অনেক শত্রু সৃষ্টি করেছিলেন। তারা যখন দেখতে পেল যে তিনিই আবার পাকিস্থানকে খাড়া রাখবার জন্য ঐ সব অনশনের ঢং আরম্ভ করেছেন, তখন দু'চার জনের যে ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করবে তাতে আর আশ্চর্য কি! হতভাগা নাথুরাম গড্‌সে বুঝতে ভুল করল যে গান্ধীজী শুধুই তাঁর অবোধ পুত্র এবং শিষ্যদের বদন রক্ষা করবার জন্যই অনশনের ঢং করেছিলেন—পাকিস্থানকে সাহায্য করবার জন্য কখনই নয়। যাই হোক, গান্ধীজীর পুত্রেরা অবোধ হলেও

অকৃতজ্ঞ ছিল না। তাঁরা শুধু জাঁকজমক করে গান্ধীজীর শ্রাদ্ধই করল তা নয়, গান্ধীজীকে তারা এবার একেবারে দেবতায় পরিণত করে তবে ছাড়ল। সারা ভারতে আজ যত গান্ধীমন্দির তৈরি হয়েছে, অত মন্দির আর কোন একজন দেবতার নামে আছে বলে মনে হয় না। গান্ধীজী হলেন এখন তেত্রিশ কোটি এক নম্বরের দেবতা ; এবং শুধু হিন্দুদেরই নয়, মুসলমানদেরও গান্ধী-মন্দিরে প্রবেশে বাধা নেই।

আরও মজার ব্যাপার এই যে, গান্ধীজীর মৃত্যুর পর জিন্না সাহেবও আর বেশি দিন বেঁচে থাকলেন না। গান্ধীজী মারা যাবার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনিও এন্তেকাল ফরমাইলেন। জিন্না সাহেব অবশ্য পিস্তলের মুখে গণফট হন নি,—তাই নূতন করে আরও বড় শহিদ হবার সুযোগ হরালেন। তিনি মারা গেলেন কোন অজানিত ব্যাধিতে, অতি নির্জনে জিয়ারৎ শৈলাবাসে। জিন্না সাহেবের মরার ব্যাপারটাও বেশ একটু রহস্যজনক এই কারণে যে, পাকিস্থানে সরকারী বা বেসরকারীভাবে তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কথা স্বীকার করা হ'ত না। কলকাতার খবরের কাগজেরা মাঝে মাঝে জিন্না সাহেবের অসুখের বিষয় নানা রকমের খবর ছাপালেও পাকিস্থানের কোন কাগজে সেরকম কোন খবর ছাপা হ'ত না। শুধুমাত্র যেদিন তিনি মারা গেলেন সেই দিনই তাঁর দেশবাসী জান্তে পারল যে তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না এবং তিনি হঠাৎ মারা গেছেন। তাঁর যে ঠিক কি হয়েছিল বা তিনি কি অসুখে মারা গেলেন সে খবর পুরোপুরিভাবে আজও সাধারণের নিকট প্রকাশ করা হয় নি।

যাই হোক, গান্ধী জিন্না মরে বাঁচলেন। বুদ্ধিমানের মত স্বাধীনতার গরমে গরমেই যদি তাঁরা মারা না যেতেন, তাহলে আজ যে তাঁদের কি অবস্থা হ'ত বলা কঠিন। গান্ধীজী মারা যাওয়ায় তাঁর মানসপুত্র ও একমাত্র উত্তরাধিকারী শ্রীজহরলাল হঠাৎ সাবালক হবার রোগে আক্রান্ত হলেন, এবং ভারতের রাজনীতিকে অতি লঘু পর্যায়ে নামিয়ে আন্লেন। সর্দার প্যাটেল যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন জহরলাল তবুও কিছুটা সায়েস্তা ছিলেন, কিছুটা সমঝে চলতেন। কিন্তু সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর পর থেকে তিনি একেবারেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। কতকগুলো ইতর, অপদার্থ, মূর্খ, লোভী এবং ভণ্ড সাগরেদ এবং মোসাহেব জুটিয়ে নিয়ে ভারতের রাজনীতিকে ক্রমেই লঘু থেকে আরও লঘুতর পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ফুর্তিফার্তা আর সেরিমনি থেকে

সেরিমনি উদ্‌যাপনের অবসরে কতগুলো অর্থবিহীন, স্ববিরোধী হাল্কা বোলচাল আজ তাঁর রাজনীতির আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ তাঁর ঔদ্ধত্য সীমাহীন, এই ঔদ্ধত্যের শেষ যে কোথায় বা পরিণামই বা কি, তাও বলা কঠিন। শুধু মনে হয় গান্ধীজীর জীবনটাই হচ্ছে একটা মস্ত ভুল, সারা জীবন তিনি শুধু ভুলই করে গেছেন। জহরলালকে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন হচ্ছে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। পাকিস্থানের রাজনীতিতে জিন্না সাহেবের মৃত্যুতে যে পরিবর্তন হল তা সামান্যই এবং প্রধানত ঐ বড়লাটের প্রাধান্য থেকে প্রধান মন্ত্রীর প্রাধান্য বেড়ে যাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। লিয়াকৎ আলি সাহেব প্রধান মন্ত্রীই ছিলেন, তাঁর ক্ষমতা বেড়ে গেল, আর নাজিমুদ্দিন সাহেব করাচীতে গিয়ে বড়লাট হয়ে বস্‌লেন।

হায়দ্রাবাদ সমস্যার সমাধান

ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে হায়দ্রাবাদই ছিল সবচেয়ে বড় রাজ্য। হায়দ্রাবাদের অধিপতি নিজাম পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি, তাই হায়দ্রাবাদও সহজে বাগ মানতে চাইল না। কিন্তু হায়দ্রাবাদের নিজামের কতকগুলি বিশেষ অসুবিধার কারণ ছিল। হায়দ্রাবাদের অবস্থানটা একেবারেই ভারতের পেটের মধ্যে, কাশ্মীরের মত বহু দেশের সীমানার সাথে সংযোগ ত ছিলই না, এমন কি সীমারেখা সমুদ্র পর্যন্তও ছিল না। আবার হায়দ্রাবাদের নিজাম ছিলেন মুসলমান আর তাঁর প্রজারা প্রায় সবই হিন্দু। ভারত নিজামের সাথে অনেক দর কষাকষি করেছিল, তাকে অনেক তোষামোদও করেছিল, কিন্তু কিছুই হয় নি; নিজাম মোটেই টলেন নি। আপোষের চেষ্টা যখন আর কিছু বাকি নেই, তখন ভয় দেখান শুরু হল, চারিদিকে ভারতীয় জায়গার মধ্য দিয়ে যাতায়াতে অসুবিধার স্থষ্টি করা হল। এইভাবে অনেকদিন ধরে নানা রকম চাপ দেওয়া হতে থাকলেও নিজাম অটলই থাকলেন। শেষে এইভাবে বছর দেড়েক কাটাবার পর ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী একদিন নিজামকে ধরাশায়ী করে ভারতে যোগদানপত্র সই করিয়ে নিলে।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর এই কার্যকলাপ পুলিশ এ্যাকসন নামে অভিহিত করা হয়েছিল,—বাইরের পৃথিবীতেও তাদের এই কাজ নেহাৎ পুলিশ এ্যাকসনের চেয়ে বেশি কিছু মর্যাদা পায় নি। এমন কি পৃথিবীর গার্জিয়ান-স্থানীয় যে সব বড় বড় দেশ আছে, তারাও এ ব্যাপারে বিশেষ নজর দিলে

না। ভারত সরকার কিন্তু ঐ গার্জিয়ানস্থানীয়দের নজর পড়বে এই আতঙ্কে বড়ই কাবু ছিলেন; তাই এত দীর্ঘ দিন পর্যন্ত নিজামকে আর কোন উপায়ে বাগ মানান যায় কিনা তারই চেষ্টা করেছিলেন। যা ভারতের হক পাওনা তা নিতে গেলে বাইরের লোকেরা বাদ সাধবে, এ ধারণা ভারতীয় রাজনীতিকদের মাথায় কি করে ঢুকেছিল জানিনা, তবে গোয়ার ব্যাপারে পরিষ্কারই বুঝা যাচ্ছে যে তাঁদের এই আতঙ্ক এখনও মোটেই কাটে নি। কাশ্মীর রক্ষার জন্ত সৈন্ত প্রেরণ বা হায়দ্রাবাদের পুলিশ এ্যাকশন যাদের জন্ত সম্ভব হয়েছিল, সেই সর্দার প্যাটেল বা অন্ত রাসভারি অকংগ্রেসী নেতারা আজ আর ভারত সরকারে নেই, এবং বোধ হয় সেইজন্তই গোয়া সমস্তার সমাধানও আর হয়ে উঠছে না। গোয়া এখনও খোদার ভরসায় ছাড়া আছে।

কাশ্মীর ও দেশীয় রাজ্য সমস্তার শেষ পরিণাম

হায়দ্রাবাদের সমস্তা সমাধানের সাথে সাথেই ভারতের দেশীয় রাজ্য-সমস্তা শেষ হল বলে ধরে নেওয়া চলে না; কারণ কাশ্মীর সমস্তা এখনও সেই অবস্থাতেই রয়ে গেছে। পরিবর্তনের মধ্যে হয়েছে এক যুদ্ধ-বিরতি। U. N. O.তে মামলা দায়ের হবার পরও বছরখানেক যুদ্ধ চলবার পর U. N. O.র মধ্যস্থতায়, এক সীমারেখা ঠিক করে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষিত হয়েছে। সে যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা এখনও আছে, আশা করা যায় পরেও থাকবে, এবং শেষপর্যন্ত ঐটিই কাশ্মীর বিভাগের লাইনে পরিণত হবে। কাশ্মীর বিভক্ত হলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগের যে প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল এ হচ্ছে তারই দ্বিতীয় পর্যায়; কিন্তু এটাই যে শেষ পর্যায় তারও গ্যারান্টি কেউই দিতে পারে না। ঐ সীমারেখায় কাশ্মীরকে ভাগ করে নেবার এক প্রস্তাব জহরলাল দিয়েই রেখেছেন, পাকিস্থান রাজী হলেই কাজটা পাকাপাকি হতে পারে। কাশ্মীর বিভক্ত হবে, এবং তা' ছাড়া উপায়ও নেই ঠিকই। হয়ত ভারত এবং পাকিস্থানও আরও অনেক টুক্রো টুক্রো হবে, সেদিনেরও বোধ করি আর বেশি দেরি নেই।

লড়াই করে বা আপোষে কাশ্মীরের ব্যাপারটা কোন মতেই কি ফয়সালা করা সম্ভব ছিল না? ভারত ওটা নিয়ে U. N. O.-তে নালিশ দরবার করতে গেল কেন? এই কেনর উত্তর কেউ দিতে পারবেন বলে মনে হয়না, তবে

এটুকু বলতে পারি যে, যেদিন এই কেনর উত্তর প্রকাশ পাবে, সেদিনই শুধু জানা যাবে যে ভারতীয় রাজনীতির দুর্বলতার একটা মূল কোথায়।

[কাশ্মীর সংক্রান্ত ভারতীয় রাজনীতি যে কোন সময়েই সন্দেহজনক অবস্থার উপরে উঠতে পারেনি, সে ত এই লেখাতেই খুবই পরিষ্কারভাবে বুঝান হয়েছে। তবে ব্যাপারটির গোড়ার গলদটি যে কি বা কোথায়, তা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়নি কখনও। কিন্তু এই 'আবোল তাবোল' লেখাটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার মাত্র কয়েকদিন পরেই ঐ গোড়ার গলদের অনেকটাই বেশ পরিষ্কারভাবে প্রকাশ হয়ে গেছে। প্রকাশ হয়েছে, ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীমেহের চাঁদ মহাজনের ঐ বিষয়ে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধের মাধ্যমে। শ্রীমেহের চাঁদ মহাজন দেশ-বিভাগের সময় কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ভারতীয়-কাশ্মীর রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ সব দলিলপত্রই তাঁর হাতে ছিল এবং তিনি নিজেই যে ঐ সময়ের ভারতীয়-কাশ্মীর রাজনীতির অনেক ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাতেও কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তাই তিনি অতি বিস্ময়কর গোপন খবরসহ ভারতীয়-কাশ্মীর রাজনীতির আরও অতি বিস্ময়কর এক চিত্র প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। বিচারপতি মহাজন যেটুকু প্রকাশ করেছেন তার মোট মানেই হচ্ছে যে, তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন সাহেব, যিনি অহিংস রাজনৈতিক কোম্পানীর বন্ধু, দার্শনিক এবং পথ-প্রদর্শক হিসাবেই নিজেকে প্রতিপন্ন করেছিলেন, তিনিই কাশ্মীর যাতে পাকিস্থানে যায় তারই চেষ্টা করেছিলেন; এবং ঐ চেষ্টা করতে গিয়ে কাশ্মীরের মহারাজার উপর নানা রকম চাপও দিয়েছিলেন। এবং তাঁর অসন্তুষ্টি হতে পারে এই ভয়েই ভারতীয় নেতারা কাশ্মীরের ভারতে যোগদান ব্যাপারে মোটেই আগ্রহশীল ছিলেন না। কাশ্মীরের হাঙ্গামাটা U. N. O.-তে নিয়ে উপস্থিত করাও যে ঐ বড়লাট বাহাদুরের বাহাদুরীর ফলেই সম্ভব হয়েছিল, তাও শ্রীমহাজনের প্রবন্ধতেই পরিষ্কার হয়েছে। এই ব্যাপারের উপর নূতন কোন টীকা একান্তই নিষ্প্রয়োজন, কারণ, ভারতীয় রাজনীতিকে যাঁরা বুঝতে চেষ্টা করছেন, তাঁরা বিচারপতি মহাজনের লেখা প্রকাশ হবার আগেই অনেক কিছুই বুঝে নিয়েছেন; আর যাঁরা কিছুই বুঝতে চান না বা বুঝবার ক্ষমতা রাখেন না, তাঁরাও সেইভাবেই চলছেন। চলছেন ঐ জিন্দাবাদ ধ্বনি করতে করতেই।

আর ঐ লেখাটিতে বিচারপতি মহাজন, প্রায়-অতিমানব ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলালের চরিত্রের একটা দিক যেভাবে নগ্ন করে দেখিয়েছেন, সেটিও লেখাটির মূল্যবৃদ্ধিতে কম সাহায্য করেনি। বিচারপতি মহাজন লিখেছেন যে, কাশ্মীর আক্রান্ত হবার পর একান্ত অসহায় অবস্থায় কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তিনি যখন দিল্লী ছুটে এসেছিলেন ভারতের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করবার জন্য, এবং ঐ বাবদই কথাবার্তা বলবার জন্য গিয়েছিলেন শ্রীজহরলালের বাড়িতে, তখন শ্রীজহরলাল তাঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হতে তাঁকে (বিচারপতি মহাজনকে) তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে যেতে আদেশ করেছিলেন। এই আদেশের কথাটিকেও শ্রীমহাজন খুবই সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন "Our Prime Minister, as usual, flared-up and asked me to get out from his room." কথাটি এতই পরিষ্কার এবং সহজবোধ্য যে এর উপরেও টীকা একান্তই নিষ্প্রয়োজন। ভারতের রাজনীতি আজ এইভাবেই চলছে, চলতে থাক্‌বেও, কারণ ভারতের ওকর্ম হয়ে গেছে।]

কাশ্মীরের লড়াই এবং U. N. O. দরবারে ঐ সমস্যাটির পেণ্ডুলামত্ব প্রাপ্তি যে আমাদের—মানে পাকিস্থানী হিন্দুদের পক্ষে এক বিরাট শূলের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা ত বলাই বাহুল্য। এক একবার কাশ্মীরের হিড়িক আরম্ভ হয়, গাজী গাজী শব্দে মিয়ারা লাফিয়ে ওঠে, আর আমরা বাড়িঘর ছেড়ে সীমানা পার হয়ে গাছতলায় আশ্রয় নেই।

এত করবার পরও কিন্তু একটা দেশীয় রাজ্যের মীমাংসা হল না। সেটি রয়েই গেল, ঠিক ভারতের বাইরে না হলেও, ভেতরেও নয়—রক্ষিত রাজ্য হিসাবে রয়ে গেল। সেই রাজ্যটি হচ্ছে সিকিম। ভারত থেকে তিব্বতের রাজধানী লাসা যাওয়ার পথে অবস্থিত। নেপাল বা ভুটানের মত সিকিমের কোন বিশেষ দাবি না থাকা সত্বেও সিকিমকে কেন অন্য সব দেশীয় রাজ্য থেকে পৃথক করে রাখা হল তার কারণ আজপর্যন্তও জানা যায়নি; অবশ্য কেউ হয়ত জানবার চেষ্টাও করেননি। অত ছোট ব্যাপার নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়! তবে সিকিমকে ভারতের মধ্যে মিশিয়ে দিতে হলে পশ্চিম বাংলাতেই দিতে হয়; সেই জন্যই সিকিমের রক্ষিতা পদপ্রাপ্তি কিনা কে জানে!

দেশীয় রাজ্য এবং রাজাদের সব শেষ করে দেওয়া হল ঠিকই, কিন্তু তাই বলে 'যার যথা স্থান' সেখানেই তাদের দেওয়া হলনা। কুচবিহার বা আগরতলা

বাংলায় এলনা, মণিপুর গেলনা আসামে। সরাইকেলা আর খরশোয়ান উড়িষ্যার হলেও গেল বিহারে, রাজপুতনার সিরোহী রাজ্য—যার ভেতরে মাউণ্ট আবু অবস্থিত, রাজপুতনায় না গিয়ে গেল গুজরাটে। আর মধ্যভারতের অসংখ্য দেশীয় রাজ্যগুলো যদিও মধ্যভারতেই থাকল, তবু তাদের থেকে উত্তর-প্রদেশের কাছাকাছি কয়েক সহস্র গ্রাম গেল উত্তর-প্রদেশে,—পুরো একটা রাজ্যকে উদরসাৎ করলে অনেকের চোখে লাগতে পারে, তাই কয়েক সহস্র গ্রামের নামে কয়েক সহস্র বর্গমাইল বৃহৎ উত্তর প্রদেশকে আরও বৃহত্তর করে ফাঁপিয়ে তুলল।

কুচবিহার অবশ্য ভারত সরকারের উদার মনোভাবের পরিচয় দিতে শেষ পর্যন্ত বাংলায়ই এসেছে। আগরতলা আর মণিপুর এখনও ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু সরাইকেলা, খরশোয়ান, সিরোহী বা মধ্য-ভারতের এতগুলো গ্রাম কায়দামত বেকায়দা জায়গায় পৌঁছে গেল কি কারণে? ভারতের নেতারা সবাই অতি মহান আর অতি-মানবের দল,—ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ ভিন্ন তাঁরা আর কিছুই বুঝেন না। ভারতের সভাপতি (তখন কংগ্রেস সভাপতি), প্রধান মন্ত্রী আর সহকারী প্রধান মন্ত্রী এই লুটের বাজারে কিছু ভাগ সংগ্রহ করে তাঁদের নিজেদের প্রদেশের উদর আরও একটু স্ফীত করলেন, এই মাত্র! ব্যাপারটা খুব সামান্যই, তবুও খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ, তাই উল্লেখ করতে হল। রাম মরণশীল, শ্যাম মরণশীল, যদু মরণশীল—এই সামান্য ব্যাপারগুলো জানা ছিল বলেই না 'মনুষ্য মরণশীল' এই মহাসত্যটি আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে! "যত ছোটই হোক না কেন সত্য সত্যই, তাকে উপেক্ষা করলে মহাসত্য জানা আর কখনই সম্ভব হবে না। সর্দার প্যাটেল কর্মীপুরুষ ছিলেন ঠিকই, তাই বলে তিনি ওসব রসে বঞ্চিত ছিলেন একথা আর বলা যায় না।

স্বাধীনতার কাজ-কর্ম

জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে, এমন কি জীবন-আদর্শে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে হবে। ইউরোপ, আমেরিকাকে কদলী দেখিয়ে এগিয়ে যেতে হবে সবার আগে; এই ধরণের প্রতিজ্ঞা নিয়েই ভারতের গঠন কর্ম আরম্ভ করা হল। বৃহৎ কাজ করতে হলেই প্রয়োজন প্ল্যানের, তাই অতি বৃহৎভাবেই প্ল্যান তৈরির কাজ শুরু হল ভারতে। বাজারে কাগজের দর চড়ে গেল। পরিকল্পনা তৈরি হতে থাকল বড় বড় শিল্প গড়ে তোলবার, বড় বড় নদীর উপর

বিরাট বিরাট বাঁধ তৈরি করবার। রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল কিছুই আর বাকি থাকল না। পাঁচ বছরে কত টাকা খরচ হবে তারই ভিত্তিতে প্ল্যান তৈরি হতে থাকল, তাই তার নামও দেওয়া হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। কাজও আরম্ভ হল কিছু কিছু। পরিকল্পনার পরিকল্পনাটা ঠিকমত করে নিতে পারলেই পুরো স্টীমে কাজ শুরু হয়ে যাবে, তাতে আর কোন সন্দেহই থাকল না। সিন্ধ্রির সারের কারখানা আর চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিনের কারখানা ত পরিকল্পনার পরিকল্পনা শেষ হবার আগেই প্রায় শেষ হয়ে গেল। সাধারণ লোক অবাক্‌বিস্ময়ে থ মেরে গেল কাজের বহর দেখে। পাঁচ বছর পরে বাইশ শ' কোটি টাকা খরচ হয়ে গেলে কি যে ব্যাপার হবে ঠিক ধারণাই করতে পারল না। পাকিস্থান অনেক বিষয়েই ভারতের অনেক পেছনে, তাই অতবড় প্ল্যান আঁটবার কায়দা বুঝে উঠতে পারল না, শুধু নিজের সাধ্যমত কিছু কিছু কাজ চালিয়ে যেতে থাকল। কিছু কিছু শিল্প পাকিস্থানেও গড়ে উঠতে লাগল।

উন্নতির কাজ যাতে কোন মতেই ব্যাহত হতে না পারে এবং উন্নতিটা সামগ্রিকভাবেই এবং সবদিকে সমান ভাবেই হতে পারে, তারজন্য অসংখ্য নূতন নূতন আইন পাশ হল। কাজের চাপে আইনসভা হিম্‌সিম্ খেয়ে গেল। শ্রমিকদের রক্ষা এবং উন্নতির জন্য পাশ হল নানারকমের শ্রমিক আইন। মালিকদের জন্যও আইন হল। সামাজিক জীবনকে আধুনিক এবং প্রগতিশীল করে তোলবার জন্য এল হিন্দুকোড বিল, আরও অসংখ্য কত কি! যতসব জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে কনফারেন্সে দিল্লী মুখর হয়ে উঠল, তার রাস্তাঘাট মেছোহাটায় পরিণত হল। আর মিশন বা কমিশনেরও অন্ত থাকল না। শতে শতে বা হাজারে হাজারে ভারত সন্তান মিশন নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণে বের হল। সাংস্কৃতিক মিশন, অর্থনৈতিক মিশন, সামরিক মিশন, কলা মিশন আরও কত রকমের মিশন,—আর কিছু না হোক, অনেকে পৃথিবী ঘুরে বেশ চালাক হয়ে দেশে ফিরে এল। কমিশনও বসল বহু এবং অসংখ্য ধরনের। সব কাজ গুছিয়ে ঠিকমত করতে হলে এসব চাই বইকি। গোড়াপত্তনে যেন ভুল না হয়। এই সঙ্গে দিল্লী আর সারা ভারতে যতসব উৎসবের ব্যবস্থা হতে থাকল সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের উৎসব, দ্বারোৎঘাটন উৎসব, বৃক্ষরোপণ উৎসব এবং আরও হাজারও রকমের উৎসবে দিল্লী শহর এমন মুখরিত হয়ে উঠল যে, মোগল-পাঠান বাদশাহ্‌দের উৎসবের ঐতিহ্য একেবারেই ম্লান হয়ে গেল। জীবনটাকে কত রকমে

উপভোগ করা যায়, সে বিষয়ে মূর্খ মোগল পাঠান বাদশাহদের জ্ঞানই-বা ছিল কতটুকু।

জানিনা, বোধহয় পৃথিবীর অন্য সব স্বাধীন দেশেও গোড়াপত্তনের কাজ আরম্ভ হয়েছিল এইভাবেই। তবে গোড়াপত্তনের কাজ যেভাবেই হয়ে থাকুক না কেন তার পরবর্তী কাজগুলোও যে হয়েছিল, সেত দেশগুলোকে দেখলেই-বুঝতে পারা যায়। ভারতে যে গোড়াপত্তনের পরের কাজ কিছুই হচ্ছে না তাও বলা কঠিন। তবে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, হাজার বছরের পরাধীন বুভুক্ষু লোক সব সস্তা স্বাধীনতা আর ততোধিক সস্তা আমোদ-উৎসবে একটু বেশি মেতে উঠেছে, মাত্রাটা ঠিক রাখতে পারছে না। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে যে পরিশ্রমের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, সে কথাটা আর বিশেষ কারুর মনে নেই। বিনা পরিশ্রমে টাকা রোজগার করবার কথা এবং তার নানা রকম বিজ্ঞানসম্মত উপায় তাদের মাথায় আজ যত সহজে প্রবেশ লাভ করছে, দেশের কথাও তাদের মন থেকে উপে যাচ্ছে তত সহজেই।

একটা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে যে বিরাট ত্যাগ এবং পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, সে ত্যাগ ও পরিশ্রম সম্ভব শুধুই অন্ধ জাতীয়তাবোধের উন্মেষে। "My country uber alles"—আমার দেশ সবার উপরে, এই অহঙ্কারের ভিত্তিতেই। প্রশ্নও হচ্ছে তাই যে, এই জাতীয়তাবোধের উন্মেষে জাতীয় নেতৃত্ব কতখানি সহায়তা করতে পেরেছে? ভারতের এক এবং অদ্বিতীয় নেতা শ্রীজহরলাল নেহেরুকে ত জানি এবং দেখছি এই জাতীয়তাবোধের বিরুদ্ধবাদী হিসাবেই। ইংরেজের কাছ থেকে ক্ষমতা হাতে পেতে না পেতেই তিনি যেভাবে আন্তর্জাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষের সুযোগই বা কোথায়! তিনি ত হামেশাই ছেলে ছোক্‌রাদের উপদেশ দিচ্ছেন, "দেশের চেয়ে পৃথিবীর বিষয় তোমাদের বেশি ভাবতে শিখতে হবে।" তাঁর কার্যকলাপে যা প্রকাশ পাচ্ছে তাতে তাঁকে আর ভারতীয় না বলে 'পৃথিবীয়' বলাই উচিত। আফ্রিকার জঙ্গলে কঙ্গো নদীর তীরে কোন্ পিগ্‌মী জননী হিপোপটেমাসের আক্রমণে নিহত সন্তানকে বুকে নিয়ে অশ্রু বিসর্জন করছেন বা সাহারা মরুভূমির কোন্ মরুস্থানে এক বেদুইন বালক সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের হাতে বন্দী হয়েছে এসব খবর তিনি আজকাল যত ভালভাবে রাখেন, সে তুলনায় তাঁর নিজের শাসনাধীনে যে কত লক্ষ কোটি হতভাগা কত বেঘোরে মারা পড়ছে সে খবর তিনি মোটেই রাখেন না। এটম বোমা আর হাইড্রোজেন বোমার

জুজুর ভয় দেখিয়ে আজ তিনি সবাইকে নায়েস্তা করতে চাচ্ছেন। এটম বোমার যুগে এটা করা চলবে না, ওটা করা ঠিক হবে না, তাঁর এক গৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাগ্যিস তাঁর হাতে একটাও এটম বোমা নেই! বর্তমান ভারতে 'স্বদেশী' কথাটি ত একটি ঐতিহাসিক শব্দমাত্র। দেশের ভেতর যেটুকু জাতীয়তা ছিল, যেটুকু জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হচ্ছিল, যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছিল, সে সব ভেঙ্গে দিয়ে তিনি যে কি করতে চাচ্ছেন, তা তিনিই জানেন।

তিনি ছাড়াও তাঁর প্রেমের বন্ধু কমুনিস্টরা ত আছেনই। যাঁরা যুদ্ধের সময় শ্লোগান চালিয়েছিলেন "জাপানকে রুখতে হবে"। যুদ্ধের পরে যাঁদের শ্লোগান হয়েছিল "পাকিস্থান মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে।" ইংরেজ ভারত ছেড়ে যাবার পর আবার তাঁদেরই শ্লোগান শোনা গেল "এ আজাদী ঝুটা হায়, ভুলো মৎ ভুলো মৎ"। এই ঝুটা আজাদীকে বরবাদ করবার জন্য ঐ ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল থেকেই এঁরা পুরো উদ্যমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি বন্ধ করবার জন্য "স্ট্রাইক", "গো স্লো", "পেন ডাউন," "টুল ডাউন" কতরকমের বৈজ্ঞানিক পন্থাই যে তাঁরা অবলম্বন করেছেন তার আর ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এর চেয়েও সর্বনাশকর কর্ম তাঁরা যা করছেন তা হচ্ছে তাঁদের প্রচারকার্য—কিভাবে ফাঁকি দিয়ে হপ্তা আদায় করা যায়, তারই বিজ্ঞান-সম্মত উপায়। কমুনিস্টদের কল্যাণে তাই আজ শ্রমিক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত কেরাণী অনেকেই বেশ চালাক হয়ে উঠেছে। ভয়ও এইখানেই এত চালাকের সমাবেশের ফলে বিনা কাজেই দেশটা এগিয়ে যাচ্ছেনা ত!

পাকিস্থানে কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবোধটা বেশ জাগ্রত। পাকিস্থানে তৈরি জিনিস পাওয়া গেলে পাকিস্থানীরা সাধারণত বিদেশী জিনিস কেনা পছন্দ করে না। আন্তর্জাতিকতা বিশেষ নেই, যেটুকু আছে তা ঐ আরব বা অন্য মুসলমান দেশগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আন্তর্জাতিক ব্যাপার নিয়ে পাকিস্থানী রাজনীতি খুব কমই মাথা ঘামায়। তবে পাকিস্থানী জাতীয়তার একটা বিশেষ গলদ হচ্ছে এই যে, ভারতের বিরুদ্ধে তাদের জাতীয়তাবোধ যত সহজে জাগ্রত হয়, অন্য কাজে তত তাড়াতাড়ি নয়।

প্রেমিক জহরলাল ও তিব্বতীয় রাজনীতি

অনেক বাজে কথা বলা হল, এবার আবার কাজের কথায় আসা যাক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীতে যে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে তাতে কেবলমাত্র ভারতই খণ্ডিত হয়ে স্বাধীন হয়নি, আরও অনেক দেশে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ইতিমধ্যেই চীনদেশের বহু পুরাতন গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে মহাচীন কমুনিস্টদের কবলিত হয়েছে। ফলে কমুনিস্ট সাম্রাজ্য পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ আকার ধারণ করেছে। চীনে কমুনিস্টদের সরকার বেশ জাঁকিয়ে বসেছে ঠিকই, তবুও পশ্চিমের অনেকগুলো দেশই এখনও চীন সরকারকে স্বাধীন বলে স্বীকার করে নেয়নি। যারা চীনকে স্বাধীন বলে স্বীকার করে নিয়েছে তাদের মধ্যে ভারতই সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান। আসলে কমুনিস্ট চীনকে স্বীকৃতি দিয়ে জাতে তুলে নেওয়াই হচ্ছে ভারতীয় রাজনীতির বর্তমান আমলের সবচেয়ে বড় সাহসিকতাপূর্ণ কাজ। অনেক সময়েই নিজস্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহস দেখাতে না পারলেও নিঃস্বার্থে বা পরার্থে অসীম সাহস দেখাতে স্বাধীন ভারতের নেতারা কখনই পেছপা হন না। তাই অতি দুঃসাহস করেই ভারত সবার আগে কমুনিস্ট চীনকে জাতে তুলে নেবার পর অনেকেই অবশ্য চীনকে স্বীকার না করে পারে নি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেকেই, এমন কি খাস ইংরেজ পর্যন্ত পরে চীনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। মহাচীন আর খণ্ডিত ভারতের বন্ধুত্বও আজ বেশ ঘন হয়েই জমে উঠেছে। চীনের সাথে ভারতের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বহু কালের, কিন্তু বর্তমানকালে স্বার্থের আদান-প্রদান বিশেষ কিছুই নেই বা হবার সম্ভাবনাও খুব কম। তবুও ভারত ঐ চীনের জন্য সব কিছুই করতে প্রস্তুত। তাই বলছিলাম যে ভারত নিঃস্বার্থে বা পরার্থে অনেক কিছুই করবার সাহস রাখে! ভারতের এই সাহসটা যে দুঃসাহস বা অসৎসাহস তাতেও কোন ভুল নেই, এবং ভুল নেই বলেই আজও ভারত ঐ দুঃসাহসের পথে অন্ধ আবেগেই এগিয়ে চলেছে, কোনই পরোয়া করছে না।

চীন-ভারত প্রেমকথা এক অপূর্ব কাহিনী। প্রেমা-প্রেমির ব্যাপারে গান্ধী-শিষ্যদের অপরিপক্ক থাকবার কথা নয়, কিন্তু তবুও নয়া চীনের প্রেমে পড়ে ভারতের নেতা জহরলাল প্রথম প্রথম যে রকম মাতোয়ালা ভাব দেখালেন, সেটাকে সমর্থন করবার মত লোক ভারতে বেশি না থাকলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। ভাল হ'ত এই জন্যেই যে, চীনের প্রেমে ভারত যতখানি মাতাল হয়েছে

চীন ঠিক ততটা হয়নি। চীনের ভারত-প্রেম যে মুসলমানের মুর্গী-প্রেমের মতই ব্যাপার তাও ইতিমধ্যেই খুব ভালভাবেই প্রমাণ হয়ে গেছে ; তবুও যে ভারতের নেশা কাটেনি সেটাই হচ্ছে এই প্রেমের আসল তত্ত্বকথা। প্রেম করতে করতেই চীন ছুরি হাতে ভারতের বুকের উপর এসে পড়বার চেষ্টা করেছে,—তিব্বত দখল করে নিয়েছে। (ইদানীং প্রকাশ পেয়েছে যে, আক্রমণ মারফৎ চীন ভারতের অনেকাংশও দখল করে বসে রয়েছে।)

তিব্বত চীনের সামরিক কর্তৃত্বাধীনে যাবার পরিণাম যে, রাজনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে ভারত এবং পাকিস্থানের পক্ষে কতদূর বিপজ্জনক সে কথা চিন্তা করে দেখবার মত লোক ভারতে আর বেশি গজাচ্ছে না। তাই জহরলাল এখনও হাটে মাঠে বড় বড় লম্বাই চৌড়াই করে বেড়াবার সুযোগ পাচ্ছেন। গজালে জহরলালকে অনেক দিন আগেই গদী ছেড়ে মাঠে নেমে আসতে হ'ত। ভারতের মাথার উপর তিব্বত এমনভাবে অবস্থিত যে, তার উপর যে-কেউ সামরিক কর্তৃত্ব করবে সেই ভারতকে সামরিক দিক থেকে কোণ্‌ঠেসা করে রাখতে পারবে। উত্তর ভারতের সব বড় বড় শহরগুলোই হিমালয়ের ওপারে তিব্বতের সীমানা থেকে ৩৫০ থেকে ৪০০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। এমন কি কলকাতা, টাটানগর বা আসানসোলের মত শিল্প-প্রধান শহরগুলোও তার চেয়ে বেশি দূরে নয়। আধুনিক যন্ত্রযুগে হিমালয়ের বাধারও আর বিশেষ কোন মূল্য নেই, তাই আজ চীনের বিরুদ্ধে ভারতের রক্ষা-ব্যবস্থারও কোন মূল্যই নেই (চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের যে আজ কোন রক্ষা ব্যবস্থা নেই সে ত চীন ভারত আক্রমণ করেই প্রমাণ করেছে, এবং জহরলালও তার অক্ষমতার সাফাই হিসাবে সেই কথাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে)। জহরলাল যে শুধু তিব্বতে চীনকে বাধা দেবার কোন চেষ্টা করেননি তাই নয়, তিনি চীনের তিব্বত দখল মেনে নিয়েছেন। এমনকি, তিব্বতে ভারতের যে সমস্ত সৈন্যসামন্ত ছিল তাদের সরিয়ে এনে ওখানের ভারতীয় সম্পত্তিগুলিও চীনকে দান করে তাঁর চীনা প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

অথচ, তিব্বতের উপর চীনের দাবি আসে কোথা থেকে এ কথাটা ভেবে দেখবার কোন প্রয়োজন তিনি কখনই বোধ করেন নি। এক ঐ মুখ গোল, নাক চ্যাপ্টা, গায়ের রং হলদে বলেই কি তিব্বতের উপর চীনের অধিকার মেনে নিতে হবে নাকি? গায়ের রং আর নাক-মুখের চেহারাই যদি চীনের দাবীর প্রমাণ হয়, তাহলে ত জাপানসুদ্ধ পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়াই চীনের মধ্যে পড়ে।

ভারতের অনেক অংশও চীনেরই প্রাপ্য হয়। তিব্বত দেশটা ত ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, এমন কি, ভাষার দিক থেকেও ভারতের সঙ্গেই ঘনিষ্ট। তিব্বতের ৩০০০ বছরের ইতিহাসে বার তিনেক চীন অবশ্য তিব্বত দখল করে কিছুদিন কিছুদিন রাজত্ব করেছে, ঠিকই। কিন্তু কেবলমাত্র চীনই তিব্বত দখল করে রাজত্ব করেছে, তাও নয়। নেপালও তিব্বত দখল করে রাজত্ব করেছে, যার ফলস্বরূপ তিব্বত নেপালকে এই হালেও বাৎসরিক একটা কর দিত। আর নেপালও ত ঐ নাক চ্যাপ্টার দলের; তবে নেপালেরই বা তিব্বতের উপর দাবী কম হয় কিসে? ভারতের সাথে তিব্বতের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি যোগ ত আছেই। তিব্বতের ভেতরে দুটো বিরাট হিন্দু তীর্থ এখনও রয়েছে। তার উপর ১৯০১ সাল থেকে তিব্বত মোটামুটি ভারতের দখলেই ছিল। তবে জহরলাল এত ভয় পেলেন কেন? তিনি কেন তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্য মেনে নিলেন? অতি অদ্ভুত ব্যাপার, রাজনীতি করা না ত ছেলেখেলা করা! রাজাগিরি করবার সখও আছে, অথচ দেশের স্বার্থে সৈন্য চালনা করবার সাহসও নেই; শুধু বোলচাল আর ইয়ার্কি করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভারতের রাজনীতি আজ এইভাবেই ঠিক পথে যাচ্ছে। তিব্বতের উপর যদি ভারতের কোন দাবীই না থাকৃত তাহলেও দেশ রক্ষার জন্য সামরিক দিক থেকে যখন প্রয়োজন, তখন শুধুমাত্র সেই কারণেই, যে কোন উপায়েই হোক তিব্বতের উপর ভারতের কর্তৃত্ব রাখবার চেষ্টা করা উচিত ছিল। অন্ততপক্ষে তিব্বতে যাতে অন্য কারুর কর্তৃত্ব বজায় থাকৃতে না পারে, তার চেষ্টা করা উচিত ছিল। তিব্বতকে নিরপেক্ষ বেসামরিক এলাকা হিসাবে রাখবার চেষ্টা করা উচিত ছিল। কিন্তু কিছুই হয়নি, হয়েছে শুধুই ইয়ার্কি।

কমুনিস্টদের সঙ্গে শ্রীজহরলালের সাক্ষাৎ কি সম্বন্ধ তা বলা কঠিন, তবে অনেক ক্ষেত্রে বেশ দেখা যায় যে জহরলাল কমুনিস্টদের পাবলিক মিটিংয়ের সমর্থন পাবার ভরসাতেই এক একটা অদ্ভুত পলিসি নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দেন আর কংগ্রেসের ঢোলগোবিন্দরা পরে হাত তুলে সায় জানায়। চীন এবং তিব্বতের রাজনীতি জহরলাল এইভাবেই করে চলেছেন। পররাষ্ট্র ব্যাপারে জহরলাল অতি বিশারদ, তিনি যা করেন তাই হয় অতি পাকা কাজ। প্রচার মারফৎ এই পাকা কাজকে পচিয়ে তুলতেও বেশী দেরি হয় না। ভারতের গত দশ (চৌদ্দ) বৎসরের ইতিহাসই হচ্ছে এইসব অতি পাকা কাজের ইতিহাস।

আর ভারতীয় পররাষ্ট্র রাজনীতিতে ভারতীয় এম্বেসাডারদের ভূমিকা রোমাঞ্চকর গল্পের চেয়েও অদ্ভুত এবং মজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় এম্বেসাডারেরা বিদেশে থেকে কি কাজ করেন সেটা কারুর জানা সম্ভব নয়। তবে তাঁরা যখন বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করবার জন্য ছুটিতে দেশে আসেন তখনই ভারতীয়েরা বুঝতে ভুল করেনা যে তাদের বৈদেশিক দূতেরা ভীষণ পরিশ্রম করে হয়রান হয়ে গেছেন। কমুনিস্ট চীনকে স্বাধীন হিসাবে স্বীকৃতি দেবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন ভারতীয় দূত সেখানে গিয়ে আস্তানা গেড়ে বসেছিলেন। পার্টি টার্টি অনেক দিয়েছেন বা খেয়েছেন, সে ত খবরের কাগজেই পাওয়া যায়, কিন্তু আসলে ভারতীয় স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে তিনি কি কি কাজ করেছিলেন তা জানবার সৌভাগ্য সকলের হয় না। চীন যে তিব্বত আক্রমণ করবার অভিসন্ধি চালাচ্ছে সে বিষয়ে তিনি কি কি খবর ভারত সরকারকে জানিয়েছিলেন? আমেরিকার বুদ্ধিমান বিভাগ ত তিব্বত আক্রান্ত হবার দু'মাস আগেই চীনের ঐ মতলবের কথা ভারত সরকারকে পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। ভারত সরকার আমেরিকার কথায় আস্থা স্থাপন করেন নি কারণ, ভারতের নিজেরই অতি-বুদ্ধিমান দূত যখন সশরীরে চীনে উপস্থিত থেকে খানাপিনা করছেন এবং ঐ বিষয়ে কোন সংবাদ পাঠাননি, তখন আমেরিকার কথায় বিশ্বাস কি! তারপর একদিন যখন সত্যি সত্যিই 'পালে বাঘ পড়িল',—মানে তিব্বত আক্রান্ত হল, তখন অবাক্‌বিস্ময়ে ভারতীয় দূত যে কথা বলেছিলেন সেটা আজ আর অনেকেরই অজানা নয়। তিনি বলেছিলেন যে, অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে চীন কর্তৃক তিব্বত আক্রান্ত হবার ঘোষণা শুনেই তিনি জানতে পেরেছিলেন যে চীনেরা ফাঁকি দিয়ে তাঁর পার্টিতে খানা খেয়ে গেছে। ঐ বিষয়ে তাঁর নিজের কোন সংবাদ ছিল না। অতি সুবোধ বালকের মত কথা। এই সুবোধ বালকদের সম্মুখে রেখেই প্রেমিক জহরলাল দুনিয়াসুদ্ধ প্রেম করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর এই অসংযত প্রেমের দায়িত্ব ভারতবাসীকেই বহন করে বেড়াতে হবে, তিনি আর ক'দিন।

তিব্বত আক্রান্ত হবার ব্যাপারে অবশ্য পাকিস্থানের কিছুই করবার ছিলনা। কারণ, পাকিস্থানের সঙ্গে তিব্বতের সীমারেখার কোন সংযোগ নেই। তবে মনে হয় তিব্বতে ভারত যদি চীনকে বাধা দিতে এগিয়ে যেত তাহলে ঐ ব্যাপারে পাকিস্থানের সাহায্য পেতেও বেশি অসুবিধা হত না। জিন্না সাহেবের পরেও যাঁরা পাকিস্থানে রাজত্ব করছেন বাস্তব বুদ্ধিতে তাঁরা ভারতীয়

নেতাদের চেয়ে অনেকটা এগিয়েই আছেন। তাঁদের আর যে কোন দোষই থাকুক না কেন, পাকিস্থানের স্বার্থ বুঝতে তাঁদের ভুল হয়না। আর তিব্বতে চীনকে বাধা দেবার মত একটা কাজে ভারত যদি পাকিস্থানকে দলে ভিড়াতে পারত, তাহলে ভারত এবং পাকিস্থানের অনেকগুলো ঝগড়া—যেগুলোর ফলে আজ ভারত এবং পাকিস্থান দুজনেই অতলে তলাতে বসেছে—হয়ত মেটান সম্ভব হ'ত। সম্ভব বা অসম্ভব কিছুই করবার চেষ্টা হয়নি; শুধুই সস্তা স্বাধীনতার ক্ষমতায় সস্তা প্রেমের মজা লুটবার চেষ্টা হয়েছে।

ডিভ্যালুয়েশন এবং পাকিস্থানী হিন্দু

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অমৃতময় ফল আরও একটি শীগ্গিরই দেখা দিল ভারত আর পাকিস্থানের সম্মুখে। দিল্লীর লাড্ডুর মতই ওটি খেলেও বিপদ, আর না খেলেও বিপদ। মানে হচ্ছে কিনা, অর্থনীতির বাজারে ইংরেজ লালবাতি জ্বালা থেকে রেহাই পাবার জন্যে তার পাউণ্ড-স্টার্লিংয়ের দর কমিয়ে দিলে। ভারত আর পাকিস্থান উভয়েই অর্থনৈতিক ব্যাপারে ইংরেজের লেজুড়ে বাঁধা, তাই এখন তারা কি করবে? ইংরেজের মহাজন পন্থা অবলম্বন করে তারাও নিজেদের টাকার দর কমিয়ে দেবে, না স্বাধীনভাবে চলবে? যতটুকু সাহস থাকলে ইংরেজের অর্থনীতি থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করা যায়, ততটুকু সাহস মোটেই ছিল না, তাই ভারত তার নিজের টাকার দর কমিয়ে ইংরেজের লেজুড় আরও জোরে আঁকড়ে ধরে থাকল। পাকিস্থান কিন্তু ভারতের গালে চড় মেরে এবার এগিয়ে গেল। পাকিস্থান তার টাকার দর কমাল না। ভারতের টাকার দর কমান আর পাকিস্থানের টাকার দর না-কমান, এর কোন্‌টি যে বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল, তা বিচার করবার মত অর্থনীতির বিদ্যা আমার নেই, অবশ্য কার যে আছে তা আজও জানি না। দেশের মুদ্রামূল্য কমিয়ে বেশি করে মাল বিদেশে চালান করতে পারলেই যে খুব লাভ হয়, একথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করবার মত অর্থনীতিবিদ্‌দের সংখ্যা আজ আর বেশি নেই। বিদেশে মাল চালাবার জন্য যদি একান্তই দর কমাবার প্রয়োজন হয় তবে উৎপাদন-খরচা কমিয়েই করতে হবে, টাকার দর কমিয়ে নয়। আর, বিশেষ করে ভারতের মত কাঁচামাল রপ্তানীকারী দেশের পক্ষে মুদ্রামূল্য কমিয়ে রপ্তানী বৃদ্ধি করবার যুক্তি বোধ হয় আরও দুর্বল। যাই হোক ভারত মুদ্রামূল্য কমাল আর পাকিস্থান কমাল না। এবং পরবর্তী

কয়েক বৎসরের বহির্বাণিজ্যের অবস্থা দেখে মনে হল পাকিস্থানই জিতেছে। কোরিয়ার লড়াইটা অবশ্যই পাকিস্থানের পক্ষে বিশেষ লাভের ব্যাপার হয়েছিল। আরও পরে ১৯৫৬ সালে অবশ্য পাকিস্থানও আবার মুদ্রামূল্য কমিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তাই বলে এটা প্রমাণ হয় না যে ১৯৪৯ সালে মুদ্রামূল্য না কমিয়ে পাকিস্থান খুব ভুল করেছিল।

ভারতীয় মুদ্রার তুলনায় পাকিস্থানের মুদ্রামূল্যের অধোগতির আর যাই কারণ থাকুকনা কেন, সেদিনের মুদ্রামূল্য না-কমান নয়। পাকিস্থানের হিন্দুরা যতদিন পর্যন্ত তাদের টাকা পাকিস্থানেই লগ্নী করবার মত আস্থা ফিরে না পাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ভারতের মুদ্রার তুলনায় পাকিস্থানের মুদ্রার দর কখনই উন্নত হতে পারে না। আর কোরিয়ার যুদ্ধের সময় পাকিস্থান যে বিরাটসংখ্যক বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করতে পেরেছিল, পাকিস্থান তার সদ্ব্যবহারও করেনি। বিবিদের জন্য সাবান, তরল আলতা, কিলিপ, মাথার কাঁটা বা অন্য সব মনোহারী জিনিস কিনেই উড়িয়ে দিয়েছে। মুদ্রামূল্য কমিয়ে ভারত বা না-কমিয়ে পাকিস্থান কে বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল, কিংবা কার বেশি লাভ হয়েছিল, সে আলোচনা আজ মূল্যহীন হলেও, পাকিস্থানের হিন্দুদের পক্ষে ভারত আর পাকিস্থানের ঐ অর্থনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদটা যে কাশ্মীরের লড়াইয়ের মতই আর একটা শূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা চোখ থাকলে যে কেউই দেখতে পায়। টাকা-পয়সা বিনিময়ের এই অসুবিধার জন্য কত হিন্দু যে বাস্তু ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, কত লক্ষ হিন্দু যে সর্বস্বান্ত হয়েছে তার হিসাব রাখে কে! ভারত যে নিজের স্বার্থরক্ষার কথা চিন্তা করেও এই টাকার দর কমাবার ব্যাপারে পাকিস্থানের সাথে কোন পরামর্শ করা দরকার মনে করেনি, তাও আজ আর অজানা নয়। ইতিমধ্যে ভারত যে নয়া পয়সার নূতনত্ব মারফৎ পাকিস্থান থেকে আরও দূরে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে সেটাও অতি নির্বিকারভাবেই (বর্তমানে অবশ্য পাকিস্থানেও ঐ দশমিক মুদ্রার প্রচলন করা হয়েছে)। শুধু পাকিস্থানের অর্থনীতিই যে ভারতের উপর নির্ভরশীল তাও মোটেই নয়, ভারতকেও বহু বহু কোটি টাকার কাঁচা পাট আজও পাকিস্থান থেকে কিনতে হয়। কিন্তু এসব কথা ভাববার মত সিরিয়াস পলিটিক্স ভারতে আজ আর হয় বলে মনে হয়না, তাই।

১৯৪৭ সালের পাঞ্জাবী দাঙ্গার পর ভারত সরকার পূর্ব আর পশ্চিম পাঞ্জাবের মধ্যে লোক-বিনিময় করে নিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করলেন না;

কিন্তু তারপরই তারা এমন এক সেকুলার সতী সেজে বসলেন যে, তাদের আর ছুঁতে পারে কে! সেকুলার ভারতবর্ষে আজ আর লোক-বিনিময়ের কথা উঠতেই পারে না। অথচ পূর্ব আর পশ্চিম বাংলার মধ্যে লোক-বিনিময় করে নিলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ব্যবস্থাটা যে অনেকটাই সোজা হয়ে যেতে পারত, সে কথা চিন্তা করবার প্রয়োজনও ভারতের আর আছে বলে মনে হয় না। পূর্ব আর পশ্চিম বাংলার মধ্যে লোক-বিনিময় আর হতে পারে না। কেন হতে পারে না? এ প্রশ্ন নরম মনের অনেক লোকেরই মনে জাগে, তবে তাদের মন নরম বলেই চিন্তাটি বেশিদূর এগোতে পারে না। পাকিস্থান ত আকারে ইঙ্গিতে জানিয়েই আসছিল যে এটা ধর্মের রাষ্ট্র, বিধর্মীদের স্থান এখানে নেই। বর্তমানে পাকিস্থানের গঠনতন্ত্রে লিখিত-পড়িতভাবেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পাকিস্থান ইস্‌লামিক রাষ্ট্র, মুসলমানরাই শুধু এখানের পুরো নাগরিক অধিকার পাবার অধিকারী। তা সত্ত্বেও ভারত পূর্ব বাংলার হিন্দুদের প্রতি এত বেদরদী কেন? কেনইবা পাকিস্থানের ইস্‌লামিক গঠনতন্ত্র পাস হবার পর হঠাৎ ভারত পাকিস্থান থেকে মাইগ্রেসন নিয়ে ভারতে যাওয়া প্রায় একেবারে বন্ধ করে দিলে? এসব তত্ত্ব ঠিকমত জানতে হলে শুধু রাজনীতির জ্ঞান থাকলেই চলবে না, একটু অর্থনীতিজ্ঞানও থাকা চাই। ভারত আজ পাকিস্থান থেকে যত টাকার পাট বা অন্য সব জিনিস কিনছে তার বদলে সে পাকিস্থানকে কত টাকার কি জিনিস দিচ্ছে? এই তত্ত্বটি জানতে পারলেই ভারতের এসব রাজনীতির ভেতরের ব্যাপারটা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসবে। ভারত প্রতি বৎসর যত টাকার পাট এবং অন্যসব জিনিস পাকিস্থান থেকে কেনে তার এক-চতুর্থাংশ টাকার জিনিসও পাকিস্থানকে বেচে না। তাহলে ভারত এই পাট কি দিয়ে কিনছে, জানেন? পাকিস্থানী হিন্দুদের হুণ্ডির টাকা দিয়ে। এই হুণ্ডি যাওয়ার ফলেই পাকিস্থানী টাকার মূল্য আজ নিম্নগতি! (পাকিস্থানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হবার পরে পাকিস্থান থেকে হুণ্ডি আসা প্রায় বন্ধ হয়েছে, তাই পাকিস্থানের টাকার দরও অনেকটা বেড়ে গেছে)

যদি পাকিস্থানে হিন্দুরা না থাকে, তাহলে ভারতে পাট যাবে কি ভাবে? অন্য সব দেশের সাথে বাণিজ্যে ত ভারতের গণেশের কয়েক বছর থেকেই উল্টো অবস্থা চলছে। তাই পূর্ব বাংলায় হিন্দুদের থাকতেই হবে। পাকিস্থানে বিদায় অভিনন্দনের ফুলের মালা গলায় নিয়েই থাকতে হবে। পাকিস্থান লিখিত-পড়িতভাবে বিদায় অভিনন্দনের মালা দেবার ফলে যাতে হুড়মুড়

করে হিন্দুরা সব চলে আসতে না পারে, মাইগ্রেসন সার্টিফিকেট বন্ধ করবার ব্যবস্থাও হয়েছে সেই কারণেই। জহরলাল পাকা খেলোয়াড়, তাই পৃথিবীর যত অত্যাচারিতের জন্য অশ্রু বিসর্জন করেই তাঁর নিজের দেশবাসীর বিচার-বুদ্ধিকে ভাসিয়ে দিতে চাচ্ছেন। পূর্ব বাংলার হিন্দুরা অনেকেই জানে না যে, জহরলালের কাছে তাদের চেয়ে পাটের মূল্য অনেক বেশি। অন্তত এই একটি ব্যাপারে ভারতের অর্থনীতি পাকিস্থানের উপর টেক্কা দিয়েছে তাতে কোন ভুল নেই। পাকিস্থানও যে ব্যাপারটা কিছুমাত্র বুঝতে পারছে না তাও নয়। সীমানার চোরা ব্যবসা বন্ধ করবার জন্য যে বিরাট চেষ্টা আজ পাকিস্থানে হচ্ছে, সে ভারতের এই উদ্দেশ্যকে বরবাদ করবার জন্যই ; তবুও এই দুরবস্থার সত্যিকারের মূলোৎপাটন করবার কোন চেষ্টাই এখনও সম্ভব হচ্ছে না। ফাঁকি দিয়েই ত সবাই রাজত্ব পেয়েছেন, তাই ফাঁকি দিয়েই চালাতে চাচ্ছন ; কিন্তু ঐ ফাঁকিতেই যে শেষ হতে হবে সেটা কেউই বুঝতে নারাজ।

১৯৫০ সালের দাঙ্গায় 'আদার মেথড' রাজনীতি

১৯৫০ সাল আরম্ভ হতে না হতেই বাঙালী এবার পাঞ্জাবী হয়ে উঠল। বাঙালী মনিষ্টিদের দিয়ে '৪৭ সালে যে কাজ সম্ভব হয় নি, বাঙ্গালীরা এবার তাই আরম্ভ করল। রক্তারক্তি শুরু হল। ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছিল '৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে, খুলনা জেলায় কোন এক গ্রামাঞ্চলে। খুব বড় ধরনের কিছু নয় কিন্তু আতঙ্ক হয়েছিল প্রচুর, যার ফলে হাজারে হাজারে হিন্দু বাড়ি-ঘর ছেড়ে পশ্চিম বাংলার দিকে ছুটতে আরম্ভ করেছিল। কলকাতার খবরের কাগজেরা সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে নি। কাগজের কাটতি বাড়াবার এ হেন সুযোগ ছাড়বার পাত্তর কাগজওয়ালারা মোটেই নন। গরম গরম শিরোনামায় তারা সংবাদগুলি ফলাও করে ছাপতে লাগলেন। পশ্চিম বাংলার অতি ঠাণ্ডারক্ত মুখ্যমন্ত্রীও ঐ ব্যাপার নিয়ে পশ্চিম বাংলার আইন সভায় কিছুটা বাজে কথা বলে বসলেন। বাক্যবাগীশ ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল ত ব্যাপারটাকে খুঁচিয়ে বেশ ঘায়ে পরিণত করে তবে ছাড়লেন। ভারতীয় পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বেশ রসিক-বাক্‌চতুরের মতই তিনি বাক্যবাণে পাকিস্থানকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করলেন। তিনি বল্লেন, "আমার মনে হয় না যে কয়লার অভাবেই পাকিস্থানীরা হিন্দু মেয়েদের উপর বলৎকার আরম্ভ করেছে।" পাকিস্থানে হিন্দু মেয়েদের উপর কখনও কোন অত্যাচার

হয়েছে একথা মনে করবার মত মন তাঁর কোনদিনই ছিলনা বা আজও নেই। তবু বাৎ কি বাৎ, খোঁচা মেরে একটা কথা বলবার সুযোগ হাতছাড়া করবার মত সংযমী আদমী জহরলাল কখনই নন। তাঁর ঐ দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা-বার্তার ফল যে কত সাংঘাতিক হতে পারে সে কথা চিন্তা করবার মত মনের অবস্থাও তাঁর কোন দিনই ছিল না। তিনি ত সদাই আবেশে ঢুলু-ঢুলুভাবেই চলতে অভ্যস্ত কিনা!

এইসব বাঁদরামির ফল ফলতে বেশি দেরিও হল না। কলকাতায় মুসলমান-দের ধরে কুর্দন দেয়া শুরু হয়ে গেল, এবং কাজটি আরম্ভও হল বেশ বৃহৎভাবেই। খুলনায় হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্যই নাকি কলকাতায় এসব কাণ্ড কারখানা। কিন্তু কর্মকর্তারা শুধু হিসাবে একটু ভুল করলেন এই যে, দেশটা যখন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতেই ভাগ করে নেয়া হয়েছে, তখন খুলনার প্রতিশোধ নেওয়া কলকাতায় যেমন সহজ, সেই প্রতিশোধের প্রতিশোধ নেওয়াও খুব কঠিন কিছু নয়। খুলনার প্রতিশোধ কলকাতায় নিলে, সেই প্রতিশোধের যে আবার প্রতিশোধ ঢাকায় নেয়া হবে না, এ গ্যারান্টি কেউই দিতে পারেন না। তাই সেই প্রতিশোধের প্রতিশোধ নিতেও খুব দেরি হল না। ঢাকায়, বরিশালে এবং পূর্ব বাংলার আরও অন্য অনেক জায়গায় আবার হত্যালীলা আরম্ভ হল। স্বাধীনতার গরমে বাঙালী যে বেশ ঐতিহ্যবান হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ ভালভাবেই পাওয়া গেল। লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান পশ্চিম থেকে পূব, আর পূব থেকে পশ্চিমে ছুটাছুটি আরম্ভ করে দিলে।

ব্যাপারটা যখন বেশ বেকায়দা মত হয়ে উঠেছে তখন বেগতিক বুঝে শ্রীজহরলাল দিল্লীর তক্ত ছেড়ে কলকাতার মাটিতে নেমে এলেন। কংগ্রেস-কর্মীদের সাথে ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হলেন, জনসাধারণকে শান্ত হওয়ার জন্য উপদেশও দিলেন। কিন্তু তাঁর স্বভাবই ঐ, কিছু লম্বাই চওড়াই না করে থাকতে পারেন না; তাই পাকিস্থানকে ভয় দেখিয়ে এক হুঙ্কারও ছাড়লেন। পাকিস্থান যদি এই অত্যাচার বন্ধ না করে তবে দেখে নেবেন, —এই ভাব আর কি! তিনি "অন্য পন্থা" (other methods) গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন, একথা বলতেও কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করলেন না। কিন্তু পাকিস্থান ত আর তাঁর খাস তালুকের প্রজা নয় যে তাঁর হুঙ্কারে মূর্চ্ছা যাবে! হুঙ্কারের ফল উল্টোই হল—অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতই। তাই তাঁকে তাঁর হুঙ্কার হজম করেই দিল্লীতে ফিরে যেতে হল। পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলায় হত্যাকাণ্ড

যথাপূর্বং চলতেই থাকল। সবাই ধরে নিলে যে এবার যুদ্ধ অনিবার্য। জহরলাল যখন চটেছেন তখন আর রক্ষা নেই!

কয়েকদিন পরে জহরলাল আবার কলকাতা ফিরে এলেন, তখন তাঁর গরম মেজাজ অনেকটাই নরম হয়ে গেছে। এবার এসে তাই বেশি হুঙ্কার ছাড়লেন না, বরং উল্টো ধরনের কথাবার্তাই বলতে থাকলেন—পশ্চিম বাংলার হিন্দুদেরই বেশি দোষ, এইসব। এখানে ওখানে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসে সমঝে নিলেন যে পাকিস্থানে অত্যাচারটা তত বেশি অমানুষিক হয়নি। অনেক উদ্বাস্তু মেয়েদের গলায় হার এবং হাতে চুড়ি তিনি নিজেই দেখেছেন; তাই মনে হয় না যে পাকিস্থানীরা হিন্দু মেয়েদের সবই লুণ্ঠন করে নিয়েছে। জহরলালের মুখে other methods-এর কথা শুনে যাঁরা আশ্চর্য হয়েছিলেন, তাঁরা এবার তাঁর এই ধরনের কথাবার্তা শুনে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলেন। লোকটা পাগল নাকি, বলে কি! ব্যাপারখানা কিছুই বুঝা গেলনা। অবশ্য বেশি বুঝবারই বা কি আছে? দিল্লীতে জহরলালের গার্জিয়ান মামারা নাকি তাঁকে ডেকে ধমকে দিয়েছেন যে, বেশি বাঁদরামি করলে দুজনের কান ধরে মাথা ঠুকে দেবেন। এর পরও কি আর কিছু করা যায়! হাজার হোক মামারা পূজনীয়, তাঁহাদের অবাধ্য হওয়া কোন মতেই উচিত নয়।

এদিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন হুগলির ছেলেরা একজন অতি বিশিষ্ট এবং পদস্থ ইংরেজকে (President, Bengal Chamber of Commerce) কোতল করে তবে ছাড়ল। ইংরেজের উপর রাগটা তখনও ভালভাবে কাটেনি কিনা, তাই। কিন্তু ইংরেজ সাহেবকে হত্যা করা, এত আর চাট্টিখানি কথা নয়! জহরলাল বেঁচে থাকতে এরকম কখনই হতে দিতে পারেন না। তাই ঐ এক সাহেব কোতল হতেই সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারী ডাকা হল, হাওড়া এবং হুগলীতে 'মার্শাল ল' জারী করা হল। আর হিন্দু মুসলমানের মিলন হতেও বেশি দেরি হলনা। তাই ভাবি, ভাগ্যি ঐ ইংরেজ সাহেবটা সেদিন মরেছিল, তা নাহলে আজ আমি নিজেই যে কোথায় থাকতাম তা কে জানে! ইংরেজের দর স্বাধীন ভারতেও কমে যায়নি। শত শত দেশের লোক যখন মরছিল, আর লক্ষে লক্ষে উচ্ছন্নে যাচ্ছিল, তখন কারও হুঁশ ছিলনা। একটা ইংরেজ মরতেই হুঁশ ফিরে এল। পশ্চিম বাংলায় হুঁশ ফিরে আসতেই পূর্ববাংলায়ও হুঁশ ফিরতে বেশি দেরি হল না। রক্তারক্তি আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগল। এই সুযোগে দিল্লী শহরে বসে ভারতের প্রধান

মন্ত্রী শ্রীজহরলাল আর পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকৎ আলী সাহেব ভারত এবং পাকিস্থানের সর্ব হাঙ্গামা মিটিয়ে এক প্যাক্ট এঁটে বসলেন। ১৯৫০ সালের দাঙ্গা শেষ হল।

১৯৫০ সালের এই দাঙ্গাটা প্রধানত বাঙালী হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হলেও, বাংলার বাইরে কোথাও কোথাও বাঙালীকে নিকেশ করবার জন্যও এই সুযোগটাকে কাজে লাগান হয়েছিল। এই দাঙ্গার সময়ে আসামেও বেশ একটু ছোটখাটর মধ্যে বড় ধরনের রক্তারক্তি লুঠতরাজ হয়েছিল। তবে, আসামের ব্যাপারটাকে যাঁরা পূর্ব-বাংলার হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ বলেই মনে করে নিয়েছেন, তাঁরা খুবই ভুল করেছেন। আসামে যা হয়েছিল তা মোটেই সাম্প্রদায়িক নয়, সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিক ইতরামি। আসামের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলি থেকে বাঙালী মুসলমানদের তাড়িয়ে আসামী-ভাষাপ্রধান এলাকা করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। কাজটা কে বা কারা করিয়েছিলেন তা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝা না গেলেও, কাজটার পেছনে যে ভাল প্ল্যান ছিল এবং কাজটা করাও হয়েছিল বেশ প্ল্যানমাফিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসাম থেকে তাড়ান হয়েছিল শুধুমাত্র বাঙালী মুসলমানদের, আসামী মুসলমানদের নয়। আর এই দাঙ্গার অজুহাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল হাজারে হাজারে বাঙালী হিন্দু ছেলেদের, আসামী দাঙ্গাকারীদের নয়। কারও সর্বনাশ আর কারও পৌষ মাস, আজ এই হচ্ছে ভারতীয় রাজনীতির গোড়ার কথা। অবশ্য আসামীদের এই প্ল্যানটা তখনকার মত খুব যে সফল হয়েছিল, তাও নয়। নেহেরু-লিয়াকৎ আলি প্যাক্টের সুযোগে বিতাড়িত মুসলমানরা আবার প্রায় সবাই আসামে ফিরে গেছেন। কিন্তু আসামী রাজনীতিও অত সহজে ছাড়বার পাত্তর নয়, তারা বাঙালী মুসলমানদের আসামে ফিরতে দিয়েছে ঠিকই—মাত্র একটি শর্তে। এই মুসলমানদের সবাইকে ঘোষণা করতে হয়েছে যে তারা আসামীভাষী—ঘোষণাটি অবশ্য বাংলাতে করলেও আসামীরা বেশি আপত্তি করেনি। রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সম্মুখে এই বাঙালী মুসলমানরাই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছে যে, তাদের মাতৃভাষা আসামী; কারণ, তারা আসামে এসে আসামী মেয়ে বিয়ে করেছে—এবং কমিশনের রেকর্ডে জানা যায় যে একথাগুলিও তারা বাংলা ভাষাতেই বলেছিল।

১৯৫০ সালের দাঙ্গাও শেষ হল এবং নেহেরু-লিয়াকৎ আলি প্যাক্টও হল, সবই ঠিক; কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে হিন্দুদের উদ্বাস্তু হওয়া বন্ধ

হল না। লাখে লাখে তারা চলেইছে, আজও যাচ্ছে। কোন প্রতিকারও নেই,—না পাকিস্থানে, না ভারতে। লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন মরণ নিয়ে এই যে খেলা হল তার জন্য দায়ী কে? এ প্রশ্ন আজ আর নূতন করে তুলবার কোন সার্থকতা নেই। দেশ ভাগ হবার দিনই সে প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে রয়েছে। কিন্তু তবুও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা যায় যে এত ছেলেমানুষির কি প্রয়োজন ছিল! অসংযমী কথাবার্তা, Other method নেয়া হবে বলে ভয় দেখান, এসবের ভবিষ্যৎ ফল যে কি হতে পারে সে বিষয়ে কি জহরলালের কোনই ধারণা ছিলনা নাকি? তাঁর নিজের মেগদার তাঁর জানা না থাক্‌বার কথা ত নয়! স্কুলের নীচু ক্লাসের ছেলেদের মত কথাবার্তা বলা আর মেজাজ দেখালে যে রাজনীতি হয় না, সেকথা জহরলালকে কে বলে দেবে? কলকাতার বন্ধুদের কাছে শুনেছি যে, '৫০এর দাঙ্গার সময় প্রথমবার যখন জহরলাল কলকাতা এলেন তখন প্রকাশ্যভাবেই অনেক জায়গায় বলে বেড়িয়েছেন যে, কয়েক দিনের মধ্যেই পূর্ববাংলায় সৈন্য ঢুকিয়ে দেবেন। আর দ্বিতীয়বার এসে ভিন্ন সুরে কথা বলেছিলেন, "আমাদের নেভির যে রকম অভাব তাতে এখন একটা যুদ্ধের ঝুঁকি নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বিশেষ করে এই জন্য যে পর্তুগীজরা গোয়াতে ওৎ পেতেই বসে আছে।" যাঁরা ঐ সময়ের কলকাতার রাজনীতির খবর রাখেন তাঁরাই জানেন যে, আমি বন্ধুদের কাছে ভুল শুনিনি। জহরলালের নাও (নেভি) ছিল না তাই রক্ষা; থাকৃল কি যে হ'ত বলা কঠিন। থাক্‌লে তিনি নাও না তলিয়ে ছাড়তেন না, সে বিশ্বাস আছে। কিংবা হয়ত নৌকা-বিলাসের আরও একটা নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন, দেখতে পেতাম। আমরা বাঙ্গালরা আর কিছু বুঝি আর নাই বুঝি, ঐ নাও-তলান বিপদটা খুব ভালভাবেই বুঝতে পারি,—নাও তলিয়েই ত আমরা ভেসে বেড়াচ্ছি। নৌকা-বিলাস বস্তুটি যে কি, সেত আজ অনেকেই ভারত আর পাকিস্থানের সরকারী নেতাদের কার্যকলাপ দেখেই আঁচ করতে পারছেন।

১৯৫০ সালের দাঙ্গা অবশ্য ভারতীয় রাজনীতিকে বেশ একটা ধাক্কা না দিয়ে গেল না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ভাঙ্গন ধরল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং ক্ষিতীশ নিয়োগী দু'জন বাঙালী মন্ত্রীই পদত্যাগ করলেন। শ্যামাপ্রসাদ জহরলালের অসংযমী কথাবার্তা এবং কার্যকলাপে বিরক্ত হয়ে তারই প্রতিবাদে মন্ত্রীত্ব ছাড়লেন। ক্ষিতীশবাবু কোন বিবৃতি দেননি, মনে হয়, তিনিও ঐ

কারণেই ছেড়েছিলেন। তবে গুজব শোনা যায় যে, তিনি নাকি তাঁর বিভাগীয় সেক্রেটারীর সাথে এঁটে উঠতে পারছিলেন না,—সেই সেক্রেটারীর উৎপাতও তাঁর পদত্যাগের অন্যতম কারণ ছিল। সেক্রেটারীর উৎপাতে মন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেয়া ব্যাপারটি একমাত্র স্বাধীন ভারতেই সম্ভব। ইদানীং কালের ভারতীয় রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগ, বিরোধী নেতারূপে অভ্যুত্থান, তাঁর জনপ্রিয়তা, এসবই খুব ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যাপার। এই ইঙ্গিতগুলি বুঝতে না পারলে ভারতীয় রাজনীতিকে বুঝা সত্যিই কঠিন হবে। আসলে শ্যামা-প্রসাদের জনপ্রিয়তাই ছিল জহরলালের জন-অপ্রিয়তার মাপকাঠি।

কোরিয়ার লড়াই ও ভারতের বিশ্ব-প্রেস্টিজ

১৯৫০ সালেই হঠাৎ কোরিয়াতে লড়াই শুরু হয়ে আবার দুনিয়া গরম হয়ে উঠল। বিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা মাল পেছনে সরাবার ম্যাজিক খেলা আরম্ভ করতেও দেরি করলেন না। বড় আশা নিয়েই তাঁরা কাজ আরম্ভ করেছিলেন। এবার দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাই তাদের খেলোয়াড়ী মনোভাবের সমঝদারের অভাব হবে না। স্বাধীন ভারতে, এমন কি পাকিস্থানেও যে কালোবাজারীদের নিকটতম আলোর খুঁটিতে ঝোলান হয় না সে ত তাঁরা দেখেইছিলেন। কোরিয়ার লড়াইটা চললও প্রায় বছর দুয়েক, কিন্তু সব দিক থেকে রসটা যেন ঠিক জমে উঠল না। প্রথম থেকেই লড়াইটার কেমন যেন একটা নির্জীব ভাব। পাকিস্থান কিন্তু তার মুদ্রামূল্য না কমানর লাভটা এবার বেশ ভালভাবেই পেয়ে গেল। বিরাট সংখ্যক বৈদেশিক মুদ্রা পাকিস্থানের হাতে এসে পাকিস্থানকে প্রায় ফাঁপিয়ে তুলল। অবশ্য সস্তায় কামাই করা টাকা সস্তায়ই নষ্ট হল, টাকাটা দেশের কোন কাজে লাগল না।

কোরিয়ার লড়াইয়ের সুযোগে ভারত আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে বেশ খানিকটা নাম কিনে ফেললে, যার ফলে ভারতীয় নেতাদের মুখের সম্মুখে আজ দাঁড়ান কঠিন। এই আকাশচুম্বী প্রেস্টিজ, যা কোরিয়ার লড়াই থেকে এসে ভারতের মস্তকে আস্তানা করেছে, তার পরিমাপ করা যার তার কর্ম নয়। সে করবার চেষ্টাও আমি করছি না। তবে লড়াইয়ের ব্যাপারটা জানা থাকলে পরে কাজে লাগতে পারে তাই মোটামুটি বিবৃত করছি।

গত মহাযুদ্ধের শেষপর্যন্ত কোরিয়া দেশটা জাপানের অধিকারেই ছিল। যুদ্ধে জর্মানীর আত্মসমর্পণের পর জাপানের অবস্থা যখন কাহিল, যখন জাপানে

এটম বোমা পড়ে অবস্থা আরও কাহিল হয়েছে,—আমেরিকানরা এসে পড়ল আর কি! সেই সময় রাশিয়া, ১৯০৪ সালে জাপান জারের রাশিয়াকে হারিয়ে দিয়ে যে অপমান করেছিল, তারই প্রতিশোধ নেবার জন্য জাপানের বিরুদ্ধে হঠাৎ যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং হাতের কাছে জাপান-অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া দখল করে কোরিয়াতে এগোতে থাকে। আমেরিকানরা ব্যাপারটার তাৎপর্য বুঝতে ভুল করে না, এবং যথাশীঘ্র কোরিয়াতে তাদের সৈন্য সামন্ত নিয়ে হাজির করে। ফলে ৩৮° অক্ষরেখায় রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে কোরিয়া ভাগাভাগি হয়। দুটো কোরিয়াকে স্বাধীন করে এক কোরিয়া তৈরি করবার চেষ্টা অবশ্য হয়েছিল, কিন্তু সফল হয়নি। তাই উত্তর-কোরিয়া এবং দক্ষিণ-কোরিয়া নামে দুটো সরকার রাশিয়া আর আমেরিকার তাঁবে বিরাজ করছিল! হঠাৎ সুযোগমত কমুনিস্ট উত্তর-কোরিয়া দক্ষিণ-কোরিয়াকে আক্রমণ করে বসল, প্রায় নিয়েই নিলে আর কি! U. N. O.তে নালিশ গেল; এবং আমেরিকার নেতৃত্বে আরও কতকগুলো দেশের সৈন্য এসে উত্তর-কোরিয়াকে বাধা দিলে। যুদ্ধ চলতে থাকল। রাশিয়া কিন্তু নেপথ্যেই থেকে গেল।

কোরিয়ার ব্যাপারটা যখন U.N.O.তে আলোচিত হয়ে উত্তর-কোরিয়াকে বাধা দেবার প্রস্তাব পাস হয়, তখন ভারত প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়নি। দু'দিন না যেতেই কিন্তু অযাচিতভাবেই ভারত U. N. O.কে জানিয়ে দিলে যে সেও ঐ প্রস্তাবের পক্ষে আছে। অথচ অনেক দিন যুদ্ধ চলতে থাকাকালে ভারত সেখানে কোন সৈন্য সাহায্য পাঠায়নি; বরং নানারকমের শান্তিপ্রস্তাব আর ফরমূলা আবিষ্কার করে নিজের বাহাদুরীর প্রচারকার্য চালিয়েছে। ইতিমধ্যে U. N. O.-বাহিনী যখন প্রায় যুদ্ধ শেষ করে এনেছে, উত্তর কোরিয়া দখল প্রায় শেষ, তখন হঠাৎ কয়েক লক্ষ চীনা সৈন্য এসে উত্তর-কোরিয়ার পক্ষে যুদ্ধে লাফিয়ে পড়ে। যুদ্ধের গতি আবার কিছুটা ঘুরে যায়। বহু চীনা এবং উত্তর-কোরিয়ান সৈন্য হতাহত হলেও U. N. O. পক্ষে আমেরিকান সহ অন্যান্য দেশের সৈন্যরাও নেহাৎ কম ঘায়েল হয় না। যুদ্ধে আসল আসামী রাশিয়ার টিকি কিন্তু কোথাও দেখা যায় না। উস্কানি দিয়ে দূর থেকে মালপত্র সরবরাহ করেই রাশিয়া খালাস, যুদ্ধের ধারে কাছেও সে নেই। আমেরিকা তার বিপদ বুঝতে পারে। আপাতত রাশিয়াকে কাছে পাওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ নেই, আর চীনেদের সাথেও একটা বড় রকমের লড়াইতে আটকা পড়বার ইচ্ছাও তার ছিল না, তাই শেষপর্যন্ত এক ভারতীয় ফরমুলার মাধ্যমে

কোরিয়াতে শান্তি স্থাপিত হয়। ভারতীয় রাজনীতিরও জয়জয়কার হয়। নেতিবাচক ভারতীয় রাজনীতি কিছু না করেই এক মহা বাহাদুরী অর্জন করে। এরপর ইন্দোচীনের ভিয়েৎনাম আর ভিয়েৎমীনদের যুদ্ধেও ভারত আরও খানিকটা ঐ ধরনের বাহাদুরী দেখাবার সুযোগ পায়।

পৃথিবীতে কমুনিস্ট আর ডিমোক্রেটিক দল দুটো যতক্ষণ রয়েছে, এবং যতক্ষণ তারা শেষ শক্তিপরীক্ষায় না অবতীর্ণ হচ্ছে, ততক্ষণ তাদের মধ্যে ছোটখাট ঝগড়াগুলো মেটাবার জন্য একজন মধ্যস্থ অবশ্যই চাই। ভারত সেই মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করে দু'পক্ষের ঝগড়া মেটাচ্ছে। বাহাদুরী এতে আছে বই কি! তবে প্রচারকার্যের ফলে ভারতীয় প্রেস্টিজের বেলুন এত ফেঁপে উঠেছে, আর এত উচ্চে বিচরণ করছে যে ভয় হয় হঠাৎ কখন ফেটে মাটিতে না লুটিয়ে পড়ে। আসলে বেলুনটি যে একেবারেই ফাঁপা তাতে ত সন্দেহ করবার কিছুই নেই! সুয়েজ ক্যানেলের রাজনীতিতে ভারতের প্রেস্টিজের বেলুনের ফাট ফাট অবস্থাই দেখা যাচ্ছে। আর কাশ্মীরের উপর U.N.O. ইদানীং নূতন যে প্রস্তাব পাস করেছে, তারপর ভারতের প্রেস্টিজ যে আজ ঠিক কোথায়, তাও বলা কঠিন। তবুও এই প্রেস্টিজের প্রচারকার্যের কিছু কমতি নেই,—হওয়া সম্ভবও নয়, কারণ ঐ রঙীন বেলুন দেখিয়েই যে আজ অনেক দুর্বলতাকে ঢেকে রাখা যাচ্ছে

এই নেতিবাচক পন্থায় বিনা আয়াসে অর্জিত ফাঁপা প্রেস্টিজ আজ ভারতের রাজনীতির কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা বলা কঠিন; কিন্তু যা দেখা যাচ্ছে, তাতে ত মনে হয় যে ঐ ফাঁপা প্রেস্টিজের মোহই আজ ভারতকে পেয়ে বসেছে। এই প্রেস্টিজের বোঝা মাথায় নিয়ে পাগলের মত ধেই ধেই করে নৃত্য করাই বর্তমানে ভারতের রাজনীতির প্রধান এবং প্রায় একমাত্র কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় নেতৃত্ব আজ তাদের কতগুলো রেডিমেড শান্তি ফর্মূলা নিয়েই বিশেষ ব্যস্ত। কোথায় সেটা পুস করে চালাবে তারই চেষ্টায় সব সময় ব্যস্ত থাকেন। আজ তাদের কথায় শোন শুধুই বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক—এটা না হলে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবে, ওটা না হলে বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। আর এটম বোমা বা হাইড্রোজেন বোমার বক্তৃতা। তাদের কথাবার্তায় আজকাল এমন একটা অথরিটি অথরিটি ভাব দেখা দিয়েছে যে, অনেক সময় মনে হয় বিশ্বযুদ্ধের কলকাঠিটি বোধ হয় তাঁদেরই জামার পকেটে রয়েছে,—একবার ছেড়ে দিলেই সব পয়মাল হয়ে যাবে। ভারতীয় নেতারা আজকাল রীতিমত পিস্ মঙ্গারে (peace monger) পরিণত হয়েছেন। কথাটা কিছু ঠাট্টা করে বলা হচ্ছে

না,—বিশ্বশান্তি তাঁরা যে চান সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছুই নেই। তবে শান্তির চেয়েও শান্তি স্থাপনের উপর তাঁদের ঝোঁকটা একটু বেশি। তাই এদিক ওদিক কিছু কিছু ছোট খাট গণ্ডগোল পাকিয়ে না উঠলেও তাঁদের মনে আজ আর শান্তি নেই। গণ্ডগোলই যদি না থাক্‌বে তাহলে তাঁরা শান্তিস্থাপন করে বাহাদুরী কিন্‌বেন কি উপায়ে? নিজেদের দেশের স্বার্থের কথা আজ আর তাঁদের ভাববার সময় নেই। সব স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়েই তাঁরা আজ শান্তি স্থাপন কার্যে মনপ্রাণ উৎসর্গ করে বসে আছেন। ভারতের মূর্খ সাধারণ ত 'কি হনুরে' ভেবেই আহ্লাদে আটখানা। তাদের চোখ ঝলসে গেছে, মন হয়ে গেছে বিকল।

ভারত ও পাকিস্থানের গঠনতন্ত্র

কোরিয়ার লড়াই চলতে থাকা কালেই ভারতীয় গণপরিষদ তাদের গঠনতন্ত্র রচনার কাজ শেষ করে ফেলেছে। গণপরিষদ উঠে গিয়ে সাময়িক আইন-সভায় পরিণত হয়েছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে না হলেও ভারতীয় গঠনতন্ত্র রচনা করতে যে খুব বেশি সময় লাগান হয়েছে তা বলা চলে না। এ বাহাদুরী গণপরিষদ সদস্যরা অবশ্যই দাবি করতে পারেন, বিশেষ করে এইজন্য যে, গঠন-তন্ত্র তৈরি করা শেষ হলেই আবার ভোটের জন্য দেশের মূর্খসাধারণের সম্মুখে এসে দাঁড়াতে হবে, তা জেনেও গণপরিষদের সদস্যরা এতটা সৎসাহস দেখিয়েছেন।

পাকিস্থান এবিষয়ে বেশ নিশ্চিন্তেই চলছিল, হাঁটি হাঁটি পা পা ভাবেই। আর এইভাবেই যে তারা আরও কতকাল কাটিয়ে দিত তাও বলা কঠিন। ইস্কান্দার মির্জা মিলিটারীর লোক, হঠাৎ কোথা থেকে বড়লাট হয়ে এসে যত গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলেন। তাই পাকিস্থানের দ্বিতীয় গণপরিষদ মাত্র বছর খানেকের মধ্যেই ১৯৫৬ সালের প্রথম দিকেই একটা গঠনতন্ত্র পয়দা করে এন্তেকাল হতে বাধ্য হয়েছে। তবুও পাকিস্থানে নূতন ইলেকসনের ব্যাপারটা যে খুব তাড়াতাড়ি হবে সে রকম মনে করবার কোন কারণ এখনও ঘটেনি।

ভারতীয় গঠনতন্ত্র পয়দা করেছে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার অধীনে তিন কিসিমের প্রাদেশিক সরকার (পরে রাজ্য পুনর্গঠনের সময় প্রদেশগুলোকে একই পর্যায়ে আনা হয়েছে, যদিও কতকগুলো কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলও রাখা হয়েছে)। কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ামণি হলেন ভারতের সভাপতি

বা প্রেসিডেন্ট। আর প্রাদেশিক সরকারদের চূড়ায় থাকলেন গভর্ণর, বা হাইকমিশনার। ভারতের সভাপতি নির্বাচিত হবেন আইন-সভাগুলোর সদস্যদের দ্বারা, আর গভর্ণরেরা নির্বাচিত হবেন সভাপতি কর্তৃক। দেশের মূর্খ সাধারণের ব্যাপক ভোটে নির্বাচিত এক আইনসভার ব্যবস্থা থাকল কেন্দ্রে আর প্রথম দুই শ্রেণীর প্রদেশগুলোতে। কেন্দ্র এবং কোন কোন প্রদেশের জন্য উচ্চতর আইন-সভারও ব্যবস্থা থাকল। আইনসভার নির্বাচিত নেতারাই মন্ত্রীসভা গঠন করে কেন্দ্রে বা প্রদেশে শাসনকার্যপরিচালনা করবেন। সভাপতি এবং গভর্ণরেরা কেবল মাত্র সই দেবার মালিক থাকলেন। অন্য সব সভ্য দেশের মতই ভারতেও ন্যায় এবং নিরপেক্ষ বিচারকার্যের জন্য সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। অডিটার জেনারেলের ব্যবস্থাও করা হয়েছে হিসাব পরীক্ষার জন্যই, এবং আরও অনেক কিছুই করা হয়েছে অন্য সব সভ্য দেশের মতই।

গঠনতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, সুশাসনের মাধ্যমে দেশের জনগণকে, জাতিধর্মনির্বিশেষে নিজেদের অগ্রগতির কাজে সমান সুযোগ সুবিধা করে দেওয়াই হচ্ছে ভারতের গঠনতন্ত্রের উদ্দেশ্য। তবে তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থাও করা হয়েছে মাত্র দশ বৎসরের জন্য। আর গঠনতন্ত্রেই ঘোষিত হয়েছে হিন্দি ভাষা হবে ভারতের রাষ্ট্রভাষা, আর "জনগণ মন অধিনায়ক" গানটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত।

যদি ভারতের মত অনগ্রসর দেশের পক্ষে প্রাপ্ত বয়স্কদের ব্যাপক ভোটের গণতন্ত্রের কোন মানে হয়, তাহলে মোটামুটিভাবে বলতে হবে ভারতের গঠনতন্ত্র একরকম ভালই হয়েছে, ভদ্রদেশের উপযোগীই। তবে গণপরিষদের সদস্যরা গঠনতন্ত্র রচনাকালে বক্তৃতা মারফৎ যত বিদ্যাবুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম চিন্তা জাহির করবার চেষ্টা করেছিলেন, ভারতীয় গঠনতন্ত্র যে ঠিক ততখানি সুচিন্তিত হয় নি, তাও ইতিমধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই গঠনতন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজনীয় কতকগুলি ধারাকে বরবাদ করে নূতন নূতন ধারা আমদানি করতে হয়েছে।

পাকিস্থানের গঠনতন্ত্রের ব্যবস্থাও প্রায় ঐ ভারতেরই মত। এক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্থান নামে দুই প্রদেশ। কেন্দ্রের চূড়ামণি প্রেসিডেন্ট আর প্রদেশের মাথা হলেন গভর্ণর। অন্যান্য আর সব ব্যাপারেও প্রায় ভারতেরই মত;—ইলেক্‌সন, মন্ত্রীসভা গঠন ইত্যাদি প্রায় সব ব্যাপারেই। তবে পাকিস্থানের মূল উদ্দেশ্য এবং আরও কয়েকটি ব্যাপারে বিশেষ বিশেষত্ব

আছে, এবং কতকগুলি ব্যাপারে পাকিস্থানের গঠনতন্ত্র ভারতের ঠিক বিপরীত। পাকিস্থানের গঠনতন্ত্রে প্রথমেই পাকিস্থানকে ইসলামিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মূল আদর্শেও আছে ইসলামিক সংস্কৃতি মতে, কোরাণ ও সুন্নার আদর্শে জীবন গঠন করে তোলাই হচ্ছে পাকিস্থানের উদ্দেশ্য। ধর্মকে বাদ দিয়ে পাকিস্থান নয়, তাই জাতিধর্মনির্বিশেষে কথাটা অনেক বিশেষ বিশেষ জায়গায়ই প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে ত পরিষ্কার ভাবেই বলে রাখা হয়েছে যে মুসলমান ভিন্ন অন্য কেউই পাকিস্থানের সভাপতি হতে পারবে না। আর ইলেক্‌সনের ব্যাপারেও একটি অতি অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্থানে ভোটাভুটি হবে পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে, আর পূর্বপাকিস্থানের নির্বাচন হবে যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে। পাকিস্থানের দুই অংশে গঠনতন্ত্রের দুই রকম ব্যবস্থা, আর যাই হোক পাকিস্থানী রাজনীতির সুস্থ অবস্থা ঘোষণা করে না (পরে অবশ্য, পশ্চিম পাকিস্থানেও যুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে)। ইতিপূর্বে গঠনতন্ত্র রচনাকালেই পাকিস্থানী গণপরিষদ আর একটি এমন কাজ করে রেখেছে, যার জন্ত পাকিস্থানকে হয়ত অদূর ভবিষ্যতেই পস্তাতে হবে। পশ্চিম পাকিস্থানের চারিটি প্রদেশকে তারা একরকম জোর করেই একটি প্রদেশে পরিণত করেছে; শুধুই শাসন-কার্যের সুবিধার অজুহাতে। পাকিস্থানের গঠনতন্ত্র যে আধুনিক বা ঠিক গণতন্ত্রসম্মত হয়নি তা বলাই বাহুল্য। গঠনতন্ত্রে অমুসলমানদের যেভাবে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে, তা খুবই আপত্তিজনক। শুধু আপত্তিজনকও নয়, এই দুর্বলতার মধ্যেই হয়ত পাকিস্থানের এক বিরাট বিপদের সম্ভাবনাও রয়ে গেছে। এই ব্যবস্থার ফলে পাকিস্থানের অমুসলমানেরা কখনই তাদের রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা ফিরে পাবে না। তাই আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই যদি ঐ অমুসলমানেরা স্বেচ্ছায় পাকিস্থান ছেড়ে চলে না যায়, বা তাদের চলে যেতে বাধ্য করা না যায়, তাহলে অবশ্যই তারা তাদের ন্যায্য দাবি আদায় করবার চেষ্টা করবে। আর ইতিমধ্যে তাদের পূর্ণ আস্থার অভাব পাকিস্থানের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ভারসাম্য অবশ্যই নষ্ট করবে। হয়ত যে সব শ্লোগানের উপর পাকিস্থান অর্জিত হয়েছে সে সব শ্লোগানের গরম এখনও কাটেনি; তাই গঠনতন্ত্রে এ ধরনের গোঁজামিল দেওয়া ছাড়া আর উপায়ও কিছু ছিল না। তবুও বলতেই হবে যে পাকিস্থানের এই গঠনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্থানী নেতৃত্ব তাদের বিদ্যাবুদ্ধি বা চিন্তাধারার প্রসারতার

যে পরিচয় দিয়েছেন, তা খুব উচ্চ প্রশংসা পাবার যোগ্য নয়। (বর্তমানে পাকিস্থানে সামরিক শাসন চলছে। গঠনতন্ত্র ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে, এবং বেসিক ডেমোক্রেসী নাম দিয়ে এক নূতন ধরণের গণতন্ত্রের গঠনতন্ত্র তৈরীর চেষ্টা হচ্ছে।)

কংগ্রেস সভাপতিত্ব নিয়ে মারামারি

১৯৫১ সাল ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে আর এক দিক থেকেও বেশ খানিকটা উত্তেজনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গঠনতন্ত্র রচিত হয়ে গেছে, তাই ইলেক্সনও শীগগিরই হবে ; এই অবস্থায় কংগ্রেস কার হাতে থাকবে, উত্তেজনা সেই সম্পর্কেই। কংগ্রেস যার হাতে থাকবে, আশা করা যায়, তিনিই বা তাঁর দলবল, আগামীতে সরকারের গদিতে আসীন হবেন। কংগ্রেস সংস্থার উপর শ্রীজহরলালের কোন দিনই বেশি দখল ছিলনা, সর্দার প্যাটেলই ছিলেন কংগ্রেসের আসল মালিক। গান্ধীজীর আশীর্বাদ পেয়ে তাঁর মানসপুত্র সিহাবেই শ্রীজহরলাল প্রধান মন্ত্রীর গদিতে আসীন হয়েছিলেন। গান্ধীজীও আজ আর বেঁচে নেই। কংগ্রেস দখল করতে না পারলে সে গদি হাতছাড়া হওয়াও অসম্ভব নয়, তাই এবারের কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারটা এত বেশি ইজ্জৎ লাভ করেছিল। অথচ, ইতিপূর্বে পট্টভি সীতারামিয়া কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালে, কংগ্রেস সভাপতির অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তিনি দুঃখ করে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন "বর্তমানে কংগ্রেস সভাপতির অবস্থা অনেকটা সংসারে বড়ভাইয়ের বিধবা বৌ-এরই মত।"

কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের হাঙ্গামাটা শ্রীজহরলাল এবং সর্দার প্যাটেলের দলের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ভিন্ন আর কিছুই নয়। কংগ্রেস সভাপতি কে হবেন সর্দার প্যাটেলের মনোনীত প্রার্থী পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন না জহরলালের মনোনীত প্রার্থী আচার্য কৃপালিনী ? ভোটে অবশ্য ট্যাণ্ডন কৃপালিনীকে হারিয়ে দিয়ে নির্বাচিত হলেন, কিন্তু ব্যাপারটা ঐ ভোটাভুটির দ্বারাই মীমাংসা করা গেল না। জহরলাল স্কুলের নীচু ক্লাসের ছেলেদের মতই আবার গালাগালি শুরু করে দিলেন, কোনরকম শালীনতারও ধার ধারলেন না। বয়োজ্যেষ্ঠ সর্দারকেই শেষ পর্যন্ত লজ্জা পেতে হল, তিনিই নীচে নেমে এলেন। জহরলালের কর্তৃত্বে যাতে কোনরকমের অসুবিধা না হয়, সেইভাবেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তৈরি করা হল, পার্লামেন্টারী বোর্ডেও জহরলালের লোকদেরই

বেশি স্থান দেওয়া হল। এইভাবেই জোড়াতালি দিয়ে কোনরকমে কংগ্রেস নেতৃত্বের বদন রক্ষা করা গেল ঠিকই; কিন্তু তবুও শ্রীজহরলালের রাগ গেল না। তারপর হঠাৎ সর্দার প্যাটেল মারা যেতেই সুযোগ বুঝে তিনি পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনকে লাথি মেরে ভূতলশায় করে নিজেই কংগ্রেস সভাপতি হয়ে বসলেন। পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হবার পর থেকে সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর পর তাঁকে লাথি মেরে তাড়িয়ে নিজেই সভাপতি হওয়া পর্যন্ত শ্রীজহরলালের কার্যকলাপ তাঁর চরিত্রের একটা প্রকাশ্য প্রদর্শনী ভিন্ন আর কিছুই নয়। ভারতীয় রাজনীতিকে বুঝতে হলে এসব প্রদর্শনীগুলোর উপর নজর রাখা একান্তই দরকার। সর্দার প্যাটেল ট্যাণ্ডনকে সভাপতি পদের জন্য দাঁড় করিয়ে তাঁকে সমর্থন দেবার জন্য তাঁর ভক্তদের মধ্যে যে আবেদন জানিয়েছিলেন তাতেও শ্রীজহরলাল সম্বন্ধে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কথা ছিল, সেটি হচ্ছে "আমি জহরলালের ছেলেমানুষি বাড়াবাড়িকে সায়েস্তা রাখবার জন্যই ট্যাণ্ডনকে সভাপতি পদের জন্য দাঁড় করিয়েছি" (I set up Tandon to give a check to the childish pranks of Jaharlal)। শ্রীজহরলালের ছেলেমানুষি বাড়াবাড়ি বুঝতে সর্দার প্যাটেল মোটেই ভুল করেননি, তাঁর দেশবাসীরাও ঐ ভুল না করলেই ভাল করতেন।

১৯৫২ সালের ভারতীয় সাধারণ নির্বাচন

১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে স্বাধীন ভারতে প্রথম নির্বাচন হল। কংগ্রেস বাদেও অনেকগুলো দল এবং উপদল নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করল। ভোটাভুটির ব্যাপারটা বেশ নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। ফল বের হবার পর দেখা গেল যে, প্রায় সব জায়গাতেই কংগ্রেস বিপুলভাবে জয়লাভ করেছে। কেন্দ্রীয় আইন সভায় ত কথাই নেই, বড় বড় প্রদেশগুলিতেও কংগ্রেস বেশ ভাল ভাবেই জিতেছে। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, পেপসু, হিমাচল প্রদেশ প্রভৃতি কয়েকটি ছোট জায়গায় কংগ্রেস খুব সুবিধা না করতে পারলেও কোন রকমে কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। পরে ভারতের সভাপতি নির্বাচনেও কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ অতি সহজেই নির্বাচিত হলেন। স্বাধীন ভারতের এই প্রথম নির্বাচনে কংগ্রেস যে বিপুলভাবেই জয়লাভ করবে সে বিষয়ে কারুরই বিশেষ সন্দেহ ছিল না। বরং কংগ্রেস যে বহু প্রদেশে দখলীকৃত আসনের তুলনায় অনেক কম ভোট পেয়েছিল সেটাই সেদিন আশ্চর্যের ব্যাপার

মনে হয়েছিল। আর কংগ্রেসের সৎ এবং সাধু মন্ত্রীরাই বা বহু জায়গায় এরকম অদ্ভুতভাবে হেরে ঢোল হলেন কেন, তাও সাধারণ লোকে সেদিন বুঝতে পারেনি। এমন কি খাস জহরলালের বিরুদ্ধে এক অতি-অচেনা অজানা লোক কি করে যে এত ভোট পেয়েছিলেন তাও কারও বোধগম্যের মধ্যে ছিল না।

ভোট পর্ব শেষ হবার পরে জহরলাল পার্লামেণ্টে কংগ্রেসী দলের নেতা হিসাবে আবার নূতন করে মন্ত্রীত্ব গঠন করলেন,—সর্দার প্যাটেল মারা যাওয়ায় তিনিই ত তখন দুনিয়ার মালিক। নূতন মন্ত্রীসভায় অনেক পুরানো মন্ত্রীই আর স্থান পেলেন না। একজন ত মনের দুঃখে বলেই ফেল্লেন, "আমরা সর্দার প্যাটেলের সঙ্গী ছিলাম, তাই আমাদের বাদ দেয়া হয়েছে।" প্রদেশগুলিতেও নূতন করে মন্ত্রীসভা গঠিত হল, অনেক নূতন নূতন লোক মন্ত্রী হলেন। অনেক জায়গায় ভোটে হেরে যাওয়া মন্ত্রীরাও পশ্চাৎদ্বার দিয়ে এসে স্থান করে নিলেন। দেখতে বিশ্রী হলেও বলবার কিছু নেই, কারণ আইনেই ঐ পশ্চাৎদ্বারের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। কিন্তু একজন ভোটে হারা মন্ত্রীকে যখন পশ্চাৎদ্বার দিয়ে এনে বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসান হল তখন অনেকেই বোকা ব'নে গেলেন। ব্যাপার কি? ব্যাপার কিছুই নয়, রাজনীতিই এই। গুজরাটি কলওয়ালাদের নেতা মোরারজী দেশাই মালদার আদ্‌মী এবং সর্দার প্যাটেলের দলের লোক ছিলেন; জহরলালের কপালগুণে ভোটে হেরে গেছেন। এখন তাঁকে যদি সাহায্য করে নিজের দলে নিয়ে আসা যায় তাহলে আখেরে অনেক লাভ হতে পারে। তাই মোরারজী ভাইয়ের জন্য জহরলাল এটুকু করতে দ্বিধা করলেন না। মোরারজী ভাইও নিমকহারাম ছিলেন না, ক্রমে কংগ্রেসে সর্দার প্যাটেলের দল হিসাবে আর কেউই অবশিষ্ট থাকলেন না—এখন সব জহরলাল। রাজনীতি ঠিক এই জিনিস, যাঁর হাতে ক্ষমতা তিনিই বাদসা, দুনিয়ার মালিক, খোদাতালার প্রেরিত পয়গম্বর—সব কিছু; আর অন্য সব মূর্খসাধারণ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভায় যাঁরা স্থান পেলেন তাঁরা সবাই জহরলালের হাতের লোক, তবুও গণতন্ত্রের সম্মানের জন্যই সব বৃহৎ প্রদেশ থেকেই মন্ত্রী সংগ্রহ করা হয়েছিল। জহরলালের নিজের প্রদেশ উত্তরপ্রদেশ থেকে অবশ্যই অনুপাতের চেয়ে অনেকটাই বেশি মন্ত্রী নেওয়া হয়েছিল। জহরলাল অতি মহান নেতা, সব সময়েই সকল নীচুতার উর্ধ্বে থাকেন তিনি, তাই কিছু ইঙ্গিত করাও উচিত নয়। উত্তর প্রদেশকে ত জনবহুল বিরাটবপু প্রদেশ করে রাখাও হয়েছে।

তবুও মনে হয় আধুনিক উত্তর প্রদেশের শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান যে রকম মহান সে দিকে লক্ষ্য রেখে, আর মন্ত্রীসভা যে কিছু কাজ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হচ্ছে, শুধু পালোয়ানী দেখাবার জন্যই নয়, সে কথাটাও ভেবে জহরলাল যদি বুদ্ধিজীবী প্রদেশগুলি থেকে আরও কিছু বেশী মন্ত্রী সংগ্রহ করতেন, তাহলেও কেউ তাঁর নিন্দা করত না।

যাই হোক আবার কাজ শুরু হল,—যোগ্যতা অনুযায়ীই শুরু হল। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় কি কি করতে হবে তারও চিন্তা আবার নূতন করে শুরু করা হল। পাঁচ বছরের জন্য যখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে তখন একটু সাবধানে ধীরে সুস্থে এগোতে হবে বইকি! কোন্ নদীতে কত কিউসেক জল পাশ করে, ভারতের সবগুলি নদীর জল কাজে লাগাতে পারলে কত লক্ষ কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়া সম্ভব, জাপানি-প্রথায় ধান আবাদ হলে দেশে বছরপ্রতি কত বাড়তি চাল জমা হওয়া সম্ভব—এরকমের সম্ভব এবং অসম্ভব সব কিছুরই হিসাব কষা আবার চলতে থাকল। আর সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে ভারতের প্রেস্টিজ বাড়াবার জন্য সহস্র রকমের মিশন তামাম দুনিয়া চষে বেড়াতে লাগল। বন্ধু-বান্ধবেরা ত মিশন নিয়ে দুনিয়া টহল দিতে গেলই, এমন কি মাঝে মাঝে সরকারী দোষত্রুটি আলোচনা করেন এরকম অনেকেও মিশনারী হবার সৌভাগ্য লাভ করতে থাক্‌লেন। দুনিয়া ঘুরে চালাক হয়ে এসে সবাই সমস্বরে জহরলালের জয়গানে ভারতের আকাশ বাতাস পাগল করে তুল্লেন। ভারতের প্রেস্টিজ নাকি এমন বেড়েছে যে তার তাল সামলান কঠিন। ভারতীয় সংবাদপত্র সংস্থাগুলোর অনেক বুভুক্ষু কর্মীও দুনিয়া ঘুরবার সুযোগ পেয়ে নিজেদের এমন কৃতার্থ বোধ করলেন যে দেশে ফিরে এসে পৃষ্ঠপোষক ভারত সরকারকে কিভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবেন তা বুঝেই উঠতে পারলেন না,—কাগজময় যত সব আবোল তাবোল বাজে কথা লিখতে লাগলেন। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলালও এই দুনিয়া টহল দেবার ব্যাপারে কারও পেছনে থাক্‌লেন না। গড়ে প্রায় প্রতি তিন মাস অন্তর একবার করে বিদেশ ভ্রমণে বের হতে থাক্‌লেন। তিনি যেখানেই যান সেই হয় এক ঐতিহাসিক যাত্রা। পৃথিবীর যত এরোপ্লেন কোম্পানিগুলি কেঁপে উঠতে লাগল; আর ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনকে ত নূতন নূতন লাইনই খুল্‌তে হল।

পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন

১৯৫২ সাল আরও কয়েকটি বিশেষ ঘটনার জন্য ভারত এবং পাকিস্থানের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকবার যোগ্য। এই ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী, পূর্ব-বাংলার রাজধানী ঢাকায় বাংলাভাষা নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে কয়েক ডজন ছাত্র, পুলিশ এবং মিলিটারীর গুলিতে নিহত হন। কয়েক ডজন ছাত্র নিহত হয়েছিলেন বলেই ব্যাপারটা যে খুব মস্ত, বলবার উদ্দেশ্য তা মোটেই নয়,—ভারত আর পাকিস্থানে ডজনে ডজনে লোক গুলি খেয়ে ত হামেশাই মারা যাচ্ছে। ব্যাপারটা মস্ত এই কারণে যে, এই ২১শে ফেব্রুরারী পূর্ব-বাংলার ছাত্রেরা তাঁদের মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে বুকের রক্ত দিয়ে যে প্রশ্ন তুলে বসলে, সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে ভারত এবং পাকিস্থানের ভবিষ্যতের অনেক কিছু। ফাঁকা রাজনৈতিক চালবাজীর একতাই বড়, না সত্যিকারের অগ্রগতির চেষ্টাটাই বড়? মাতৃভাষাকে ক্ষুণ্ণ করে মাতৃভূমির তথাকথিত একতা রক্ষা করা সম্ভব কি না, সেটাও নির্ধারিত হবে ওই প্রশ্নের উত্তরেই। বোলচাল আর মিথ্যা বাক্যের তুবড়ীবাজিতে আর বিভ্রান্ত করা যাবে না সত্যকে; ভোলান যাবেনা বাঙালীকে তার গর্বের মাতৃভাষা। এই হচ্ছে ঐ ২১শে ফেব্রুয়ারীর লিখন। এ লিখনের পাঠোদ্ধার কে করতে পেরেছে, আর কে পারেনি, জানি না। কিন্তু এ যে প্রতিদিনই মূর্ত্ত্য হয়ে উঠছে, আবছা থেকে পরিষ্কারের রূপ নিচ্ছে, সে ত অনুভব করছি প্রতি মুহূর্তেই।

ভারতীয় গঠনতন্ত্রে যদিও অনেকগুলি প্রাদেশিক ভাষাকেই জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে এবং হিন্দির বিশেষত্ব শুধুই অন্ত প্রাদেশিক ভাষা হিসাবেই, তবুও ছলে বলে কৌশলে আজ ভারতে হিন্দিকেই একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসাবে চালাবার এবং অন্য ভাষাগুলিকে ধ্বংস করবার যে এক অদ্ভুত প্রয়াস দেখা যাচ্ছে, তা আজ আর কারুর বুঝতে বেশি অসুবিধা নেই। ঠিক এইভাবেই পাকিস্থানেও অন্য সব ভাষাকে শেষ করে দিয়ে এক উর্দু ভাষাকেই চালাবার অপপ্রয়াস চলছিল। আর ঐ ২১শে ফেব্রুয়ারীর রক্তদানও ছিল ঐ প্রয়াসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রক্তস্নানের পথেই বাংলাভাষা আজ পাকিস্থানে তার নিজ স্থান অধিকার করেছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতেও যে বাংলা এবং অন্য শক্তিশালী ভাষাগুলি এইভাবেই নিজেদের আত্মরক্ষায় এগিয়ে আসবে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার মত মূর্খ দেশে

যত কম থাকে ততই ভাল। রক্তস্নানের পথ যে ভারতেও প্রয়োজন হবে না তাও বলা যায় না, হয়ত ভারতকেও ঐ পথেই যেতে হবে (ভাষা নিয়ে রক্তারক্তি ভারতেও শুরু হয়ে গেছে। গত ১৯শে মে (১৯৬১) শিলচরে ঐ বাংলা ভাষার জন্যই পুলিশ এবং মিলিটারীর গুলিতে এগার জন হত এবং বহু আহত হয়েছে।) শুধু এইটুকুই আজ বলা যায় যে, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তাই হবে, তাতে কেউই পেছপা হবে না। মাতৃভাষা ভোলানো সহজ কথা নয়, বিশেষ করে সেই ভাষায় যদি গর্ব করবার মত কিছু থাকে। বাংলা ভাষার গর্ব করবার মত অনেক কিছুই আছে, আর আছে ঐ ২১শে ফেব্রুয়ারীর নিহত ছেলেদের রক্ত।

পূর্ব-বাংলার এই ভাষা আন্দোলন কবে থেকে, কোথায়, কিভাবে বা কার দ্বারা আরম্ভ হয়েছিল, সেবিষয়ে খুব পরিষ্কার ধারণা অনেকেরই নেই। কারণ কোন আন্দোলনকে বুঝতে হলে বা জানতে হলে লোকে সাধারণত যে দিকে তাকায় সে হচ্ছে ঐ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ (Middle class intelligentsia)। তাদের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করতে কেউ দেখেনি। বরং পাকিস্থান হবার পর পূর্ব-বাংলার এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ মুসলমানী ভাষা হিসাবে উর্দুকেই যে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিতে হবে, সেত প্রায় একরকম মেনেই নিয়েছিল। তারা তাদের খানদানী মুসলমান প্রমাণ করবার জন্য উর্দু ভাষাকে রপ্ত করবার ফিকিরেই ছিল। যার ফলে পাকিস্থানের বাঙালী মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মধ্যে বাপ, মা, দিদি শব্দগুলো উঠে গিয়ে আব্বা, আম্মা, আপ্পায় পরিণত হয়েছে। আরও বহু অবান্তর উর্দু শব্দও আজকাল যত্র তত্র এবং হামেশাই তাদের ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে। তাই বলছিলাম যে অনেকেই বুঝতে পারেনি কিভাবে এই প্রচণ্ড বিদ্রোহ গড়ে উঠল। কিভাবে এই আন্দোলন এত শক্তি সঞ্চয় করল, এই শক্তির মূল কোথায়! শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী বা সরকারী চাকুরিয়ার দল কি চান বা না চান, বা তাঁরা নেতৃত্ব করবার জন্য এগিয়ে না আসলেও যে আরও নীচু থেকে আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, সে কথাটা আমিও কখনও বিশ্বাস করতাম না, যদি না পূর্ববাংলার এই বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেতাম। ঐ আন্দোলনের চাপ এসেছিল আরও নীচু থেকে। যাঁরা পাকিস্থানের নামে বাঙালীর উপর উর্দু ভাষাকে চালাবার ইয়ার্কিটা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না, তাঁদের কাছ থেকেই এসেছিল এ চাপ। আর ছাত্রসমাজ যাঁরা সেদিন মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারছিলেন যে মাতৃভাষা ছাড়বার বিপদ কতখানি, তাঁরাই করেছিলেন

এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব। এই আন্দোলনের সত্যিকারের নেতৃত্ব ছিল ঐ ছাত্রদের হাতেই, আর কারুর হাতে নয়। স্কুলের শিক্ষক, কলেজের অধ্যাপক এবং অন্য সব শিক্ষাব্রতীদের একটা অতি বৃহৎ অংশের অন্তরের আশীর্বাদ নিয়েই ছেলেরা তাঁদের শক্তিকে সংহত করতে পেরেছিলেন, তাতেও কোন ভুল নেই। তবুও এই বিদ্রোহ ঐ ছাত্রদেরই, একমাত্র তাঁদেরই, অন্য কারুর নয়। অনেক রাজনৈতিক নেতা অবশ্য পরে আন্দোলনটাকে নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন, অনেক হাঁক-ডাক করে অনেক মায়া-কান্না কেঁদে নিজেদের ভিত্তি পাকা করবার চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু কিছুই সুবিধা হয় নি। পূর্ব-বাংলার রাজনীতি আজ যাঁরা বুঝতে চেষ্টা করছেন, তাঁরাই জানেন যে পূর্ব-বাংলায় আজ মুসলিম লীগের নেতৃত্ব নেই, আওয়ামী লীগেরও নয়। পূর্ব-বাংলার নেতৃত্ব আজ ঐ ছাত্র এবং ঐ দিনের ছাত্র-নেতাদেরই হাতে। এ নেতৃত্ব রক্ষা করতে আরও অনেক রক্ত দানের প্রয়োজন হয়ত এখনও শেষ হয়নি, তবে পূর্ব-বাংলার ছেলেরা দেশকে, মাতৃভাষাকে রক্ত দিয়েই এবার ভাল বেসেছে ; ভরসার কথাও তাই।

লিয়াকৎ আলী সাহেবের মৃত্যু

নিজেদের দেশে যখনই কোন গোলমাল পাকিয়ে ওঠে, তাল সামলান কঠিন হয়, পাকিস্থানী রাজনীতি তখনই একটি মোক্ষম দাওয়াই ব্যবহার করেন। সেটি হচ্ছে ভারতের বিরুদ্ধে গালিগালাজ। দাওয়াইটি যে অব্যর্থ ফলপ্রদ তা বহুবার প্রমাণ হয়েছে। তবে ইদানীং দাওয়াইটি ক্রমেই অকেজো হয়ে উঠেছে, তাতেও বিশেষ সন্দেহ নেই। ভারতীয় নেতারা এসব ব্যাপারে অনেক চালাক, তাই তাঁরা আগে থাকৃতেই এসব রোগের প্রতিকারের জন্য অনেক প্ল্যান বাৎলে রেখেছেন। আর তাঁদের আন্তর্জাতিক প্রেস্টীজ ক্রমেই যেরকম উর্দ্ধ :থেকে আরও উর্দ্ধে বিচরণ করতে শুরু করেছে তাতে সাধারণ রোগ আর বিশেষ তাঁদের কাছে নাগাল পাচ্ছে না। রোগের ভয় ভারত আর বেশি করেনা, ভয় যা একটু ঐ প্রেস্টিজ চাপা পড়ে মরবার। তবে আর যাই হোক, ভারত সাধারণত পাকিস্থানকে গালাগালি করে কোন কাজ উদ্ধার করবার চেষ্টা করে না। (তবে ইদানীং ভারতীয় নেতারাও গালাগালির আসরে নেমে পড়েছেন এবং প্রায় পুরোপুরি ভাবেই।)

তাই ভাষা আন্দোলন এবং আরও নানা গোলমাল যখন পাকিস্থানকে

বেশ ঘায়েল করে আনল, পাকিস্থান তার বহু-পুরাতন এবং পরীক্ষিত দাওয়াই চালাল। আবার ভারত এবং পাকিস্থান বেশ গরম হয়ে উঠল। পাকিস্থানের উজিরে আজম লিয়াকৎ আলী সাহেব গরমটা জমাবার উদ্দেশ্যে বেশ ঘুষি বাগিয়েই চলতে থাকলেন। প্রকাশ্য জনসভায় ভারতের উদ্দেশ্যে ঘুষি ছুঁড়ে মারলেন,—না তিনি পাগল হননি! অতি সুস্থ মস্তিষ্কেই এসব করতে লাগলেন। মূর্খ সাধারণও আবার ভেড়া ব'নে ঘাস চিবোতে আরম্ভ করল। মাঝে মাঝে ভারত আর পাকিস্থানে এই ধরণের যে বচসা বা এই ধরনের অন্য যা কিছু হয় তাতে দোষের কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। ভারত এবং পাকিস্থানের নেতারা অতি নির্দোষ আনন্দ উপভোগের জন্যই এসব করে থাকেন। তবে মজা হচ্ছে এই যে, পূর্ব-বাংলার কাপুরুষ হিন্দুগুলো প্রতিবারই এই ইয়ার্কি মসকরাটা আরম্ভ হতে না হতেই চাট্টি বাট্টি বেঁধে, ঘর বাড়ি ফেলে পশ্চিমবাংলার দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করে। এবারও সেই দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হয়ে গেল।

অবস্থাটা যখন ঠিক এইরকম, তখন একদিন হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে, পাকিস্থানের উজিরে-আজম লিয়াকৎ আলি সাহেব জনসভায় বক্তৃতা করবার সময় এক আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। লিয়াকত আলি সাহেবের মৃত্যুরহস্য আজও কিছুই জানা যায়নি, এবং বোধ হয় আর কোনদিনই জানাও যাবে না। তাঁর আততায়ী ধরা পড়েছিল, কিন্তু পাকিস্থানী পুলিশ আর লিয়াকৎ আলি সাহেবের ভক্তেরা, তাদের রক্তের গরম দেখাতে গিয়ে তাকে সেইখানেই শেষ করে দিয়েছে,—আর ঐ হত্যার রহস্য জানবার আশাও ঐ সাথেই লুপ্ত হয়ে গেছে। লিয়াকৎ আলী সাহেবের মৃত্যুতে কিন্তু পাকিস্থানের রাজনীতিতে বিশেষ কোন তারতম্য দেখা গেল না। শুধু নাজিমুদ্দিন সাহেব বড়লাটগিরি ছেড়ে এসে প্রধান মন্ত্রী হলেন আর রাজস্বমন্ত্রী গোলাম মহম্মদ গিয়ে বসলেন বড়লাটের গদিতে।

ভারত পাকিস্থান পাসপোর্ট

এই বছরেই (১৯৫২) অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যাতায়াতের বাধা সৃষ্টি করবার জন্যই পাসপোর্ট প্রথা প্রচলিত করা হল। পৃথিবীর প্রায় সব স্বাধীন দেশের মধ্যেই যাতায়াতের ব্যাপারে পাসপোর্টের ব্যবস্থা আছে। আমরাও যখন স্বাধীন হয়েছি তখন আমাদেরই বা থাকবে না কেন! হাজার লোক ভারতে আর পাকিস্থান ত দুটো স্বাধীন দেশ, তাই

পাসপোর্ট দরকার! এখন আমাদের কলকাতা যেতে হলে পাসপোর্ট আর ভিসা নিয়ে যেতে হয়, এর চেয়ে স্বাধীনতার গর্ব আর কি হতে পারে! শুধু আমরা ভুলে গেলাম যে পৃথিবীর অন্য দুটো দেশের সম্পর্ক আর ভারত এবং পাকিস্থানের সম্পর্ক ঠিক এক রকমের নয়। অল্প কয়েক দিন আগে কাগজে দেখেছি জার্মানী আর ফ্রান্স তাদের নিজেদের মধ্যে যাতায়াতের ব্যাপারে পাসপোর্ট তুলে দিয়েছে, তাই নিরাশ হবার মত কিছু কারণও দেখছি না।

পাসপোর্ট চালু করবার ব্যাপারে অবশ্য পাকিস্থানই অগ্রণী হয়ে কাজ শুরু করে আর ভারত সেই সুযোগ গ্রহণ করে। এই প্রথা চালু হওয়ায় পাকিস্থানের কি সুবিধা হয়েছে জানি না; তবে কিছু কিছু অসুবিধা যে হয়েছে তা বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না। ভারতের কিন্তু এ ব্যাপারে লাভ হয়েছে অনেকভাবেই। যাতায়াতে এই বাধা সৃষ্টি হবার আগে পাকিস্থানের হিন্দুরা যেরকম ইচ্ছেমত ভারতে পলায়নের সুবিধা পেত, আজ আর সে সুবিধা নেই। এই অবাঞ্ছিতদের আটকাবার পক্ষে ব্যাপারটা খুবই সুবিধাজনক হয়েছে। উদ্বাস্তুদের যে বিরাট বোঝা ভারতের স্কন্ধে ভর করছিল, সেটা লাঘব হয়ে এসেছে,—এখন মাইগ্রেসন সার্টিফিকেট না পেলে কেউই আর উদ্বাস্তু হতে পারছে না। বর্তমানে সে মাইগ্রেসন সার্টিফিকেটও বন্ধ করা হয়েছে। মোটকথা, এপ্রথা চালু হবার ফলে ভারতের লাভ আর পাকিস্থানের লোকসান যাই হোক না কেন পূর্ব-বাংলার হিন্দুদের সর্বনাশ হয়েছে। অবশ্য তাদের জন্য ভাববার দায় ত আর ভারত বা পাকিস্থানের নয়, সাহারা মরুভূমির বেদুইনরা হয়ত আজ তাদের কথা কিছু ভাবতে পারে।

শ্রীরামালু ও অন্ধ্র রাজ্য আন্দোলন

ইতিমধ্যে ভারতেও ঐ ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনার মতই এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। ঘটেছে অন্ধ্রদেশে শ্রীরামালুর আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে। আগেই বলা হয়েছে যে, দেশ স্বাধীন হলে কি কি জিনিস পয়দা করা হবে, সে বিষয়ে কংগ্রেসী নেতারা বহু ফিরিস্তি জাহির করে বসেছিলেন। ঐ সব ফিরিস্তির মধ্যেই একটা ছিল, ভাষাকে ভিত্তি করে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলিকে পুনর্গঠন করা হবে। কিন্তু যখন আইনত দেশ স্বাধীন হল, এবং কংগ্রেসী সত্যবাদীরা গদিতে আসীন হলেন, তখন তাঁদের

ভাবগতিক দেখে আর সন্দেহ থাকল না যে, অন্য অনেক পূর্ব-অঙ্গীকারের মতই এই ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের কাজটিও তাঁরা আর করতে চান না। প্রদেশগুলি সব ভাষাভিত্তিক হয়ে উঠলে, বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি মিটে গেলে, রাষ্ট্রভাষা হিন্দিকে চালু করা খুব সহজ হবে না,—ভয়টা বোধ হয় এইখানেই। হিন্দির প্রাধান্য যদি খর্ব হয় তবে উত্তর প্রদেশের একচেটে কর্তৃত্ব গতাসু হতেও খুব বেশি দেরি হবে না। এই কারণেই বোধ হয় নানা রকমের টালবাহনা আরম্ভ হল। আবিষ্কার হতে থাকল নানারকমের আজগুবি থিওরী। বৃহত্তর ভারতের স্বার্থ আর ঐক্যের চীৎকার শুরু হল। নানারকমের কমিটি কমিশনের নীচে পুরো পাঁচ বছর প্রশ্নটিকে চাপা দিয়ে রাখা হল। কিন্তু ভবী ভুলবার নয়, তাই শেষ পর্যন্ত কিছুই চাপা থাকল না। মাদ্রাজ থেকে পৃথক করে বৃহৎ অন্ধ্ররাজ্য গঠন করবার দাবিতে অন্ধ্র নেতা শ্রীরামালু অনশন আরম্ভ করলেন, তবুও দিল্লীর বাদশাহদের টনক নড়ল না। তাঁরা যতসব ফাজিল কথার আড়ালে লুকিয়ে পাশ কাটাবার তালে থাকলেন। অবশেষে একদিন যখন শ্রীরামালু মারা গেলেন আর বিক্ষুব্ধ অন্ধ্রবাসীরা মার চড়াল, তখন তাদের ঘুম ভাঙ্গল এবং জেগে উঠেই, মাত্র একদিনের মধ্যে, অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনকার্য সমাধা করে তবে ছাড়লেন। প্রমাণ হল মূর্খস্য লাঠ্যৌষধির মত দাওয়াই আর নেই, ওই দাওয়াইতেই তাঁরা নীরোগ হন, তাঁদের বুদ্ধিও খোলে।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবি আদায় করে অন্ধ্রের জনগণ আবার নূতন করে তথাকথিত জাতীয় নেতৃত্বের মুখোস খুলে দিলেন। ঢাকার ২১শে ফেব্রুয়ারীর লিখনের মতই আর এক লিখন রেখে গেলেন শ্রীরামালু তাঁর রক্তের বিনিময়ে। সে লিখনের মর্ম অনুধাবন করবার মত সাধারণ মানুষ যে আজও ভারতের নেতৃত্বে বিশেষ নেই, সেও ভারতীয় নেতৃত্বের আরও পরবর্তী কার্যকলাপ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কার্যেও যে শ্রীরামালুর আত্মত্যাগের ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করবার চেষ্টা হয়েছে তাও অতি সুস্পষ্ট। তবুও জানি এ লিখন রক্তের লিখন, তাই ব্যর্থ হবার কোন উপায় নেই, হয়ত আরও অনেক রক্তের প্রয়োজন আছে। যদি তাই হয়, তবে সে রক্তও যে আসবে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। রক্তের পথেই যে ভারতে সকল ভণ্ডামির অবসান হবে, তা ত প্রায় দিনের আলোর মতই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ১৯৫২ সাল ভারত এবং পাকিস্থানের

ইতিহাসে বহু বছদিন পর্যন্ত এক বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকবে; এই দুটি বিশেষ ঘটনার জন্যই।

উজিরে আজম নাজিমুদ্দিন সাহেব বিতাড়িত

১৯৫৩ সাল আরম্ভ হতে না হতেই আবার ভারত আর পাকিস্থানে নূতনতর রাজনীতির খেলা শুরু হল। পাকিস্থানের বড়লাট গোলাম মহম্মদ প্রায় বিনা কৈফিয়তেই প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেবকে বরখাস্ত করে দিলেন। নূতন প্রধান মন্ত্রী হলেন আমাদের বিশেষ পরিচিত মহম্মদ আলি সাহেব, যিনি এতদিন আমেরিকাতে পাকিস্থানের এম্বেসাডার ছিলেন। নাজিমুদ্দিন সাহেবের বরখাস্তের কারণ অবশ্যই একটা দেখান হয়েছিল ;— দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থার অধঃপতন। তবে সেটা শুধুই একটা কৈফিয়ৎ ভিন্ন আর কিছুই নয়। আর যাই হোক, এতদিন পাকিস্থান তবুও একটা গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে ছিল, এবার বড়লাট বাহাদুরের এই কার্যটি তাকে যে কোন্ নিরুদ্দেশের পথে এগিয়ে নিয়ে চল্লে, তা বলা কঠিন। সে পথের শেষ যে কোথায় তা আজও জানা যায় নি, তবে সে পথ যে গণতন্ত্রের পথ নয়, তাও খুবই পরিষ্কার। এই ধরণের কাজ কারবার একবার চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে আরম্ভ করলে, আবার ঐ আইনের পথে ফিরে আসা যে খুবই কঠিন, তাও জানা কথা। পাকিস্থানের রাজনীতির এই নূতন পথের দিকে দৃষ্টি রেখেই আজ পাকিস্থান রাজনীতিকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। তবে বর্তমানে 'পাকিস্থানে গঠনতন্ত্র রচনার কাজ শেষ হয়েছে, এইটুকুই যা ভরসা।

কাশ্মীরের নূতন সমস্যা ও শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু

পাকিস্থানের রাজনীতি যখন এই অদ্ভুত অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়েই ভারতীয় রাজনীতিও একটা খুবই বিপদসঙ্কুল পথে এগিয়ে চলেছিল। এই বিপদের সঙ্কেত জানাতে গিয়েই ভারতীয় পার্লামেণ্টের বিরোধী দলের নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। অনেকদিন থেকেই চক্ষুষ্মান সকল মূর্খের কাছেই ব্যাপারটা ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসছিল যে, ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের নূতন বাদশা সেখ আবদুল্লা বিতাড়িত মহারাজার মতই এক খোয়াব দেখছেন। যে

খোয়াবের মূল ছবিই হচ্ছে কিনা স্বাধীন কাশ্মীর। কাশ্মীরের অবস্থান যে বৃহৎ সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই লোভনীয়, এবং এই কারণেই কাশ্মীরের উপর বৃহৎ শক্তিদের সুনজর থাকাও বিশেষ আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। তাই সুযোগ বুঝে যদি কাশ্মীরকে স্বাধীন ঘোষণা করা যায়, তাহলে কিরকম হয়! বোধহয় সেখ আবদুল্লা এই কি রকম হয় কথাটাই ভাবছিলেন, যা তাঁর কার্যকলাপে ক্রমেই প্রকাশ পাচ্ছিল। যে মহারাজা কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তি পত্র সই করবার মালিক ছিলেন, তাঁকে ত বন্ধু জহরলালের সাহায্যে বেশ সহজভাবেই লাথি মারা গেছে। পূর্বে লড়াইয়ে সাহায্যের জন্য মহারাজা যে ভারতভুক্তি পত্র সই করেছিলেন, তাও ভারত সরকার অতি বুদ্ধিবলে পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করেননি! এই অবস্থায় কথাবার্তা বলে বাইরে থেকে যদি সাহায্যের ভরসা পাওয়া যায়, তাহলে স্বাধীনতা ঘোষণায় আর অসুবিধা কি! সেখ আবদুল্লা এই রকমই ভাবছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ এবং অন্যান্য সব বিরোধী নেতারা সাধারণ মূর্খদের মতই সেখজীর এই সব খোয়াবী কার্যকলাপ বুঝতে ভুল করেননি। বহুবার তাঁরা এই বিষয়ে সাবধান বাণীও উচ্চারণ করে জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের জ্ঞানোদয় হয় নি। কি করে হবে, সেখজী যে জহরলালজীর মিতা লোক। আর বাজে লোকদের কথায় কাজ করলে কি প্রেস্টিজ থাকে! এই সব কারণেই কিছুই করা সম্ভব হয়নি, এবং তাই কাশ্মীরকে স্বাধীন ঘোষণা করবার কাজও বেশ নিশ্চিন্তেই এগিয়ে যাচ্ছিল।

ব্যাপারটা যখন বেশ ঘোরাল হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাগ মানান প্রায় অসাধ্য আর কি; সেই অবস্থায় কাশ্মীরের প্রজাপরিষদ এবং ভারতের জনসংঘ এবং হিন্দু মহাসভাওয়ালারা সত্যাগ্রহ নামে একটা গণ্ডগোলের পথ নিলেন। উদ্দেশ্য ছিল বোধহয় ভারতীয় জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিন্তু মূর্খকে উপদেশ দিতে গেলে যে অবস্থা হয় এ ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম হল না। জহরলাল কিছুই বুঝলেন না, শুধুই ক্রুদ্ধ হলেন। তাই শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে যাবেন সংবাদ পেয়ে বন্ধু আবদুল্লাকে শ্যামাপ্রসাদকে সায়েস্তা করবার পরামর্শ দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বিলেত রওনা হয়ে গেলেন রাণীর করোনেশন উৎসবে ফূর্তি করতে। শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরের সীমানায় প্রবেশ করামাত্র গ্রেপ্তার হলেন; পরে কয়েক-দিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আর উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে

তাঁর মারা যেতেও বেশি দেরি হল না। সারা ভারতময় হৈ হৈ শুরু হয়ে গেল, অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন তুলল; দাবি জানাল শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুরহস্য ভেদ করবার জন্য এন্‌কোয়ারী কমিশন বসান হ'ক। জহরলাল কিন্তু নির্বিকারই থাকলেন। সবেমাত্র করোনেশনের আনন্দ উপভোগ করে দেশে ফিরেছেন, যত বাজে কথায় কান দিয়ে আবেশটা কাটিয়ে ফেলতে নারাজ। তাই কিছুই হল না। না শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুরহস্য ভেদ, না আবদুল্লা সাহেবের মতিগতির হিসাব। এন্‌কোয়ারী কমিশন অবশ্য বসান সম্ভব ছিল না, কারণ শ্যামাপ্রসাদকে বেআইনী গ্রেপ্তারের পরামর্শ যে ভারত সরকারই দিয়েছিলেন, সেটা এতই পরিষ্কার ছিল যে, কোন মতেই চাপা দেয়া সম্ভব ছিল না।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে ভারতের কি ক্ষতি হয়েছে জানিনা; বোধহয় বিশেষ কিছুই নয়। ভারতীয় রাজনীতি আজকাল যেমন দেখছি তাতে মনে হয় শ্যামাপ্রসাদ কোন্ ছার চল্লিশ কোটি ভারতবাসী নিকেশ হয়ে এক জহরলাল বেঁচে থাকলেই সে রাজনীতি কৃতার্থ হয়ে যাবে। তবে আমাদের, মানে পাকিস্থানী হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা ভারতে গেছেন বা যাবার প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন, তাঁদের কাছে শ্যামাপ্রসাসের মৃত্যু এক অপূরণীয় ক্ষতি হিসাবেই দেখা দিয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে পাকিস্থানী হিন্দুদের জন্য যতটুকু দরদ ভারত দেখিয়েছে তা ঐ এক শ্যামাপ্রসাদের জন্যই। পাকিস্থানী হিন্দুদের নিশ্চয়ই ভারত বা শ্যামাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে থাকা উচিত নয়; তবুও ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে যখন হচ্ছে তখন তাকিয়ে না থেকেই বা উপায় কি! আর ভারতের কংগ্রেসী সরকারের পক্ষে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ত লটারীতে টাকা পাওয়ার মতই এক লাভের কারণ হয়েছে। পার্লামেন্টে এবং বাইরে বিরোধিতা দুর্বল হয়েছে, উদ্বাস্তুদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার অবাধ সুযোগ হয়েছে। আজ মাইগ্রেসন সার্টিফিকেট বন্ধ করে দিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আসা বন্ধ করে দিলেও বাধা দেবার কেউ নেই। জহরলাল বা তাঁর সাগরেদরা চুপে চাপে হরির লুট দিয়েছিলেন কিনা তা অবশ্য জানা যায় নি, তবে স্বস্তির নিশ্বাস যে ছেড়েছিলেন তাতে কোন ভুল নেই। এক শ্যামাপ্রসাদ অতবড় খানদানী কংগ্রেসী সরকারকে যতখানি কাবু রাখতেন, সে অতি অদ্ভুত ব্যাপার। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এ ধরণের নজির আছে কিনা, জানা নেই। এ ব্যাপারটি অবশ্য সম্ভব হ'ত এই জন্যেই যে ঐ কংগ্রেস এবং জহরলালের খানদানী ব্যাপারটা ছিল একেবারেই ফাঁপাবস্তু।

তাই তাঁদের সায়েস্তা রাখতে এক শ্যামাপ্রসাদই ছিলেন যথেষ্ট। শ্যামাপ্রসাদের জনপ্রিয়তাই ছিল জহরলালের জন অপ্রিয়তার মাপকাঠি।

যাইহোক, শ্যামাপ্রসাদ মরায় আপাতত জহরলাল বাঁচলেন ঠিকই, কিন্তু মিতা আবদুল্লাকে আর বাঁচাতে পারলেন না। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আবদুল্লা সাহেবের খোয়াবের ব্যাপারটা কংগ্রেসী অন্যসব নেতাদেরও বুঝতে বাকি থাকল না। রফি আমেদ কিদোয়াই সাহেবের মত এক-আধজন সত্যিকারের পুরুষ তখনও কংগ্রেসে ছিলেন ; তাই তাঁরই নেতৃত্বে কংগ্রেসীদের একদল জহরলালকে সোজাকথা মোটাভাবেই বলে দিলেন, "আবদুল্লাকে কণ্ট্রোলে রাখতে না পারত নিজেই গদী ছেড়ে বিদেয় হও।" কিন্তু জহরলাল ত আর গদি ছাড়তে পারেন না, তবে 'এ অভাগা দেশের হইবে কি'! তাই শেষ পর্যন্ত বন্ধু আবদুল্লাকেই গদি ছাড়ালেন। আবদুল্লা সাহেব জেলে স্থান পেলেন। কাশ্মীরের রাজনীতির নূতন ছক তৈরী হল।

কুম্ভমেলায় শ্রীজহরলালের বিশ্বরূপ প্রদর্শন

১৯৫৪ সাল আরম্ভ হতেই সারা বাংলা জুড়ে হৈ হল্লা শুরু হল। পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচনের, আর পশ্চিম বাংলায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে, তারই হৈ হল্লা। সেবার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল কল্যাণীতে। এন্তার ফূর্তির ব্যবস্থা ছিল। নাচ, গান, ডন, কুস্তি, প্রদর্শনী, বায়স্কোপ কিছুই বাদ ছিল না। মজা দেখতে আমিও গিয়েছিলাম। কংগ্রেসে অনেক প্রস্তাবও নিশ্চয়ই পাশ হয়েছিল, কারণ কংগ্রেসের অধিবেশনগুলি ত সবই ঐতিহাসিক ব্যাপার, তাই কতকগুলি প্রস্তাব পাস না হলে, রেকর্ড থাকবে কি করে! যাইহোক গল্প যেটা বলতে যাচ্ছি তা ঐ কংগ্রেসেরও নয় কলকাতা বা কল্যাণীরও নয়, একেবারে জহরলালের দেশ খাস এলাহাবাদের।

কল্যাণী কংগ্রেসের কয়েকদিন পরেই এলাহাবাদে ছিল বিরাট কুম্ভমেলার আয়োজন। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ হলেও ধর্মরাষ্ট্র নয়, সে হচ্ছে সেকুলার, নামে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু এই সেকুলার সরকার আর সরকারওয়ালাদেরও মাঝে মাঝে ঐ ধর্মের ব্যাপার নিয়েও বেশ বাড়াবাড়ি করতে দেখা যায়। ঐ কুম্ভমেলার ব্যাপারেও বেশ একটু বাড়াবাড়িই দেখা গিয়েছিল সেবার। প্রত্যেক কুম্ভমেলাতেই অবশ্য সরকার থেকে অনেক রকম ব্যবস্থা করা হয়,

অনেক টাকাও খরচ করতে হয়। তবে এবারের ব্যবস্থাটা একটু বিশেষ হয়েছিল; তাই লিখবার মত গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীজহরলাল নিজেই কয়েকবার ঐ মেলার ব্যবস্থা যাতে ঠিক মত হয় তার তদারক করে গেলেন। কল্যাণীতে আসবার পথে এবং বোধহয় ফেরবার পথেও কুম্ভমেলার ব্যবস্থা পরিদর্শন করতে ভুল করলেন না। বশংবদ খবরের কাগজগুলো অনেক ছবি ছেপে কৃতার্থ হলেন, আর কুম্ভমেলার প্রচার কার্য হল একশোগুণ। হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে লোক ছুটল কুম্ভমেলার মজা দেখতে। ভারতের সভাপতি, প্রধান মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সরকারী কর্ণধারেরা প্রায় সবাই সেখানে হাজির হলেন নানা উদ্দেশ্যে—কুম্ভমেলায় আরও বেশী লোক জমাবার তালটাই বোধহয় ছিল প্রধান। কম করেও নাকি চল্লিশ লক্ষ লোক জমায়েৎ হল মেলা ক্ষেত্রে, ঐ শুভদিনে। তারপর এলাহাবাদের মত ছোট শহরে, অত লোকের ভিড় হলে যা হওয়া স্বাভাবিক, হলও তাই। ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে হাজার তিনেক লোক পায়ের তলে চেপ্টে গিয়ে স্বর্গলাভ করল। চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে মাত্র হাজার তিনেক মরলেই বা কি আর থাকলেই বা কি; তাই সে প্রশ্নও নয়। প্রশ্ন হচ্ছে যে সেকুলার, মানে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে, সরকারী পর্যায়ে এ সব হুজুগ তোলার মানে কি? চল্লিশ লক্ষ লোক মাথা প্রতি গড়ে দশ টাকা করে যদি মেলায় খরচা করে, তাহলে শ্রীজহরলালের নিজ জেলা এবং নির্বাচন কেন্দ্রের ব্যবসায়ীরা চার কোটি টাকার ব্যবসা করতে পারবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটুকু অর্থনীতি শ্রীজহরলাল বুঝেন জানি, কিন্তু ঐ অর্থনীতির জন্যই কি একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সরকারী পর্যায়ে ঐ হুজুগ তোলা উচিত কর্ম বিবেচিত হচ্ছে নাকি! বুঝিনা এ আবার কোন ধরণের ইয়ার্কি। যাকগে, ও সব ইয়ার্কি না বুঝলেও চলবে। তবে 'যে শেষ কথাটাই দামী' সেটা এখনও বলা হয় নি। কুম্ভমেলার শেষ কথাটি হচ্ছে এই যে, সেদিন যখন তিন হাজার ভারতবাসী সরকারী অপদার্থতা, অকর্মণ্যতা বা দুষ্কর্মণ্যতার জন্য বেঘোরে মারা পড়ল, তাদের মৃতদেহগুলো সৎকার করা ত দূরের কথা, তখনও খুঁজে বের করাই হয়নি। সেই সময়ে মানে সেই অসময়ে, এলাহাবাদের লাটভবনে সপারিষদ বাদশাহ শ্রীজহরলাল কি করছিলেন, সে খবরও অনেকেরই অজানা নয়। তবুও বলছি, তিনি সে সময় নাচ-গান, খানা-পিনায় মত্ত হয়ে আবেশে ঢুলু ঢুলু অবস্থায়

একটু ইয়ে মানে মৌজ করছিলেন। ব্যাপারটা খুব সামান্যই; ভারতের কপালে আজকাল এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটছে। তবুও উল্লেখ করতে হল এই জন্যেই যে, শ্রীজহরলাল আর তাঁর সাগ্‌রেদদের ভেতরটা জানতে এটা একটা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যাপার। বেলা আটটায় যখন এই দুর্ঘটনা ঘটে তখন শ্রীজহরলাল মেলাতেই ছিলেন। বেলা চারটে পর্যন্ত তিনি হতাহতদের কি হল একবার খোঁজ করাও দরকার মনে করেন নি। আর চারটে বাজতেই প্রোগ্রাম-মাফিক নাচ, গানা আর আনুষঙ্গিক প্রমোদে মত্ত হয়েছিলেন। ফুর্তির প্রোগ্রাম ত আর বন্ধ করা যায় না; তিনি ত ফুর্তি লুটতেই জন্মেছেন কিনা! পৃথিবীর কোন সভ্য বা মানুষের দেশের সরকারী নেতারা ভুলেও যদি এরকম কিছু করতেন, তাহলে তাঁদের দেশের সাধারণ মানুষ তাঁদের কি করতেন আমি কল্পনাও করে উঠতে পারিনা। তবে এটুকু বিশ্বাস করি যে, তাঁরা নিজেরাই লজ্জায় আত্মহত্যা করতেন। শুধু মনে হয়, কয়েক সহস্র হতাহত মানুষ সম্মুখে পড়ে রয়েছে, তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়নি, সৎকারেরও নয়; আর অন্য কতকগুলো মানুষ কিনা সেখানে বসে খানাপিনা করে ফুর্তি জমাচ্ছে! এরা কি সত্যই মানুষ? কৈ, একটা লোককে বাস চাপা পড়তে দেখলে ত আমার আপনার এ ভুল হয় না। মুখ থেকে দুঃখসূচক আঃ-হাঃ-হাঃ শব্দটি আপনা হতেই বেরিয়ে আসে! গোঁজামিল দিয়ে নয়, শ্রীজহরলালের মুখের লম্বাই চৌড়াই শুনে নয়, অন্য কে কোথায় শ্রীজহরলালকে সৎচরিত্রের সার্টিফিকেট দিলে তা দেখেও নয়, কুম্ভমেলার এই সত্য ছবিটি দেখেই শ্রীজহরলালকে জানতে হবে। তবেই শুধু জানা যাবে ভারতের রাজনীতি আজ কোথায়, কত উর্ধ্বে! একটা কৈফিয়ৎ অবশ্যই দেয়া হয়েছিল—শয়তানের অজুহাতের অভাব হয় না—সেই ধরণেরই। তাঁরা নাকি ফুর্তি ফার্তা আরম্ভ করবার আগে পর্যন্ত ঐ দুর্ঘটনার কথা জানতেই পারেননি। জানি না আসল দোষটা না এই কৈফিয়ৎটা, কোনটা বেশি সাংঘাতিক। বেলা আটটায় ঘটনা হল এলাহাবাদে, বেলা একটায় কলকাতার খবরের কাগজগুলো বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করল ঐ দুর্ঘটনার, আর বেলা চারটে পর্যন্ত এলাহাবাদের লাট-ভবনে এ সংবাদ পৌঁছেনি। এই যদি সত্যি অবস্থা হয়, তাহলে শ্রীজহরলাল আজও সরকারী স্কন্ধে বসে রয়েছেন কি উদ্দেশ্যে? ভারতকে বেচে দিয়ে শেষ আমোদটুকু করে নেবার জন্যেই কি?

১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলার সাধারণ নির্বাচন

ইসলাম ধর্মে যেমন মূর্তি পূজার স্থান নেই, পাকিস্থানেও সেই রকমই এই ধরণের ব্যক্তি-পূজার বিশেষ স্থান নেই। গান্ধীইজিমের অতি-মানববাদের থিওরী মুসলমানদের উপর কোন দিনই বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। পাকিস্থানীরা কার্যকলাপ দেখেই তাদের নেতাদের বিচার করে, অন্য লোকের সার্টিফিকেট দেখে নয়, আর তাদের লম্বাই চৌড়াই বক্তৃতা শুনে ত নয়ই। পাকিস্থানী জনসাধারণও দরিদ্র, মুর্খ বা অজ্ঞ যতই হোক না কেন বর্তমান ভারতের জনসাধারণদের মত নির্বোধ বা ক্লীব হয়ে যায়নি। শ্রীজহরলালের পরে কি হবে এই ধরণের ভীষণ চিন্তা আজও পাকিস্থানী জনসাধারণকে ব্যস্ত করে তুলতে পারেনি। পাকিস্থানী জনসাধারণ যে নির্বোধ বা ক্লীব নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ঐ বছরেই পূর্ব-বাংলার সাধারণ নির্বাচনে।

১৯৫৪ সালের প্রথমেই নির্বাচনের তারিখ ঠিক হয়েছিল, তার জন্য সবদিক থেকে প্রস্তুতিও চলছিল। ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগ দল, ভারতের কংগ্রেস দলেরই মত পাকিস্থান অর্জন করবার গর্বে অন্ধ হয়েই বসেছিল। টাকা ছাড়লেই ভোট পাওয়া যায় সেবিষয়েও তাদের কোন সন্দেহই ছিল না। তপশিলী হিন্দুদের মধ্যে তপশিলী ফেডারেশন দলটিও তাদেরই সঙ্গে ছিল। বিরুদ্ধ পক্ষে মুসলমানদের সকল দল এক জোট হয়ে তৈরি করেছিল এক যুক্ত ফ্রন্ট। আর কংগ্রেস এবং অন্য কয়েকটি ছোট দলও হিন্দুদের মধ্যে বিরোধী দলে ছিল।

কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে এবার নির্বাচনে দাঁড়াবার সখ আমারও হয়েছিল। মনোনয়নের জন্য চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ দাদারা কেউই দেশ সেবার মহান কাজ থেকে সরে দাঁড়াতে রাজী ছিলেন না, ফলে মনোনয়ন লাভ করা সম্ভব হয়নি। দাদাদের অনেকেরই ত ঐ এম. এল, এ.-গিরির মাইনে দিয়ে সাংসারিক বাজেটের ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়; বিশেষ জোরে দাবি করবার উপায়ও ছিলনা সেই জন্যই। যাই হোক, নিজে মনোনয়ন পেলাম না বলেই ত আর বসে থাকা যায় না, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতেই ত আমার মত মুর্খেরা জন্মগ্রহণ করেছে। তপশিলি আসনগুলির জন্য আমাদের কংগ্রেসের বিশেষ মাথা-ব্যথা ছিল না। শুধু বর্ণহিন্দু আসন কটি নিয়েই তাঁদের মারামারি। তাই একজন

তপশিলী হিন্দুকে নিজেই মনোনয়ন দিয়ে রংপুর থেকে দাঁড় করিয়ে দিলাম। তারপর শুরু হল রংপুরের এমাথা থেকে ওমাথা চষে বেড়ান, শুধুই ভোট আর ভোট। সত্যিকথা বলতে কি, এই ভোট ব্যাপারে বের হয়েই মফঃস্বল এলাকা-গুলির স্বরূপ আবার দেখতে পেলাম। কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মফস্বলে যাতায়াত, পাকিস্থান হবার পর এই প্রথম। এই নির্বাচনে হৈ হল্লা করতে না নাম্‌লে মফস্বলের অবস্থা এত ভালভাবে দেখা হত কিনা সন্দেহ। বিরাট এলাকা, আর লোকজনেরও একান্ত অভাব, তাই খাটতেও হয়েছিল প্রচুর, কিন্তু আমার মনোনীত প্রার্থীও সাফল্যলাভ করেছিলেন।

নির্বাচনে বের হয়ে প্রথম থেকেই যা অনুভব করছিলাম সে এক অতি নূতন অভিজ্ঞতা। প্রায় শতকরা একশজন সাধারণ মুসলমান ভোটারই দেখলাম মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে—সব প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তবে গ্রামে গ্রামে মুরুব্বি বা দেওয়ানী গোছের যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকেই মুসলীম লীগের হাতেই ছিলেন। তাই প্রথম কেন, প্রায় শেষপর্যন্তও ঠিক বুঝতে বা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে শেষ পর্যন্ত সাধারণ ভোটাররা কি করবে। তারা সত্যি সত্যিই কি মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে যেতে পারবে? আমাদের দেশের মূর্খ সাধারণ কি মুরুব্বিদের ছেড়ে চল্‌তে পারবে? সে প্রশ্নের উত্তর পূর্ববাংলার মুসলমান সাধারণ দিয়েছে এবং ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারা অশিক্ষিত হতে পারে, দরিদ্র ত নিশ্চয়ই, কিন্তু নির্বোধ কখনই নয়, আর টাকা দিয়ে তাদের কেনাও যায় না। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনেও কমুনিস্ট পার্টির বিপর্যয়ের মধ্যে ঐ দৃশ্যই অনুভব করেছিলাম। তবে সে বারের ভোটাররা ছিল হিন্দু আর এবারের ভোটাররা হচ্ছে পূর্ববাংলার মুসলমান সাধারণ।

এই নির্বাচনের ফলে ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগ যে কি অদ্ভুতভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, সে খবর আজ আর কারও অজানা নয়। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ক্ষমতাসীন দলের এই রকমের বিপর্যয়ের ইতিহাস আর আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে যে কারণে মুসলীম লীগ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও জনসাধারণকে মোটেই বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়নি সেটি হচ্ছে ঐ যুক্তফ্রন্ট—সব দলের ঐক্য। এই ঐক্য যদি সম্ভব না হত, তাহলে অবশ্যই জনসাধারণ বিভ্রান্ত হতেন, এবং মুসলীম লীগ আবারও ক্ষমতায় আসীন হতেন। আজ ভারতেও যদি ঐ রকমের যুক্তফ্রন্ট গঠন করে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা পরীক্ষা করা হয়, তাহলে কংগ্রেস আর মুসলীম লীগ যে অভিন্ন

নয়, সেটা প্রমাণ হতেও বেশি দেরি হবে না। জনসাধারণ কখনই নির্বোধ নয়; তবে তারা নির্বোধের মত কাজ করে, কর্তব্য স্থির করতে পারে না, শুধুমাত্র ঐ অনেকগুলো দলের ভোটের জন্য শকুনির মত কাড়াকাড়ি দেখে। ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচন ভণ্ড রাজনীতিকদের কাছে চিরকালই এক সাবধান-বাণী হিসাবেই থাকবে।

ইলেকসন যখন হয়েইছে একটা মন্ত্রীসভা গঠন না করে উপায় নেই। তাই অতিবৃদ্ধ ফজলুল হক সাহেবের ডাক পড়ল। ফজলুল হক সাহেবই ছিলেন যুক্তফ্রন্টের একনম্বর নেতা। তবে তাঁকে তাড়িয়ে গভর্ণরী শাসন প্রবর্তিত হতেও বেশি দেরি হল না। হক সাহেব বিতাড়িত হলেন পুরোপুরিভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করবার পূর্বেই। অজুহাত অবশ্য একটা ছিলই,—নারায়ণগঞ্জের এক পাটের কলে বাঙালী আর আবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে মারামারি। যার ফলে,—প্রায় হাজার খানেক শ্রমিক নিহত হয়েছিল। ইতিমধ্যে অবশ্য কলকাতা গিয়ে ফজলুল হক সাহেব কতকগুলি অপাকিস্থানী কথাবার্তাও বলে এসেছিলেন। তিনি এমন কথাও বলেছিলেন যে, যাঁরা পাকিস্থানের নামে ভারত ভাগ করেছেন তাঁরা দেশের জনগণের শত্রু। ফজলুল হক সাহেব শুধু যে বিতাড়িত হলেন তা নয়, তিনি প্রায় স্বগৃহে অন্তরীণ হলেন। পাকিস্থানের রাজনীতি আরও ঘোরাল হয়ে উঠল; কিছুই বুঝবার উপয় নেই।

পাকিস্থান গণপরিষদ বাতিল

একবার আইনের কাঠামোর বাইরে গেলে রাজনীতিক্ষেত্রে সাধারণত যা হয় পাকিস্থানের রাজনীতিতেও সেই সব লক্ষণগুলিই প্রকাশ পেতে থাকল। কিছুদিনের মধ্যেই বড়লাট গোলাম মহম্মদ পাকিস্থান গণপরিষদ বাতিল করে দিয়ে আর এক কীর্তি করে বসলেন। গণপরিষদ বাতিল করে দেবার অধিকার কারুর থাকা সম্ভব নয়, তবুও গণপরিষদ বাতিল হল। সুপ্রিম কোর্টে মামলা হল; তার রায় কিন্তু বড়লাটের পক্ষেই গেল। সুপ্রিম কোর্টের রায় যে বড়লাটের অনুকূলে হয়ে ঠিকই হয়েছিল সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। গণপরিষদ জিনিসটি এমন একটি জিনিস, এমন সর্বশক্তিমান যে তার উপর কারুর কোন ক্ষমতা থাকতে পারে না,—অতি সত্যি কথা। কিন্তু যদি কেউ গণপরিষদ জোর করে ভেঙ্গে দিতে পারে, তাহলে সেই গণপরিষদকে

আর আইন বলে রক্ষাও করা সম্ভব নয়,—বাহুবলেই গণপরিষদকে রক্ষা করতে হয়। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে মহাশক্তিমান ঐ গণপরিষদ ধ্বংসকারীর হাতেই গণপরিষদের সমস্ত ক্ষমতা চলে যেতে বাধ্য। এখানে হলও তাই। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য এসব সোজা পথে না এসে, অনেক ঘোরা পথে, পাশ কাটিয়ে গিয়ে বড়লাটের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে আবার ভোটের জোরের অভাব হেতু পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী বদল হল। প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ আলী সাহেবের জায়গায় রাজস্বমন্ত্রী দ্বিতীয় মহম্মদআলী প্রধান মন্ত্রী হলেন। নূতনভাবে পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হল,—ফজলুক হক সাহেব, সুরাবর্দি সাহেব সবাই তাতে স্থান পেলেন। বড়লাটও বদলে গিয়ে নূতন বড়লাট হলেন ইস্কান্দার মির্জা সাহেব। ইস্কান্দার মির্জার কড়া শাসনে পাকিস্থানের রাষ্ট্রতরী আবার চলতে শুরু হল। গঠনতন্ত্র গঠনের কাজ পুরোদমে এগোতে থাকল।

সুরাবর্দি সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব-বাংলায় যুক্তফ্রণ্ট ত্যাগ করে পূর্ব-বাংলার রাজনীতিতে আর এক অস্বস্তিকর অবস্থায় সৃষ্টি করেছিলেন। তবুও ১৯৫৫ সাল আরম্ভ হতেই আবুহোসেন সরকারের নেতৃত্বে পূর্ববাংলায় এক নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হল। আবুহোসেন সরকার সাহেব আমাদের রংপুর কংগ্রেসের বহুকালের নেতা, তাই আমাদের অনেক আশাও হল। পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেস দলও আবুহোসেন সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে জাতে উঠল। কিছুদিনের মধ্যেই আবার পশ্চিম পাকিস্থানেও আর এক কংগ্রেসী নেতা—ডাঃ খান সাহেব, সরকারী গদি দখল করে এবং ক্রমেই ক্ষমতা থেকে ক্ষমতায় এগিয়ে গিয়ে পাকিস্থানের রাজনীতিতে নূতন ঝড়ের সৃষ্টি করলেন। পাকিস্থানের রাজনীতিতে স্বাধীনতা পূর্বযুগের কংগ্রেসীদের জয় জয়কার শুরু হল।

ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন আন্দোলন ও কমিশন

ভারতের প্রদেশগুলি সব ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা হবে এ ঘোষণা অনেক দিনের। নেতৃত্ব মাহাত্মা গান্ধীর হাতে যাবার অনেক আগেই কংগ্রেস এই কার্যসূচী গ্রহণ করেছিল। ১৯১১ সালে বোধহয় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে এই নীতিটি প্রথম গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের

অঙ্গচ্ছেদ করে খানিকটা বিহার এবং খানিকটা আসামের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। এইভাবেই বাংলাকে খর্ব করে ইংরেজ চেয়েছিল বাংলার বিপ্লবী ভাবধারাকে ধ্বংস করতে, চেয়েছিল বাংলার শক্তি-চেতনাকে শেষ করতে। ইংরেজের রাজনীতি ছিল সেদিন বাংলাকে মুসলমানপ্রধান প্রদেশ হিসাবে তৈরি করা। তাই বাংলাকে খণ্ডিত করে উপহার দেয় হয়েছিল অনুরাগী বিহারকে, আসামকেও। সেদিনের কংগ্রেস নেতাদের ব্যাপারটা বুঝতে বেশি বেগ পেতে হয়নি; তাই প্রধানত বাংলার উপর অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যই কংগ্রেস সেদিন ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের নীতি গ্রহণ করেছিল। নীতিটা অবশ্য গ্রহণ করা হয়েছিল সর্বভারতীয়ভাবেই। বিহারের কোন্ কোন্ অংশ বাংলাকে ফেরত দেয়া হবে, সেও সেদিনই ঠিক করা হয়েছিল এবং তখনকার বিহারের পাঁচজন অতি বিশিষ্ট নেতা নির্দিষ্ট জায়গাগুলি বাংলাকে ফেরত দেওয়া হবে এরকম স্বীকৃতি জানিয়ে এক বিবৃতিও প্রকাশ করেছিলেন। মোট কথা সেদিন কংগ্রেসের ভিতর শুভবুদ্ধির অভাব ছিল না, তাই যেটুকু অন্যায়ভাবে বাংলা থেকে কেড়ে নিয়ে বিহারকে দেয়া হয়েছে, যার উপর বিহারের কোন দাবি নেই বা থাকতে পারেনা, সে জায়গাটুকু বাংলাকে ফিরিয়ে দেবার অঙ্গীকার করতেও তাই সেদিন কারও অসুবিধা হয়নি। কংগ্রেস তারপরেও বহুবার বহু প্রকাশ্য অধিবেশনে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের নীতি প্রকাশ্যভাবেই ঘোষণা করেছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব যাবার পরও এরকম ঘোষণা বহুবার হয়েছে। শুধুমাত্র কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা ছিল না বলেই এই কাজটি করে উঠতে পারে নি।

কিন্তু একদিন যখন সতিসত্যিই কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা এল, আবার ঐ বাংলাকে খণ্ডিত করার মাধ্যমেই, সেই ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে। তখন কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের ঐ বহু বিঘোষিত নীতিটির কথা আর মনে থাকল না। নূতন ক্ষমতা পাবার আনন্দ উৎসবে তাঁরা অবশ্যই তখন বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। আর বাংলাদেশের মূর্খসাধারণও সেদিন একদিকে স্বাধীনতার আনন্দ, আর অন্যদিকে মাতৃঅঙ্গচ্ছেদের ব্যথার বোঝা—লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের নিয়েই বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। তাই পূর্বের খণ্ডিত অংশগুলি যা ভারতের মধ্যেই ছিল, সেগুলি ফিরে পাবার জন্য বিশেষ তাড়াহুড়া করেন নি। বাঙালী যেদিন বাংলাকে খণ্ডিত করে ভারতের স্বাধীনতা আনবার প্রস্তাবে রাজী হয়েছিল, সেদিনও কোন শর্ত আরোপ করেনি। আসলে বিহার এবং

আসামের মধ্যে অবস্থিত বাংলার জায়গাগুলি ফেরত আসার ব্যাপারটি এতই স্বতঃসিদ্ধ ছিল যে, সে বিষয়ে কোন শর্ত আরোপ করাও বাঙালী সেদিন প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা আসবার পরও স্বাভাবিকভাবেই জায়গাগুলি ফেরত আসবে মনে করে বিশেষ ব্যস্ততা প্রকাশও করেনি বাঙালী। কিন্তু ক্রমেই যখন দিন চলে যেতে লাগল, আর কংগ্রেসী নেতাদের কথার সুরও বদলাতে থাকল, তখন আর চুপ করে থাকা গেল না। বাংলায় এবং ভারতের অন্যান্য যে সমস্ত জায়গায় ঐ ভাষার গণ্ডগোল ছিল, সর্বত্রই ভাষাভিত্তিক প্রদেশগঠনের দাবি আবার নূতন করে প্রকাশ পেতে থাকল।

পূর্ববাংলা থেকে আগত ক্রমবর্ধমান উদ্বাস্তুদের চাপে পশ্চিম বাংলার অবস্থা ক্রমেই আরও শোচনীয় হতে থাকলেও কংগ্রেসী নেতারা কর্তব্য কাজ না করে, বরং ঐ কাজটি না করবার নানা অজুহাত খুঁজতে লাগলেন—তাঁদের কথার সুর পাল্টে গেল। ভাষাভিত্তিক প্রদেশগঠনের দাবি নাকি ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের দিক থেকে খুবই খারাপ। ওতে নাকি ভারতের ঐক্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর শাসনকার্যের সুবিধা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য, সামরিক রক্ষা ব্যবস্থা, এসব অনেক বাজে কথাই তাঁদের মুখে শোনা যেতে লাগল। তবুও যখন ভাষাভিত্তিক প্রদেশের দাবি আরও জোরদার হয়ে উঠল, সোজাসুজি আর চেপে রাখা সম্ভব নয়, তখন কংগ্রেসী নেতারা ফাঁকিবাজীর বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অবলম্বন করলেন। নানা রকম কমিশন, কমিটি ইত্যাদি বসিয়ে ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা চলতে থাকল। এইভাবে বছর পাঁচেক কাটানও গেল। তারপর ১৯৫১ সালের লোকগণনার সময় বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলির ভাষাভাষীর সংখ্যা উলট-পালট করে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই তাঁরা ভণ্ডামি কথাবার্তার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলেন। তবুও ভবী ভুলবার নয়, অন্ধ্র প্রদেশে গণ্ডগোল শুরু হল। অন্ধ্র নেতা শ্রীরামালু ভাষাভিত্তিক প্রদেশ-গঠনের দাবিতে অনশন করে প্রাণত্যাগ করতেই অন্ধ্রবাসীরা কংগ্রেসী ভণ্ডামিকে লাথি মারতে দ্বিধা করল না; এবং একদিনের মধ্যেই অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিতও হয়ে গেল। অন্য প্রদেশগুলিও ঐ পথে যাচ্ছে দেখে ভারতীয় নেতৃত্ব তখন ভাষাভিত্তিক প্রদেশগঠনের কাজ শীগগিরই শুরু হবে বলে ঘোষণা করলেন। অযথা হাঙ্গাম আর কে করতে চায়, তাই তখনকার মত সবাই শান্ত হলেন; কিন্তু আসলে সততারই যখন অভাব তখন সমস্যার সমাধান সহজ পন্থায়

কখনই হওয়া সম্ভব নয়। এই হবে হচ্ছে করে আরও বছর অনেক কাটাবার পর শেষপর্যন্ত ১৯৫৪ সালের কল্যাণী কংগ্রেসের সময়, এক রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের কথা ঘোষণা করা হল। কিছুদিন পরে সত্যিসত্যিই এক কমিশন তৈরি করাও হল, যদিও তাদের কাজ শুরু হল প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৫ সালে।

কমিশনের সম্মুখে অবশ্য ভাষাভিত্তিক ছাড়াও অনেক রকমের প্রশ্ন বিচারের বিষয় হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছিল। এই বাড়তি প্রশ্নগুলির ভেতরে সামরিক রক্ষা ব্যবস্থা, শাসনকার্যে সুবিধা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, যাতায়াতের সুবিধা—এই ধরণের অনেক কিছুই মীমাংসা করে দেখবার হুকুম থাকল। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সঙ্গে এ প্রশ্নগুলোর যে কি সম্বন্ধ তা অবশ্য মূর্খ সাধারণের বুঝবার নয়। আর কমিশনের সদস্য হলেন গভর্ণর ফজলে আলি, হৃদয়নাথ কুঞ্জুরু এবং সর্দার কে. এম. পানিক্কর। দুজন হিন্দীভাষী বিহার এবং উত্তর প্রদেশের লোক আর অন্যজন জহরলালের অতি পেয়ারের লোক, ইজিপ্টে ভারতের এম্বেসাডার। এই সর্দার পানিক্করই পূর্বে চীনে ভারতীয় এম্বেসাডার ছিলেন এবং চীনের তিব্বত আক্রমণের ব্যাপারটা অল ইণ্ডিয়া রেডিও মারফৎ শুনে জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

১৯৫৫ সালে তাঁরা সারা ভারতময় ঘুরে টহল দিয়ে বেড়াতে লাগলেন, অনেক সাক্ষ্য শুনলেন, অনেক মেমরেণ্ডাম পড়লেন। ফলে সীমানা বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে পেতে প্রায় আকাশে গিয়ে ঠেক্‌ল। তাঁরা যেখানেই যান সেখানেই হৈ হল্লা বাধে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে তাড়াহুড়া লেগে যায়, কে কিভাবে নিজেদের দাবি জানাবেন। শেষে যখন তাঁরা বিহারে এলেন তখন বিহারীরা যুক্তি বোঝাতে লাঠি ব্যবহার করল,—কমিশনের সদস্যদের উপরে নয় নিশ্চয়ই। কমিশনের সদস্যরা অতি সম্মানিত অতিথি হিসাবেই থাকলেন, লাঠি চালান হল বিহারের বাঙালীদের মাথায়। লাঠির যুক্তি খুবই কঠিন যুক্তি, কমিশন সব বুঝে নিলেন। আর এঁরা আসামে যাবার আগেই আসামীরা গোয়ালপাড়ার বাঙালীদের উপর যা করলেন তা শুধু জঙ্গলেই সম্ভব। তবে স্বাধীন ভারতেও যে একেবারে অসম্ভব নয় তাও চোখের উপরই দেখতে পেলাম—দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুঠতরাজ, নারী-ধর্ষণ—কিছুই বাদ থাক্‌ল না। হাজারে হাজারে বাঙালী আবার উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিম বাংলার কুচবিহার আর জলপাই-গুড়িতে পালিয়ে আস্‌তে বাধ্য হল। তবুও কিন্তু ভারতে যে একটা কেন্দ্রীয় সরকার আছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল না। তারপর আসামে গিয়েও কমিশন

সব বুঝে এলেন,—বেশি করে বুঝবারই বা কি ছিল! তাঁদের কি করতে হবে না হবে, সে ত দিল্লীতেই বেশ ভাল করেই তাঁদের বুঝান হয়েছিল। সব বুঝে শুনে, কোথা দিয়ে কিভাবে লাইন টান্‌লে, কাকে কতটুকু দিলে বা না দিলে ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ খুব ভালভাবে বজায় থাক্‌বে, সব বিষয়ে সূক্ষ্ম চিন্তা করে তাঁরা এক লম্বা রিপোর্ট পেশ করলেন, ভারত সরকারের কাছে। কাকে কি দেয়া হবে না হবে সেটাত জহরলালের অন্তরঙ্গদের মোটামুটি জানাই ছিল; তাই কেন্দ্রীয় সরকার সে রিপোর্ট প্রকাশ করবার আগেই বিশেষ বিশেষ লোক মারফৎ বিশেষ বিশেষ জায়গা থেকে প্রকাশ হতে থাক্‌ল। তারপর যখন আসল রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ করলেন তখন আর তাতে নূতনত্ব বিশেষ কিছুই থাক্‌ল না। খুব আশ্চর্যও বিশেষ কেউই হলেন না কারণ, খেলা চলছিল অনেক দিন থেকেই; তাই রিপোর্টে যে কি সাপ না বাঘ থাক্‌বে তা অনেকেই আন্দাজ করতে পারছিলেন।

রিপোর্টে ন্যায় নীতি, ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ এসব অনেক বিষয়ের আলোচনার পর, কমিশন রাজ্য-পুনর্গঠনের যে ব্যবস্থা বাৎলে দিলেন, তাতে দেখা গেল দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো সবই তৈরি করা হয়েছে শুধুমাত্র ভাষাকে ভিত্তি করেই,—ঠিক যেমন ছিল সাধারণের দাবি। দক্ষিণ ভারতের রাজ্য পুনর্গঠন ব্যাপারে অন্য সব অবান্তর প্রশ্নগুলোকে মোটেই আমল দেয়া হয়নি। এমন কি বোম্বাই প্রদেশটিকে মারাঠি আর গুজরাটিদের মিলিয়ে এক বৃহৎ দ্বিভাষিক প্রদেশ হিসাবে গঠন করার উপদেশ থাকলেও, শুধুমাত্র ঐ ভাষা দুটিকে ভিত্তি করেই বোম্বাই প্রদেশের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু উত্তর ভারতের বেলায় তাঁরা আর ভাষার প্রশ্নটিকে বেশি আমল দেয়া দরকার বোধ করেন নি। এখানে ঐ অবান্তর প্রশ্নগুলোই প্রাধান্য লাভ করেছে। এমন কি দুর্দশাগ্রস্ত খণ্ডিত পশ্চিম বাংলাকে দুঃখ লাঘবের জন্য কিছু বেশি জায়গা দেবার জন্য নয়, বাংলাকে ঠকাবার জন্যই ঐ অবান্তর প্রশ্ন-গুলোর প্রাধান্য দিয়েছেন। আসামের কোন অঞ্চলই বাংলায় আসেনি, আগরতলাও নয়। আর বিহার থেকে যেটুকু দেয়া হয়েছে তা ঐ ফকিরের ভিক্ষার চেয়ে বেশি মোটেই নয়। সরাইকেলা, খরসোয়ান প্রভৃতি উড়িয়াভাষী অঞ্চলগুলো উড়িষ্যায় দেওয়া হয়নি। পাঞ্জাবের ব্যাপারেও করে রাখা হয়েছে এক জগা-খিঁচুড়ি,—হিমাচল প্রদেশ পাঞ্জাবে যায়নি। তবে হিন্দিভাষী মধ্য প্রদেশটিকে নূতন করে ঢেলে তৈরি করা হয়েছে বেশ একটু ফুলিয়ে ফাঁপিয়েই,

হিন্দীভাষী বলেই। আয়তনে হয়েছে এক লক্ষ একাত্তর হাজার বর্গ মাইলের মত ;—পশ্চিম বাংলার আয়তন তিরিশ হাজার বর্গমাইলের খুব কাছাকাছিই আর কি ! কমিশনের চেয়ারম্যান ফজলে আলি সাহেব একজন বিহারী, তাই বিনয়বশে বাংলা বিহারের হাঙ্গামের মধ্যে আসেননি, নিরপেক্ষ ছিলেন। এই ফজলে আলি নাকি হাইকোর্টের এবং সুপ্রিম কোর্টেরও জজ ছিলেন। তাঁর জজিয়তির আমলে বাঙালী বিহারীর মধ্যে কোন মামলা হলে তিনি কি করেছেন জানতে ইচ্ছা হয়। নিরপেক্ষ থেকেছেন কি? স্বাধীনতার পূর্বে ভারতীয় কংগ্রেসে মুসলমানেরা বিশেষ ভিড়ত না, তাই কানা খোঁড়া ক অক্ষর গোমাংস—যে রকমেরই হোক একজন মুসলমান পেলেই কংগ্রেস তাকে নেতা বানিয়ে তবে ছাড়ত। আশা করি ফজলে আলিও ঐভাবেই জজ হয়েছিলেন না। তবে তাঁর এই নিরপেক্ষতার কার্যটি যে মোটেই একজন বিচারপতির মত হয় নি, একজন বিহারীর মতই হয়েছে সে ত যে-কেউই বুঝতে পারে। রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর আবার সারা ভারতময় হৈ-হল্লা শুরু হল, ঐ রিপোর্টকে বরবাদ করে ন্যায়নীতি এবং ভাষার ভিত্তির উপর নূতনভাবে রাজ্যপুনর্গঠন করবার জন্য।

গোয়ার কেলেঙ্কারী

ইতিমধ্যে গোয়ার ব্যাপার নিয়েও এই ১৯৫৫ সালেই ভারতে বেশ খানিকটা কেলেঙ্কারী হয়ে গেল। কেলেঙ্কারী বলা হচ্ছে অবশ্য কলঙ্ক কথাটি বাদ দিয়েই ; কারণ অহিংস ভারত, শান্তিবাদী ভারত, আন্তর্জাতিক প্রেস্টিজের অতি উর্ধ্বমার্গে বিচরণকারী ভারত ওসব কলঙ্ক-টলঙ্কের ধার ধারে না। ভারত তার সব সমস্যার মীমাংসা করে ফেলবে অহিংস পথেই, শুধু বক্তৃতা করেই। গোয়া সমস্যা হচ্ছে ভারতের কাজ না করে বেশি কথা বলার সমস্যা। ইংরেজ ছাড়াও ফরাসী আর পর্তুগীজদের হাতে ভারতের কয়েকটি ছোট ছোট জায়গা ছিল। তারই মধ্যে গোয়া হচ্ছে সবচেয়ে বড় এবং বিশিষ্ট। ইংরেজ চলে যাবার পর ভারত সরকার ফরাসী আর পর্তুগীজদের সাথে কথাবার্তা চালাতে থাকেন, যাতে তারাও ইংরেজদের মত সসম্মানে চলে যেতে পারেন। ফরাসীরা ভদ্রভাবেই তাতে রাজী হয় এবং বলে যে তাদের অধিকৃত চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, মাহে আর কারিকলের অধিবাসীরা যদি ভারতের সাথে মিশে যেতে চায়, তাহলে তাদের আপত্তি নেই। ভোটাভুটি হয়ে চন্দননগর কার্যত ভারতে চলেও

আসে ; কিন্তু পণ্ডিচেরী, মাহে আর কারিকলের বাসিন্দাদের মতিগতি ঠিক বুঝা যায় না। ফলে ভারত সরকার ঐ জায়গাগুলিতে ভোটের সম্মুখীন হতে নারাজ হন। বিনা ভোটেই যাতে ওগুলো ভারতে আসে তারই জন্য ভারত ফরাসীদের সাথে আবারও কথাবার্তা চালাতে থাকে। অহিংস পন্থায় নিতে হবে ত! তা নাহলে গান্ধীইজমের বাহাদুরী প্রমাণ হবে কিসে। তাই প্রতিবারই ভারতের দূত যখন প্যারীতে ঐ বিষয়ের কথাবার্তা বলবার জন্য যেতেন, তখনই কথাবার্তার সফলতার আশায় ফরাসীদের সঙ্গে বহু বহু কোটি টাকার সামরিক মালপত্র এবং অন্য সব জিনিস সরবরাহের চুক্তি করে আসতেন। এই ভাবে দু' তিন বার ঘোরাঘুরির পর চক্ষুলজ্জার খাতিরে ফরাসীরাও ও-জায়গাগুলি বিনা ভোটেই ভারতকে দিতে রাজী হল। অহিংসার জয়জয়কার হল। শুধু জানা গেলনা যে কত কোটি টাকার বাজে মাল কেনার পর ফরাসীরা ওগুলি ছেড়ে যায়। খুব অল্প দু চার কোটি টাকার পরিবর্তে অবশ্যই নয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিবিশারদ শ্রীজহরলাল বেশ কায়দামাফিক ফরাসীদের জায়গাগুলি ভারতে এনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর নিজ প্রেস্টিজ আরও খুব বাড়িয়ে তোলেন। ঐ সব লাভের বাণিজ্য চুক্তি করবার পর ফরাসী ব্যবসায়ী আর খবরের কাগজগুলো ত তাঁর সুখ্যাতিতে ভরপুর। আর জহরলালের সুখ্যাতি মানেই যখন ভারতের সুখ্যাতি, তখন আর কথা কি! না হয় গেছে কয়েক কোটি টাকা। ঠিক এই রকম অহিংস পন্থায়ই জহরলাল চেষ্টা করেছিলেন পর্তুগীজদের অধিকৃত গোয়া, দমন আর দিউ প্রভৃতিকে ভারতে নিয়ে আস্তে। কিন্তু পর্তুগীজরা জলদস্যুর জাত, ফরাসীদের মত চক্ষুলজ্জা ,ত দূরের কথা, কিছুমাত্র ভদ্রতাজ্ঞানও নেই ; তাই জহরলালের পলিসি এখানে সুবিধা হয়নি।

প্রথম যখন গোয়া নিয়ে পর্তুগালের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হয়, চিঠিপত্র বিনিময় চলতে থাকে, তখন এক সময় মনে হয়েছিল যে পর্তুগালও বোধ হয় ইংরেজ ফরাসীর মতই ভারত ছেড়ে যাবে। কিন্তু ঘোম্‌টার নীচে এই কথাবার্তা চলতে থাকার সময় হঠাৎ কি হল বোঝা গেল না—পর্তুগাল বিগড়ে বসল। যে সব চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা হয়েছিল, তার কিছু কিছু পর্তুগালের পক্ষ থেকে হঠাৎ একবার প্রকাশিতও হয়েছিল। বেশ মনে আছে, তারই একখানি চিঠিতে শ্রীজহরলাল একরকম সোজাসুজিই পর্তুগালকে গোয়া ছাড়বার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতেও রাজী ছিলেন। পোড়াকপাল দেখছি কেবল ঐ ইংরেজদের! তাঁরা না পেলেন বাজে মাল সরবরাহের ঠিকাদারী, না পেলেন ক্ষতিপূরণ। সেটা

অবশ্য তাঁদেরই ভুল। শ্রীজহরলাল বাদশা হবার আগেই যে তাঁরা ভারত ছাড়লেন, দর পাবেন কোথা থেকে! শ্রীজহরলালকে গদিতে বসিয়ে, যাই যাচ্ছি বলে আর কিছু দিন টালবাহনা করলেই অনেক টাকা পেতে দেরি হ'ত না। সরকারী টাকায় বদান্যতা করতে শ্রীজহরলালের কখনই অসুবিধা হয় না। আর সে খরচাটা যখন স্বাধীনতার জন্যই, পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্য ত বটেই, তবে আর কথা কি! অহিংস স্বাধীনতার গ্যারাকল এই রকমই। বহুশত কোটি টাকা খরচ করে সৈন্যবাহিনীও পুষবো, আবার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিদেশী অধিকৃত জায়গাগুলিও কিনব। এই হচ্ছে জহরলালের অহিংস রাজনীতি। এরকম না হলে কি আর সারা দুনিয়ায় এত সোরগোল পড়ে, না ভারতের আন্তর্জাতিক প্রেস্টিজ এত বাড়ে! যাই হোক পর্তুগাল ভারত ছাড়তে রাজী হল না। বোধ হয় ঐ ক্ষতিপূরণের চিঠিখানি পাবার পরেই পর্তুগীজেরা বুঝে নিলে যে ভারত ছেড়ে যাবার এমন কিছু তাগাদা নেই। যতদিন থাকা যায় তাই লাভ। প্রতিবৎসর বহুকোটি টাকার লৌহপ্রস্তর গোয়াতে পাওয়া যায়, আপাতত সেই লাভটাই খাওয়া যাক। পরে সুবিধামত মানে, অসুবিধামত ক্ষতিপূরণের টাকা খেলেই চলবে। তাই এখনও তারা ঐ লৌহ-প্রস্তরের লাভই খাচ্ছে, আর জহরলালের অহিংস ভারত দূর থেকে তাকিয়ে দেখছে, কিছু বলবার সাহস নেই।

জহরলাল ভারতের বাদশাহ, ভারতের নেতা, সবকিছু, কিন্তু জানিনা তিনি কখনও ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকও ছিলেন কিনা। যদি কখনও তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকও থেকে থাকেন তাহলে তাঁর ভারত বোধ হয় শুধু ইংরেজের অধিকৃত ভারতই ছিল, যেটাকে ভাগ করে নিয়ে একাংশের তিনি আজ মালিক। ফরাসী বা পর্তুগীজদের অধিকৃত অংশগুলিও যদি তাঁর মতে ভারতেরই অংশ হ'ত তাহলে তাঁর এত ভয় কিসে! এত সৈন্যসামন্ত হাতে নিয়ে তাঁর এত ভয়ের মানে কি? তিব্বতে চীনেদের বাধা না দিয়ে তিনি ও ওদিক একরকম শেষ করেই বসে আছেন। বিদেশীকে তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করতে গেলে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবে, এই কি তাঁর বিশ্বাস নাকি? জহরলাল বিশ্ববিশারদ, তাঁর উপর কথা বলবার কেউ নেই, আমিও বলব না। তবে মনে হয়, তিনি ভয় পাচ্ছেন ঐ ক্ষতিপূরণ দেবার চিঠিখানাকেই, যেটাকে আজ পর্তুগীজেরা তাদের পক্ষে দলিল হিসাবেই ব্যবহার করতে পারে। তাঁর সে ভয়েরও কোন ভিত্তি নেই, ওসব দলিলের

কোন মূল্যই নেই ; গোয়া ভারতেরই অংশ। তবুও তিনি কিছুই করবেন না, কারণ কতগুলি লম্বাই চৌড়াই কথার জালে তিনি আটকে পড়েছেন, আর সোজা কথায় তিনি একটি অতি-অপদার্থ।

শ্রীজহরলাল কি করবেন বা না করবেন, তাঁর উপর নির্ভর করে ত আর স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকরা কাজ করে না। তাই পর্তুগীজ-গোয়ার ভারতীয় অধিবাসীরা তাঁদের স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর উপর কিছুমাত্র ভরসা না রেখেই। ভারতে বা পাকিস্থানেও এই স্বাধীনতা যোদ্ধাদের জন্য সহানুভূতির অভাব নেই। জহরলালের কংগ্রেস দল বাদে ভারতের অন্য সব রাজনৈতিক দল গোয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করবার জন্য নানারকম আন্দোলন চালাচ্ছেন। ১৯৫৫ সালে গোয়ার অভ্যন্তরে এবং ভারতেও যখন গোয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন খুবই জোরদার হয়ে উঠল, তখন চাপে পড়ে ভারতের কংগ্রেস দল এবং জহরলালকেও বেশ খানিকটা কাবু হতে হয়েছিল। তাই গোয়ার অভ্যন্তরে গিয়ে গোয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করে তুলবার জন্য যখন ভারতের অন্য সব রাজনৈতিক দল স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছিল। সত্যাগ্রহ নামে গোয়ার ভেতরে ব্যাপক স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করা হবে সে চরমপত্রও পর্তুগীজ সরকারকে দেয়া হয়েছিল। তখন বেকায়দায় পড়েই বা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কায়দামতই শ্রীজহরলালও বেশ কিছু লম্বাই চৌড়াই ঝাড়তে থাকলেন। আর ভারতের কংগ্রেসদল দলগত হিসাবে কোন স্বেচ্ছাসেবক দল না পাঠালেও এককভাবে কংগ্রেস-কর্মীরা গোয়া সত্যাগ্রহে যোগ দিতে কোন বাধা নেই, এই সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন।

শুভদিনে শুভ মুহূর্তে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করাও হয়েছিল। শ্রীজহরলালের লম্বাই চৌড়াইএর ফলে, গোয়ার এই সত্যাগ্রহের প্রচারকার্যও হয়েছিল ভীষণ-ভাবেই—যার ফলে পৃথিবীর বহু দেশের বহু বিখ্যাত সংবাদপত্র ঐ সত্যাগ্রহের সংবাদ সংগ্রহের জন্য সংবাদদাতাদের পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু যখন পর্তুগীজ দস্যুদের রাইফেল আর মেসিনগানের সম্মুখে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীরা শুধুমাত্র নিজেদের সম্মান বাঁচাবার জন্যই রক্তদান করে ভূতলশায়ী হলেন ; শতে শতে নিহত এবং সহস্রে সহস্রে গ্রেপ্তার হয়ে পর্তুগীজ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন, তখন বীর জহরলালের টিকিটিও আর দেখা গেল না। সৈন্যসামন্ত নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ত দূরের কথা তিনি পর্তুগীজদের উদ্দেশ্যে আর একটি গরম কথাও

উচ্চারণ করলেন না। বরং উল্টো রকমের চীৎকার শুরু করলেন। যত দোষ ঐ সত্যাগ্রহীদের মাথায় চাপিয়ে তিনি শান্তিবাদী সেজে উর্ধ্ব আকাশে বিচরণ করতে থাকলেন। গোয়া সত্যাগ্রহের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি যে সব কথা বলেছিলেন তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে,—আমি অহিংস, আমি শান্তিবাদী, আমি নপুংসক ও কাপুরুষ, তবুও তোমরা আমাকে সমর্থন দাও, তা না হলে তোমরা রসাতলে যাবে।

যাঁরা গোয়ার স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করবার দাবি জানাচ্ছিলেন, সুযোগ মত তিনি তাঁদের বিদ্রূপ করতেও ছাড়লেন না, "অহিংস সত্যাগ্রহীদের রক্ষা করবার জন্য সশস্ত্র সৈন্য এগিয়ে যাবে—এই আশা নিয়ে যাঁরা সত্যাগ্রহ করতে চান, তাঁরা কখনই সত্যিকারের সত্যাগ্রহী নন, তাঁদের জন্য আমার কোন সহানুভূতি নেই।" কার জন্য যে তাঁর সহানুভূতি আছে, আর কার জন্য যে নেই, সেকথা আজ আর কিছু অজানা জিনিস নয়, সমঝদারেরা সেটুকু বুঝে নিয়েছেন। বহু-ধিক্কৃত আমেরিকান খবরের কাগজের সংবাদদাতারা ঐ সত্যাগ্রহের সময় নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও অনেক সত্যাগ্রহীকে পর্তুগীজ জলদস্যুদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন ; বোধহয় আরও ধিক্কৃত হবার জন্যই। আর জহরলাল পেয়েছিলেন তাঁর কাজের সমর্থন, ভারতের পার্লামেন্টে এবং ভারতের সংবাদপত্রওয়ালাদের কাছ থেকে। ন' বছরেই ভারত যে স্বাধীনতার পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে সে কথা প্রমাণ করবার জন্যই। ভারতের স্বাধীনতা ঠিক এইভাবেই এগিয়ে চলেছে। তবে গোয়ার ব্যাপারে 'পর্তুগীজদের সাথে অহিংস হলেও নিজের খাস তালুকে শ্রীজহরলাল কখনও কাপুরুষতা দেখান না। সেই জন্যই, এবং সেই সময়েই ভারতের অভ্যন্তরে গোয়া সমর্থকদের উপর গুলি চালাতে তিনি মোটেই পরোয়া করেন নি। গোয়া আন্দোলনের সমর্থকদের রক্তে সেদিন ভারতভূমিও রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল।

ঐ ব্যাপারের কিছুদিন পরে পর্তুগীজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী কানা সাহেব আমেরিকায় যান এবং আমেরিকান বৈদেশিক মন্ত্রী ডালেস সাহেবের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এক যুক্ত-বিবৃতি প্রকাশ করেন। সে বিবৃতিতে গোয়াকে পর্তুগালের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই দাবি করা হয়। কাগজে সংবাদ প্রকাশ হবার পর বাদশাহ জহরলাল আবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, এবং অনেক লম্বাই চৌড়াই হাঁকবার পর ভীষণ কঠোর প্রতিবাদ করা হবে বলে আমেরিকাকে ভয়

দেখালেন। আমেরিকা বোধ হয় ভীষণ ভীতও হয়ে পড়েছিল, তাই শেষ পর্যন্ত তিনি আর দয়া করে কোন প্রতিবাদ জানান নি। ডালেস সাহেব অবশ্য তার কিছুদিন পরেই দিল্লীতে এসে খানাপিনা করে গেছেন ঐ জহরলালের সাথেই।

গোয়ার ব্যাপারে সাক্ষাৎভাবে কিছু করা পাকিস্থানের পক্ষে সম্ভব ছিল না,—পাকিস্থানের সাথে গোয়ার কোন সংযোগ নেই। গোয়া পাকিস্থান থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। সংযোগ থাকলে পাকিস্থান, যে সহজ পন্থাতেই ওই সমস্যার সমাধান করত সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। তবে, ভারত সেদিন যদি গোয়ার স্বাধীনতার জন্য গোয়ার অভ্যন্তরে সৈন্য প্রয়োগ করত, তাহলে যে পাকিস্থান কোন বাদ সাধত না সে বিশ্বাস আমার আছে। গোয়ার ব্যাপার নিয়ে পাকিস্থান এতদিন পর্যন্ত মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করেনি, কিন্তু ঐ সত্যাগ্রহের দিনের কেলেঙ্কারীর পরে গোয়াবাসীদের মধ্যে ভারতের প্রেস্টীজ যেরকম ফেঁপে উঠেছে, তারই সুযোগে বর্তমানে পাকিস্থান যে গোয়ার ব্যাপারে একেবারেই নিরপেক্ষ দর্শক তাও বলা চলে না। গোয়া থেকে পর্তুগীজদের বিদায় করবার ব্যাপারে পাকিস্থান যদি কিছু করতে পারে তাহলে পাকিস্থানের অসম্মানের কিছুই নেই। অবস্থা যেরকম দাঁড়িয়েছে, তাতে শেষ পর্যন্ত গোয়া পাকিস্থানে আসাও খুব অসম্ভব মনে হয় না। ভারত ভাগ হয়েই পাকিস্থান সৃষ্টি হয়েছে, তাই গোয়ার উপর পাকিস্থানের দাবি যে একেবারে অচল তাও নয়।

হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

ভারতে ১৯৫৬ সাল আরম্ভ হল এক বিদ্রোহের মধ্যে, হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অন্যসব ভাষাভাষীদের বিদ্রোহ। কিছুদিন আগে যখন রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছিল তখন থেকেই গণ্ডগোল শুরু হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৬ সাল আরম্ভ হতেই সে আগুন প্রায় প্রলয় আকারই ধারণ করে। বিদ্রোহ দমন করবার জন্য যে সমস্ত শাস্ত্রসম্মত পন্থা পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশে অবলম্বিত হয়ে থাকে, অহিংস ভারতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিদ্রোহীরা সরকারী পশুশক্তির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। ভারতের বাদশাহরা অন্তত কিছুদিনের জন্য শান্তিতে দুনিয়া উপভোগের সুযোগ ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু

এই বিদ্রোহের ফলে, বিদ্রোহ দমন কার্যের তৎপরতায় এবং সরকারী ক্ষমতা দম্ভের প্রদর্শনীর ফলে, ভারতের রাজনীতিতে যে ফাটল সেদিন ধরেছে তার শেষ যে কোথায় বলা কঠিন। ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ, ভারতের ঐক্য—এই বড় বড় কথাগুলি কপচিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করাই যাঁদের একমাত্র ব্যবসা তাঁরা আজ ভারতকে কোথায় নিয়ে চলেছেন তাও জানি না।

মোটকথা, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পরে আর বুঝতে কারও বাকি থাকল না যে, হিন্দি-সাম্রাজ্যবাদ আজ বেশ ভাল ভাবেই খুঁটি গেড়ে বসেছে। এতদিন তারা যেটুকু চক্ষুলজ্জার ধার ধারত, সে চক্ষুলজ্জাও তাদের শেষ হয়ে গেছে। তা না হলে দক্ষিণ ভারতে যেখানে হিন্দিভাষীদের কোন স্বার্থ নেই, সেখানে রাজ্যগুলি শুধুমাত্র ভাষাভিত্তিক করে তৈরি করবার পরই হঠাৎ উত্তর-ভারতের বেলায় এ ধরনের ডিগবাজী খায় কিভাবে? কয়লাখনির জন্য বিখ্যাত অঞ্চল ধানবাদ হিন্দিভাষী বিহারে রাখতেই হবে; তাই ধানবাদ মহকুমার অস্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যা যোগ করেই তাকে হিন্দিপ্রধান অঞ্চলে পরিণত করে বিহারে রাখা হয়েছে। অথচ মহীশূরের স্বর্ণখনি এলাকা কোলার জেলা অন্ধ্রভাষী প্রধান হয়েও অন্ধ্রেতে যায়নি, গিয়েছে কর্ণাটকী মহীশূরে; কারণ কোলারের অন্ধ্র-ভাষীরা বেশীর ভাগই ছিল সেখানকার অস্থায়ী বাসিন্দা। উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের বেলায় দুরকম এবং ঠিক উল্টো ধরণের মাপকাঠি। যারা জহরলালকে হাঙ্গারীর ব্যাপারে অদ্ভুত আচরণের জন্য বহু মাপকাঠিসিদ্ধ বলে আজ গালাগালি দিচ্ছেন, তাঁরা জানেন না যে জহরলাল জন্মেছেনই ঐ ডবল স্ট্যানডার্ড্-এর কলকাঠি হাতে নিয়েই। ধলভূম মহকুমা, যার ভেতর হচ্ছে কিনা টাটানগর, তাকেও বিহারে রাখতে হবে, তা সে যে কোন উপায়েই হোক না কেন। তাই সেখানে এক মিথ্যা অজুহাত দেখান হল যে উড়িষ্যা এবং বাংলা উভয়েই যখন ওটা দাবি করছে তখন ওটা কাউকেই দেয়া যায় না। উড়িষ্যা সিংভূম জেলার সদর দাবি করলেও ধলভূম মহকুমা কখনই দাবি করেনি,—একথা নথিপত্র দেখিয়ে জহরলালকে বুঝাবার অনেক চেষ্টাও হয়েছে, কিন্তু বুঝান সম্ভব হয়নি। উড়িষ্যাকে উড়িয়াভাষী সিংভূম সদর ফিরিয়ে দেওয়া ত দূরের কথা, উড়িয়াভাষী দেশীয় রাজ্য সরাইকেলা ও খরসোয়ান, যে দুটোকে অতি অন্যায়ভাবে জবরদস্তি করে বিহারে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে, সে দুটোও ফেরৎ দেওয়া হয়নি।

আর মানভূমের সদর যা বাংলাকে দেয়া হল তার থেকেও চাষ থানাটিকে কেটে রাখা হল। কেন জানেন? রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সম্মুখে মিথ্যা ম্যাপ তৈরী করে উপস্থিত করা হয়েছিল, তাই। সেই মিথ্যা ম্যাপে' দেখান হয়েছিল যে, সদরের চাষ থানাটিও ধানবাদ মহকুমার সাথেই দামোদর নদীর উত্তর পারে অবস্থিত। কিষণগঞ্জের একটা অংশকে বাংলায় দেয়া হয়েছিল উত্তর বাংলা আর দক্ষিণ বাংলার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য; কিন্তু আসলে দেখা গেল যে কিষণগঞ্জের ঐ অংশটুকু পেলেও বাংলার সংযোগ সাধন হয় না। কি ব্যাপার! এরকম হবার মানে কি? রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সদস্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুই তার উত্তর দিয়েছেন, ঐ পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়েই বলেছেন যে তাঁদের নাকি ভুল ম্যাপ সরবরাহ করা হয়েছিল। এত ভুল ম্যাপের আমদানি হল কোথা থেকে? একি শুধুই আকস্মিক ব্যাপার? এই তত্ত্বগুলির মীমাংসা হলেই জানা যাবে যে, হিন্দি-সাম্রাজ্যবাদ অন্য সবাইকে কোণঠেসা করে নিজের স্বার্থ গুছিয়ে নিচ্ছে, কি সুন্দর উপায়ে, কিরকম খাসা প্ল্যান মারফৎ।

বাংলার দাবিমত বিহার থেকে বাঙ্গালী অংশগুলি ফিরিয়ে দিলে বিহারের সত্যিই ক্ষতি হবে; তাই বাংলা থেকেই প্রস্তাব করা হয়েছিল, উত্তর প্রদেশ থেকে কিছুটা অংশ বিহারকে দেবার জন্য। উত্তর প্রদেশও হিন্দিভাষী আর বিহারও হিন্দিভাষী,—কোন অসুবিধাই ছিল না। আর বিহার যদিও জানত যে শত বাধা দিলেও অন্তত কিছুটা বাংলাকে দিতেই হবে, এবং শেষ পর্যন্ত যখন দিতে হলও, তখনও বিহার উত্তর প্রদেশ কিংবা অন্য কোথাও থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করেনি। বিহারের যত শৌর্যবীর্য সে শুধুই বাংলাকে বা উড়িষ্যাকে বাধা দেবার জন্যই, হিন্দিভাষী উত্তর প্রদেশ থেকে পাবার জন্য কখনই নয়। যেটুকু বাংলাকে বা উড়িষ্যাকে দেওয়া হবে সেইত হবে আসল ক্ষতি। উত্তর প্রদেশ ত হিন্দিভাষী, তার জায়গার জন্য ভবনা নেই। পাশেই একলক্ষ একাত্তর হাজার বর্গ মাইল নূতন হিন্দিভাষী মধ্যপ্রদেশ গঠন করা হল, তবুও কিঞ্চিৎ ভূমি বিহারকে দিয়ে তার ক্ষতি পূরণ করা হল না। কেন? ক্ষতিপূরণ পেয়ে বিহারের চোখের জল বন্ধ হলে বাংলার দাবিকে ঠেকাবে কে? তখন যে বাংলার ন্যায্য দাবি সবটুকুই আর না দিয়ে উপায় থাকবে না, তাই। বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সবাই হিন্দিভাষী, তাই কোন গণ্ডগোলও নেই; কে ছোট থাকল

আর কে বিশাল-বপু হল, তাতেও কিছু এসে যায় না। সকলে মিলে যত হাঙ্গাম করতে হবে ঐ বাংলার, ঐ উড়িষ্যার দাবি বরবাদ করবার জন্য। আসাম থেকেও বাংলাকে কিছু দেওয়া হবে না। কারণ ঐ একই,—আসাম বাংলা দুইই অহিন্দিভাষী, স্বার্থের গণ্ডগোল মিটে গেলে বন্ধুত্ব হতে বেশী দেরি হবে না। অহিন্দিভাষীদের মধ্যে বন্ধুত্ব বা একতা হওয়া যে হিন্দির পক্ষে মারাত্মক। খুবই সোজা ইঙ্গিত।

ভাষাভাষীদের সংখ্যানুপাতের হিসাবে হিন্দিভাষীরাই যে ভারতের সবচেয়ে বৃহৎ তাতে কোন সন্দেহ নেই, ঠিক যেমন সন্দেহ নেই যে অন্যান্য অনেক ব্যাপারেই তারা মোটেই বৃহৎ নন বরং তার উল্টোটাই। আর্থিক ব্যাপারেও তাদের অবস্থা খুব বেশী উচ্চে নয়। কোন হিন্দি এলকার সঙ্গেই সমুদ্রের কোন সংযোগ নেই, ফলে তাদের কোন বন্দরও নেই। সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখতে হলে এসব কথা অবশ্যই ভাবতে হবে এবং এই সব কথা ভাববার ফলেই টাটানগরসুদ্ধ ধলভূম বা কয়লাখনিসুদ্ধ ধানবাদও যেমন তাদের হাতে রাখতে হবে, ঠিক সেই ভাবেই এক আধটি বন্দরও তাদের আয়ত্তে রাখা চাই। বোম্বাই শহরের সমস্যাও এই কারণে। হঠাৎ করে কলকাতার উপর নজর দিতে গেলে বাংলার প্রকাশ্য বিদ্রোহ করা ছাড়া আর উপায় থাকবে না,—বাংলা ভাগ হতে হতে ত প্রায় কলকাতাতেই এসে ঠেকেছে। তাই আপাতত বোম্বাইকে আয়ত্তে রাখবার ব্যবস্থা করা হউক।

এই ব্যবস্থা হতে গিয়েই বোম্বাই নিয়ে এত হাঙ্গামা। কমিশন মারাঠী আর গুজরাটীদের মিলিয়ে এক বৃহৎ দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্য গঠন করবার উপদেশ দিলেন। বোম্বাই শহর থাকবে এই বৃহৎ প্রদেশের রাজধানী হিসাবেই; কিন্তু সততার প্রমাণ পাওয়া গেল না এই জন্যেই যে, মারাঠী আর গুজরাটীদের জনসংখ্যার সমতা রাখবার জন্যই তারা আবার বিদর্ভ নামে আর একটি মারাঠীভাষী প্রদেশ গঠনেরও উপদেশ দিলেন। ইঙ্গিতটা এখানেও কিছুই কঠিন নয়। প্রায় সমসংখ্যক মারাঠী আর গুজরাটীতে মিলে বোম্বাইয়ের মারামারিটা জমাবে ভাল, সেই সুযোগে বোম্বাই শহরের উপর বাইরের কর্তৃত্বও বেশ সোজা হবে। মারাঠীরা রাজী হল না। তাই প্রথমে বোম্বাই শহরকে পৃথক রাজ্য করে মারাঠী আর গুজরাটীদের জন্য দুটো ভিন্ন রাজ্যের ব্যবস্থা হল; কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই বাদশাহদের বুদ্ধি পরিষ্কার হতেই তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, বোম্বাইকে পৃথক রাজ্য হিসাবে গঠন করলেও সেটা

মারাঠীদের দখলে থেকে যাবে এই জন্যই যে, বৃহৎ বোম্বাই শহর অতি অবশ্যই মারাঠীপ্রধান এলাকা। তাই সেই প্রস্তাব পাল্টে দিয়ে বোম্বাই শহরকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ করে রাখবার প্রস্তাব আসতেও বেশী দেরী হল না। টোপ্ দেওয়া হল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বোম্বাই শহর হবে ভারতের দ্বিতীয় রাজধানী—মানে বাণিজ্যিক রাজধানী। ইঙ্গিতগুলি এতই পরিষ্কার যে মারাঠীরাও বুঝতে কিছুই ভুল করলা না। মারাঠীরা আরও ক্ষেপে উঠল, ভীষণ আন্দোলন শুরু হল। আন্দোলনকে সায়েস্তা করতে রাইফেল, মেশিনগান, বোমা কোনটাই আর বাদ থাকল না; তবুও অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে। বেগতিক বুঝে জহরলাল হঠাৎ বশংবদ পার্লামেন্টের উপর নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে শিবঠাকুর সাজলেন। পার্লামেণ্ট ভোটের জোরে মারাঠী আর গুজরাটীদের মিশিয়ে, বোম্বাই শহরকে রাজধানী করে আরও বৃহত্তর এক রাজ্য গঠন করে বস্‌লেন; কারণ এবার আর বিদর্ভ বলে কোন ভিন্ন মারাঠী রাজ্যের ব্যবস্থা থাকল না। মারাঠীরা সব এক বোম্বাই রাজ্যে এসে যাওয়ায় একটু শান্ত হল। এবার গুজরাটীরা ক্ষেপলেন, আমেদাবাদে ভীষণ গণ্ডগোল শুরু হল,—গুলিবৃষ্টি শুরু হতেও দেরি হল না। এবার গুজরাটীদের সায়েস্তা করবার জন্যই। বোম্বাইতে মারাঠীদের উপর গুলি চালাবার জন্য গুজরাটী পুলিশ আমদানী করা হয়েছিল। আমেদাবাদে মারাঠী পুলিশ এসেছিল কিনা সেটি অবশ্য খবরে প্রকাশ পায়নি। এইভাবেই গুলিতে ঘায়েল হয়ে মারাঠী আর গুজরাটীরা এক বোম্বাই প্রদেশেই শান্তিতে বসবাস করবার জন্য রাজী হল। আশা করা যায় তারা শান্তিতে না হোক অশান্তিতেই বাস করতে থাকবেই, এবং নানা ব্যাপারে ন্যায়নীতি লাভের জন্য দিল্লীর বড় কর্তাদের মুখের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে তাদের; দিল্লীর প্ল্যানের সফলতা প্রমাণ করবার জন্যই।

মারাঠী আর গুজরাটীদের স্বার্থের সংঘাত বাধাবার সুব্যবস্থা করে হিন্দিওয়ালারা যে প্ল্যানমাফিক অনেক কিছুই করে নিলে, সেত খুবই পরিষ্কার; কিন্তু এই Divide and Rule পলিসির পরিণাম যে শেষপর্যন্ত কি হতে পারে তা ভাববার মত মানসিক অবস্থা দিল্লীতে আজ আর নেই বলেই মনে হয়। আসলে এই বোম্বাই শহর নিয়ে এত হাঙ্গামা বাধাবার কি প্রয়োজন ছিল? বোম্বাই শহরটা যখন মারাঠীদের তখন সেটা ভদ্রভাবে তাদের দিয়ে দিলেই ত হ'ত। সেই ত হ'ত সত্যিকারের সুব্যবস্থা। তা না করে এত

হাঙ্গামা, এত গোলাগুলির প্রয়োজন দেখা দিল কিভাবে? প্রয়োজন ছিল ঠিকই; ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য, ভারতের ঐক্য আরও দৃঢ় করবার জন্য অরাষ্ট্রভাষীদের মধ্যে এরকম একটু মারামারি না থাকলে চলবে কেন! সব অহিন্দীভাষীরা এককাট্টা হয়ে গেলে হিন্দিভাষা যাবে কোথায়? আর হিন্দিভাষা যদি উঠেই যায় তবে কি আর ভারতের ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হবে! পরে অবশ্য, দিল্লির বড়কর্তাদের সব বোম্বাই চালাকিই বোম্বাইতে গিয়ে হোচট খেয়েছেন—মানে কোন চালাকিই শেষ পর্যন্ত খাটেনি। বোম্বাইকে মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেই মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট নামে দুই প্রদেশ সৃষ্টি করতে হয়েছে।)

পাঞ্জাবেও নানা রকম গোঁজামিল চালিয়ে পাঞ্জাবীদের ঠকাবার চেষ্টার ত্রুটী হয়নি। পাঞ্জাবীরা মোটামুটি হিন্দিভাষী হলেও, হিন্দিওয়ালাদের তাঁবেদারীতে চলতে নারাজ। তাই তাকেও ঠকাতে হবে—হিমাচল প্রদেশ জায়গাটুকু কিছুতেই পাঞ্জাবে দেওয়া যাবে না। এই না দেবার মতলব হাসিল করতে গিয়ে জহরলাল কত আবোল তাবোলই যে বক্‌লেন তার আর ইয়ত্তা নেই। শেষপর্যন্ত মাস্টার তারা সিং, আর শিখ সাম্প্রদায়িকতাকে মধ্যে খাড়া করে তাদের সন্তুষ্ট করবার অজুহাতে হিমাচল প্রদেশ আর কিছুতেই পাঞ্জাবে গেল না।

বাংলা, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং পাঞ্জাব এই প্রদেশগুলির উপরই অন্যায় করা হয়েছে সব চেয়ে বেশী, তাই বিক্ষোভও হয়েছে এই জায়গাগুলিতেই সবচেয়ে চরম। সরকার পক্ষ থেকে সত্যিকারের সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করবার ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয়েছে প্রায় সব জায়গাগুলিতেই। রাইফেল, মেশিনগান দিয়ে সরকার বিদ্রোহ দমন করেই তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন; ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার তাঁরা বোধ করেন নি। খণ্ড বিচ্ছিন্ন পশ্চিম বাংলার ঘাড়ের উপর চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ উদ্বাস্তু পড়ে রয়েছে, এবং প্রতিদিনই হাজারে হাজারে আরও আসছে; একথা চিন্তা করেও পশ্চিম বাংলাকে কিছু বেশী জমি দেয়া তাঁরা প্রয়োজন বোধ করেন নি। যেটুকু ন্যায্যত পশ্চিম বাংলার পাওয়া উচিত ছিল, সেটুকুও নয়। বরং তাঁরা পশ্চিম বাংলাকে একেবারে লুপ্ত করে দেবার প্ল্যানই তৈরী করেছিলেন;—পশ্চিম বাংলাকে বিহারের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে। নানা কারণে শেষপর্যন্ত পশ্চিম বাংলাকে একেবারে লুপ্ত করে দেওয়া অবশ্য হয়ে উঠেনি ঠিকই, কিন্তু রাজ্য

কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী পশ্চিম বাংলা যে ফকিরের মত ভিক্ষা লাভ করেছিল তা থেকেও অনেকটা কেটে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের বিচারবুদ্ধি এবং ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়েছেন, যে ন্যায়পরায়ণতা এবং বিচারবুদ্ধি বলেই তাঁরা ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ বজায় রাখতে চাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, পুরুলিয়া মহকুমার যে অংশটি শেষপর্যন্ত বাংলায় এসেছে, সেটুকু হস্তান্তরের সময় বিহার সরকার যেভাবে পুরুলিয়া থেকে সম্ভাব্য সকল প্রকার অস্থাবর সম্পত্তি সরিয়ে নিয়ে গেছেন তাও কম নয়ন-বিমোহন দর্শনীয় ব্যাপার হয়নি। এমন কি কোর্ট কাছারীর পুরোন টেবিল চেয়ার এবং জানালার পর্দাগুলি পর্যন্ত তাঁরা আর পুরুলিয়াতে রেখে যান নি। কলকাতার খবরের কাগজগুলো এসব ব্যাপারের অনেক ছবিও ছেপেছেন, কিন্তু কাউকে কোন উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায় নি, লজ্জা পাওয়া ত অনেক দূরের কথা। সম্ভবত ঐ সম্পত্তিগুলি পাটনাই বিহারীদের প্রেমের দান হিসাবেই পুরুলিয়াতে এসেছিল, তাই প্রেম ছুটে যেতেই ফেরৎ নিয়ে গেছেন। বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ভারতে আজকাল এধরনের কাজ-কারবার হামেসাই হচ্ছে, চক্ষুলজ্জারও কোন বালাই নেই। হিন্দি সাহিত্যের মারফৎ সংস্কৃতিবান হয়েই ত আজকাল সব নেতা হয়ে বসেছেন কিনা, তাই চক্ষুলজ্জার মত দুর্বলতা গজাতে একটু সময় লাগবে বইকি! মোট কথা, রাজ্যপুনর্গঠন ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃত্ব তাঁদের চরিত্রের ভেতরের দিকের যে প্রকাশ্য প্রদর্শনী দেখিয়েছেন, সেইটুকুই ভারতীয় জনগণের আপাতত একটা বড় লাভ হয়েছে। অন্য সব লাভ লোকসান তারা অবশ্যই ভবিষ্যতে দেখে নিতে পারবে।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও আরও বেশ কিছু দামি জিনিস এই রাজ্য-পুনর্গঠন আন্দোলনের সময় প্রকাশ পেয়ে গেছে। জহরলালের ঐ আত্মম্ভরিতার কথা "আমি প্রধান মন্ত্রীর চেয়েও বড়" (I am more than a Prime Minister), তারই মধ্যে। জহরলাল যে দিল্লীর মসনদে নূতন বাদশাহরূপেই দেখা দিয়েছেন, সেটা চোখে দেখলেও অনেকে ঠিক বুঝতে পারতেন না। বোধ হয় সেই জন্যই সুযোগমত জহরলাল কথাটা পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন, আর যেন কারও ভুল না হয়। ভুল হলে ভারতের রাজনীতি বুঝার চেষ্টা তার পক্ষে বৃথা চেষ্টা হবে। বোম্বেকে মহারাষ্ট্র থেকে বের করে কেন্দ্রীয় শাসনে রাখবার জন্য যখন কথা হচ্ছিল, সেই সময় মারাঠী রাজস্বমন্ত্রী দেশমুখ পদত্যাগ করে তার প্রতিবাদ জানান। প্রথমটা জহরলাল চুপ করেই থাকলেন,

তারপর দেশমুখ যখন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে জহরলালের বাদশাহী কার্যকলাপের অনেক গোপন কেচ্ছা প্রকাশ করে দিলেন, তখনও জহরলালের মুখে কথা ফুটলনা। অভিযোগগুলি যখন দিনের আলোর মতই পরিষ্কার, তখন মুখ ফুটিয়েই বা লাভ কি হবে। কিন্তু উত্তর না থাকলেও, কিঞ্চিৎ তেড়ে মেরে মেজাজ না দেখালে হিন্দি সংস্কৃতির সম্মান বাঁচান যায় কিভাবে! হিন্দি সংস্কৃতির শক্ত পুরুষ বুদ্ধিদাতা পন্থজী ত কাছেই ছিলেন; উৎসাহ পেতেও দেরি হল না। তাই জহরলাল আসলেন দেশমুখকে লাথি মারতে, কয়েকদিন পরে ঐ পার্লামেন্টেই। তৈরী হয়েই এসেছিলেন, তাই মুখে বলতে বাধলনা যে আমি প্রধানমন্ত্রীর চেয়েও অনেক বড়,—মানে আমি বাদশাহ। পাকিস্থানেও উজিরে আজমদের হামেশাই বাদশাহী করতে দেখা যায়, তবুও মুখে অতখানি দাম্ভিকতা প্রকাশ করবার মত অসভ্যতা তাঁরা কেউই এপর্যন্ত করেন নি। আর পাকিস্থানীরাও অতখানি দাম্ভিকতা হজম করবার মত ক্লীব হয়ে গেছে বলেও মনে হয় না।

জহরলাল কথাটি বলেছিলেন, বেশ ভেবে চিন্তেই বলেছিলেন, হঠাৎ বাৎ কি বাৎ বলে ফেলেন নি। তিনি যে তৈরী হয়েই এসেছিলেন তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে ভালভাবেই। ঐ দিনই পঞ্চ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট, যারা গত সাড়ে পাঁচ বছর ধরে প্রেসিডেণ্টের বাড়ীর পাহারায় ছিল (গার্ডমাউন্ট করছিল) তাদের সরিয়ে নিয়ে এক রাজপুতবাহিনীকে ঐ কাজে নিয়োগ করা হয়। খবরটি হয়ত অনেকেরই চোখে পড়েনি, কিন্তু যাঁরা জহরলালকে চেনেন, তাঁরা খবরটির মর্ম অনুভব করতে অসুবিধা বোধ করেন নি। জহরলাল খেলোয়াড় লোক, সবদিকে নজর রেখেই খেলছেন, বুঝে শুনেই খেল দেখাচ্ছেন। তাই রাজ্যপুনর্গঠন ব্যাপারে ঠকাতে গিয়ে পাঞ্জাবকে যখন ক্ষেপিয়েই তোলা হয়েছে তখন পাঞ্জাবী রেজিমেণ্টকে প্রেসিডেণ্টের বাড়ীর পাহারায় রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অতি-বুদ্ধিমানদের নেতৃত্বেই ভারত স্বাধীনতা অর্জন করছে; তাদেরই নেতৃত্বে ভারত স্বাধীনতার পথে উল্কাবেগে এগিয়ে চলেছে; ভারতের ভবিষ্যৎ মারে কে! ভয় শুধুই যে সেই শুভ ভবিষ্যতের দিন পর্য্যন্ত ভারত বাঁচবে ত!

ইতিমধ্যে পাকিস্থানেও ঐ রাজ্যপুনর্গঠনের মতই একটা ব্যাপার হয়েছে, যার ফলে পশ্চিম পাকিস্থানের চারটি প্রদেশকে এক করে এক পশ্চিম পাকিস্থান

প্রদেশ তৈরী করা হয়েছে, ঐ ভারতেরই মত একটি বিশেষ ভাষাগোষ্ঠির স্বার্থে, আর পাকিস্থানের বৃহত্তর স্বার্থের নামে। ক্ষমতা যাঁদের হাতে থাকে তাঁরাই শুধু দেশের বৃহত্তর স্বার্থগুলো ভালভাবে বুঝতে পারেন; মূর্খদের ভাবাবেগের মূল্য কিছুই নেই। তবে পাকিস্থানের এই কার্যটিও কোন শুভ ইঙ্গিত করে না।

পশ্চিম পাকিস্থানেও মুস্লিম লীগের এন্তেকাল

১৯৫৬ সালের প্রথমেই পাকিস্থানের রাজনীতিতেও এক বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেল। ক্ষমতাসীন মুস্লিম লীল দল, যাঁরা পাকিস্থান অর্জ্জন করে জনগণের মস্তক ক্রয় করেই বসে আছেন ভাবছিলেন, তাঁদের সুখস্বপ্ন প্রথম চুরমার হয়ে যায় ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গের সাধারণ নির্বাচনে। তবুও পশ্চিম পাকিস্থানের উপর ভর করে তাঁরা আবার নিজেদের অবস্থা ফিরিয়ে আন্‌তে পারবেন বলে আশা করছিলেন, কিন্তু ১৯৫৬ সালে পশ্চিম পাকিস্থানেও এবং বিনা নির্বাচনেই তাঁদের কপালে যে বিপর্যয় এসে গেল সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। স্বাধীনতা-পূর্বযুগের কংগ্রেসী নেতা ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব, পাকিস্থান অর্জন করবার পর মুস্লিম লীগ যাঁকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং যিনি স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে একজন বিশিষ্ট পাকিস্থান-বিরোধী নেতা ছিলেন। তিনিই ক্রমে ক্রমে পশ্চিম পাকিস্থানে ক্ষমতাসীন হতে থাকেন এবং পশ্চিম পাকিস্থানের চারটি প্রদেশ যখন একসঙ্গে মিলিয়ে একটি প্রদেশ করা হয়, তখন সেই প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে বৃত হন। প্রথমে মুস্লিম লীগ অবশ্য তাঁকে তাঁদের নিজেদের স্বার্থের কাজে লাগাতে গিয়েই সমর্থন জানিয়েছিলেন; কিন্তু যখন কাজ হাসিল হবার পর তাঁকে বিতাড়িত করবার মতলবে প্যাঁচ কষতে আরম্ভ করেন, তখন মুস্লিম লীগই তাঁর কাছে প্যাঁচ খেয়ে উল্টে পড়েন। বেশীর ভাগ মুস্লিম লীগ এম. এল. এ-ই ডাঃ খান সাহেবকেই সমর্থন করেন এবং মুস্লিম লীগ ছেড়ে এসে ডাঃ খানসাহেবের নূতন গঠিত রিপাব্লিকান পার্টিতে যোগ দেন। পশ্চিম পাকিস্থানেও মুস্লিম লীগ ক্ষমতাচ্যুত হন, এবং মুস্লিম লীগ সংস্থাও প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। মাত্র দশ বৎসর না যেতেই পাকিস্থান-অর্জনকারী মুস্লিম লীগের এই বিপর্যয় এক অদ্ভুত দর্শনীয় ব্যাপার সন্দেহ নেই। তবে মুস্লিম লীগ ভেঙ্গেছে খুব স্বাভাবিক নিয়মেই। ভাঁওতা আর ভণ্ডামি যে জনসাধারণকে বেশীদিন ঠকিয়ে রাখতে পারে না, এ সত্যটি প্রমাণ

করবার জন্যই। তাই মুস্লিম লীগের এই বিপর্যয়ে সহানুভূতি দেখাবার আজ কেউই নেই।

আবুহোসেন সরকারের মন্ত্রীত্ব পতন ও কংগ্রেসী রাজনীতি

১৯৫৫ সাল থেকে পূর্ববঙ্গে আবুহোসেন সরকারের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজাদল, কংগ্রেস এবং অন্য কয়েকটি ছোটদলের সহায়তায় মন্ত্রিসভা গঠন করে রাজত্ব করছিলেন। সরকার সাহেব আমাদের নিজস্ব লোক। স্বাধীনতা যুদ্ধের আমলে তাঁর ত্যাগ, তাঁর সততা, তাঁর কর্মতৎপরতা শুধু মুসলমানদের মধ্যেই নয়, তাঁকে হিন্দুদের মধ্যেও এক বিশেষ সম্মানের আসন দিয়েছিল। তাঁর মত ভাল লোক রাজনীতিতে কমই দেখেছি; তাই খুবই আশা হয়েছিল যে এবার পূর্ববাংলার কপাল ফিরেছে। মন্ত্রিত্ব চলতে থাকাকালে কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য বুঝতে ভুল হল না যে তিনি কিছুই করতে পারছেন না। পারিপার্শিক অবস্থাগুলি যে তাঁর কাজ করবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল না সে খুবই সত্যিকথা। তবুও সত্যের খাতিরে এটুকু অবশ্যই বলতে হবে যে, তাঁর পিছনের দলগুলির পরস্পর-বিরোধী আদর্শ এবং কার্যকলাপও তাঁর কাজের সহায়ক ছিল না। আর তাঁর নিজের দল বলে পরিচিত কৃষক-প্রজাদলকে ত একটা সুসংবদ্ধ দল বলাই কঠিন। ফলে যা হয়, কিছুই হচ্ছিল না শুধুই মন্ত্রিগিরী ছাড়া। কিছুদিন পর আমাদের কংগ্রেস দল মন্ত্রিত্ব ছেড়ে তাঁর পেছন থেকে সরে আসে, অথচ এই কংগ্রেস দলই ছিল পূর্ববঙ্গের রাজনীতিতে ভারসাম্য রক্ষাকারী অবস্থায়,—যেদিকে যাবে তারাই মেজরিটি হবে। কংগ্রেস সরে যাবার ফলে আবুহোসেন সরকারের মন্ত্রিত্ব আরও বেকায়দায় পড়েছিল। আমরা কয়েকজন অবশ্য, কংগ্রেস যাতে আবার আবুহোসেন সরকারের সাথে হাত মেলায়, তারই জন্য চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সুবিধা হয় নি।

ইতিমধ্যে কলকাতায় রাজ্যপুনর্গঠন আন্দোলন বেশ জমে উঠেছে দেখে মজা দেখবার জন্য কলকাতায় উপস্থিত হয়েছি। হঠাৎ খবর পেলাম, সরকার সাহেবের সাথে পাকিস্থান কংগ্রেসের গণ্ডগোল মেটান যায় কিনা তারই একটা শেষ চেষ্টা করে দেখবার জন্য ডাক পড়েছে। তা নাহলে সরকার সাহেবের মন্ত্রিত্ব আর টেকেনা। তাই ঢাকায় যেতে হল, কিন্তু গিয়েই বুঝতে পারলাম যে গণ্ডগোল মেটবার নয়। ওটা আদর্শগত রাজনীতি থেকে ব্যক্তিগত রাজনীতিতে

নেমে এসেছে। কংগ্রেস থেকে কার বদলে কে মন্ত্রী হবেন সুরাবর্দি সাহেবের সঙ্গে সে সব কথাও ঠিক হয়ে গেছে। শ্রীমনোরঞ্জন ধর কংগ্রেস সেক্রেটারীই এ বিষয়ে বিরোধীপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে ফেলেছেন।

কংগ্রেস এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে যুক্ত-নির্বাচনের দাবি করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ঐ যুক্ত-নির্বাচনের ব্যবস্থা কায়েম হলে যে একজন হিন্দুও আর আইনসভায় আসতে পারবেন না সে কথাটুকু ভেবে অনেকেই যুক্ত-নির্বাচনের সঙ্গে সংরক্ষিত আসনের দাবি তুলেছিলেন। কংগ্রেস রাজনীতির পক্ষে তখন এই সংরক্ষিত আসনের প্রশ্নটাই ছিল বড় প্রশ্ন। তাই ঐ ব্যাপারে সুরাবর্দি সাহেব কতটা দিতে রাজী হয়েছেন জিজ্ঞাসা করায় যখন জানতে পারলাম যে, তিনি তপশিলীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণই মেনে নিয়েছেন, আর বর্ণ-হিন্দুদের আসন কটিও সংরক্ষিত করবার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন কথা দিয়েছেন। তখন সরকার সাহেবকে সংখ্যালঘুদের জন্য সব কটি আসনই সংরক্ষিত রাখা হবে, এই রকমের কথা দেবার জন্য পরামর্শ দিয়ে আমি ঢাকা ছাড়লাম। সরকার সাহেব কংগ্রেসী নেতাদের সাথে আপোসের আরও অনেক রকমের চেষ্টা করেছেন কিন্তু তবুও আপোষ হওয়া সম্ভব হয় নি। সরকার সাহেব তলিয়েছেন, দুঃখ করে লাভ নেই। রাজনীতি তাঁর মত ভাল মানুষের জন্য নয়;—ওটা একেবারে ছেড়ে দিলেই তিনি বুদ্ধিমানের কাজ করবেন।

আমার পাকিস্তানী কংগ্রেস দল আবার নূতন মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন কিন্তু হিন্দুদের জন্য কোন আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। সুরাবর্দি সাহেব যতটুকু অঙ্গীকার করেছেন বলে শুনেছিলাম, ততটুকুও যে কেন হল না, তা আজও বুঝতে পারি নি। কংগ্রেসের বড় নেতা, যাঁরা মন্ত্রী হবার জন্য আশে পাশে ঘুরে বেড়ান তাঁরাও এ ব্যাপারে একেবারেই নির্বাক— যেন কিছুই হয়নি। সুরাবর্দি সাহেব মিথ্যে স্তোক দিয়ে কংগ্রেসকে ঠকিয়েছেন, না মনোরঞ্জন ধর মন্ত্রী হবার আশায় মিথ্যা কথা বলেছিলেন, তাও আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে রাজনীতি এই রকমই,—ভারতেও যেমন পাকিস্তানেও ঠিক তেমনি; আমি মন্ত্রী হতে পারলেই হল। ভবিষ্যতের আইন সভায়, একজনও সংখ্যালঘু আসতে পারবে কি না-পারবে, অতটা আজই চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই। সময় মত দু'চারটে বোলচাল ঝেড়ে কলকাতা গিয়ে উদ্বাস্তু নেতা হলেও কাজ চালিয়ে নেয়া যাবে। আর, আগামী আইন সভায় একজনও

সংখ্যালঘু সদস্য আসতে না পারার সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেস নামক বিরাট প্রতিষ্ঠানটিরও এন্তেকাল হইল।

নাগা পাহাড়ে বিদ্রোহ

ইতিমধ্যে আসামের নাগা হিল জেলার পার্বত্য অঞ্চলে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা কার্যত নাগা হিল জেলাকে তাদেরই অধিকারে নিয়ে ফেলে। সশস্ত্র বিদ্রোহকে দমন করবার জন্য ভারত সরকার সশস্ত্র ব্যবস্থা কিছু কম করেন নি, তবুও আজ পর্যন্ত সে বিদ্রোহ দমন কার্য কিছুই অগ্রসর হয়েছে বলে মনে করবার কোন কারণও ঘটেনি। বরং প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে যে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ ক্রমেই আরও ছড়িয়ে পড়ছে।

আসামের নাগারা যে স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি তার প্রমাণ ইংরেজ আমলেও অনেকভাবেই পাওয়া গেছে। ইংরেজের অধীনতাও তারা কোনদিনই পুরাপুরি-ভাবে স্বীকার করেনি,—আগাগোড়াই সেখানে লড়াই বিদ্রোহ লেগেই ছিল। ইংরেজ তাদের সাথে অনেক লড়াই করলেও শুধু ঐ লড়াইয়ের পথেই যে স্বাধীনতাপ্রিয় নাগাদের বশ করা যাবে না, সে কথাটাও বুঝতে ভুল করেনি; তাই ঐ নাগা পাহাড়ে তারা রাইফেল মেশিনগানের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়েছিল অনেক মিশনারীকে। যার ফলে নাগাদের অনেকেই আজ খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে এবং আজও ঐ নাগা পাহাড়ে ইংরেজ মিশনারীদের আধিপত্যই সবচেয়ে বেশী। ভারতে ইংরেজ শাসনের শেষের দিকে নাগারা যে অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছিল, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। অন্ততপক্ষে, জাপানীদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় নাগারা যে জাপানীদের পক্ষে যায়নি বরং তাদের বাধাই দিয়েছিল, তার প্রমাণও অনেকই পাওয়া যাবে।

এই নাগারাই আবার ভারত স্বাধীন হবার পরে তাদের স্বাধীনতা নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করে। ভারতের স্বাধীনতা বা খণ্ডিত-ভারতের নাগরিক হিসাবে গর্ব করবার মত ভারতীয় সংস্কৃতি যদি নাগাদের না থেকে থাকে, তাহলে সে দোষ যে তাদের নয়, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই; কারণ ভরেতের সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে ঐ সব উপজাতির সম্পর্ক কোন দিনই বিশেষ ছিল না বা এখনও নেই। ভারতের শিক্ষাদীক্ষা বা সংস্কৃতি তাঁদের কাছে পৌছাবার চেষ্টা পূর্বেও কোনদিনই হয়নি, ভারত স্বাধীন হবার পরও নয়। দু'চারজন সাধারণ ভারতীয়কে তারা যেটুকু জানবার সুযোগ পেয়েছে, তাদের

সে অভিজ্ঞতাও খুব মধুর নয়। দু'চারজন সাধারণ ভারতীয় যারা নাগা পাহাড়ে যাতায়াত করেছেন তাঁরা সবাই ব্যবসায়ী এবং গিয়েছেনও সেখানে সরল নাগাদের ফাঁকি দিয়ে টাকা লুটবার উদ্দেশ্যেই। শুধু আসামের নয়, সমগ্র ভারতের সব উপজাতির সঙ্গে সাধারণ ভারতীয়দের প্রায় এই একটি মাত্র সম্পর্কই আজও রয়েছে। মোটকথা, এই সব উপজাতিদের ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের মাধ্যমে, ভারতীয় করে তোলবার চেষ্টা ইংরেজ আমলেও যেমন হয়নি আজও ঠিক তেমনি হচ্ছেনা। যে যেখানে আছ, ঠিক তেমনি থাক, শুধু সরকারের প্রয়োজন মত ট্যাক্স জোগাও আর সরকারী আইন সব মেনে চল, এই যখন অবস্থা, তখন স্বাধীন ভারতেও যে ঐ ধরনের উপজাতিরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই থাক্‌তে পারে না। নাগা পাহাড়ের পাশেই মণিপুর। সেও পাহাড়ী জায়গা এবং পাহাড়িয়া উপজাতিদেরই বাস সেখানে, কিন্তু মণিপুরীরা আজ নিজেদের উপজাতি মনে করেনা। তারা নিজেদের ভারতীয়ই মনে করে, কারণ কয়েকশত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী বৈষ্ণবরা তাদের শুধু বৈষ্ণব ধর্মেই দীক্ষা দেয়নি, তাদের পুরোপুরি ভারতীয়ই তৈরী করে ফেলেছে।

স্বাধীনোত্তর ভারতে এসব মিশনারী কাজ আরম্ভ করাও যে সম্ভব নয়, তাও খুবই পরিষ্কার। ভারত আজ পৃথিবীর অন্য বহু সমস্যা সমাধানে যত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাতে এসব ক্ষুদ্র বিষয়ে দৃষ্টি দেবার তাঁর সময়ই বা কোথায়! আর এসব মিশনারী কাজ ইতিপূর্বে যা হয়েছে বা ইউরোপীয় পাদ্রীরা এখনও যা করছে, তা সবই ধর্মের ভিত্তিতে। তাই ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে সরকারী পর্যায়ে সে রকম কাজ করাও আর মোটেই সম্ভবপর নয়। নাগাদের তাই ভারতীয় করবার চেষ্টা হচ্ছে শুধু বুলেট-চিকিৎসায়। বুলেট-চিকিৎসাই আজ ভারতের সর্ব-রোগহর প্রধান দাওয়াই হিসাবে দেখা দিয়েছে। তবে বুলেট-চিকিৎসা আজ কয়েক বছরের উপর চলা সত্ত্বেও খুব যে ফলপ্রদ হয়নি, সেটাও খুবই সত্যিকথা। আর অন্য সত্যিকথাটি হচ্ছে এই যে, ঐ ব্যারাম আরও ছড়িয়ে যাচ্ছে। আসামের উপজাতি এলাকাগুলির খবর যাঁরা কিছু রাখেন তাঁরাই জানেন যে, অন্যান্য সব জায়গার অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়, নাগাদের অস্ত্রশস্ত্রের যে সুবিধাটুকু আছে সেটুকু অবশ্য অন্য কোথাও এখনও নেই, তাই অবস্থা বেশী বিগড়াতে পারে নি।

নাগাদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির অভাব, বা তাঁরা স্বাধীন ভারতের অধীনে

থাকতে চায় না, এসব কথা বলে সম্পূর্ণ দোষ তাদের উপর চাপাবারও কোন মানে হয় না। যতদূর জানা যায়, আইনসঙ্গতভাবে আলোচনার মাধ্যমে তারা একটা আপোষ করবার চেষ্টাও অনেকদিন থেকেই করে আসছিল ; কিন্তু এপর্যন্ত নাকি তারা ভারতের বড় কর্তাদের কাছে একবারও এগোবারই সুযোগ পায় নি। শ্রীজহরলাল যখন ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী উ'নুকে নিয়ে ঐ অঞ্চলে বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন, তখনও তিনি নাগা নেতাদের সাথে ঐ বিষয় আলোচনা করতে রাজী হননি। বরং তাঁর বক্তৃতাসভা থেকে চলে আসবার অজুহাতে অনেকদিন পর্যন্ত নাগাদের উপর অনেক অত্যাচারও করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন নাগাপাহাড়ে গিয়েছিলেন তখনও নাকি নাগাদের একটি আবেদন পেশ করতে দেয়া হয়নি। ভারতের কংগ্রেস সভাপতির সফরকালেও তাই হয়েছে। অনেক লেখালেখি করবার পর দিল্লী থেকে নাগাদের কয়েকজনকে দেখা করবার জন্য একবার ডেকে পাঠান হয়েছিল, কিন্তু আসামের রাজধানী শিলংয়ে সেই নিমন্ত্রণ-পত্রটিকে চেপে রেখে নিমন্ত্রণের দিন অতিবাহিত হবার পর নাগাদের কাছে পৌছে দেয়া হয়! এইভাবেই কাজকর্ম সব হচ্ছে। নাগারা ঐ নিমন্ত্রণপত্র দেরিতে পাবার অজুহাতে অন্য একদিন দেখা করবার দিন ধার্যের অনুরোধ জানালেও তার কোন উত্তর আসে নি। তাই ব্যাপারটা শুধুমাত্র নাগাদের ভারত-বিদ্বেষী মনোভাবের জন্যই হয়েছে একথা বলার কোন মানেই হয় না। নাগাপাহাড়ে মিশনারী কাজ এখনও ইউরোপীয় পাদ্রীরাই চালাচ্ছে। এই ইউরোপীয় পাদ্রীদের উপর ঐ কাজ চালাবার সুবিধার জন্য প্রধানত একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে—হিন্দির মাধ্যমে শিক্ষা প্রচার করতে হবে। তাই ওসব ক্ষুদ্র ব্যাপারে নজর দেবার প্রয়োজনও আর নেই ; বাকিটা বুলেট-চিকিৎসায় ঠিক হয়ে যাবে।

এই লেখাটি শেষ হয়ে (প্রথম সংস্করণ) ছাপাখানায় যাবার পরে সদ্য মণিপুরপ্রত্যাগত এক বন্ধুর সাথে দেখা হতে নাগাদের বিষয় শেষ খবর যেটুকু পেয়েছি তা মোটামুটি হচ্ছে এই যে, নাগারা ভারতের বাইরে গিয়ে নয় ভারতের ভেতরই তাঁদের জেলাটিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত এলাকা হিসাবে পেতে চায়, তাদের দাবি অন্য কিছুই নয়। উচ্চপদস্থ একজন সামরিক অফিসারের সাথে আলাপ করেই বন্ধু নাগাদের বিষয় এটুকু জান্‌তে পেরেছেন। উচ্চপদস্থ ঐ সামরিক অফিসারটি নাকি নাগাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে মন্তব্য করেছেন যে, সামরিক পন্থায় সমাধান করবার মত সমস্যা নাগাপাহাড়ে নেই, নাগাদের সমস্যা

সম্পূর্ণই রাজনৈতিক, এবং রাজনৈতিক পন্থায়ই তার সমাধান করতে হবে। তিনি নাকি আরও মন্তব্য করেছেন যে সমস্যাটি কিছু কঠিনও নয়, নেতারা একটু 'সিরিয়াস' হলেই অতি সহজেই এটিকে মিটিয়ে ফেলা যেতে পারে। সামরিক অফিসার ভদ্রলোক যে সমস্যাটিকে ঠিকই বুঝেছেন তাতে কোন ভুল নেই, আর সমাধানের যে পথের ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, সেটাই যে সত্যিকারের সমাধানের পথ সে বিষয়েও কেউ সন্দেহ করে না; কিন্তু তবুও কেন যে সমস্যাটির এখনও সমাধান হচ্ছে না, সেটাই আশ্চর্য। সামরিক অফিসার ভদ্রলোকও বোধ হয় আশ্চর্য হয়েছেন। তবে তিনিও যে ভুলই বুঝেছেন তাতেও কোন ভুল নেই, কারণ তিনিই মন্তব্য করেছেন যে নেতারা 'একটু সিরিয়াস' হলেই ব্যাপারটা মেটান যেত। এই 'একটু সিরিয়াস' হওয়া কাজটি যে অত সোজা কাজ নয়, সেইটুকুই শুধু তিনি বুঝতে ভুল করেছেন। তাই নাগা সমস্যার সমাধান আজও সম্ভব হয় নি। আসলে নাগাপাহাড়ের সমস্যা, নাগাদের বিদ্রোহের সমস্যা নয়, নেতাদের 'একটু সিরিয়াস' না হতে পারারই সমস্যা। শুধু নাগাদের সমস্যাই নয়, ভারতের বহু সমস্যারই মূল কারণ হচ্ছে এইটি, অন্য কিছুই নয়। (এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর অবশ্য, ভারত সরকার অনেকটাই নিচুতে নেমে এসেছেন এবং নাগা অঞ্চলের খানিকটা কেন্দ্রীয় শাসনে নিয়ে ঐ সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু তবুও সমস্যা সমাধান হয়নি মোটেই। সময়ের কাজ সময়ে না করলে এই রকমই হয়।)

মিশর কর্তৃক সুয়েজখাল দখল

১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু কমনওয়েল্থ কনফারেন্স উপলক্ষে লণ্ডনে যান। মাঝে মাঝে অবশ্য ইউরোপ না গেলে তাঁর শরীর বা মন ঠিক তাজা থাকে না, সেটাও একটা কারণ বটে। ফিরবার পথে ব্রিয়ানি দ্বীপে যুগোশ্লোভিয়ার প্রেসিডেণ্ট টিটো আর মিশরের প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী যা করেন তাই একটা ভীষণ ব্যাপার এবং ঐতিহাসিক ব্যাপার হয়। এটারও সেইরকমই প্রচারকার্য হয়। তবে আসলে খানাপিনা বাদে আর যে কি তাঁরা করেছিলেন তা কেউই জানতে পারেনি। শোনা যায়, এই বৈঠকে মিলিত তিন নেতার নেতৃত্বে এক নিরপেক্ষ ব্লক তৈরী হবে, এবং আরও অনেক কিছু।

শ্রীনেহেরু ভারতে ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই খবর পাওয়া গেল মিশরের

ডিক্টেটার নাসের সুয়েজখাল জাতীয়করণ করেছেন এবং খালের পরিচালনা ক্ষমতাও নিজ দখলে নিয়েছেন। কারণ হচ্ছে কিনা, ইংরেজ ও আমেরিকানরা 'আসোয়ান ডাম' তৈরী করবার জন্য মিশরকে যে টাকাটা দিতে চেয়েছিল শেষপর্যন্ত একটা বাজে অজুহাতে সেটা না দেবার সিদ্ধান্ত করেছে। নাসের এবার সুয়েজ খালের লাভের টাকা দিয়েই 'আসোয়ান ডাম' তৈরী করবেন।

ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। সুয়েজখাল একটা অতি ভীষণ প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক জলপথ। ইউরোপ আমেরিকার অনেক জাতিরই ওটা একটা জীবনমরণ সমস্যা বিশেষ। তাই এই জলপথ যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁরা কি অত সহজে এটাকে ছেড়ে দেবেন? আর যদি না ছাড়েন তাহলে মিশর কি গায়ের জোরে পারবে? নাসের মিলিটারীর লোক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু শ্রীনেহেরুর বন্ধুও বটেন, তাই কথায় কম যাবেন কেন, বাৎচিৎসেই সব মেরে দিতে থাকলেন। আর বন্ধু শ্রীনেহেরু ত আহ্লাদে আটখানা। অনেকদিন পরে আবার শান্তিস্থাপন করবার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। গণ্ডগোলটা এখন হঠাৎ করে আপোষ না হয়ে গেলেই রক্ষা। সুয়েজখাল বেদখল হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ইংরেজ আর ফরাসীরা যে ভাব দেখালেন তাতে পরিষ্কারই বুঝা গেল যে এবার আর তাঁরা সহজে ছাড়বেন না। নাসেরও মিলিটারীর লোক মেজাজও মিলিটারী মার্কা, তার উপর বিরাট বন্ধু রয়েছেন শ্রীনেহেরু, তিনি কার তোয়াক্কা রাখেন! লম্বাই চৌড়াই সমানেই চলতে থাকল। নাসের যে বিজ্ঞ ব্যক্তি সে বিষয়েও কোন ভুল নেই বা থাকতে পারে না, কারণ ক্ষমতা হাতে থাকলেই সবাই বিজ্ঞ হয়। শুধু বুঝতে একটু ভুল করলেন যে, তিনি নিজেও কানা আর দাদা নেহেরুও চোখে দেখেন না। তাই শেষপর্যন্ত শুধু বাৎচিৎসেই সব ফয়সালা হবে না। হয়ও নি। বেশী তাড়াতাড়ি আগাতে গিয়ে তিনি মিসরকে অনেকটাই পেছিয়ে দিয়েছেন। মিশর যে ধাক্কা খেয়েছে তার টাল সামলাতেই অনেকদিন লেগে যাবে। তবে ইদানীং তিনি কিছুটা অভিজ্ঞ হয়েছেন বলেই মনে হয়—কথাবার্তা একটু বুঝেশুনেই বলছেন।

সুরাবর্দি সাহেবের গদী লাভ

মিশরে সুয়েজখাল নিয়ে গণ্ডগোল বাধবার আগেই ভারত এবং পাকিস্থানে আরও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। পরিবর্তনগুলি খুব বেশী না হলেও তাৎপর্য্যপুর্ণ বটেই। আগেই বলেছি যুক্ত-নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হবার সঙ্গে

সঙ্গেই পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেস নামক বিরাট প্রতিষ্ঠানটিরও এন্তেকাল হল। বলেছি এই জন্যেই যে পাকিস্থান কংগ্রেস তার লিখিত আদর্শ বা সদিচ্ছার দিক থেকে যতই সর্বপাকিস্থানীয় বলে দাবি করুকনা কেন আসলে একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। আর হিন্দুদেরই যখন আইন সভায় যাওয়া প্রায় এক রকম অসম্ভব হল তখন কংগ্রেস সংস্থা টিকবে কিভাবে? রাজনীতির রস যেটুকু ছিল, তাত ঐ আইনসভার সদস্যগিরির মধ্যেই। আজকাল কংগ্রেসের অনেকে অবশ্য ভারতীয় হাইকমিশন অফিস থেকে ভিসা সংগ্রহের কাজ করে দেশসেবা এবং নিজেদের সেবাকার্যও চালাচ্ছেন ঠিকই, তবুও একমাত্র ঐ ভিসা সংগ্রহের রসে কি আর একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে?

পূর্ববঙ্গে আবুহোসেন সরকারের মন্ত্রিত্ব পতনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান মন্ত্রী দ্বিতীয় মহম্মদ আলি, যিনি তাঁর বাকসংযম ও ভদ্র ব্যবহারের জন্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনিও পদত্যাগ করেন। পশ্চিম পাকিস্থানেও মুসলিম লীগের লালবাতি জ্বলবার জন্যই,—তাঁর আর অন্য উপায়ও ছিল না। তবে আপাতত তিনি মুসলিম লীগের সাঙ্গপাঙ্গদের দুর্ব্যবহারের জন্যই মন্ত্রীগিরিতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন। প্রধান মন্ত্রী হবার জন্য সুরাবর্দ্দি সাহেব ওৎপেতেই বসেছিলেন, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাও সুরাবর্দ্দি সাহেবের মত কাজের লোকই একজন খুঁজছিলেন;-তাই সুরাবর্দ্দি সাহেবই প্রধান মন্ত্রীর গদী পেয়ে গেলেন। প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দ্দি সাহেব হলেন ঠিকই, কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিষদে তাঁর নিজের দলের সদস্যসংখ্যার অনুপাত যে রকম দুর্বল তাতে মন্ত্রিত্ব করতে হলে যে তাঁকে প্রেসিডেন্টের হাতেই খেলতে হবে, তাতেও আর কোন সন্দেহ থাকল না। সুরবর্দ্দি সাহেবই এখন পাকিস্থানের আশাভরসা। কর্মীলোক হিসাবে অনেকেরই তাঁর উপর আস্থা আছে মনে হয়। আপাতত কিছু দিন থেকে আমার মত অনেকেরই তাঁর উপর একটা ভাল ধারণাই হয়েছিল—হাজার হক দশটি বছর বিরোধী দল চড়িয়ে বেড়িয়েছেন ত! অনেকটাই বিজ্ঞ হয়েছেন আশা করেছিলাম। কিন্তু মন্ত্রী হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যে হারে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন। তাতে কাজ বেশী এগোবে বলে আশাকরা কঠিন। এখন মনে হচ্ছে যে তিনি দশবৎসর বিরোধী দলে থাকলেও ঐ যে মাস কয়েক গান্ধীজীর সাথে ঘুরেছিলেন তাতেই সব পয়মাল করেছেন। তবে তিনি সবেমাত্র আরম্ভ করেছেন, তাই

আগে থাকতেই আর বেশী ব্যাগড়া কাটতে চাই না। (আমি ব্যাগরা না কাটলেও সুরাবর্দি সাহেব টিকতে পারেন নি। ইতিমধ্যেই তিনি আবারও বেকার হয়েছেন।)

নেতাজী এনকোয়ারী কমিশন

ভারতে আবার কি হল বলা কঠিন। ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার হঠাৎ নেতাজী সুভাষচন্দ্র সুস্থ শরীরে স্বর্গারোহণ করেছেন, তাই প্রমাণ করবার জন্য এক কমিশন তৈরী করে বসলেন। অনেক সাক্ষীসাবুদ যোগাড় করে এবং অনেক দলিলপত্র ঘেঁটে, সেই কমিশন নেতাজী স্বর্গে গিয়ে সুস্থ শরীরেই আছেন বলে এক রিপোর্ট দিতেও দেরি করল না। কমিশনের একজন সদস্য আবার উল্টো কথাবার্তা বলে কেমন একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টিও করলেন। তিনি ভিন্ন এক রিপোর্টে জানালেন যে, নেতাজীর মৃত্যু প্রমাণ হবার মত যথেষ্ট প্রমাণ কিছুই নেই। বরং তিনি যে পালিয়ে রাশিয়া গেছেন সেইটাই বিশ্বাসযোগ্য। কোন্‌টা বেশী বিশ্বাসযোগ্য তা আপাতত বুঝা খুব সহজ নয় ঠিকই, তবে কমিশনের সম্মুখে সাক্ষীদের সাক্ষ্যে এবং গোপন যেসব দলিল প্রকাশ পেয়েছে, তাতে নেতাজীর স্বর্গারোহণ ব্যাপারে অনেকেরই এবার সন্দেহ জেগেছে। সত্যিকথা বলতে কি, আমি নিজে কখনও বিশ্বাস করিনি যে নেতাজী এখনও বেঁচে থাকতে পারেন। কিন্তু এই কমিশনের ঘটনাবলীর পর আমারও বেশ রীতিমত সন্দেহ জেগেছে। কমিশন তৈরী করবার ব্যাপারে, এবং কমিশনের রিপোর্ট পার্লামেন্টে উপস্থিত করবার ব্যাপারে শ্রীনেহেরুর কার্যকলাপও মোটেই সন্দেহাতীত নয়। তারপর কমিশনের বিরোধী সদস্যকে চাপ দিয়ে একমত করবার চেষ্টা এবং তবুও একমত না হবার পরে, তাঁর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার; তাঁকে রিপোর্ট লেখার সময় না দিয়েই বাকি দুজনের রিপোর্ট পার্লামেন্টে পেশ। এসব মিলিয়ে যে একটি রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে, সেটা খুব ভাল ইঙ্গিত বলে কখনই মনে হয় না। ইংরেজ আমেরিকার নেতাজী সম্পর্কে গোপন রিপোর্ট, যা এতদিন ভারত সরকারের হাতেই ছিল সেটাই বা ভারত সরকার এতদিন চেপে থাকলেন কেন? এসব অনেক প্রশ্নই আজ মনে হচ্ছে। ঐ গোপন রিপোর্টে যখন ছিল যে রাশিয়ার 'প্রাভদা' কাগজ খবর দিচ্ছে নেতাজী রাশিয়াতে আছেন, আরও দু'জন রুশ কূটনৈতিক নেতাজী রাশিয়াতে আছেন বলে স্বীকার করেছেন তখন

নেতাজীর খোঁজে রাশিয়াতে লোক না পাঠিয়ে, নেতাজীর মৃত্যু প্রমাণ করবার জন্য কমিশনকে জাপানে পাঠাবারই বা মানে কি? ব্যাপার কি? জহরলাল এত ঢাকঢাক করছেন কেন? এ কেনর উত্তর কে দিতে পারেন জানি না। তবে কিছুদিন আগে কলকাতার এক ট্রামে ঘুরে বেড়াবার সময় নেতাজী সম্পর্কে একটা খুব হট আলোচনা শুনেছিলাম, যা মোটামুটি হচ্ছে এই যে, নেতাজী রাশিয়াতে আছেন, আধাবন্দী অবস্থায়। জহরলাল সে খবর জানেন, এবং রাশিয়া যাতে নেতাজীকে ভারতে পাঠিয়ে না দেয় সেই জন্যই জহরলাল আজকাল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়ার দালালি করেন; এবং এই জন্যেই তাঁর প্রমাণ করা দরকার নেতাজী সশরীরে স্বর্গারোহণ করেছেন। ট্রামে, বাসে যেসব আলোচনা শুনি, ট্রাম বাস থেকে নেমে আসবার পর সেগুলি আর বিশেষ মনে থাকে না, কিন্তু এই আলোচনাটি আজও মনে আছে; সম্ভবত মনে একটু দাগও কেটেছে।

সুয়েজ ক্যানেল রাজনীতিতে ভারতের অবদান

মিশর, নাসের বা ইংরেজ ফরাসীর সুয়েজখালের রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার কোন প্রয়োজন নেই, তবুও সুয়েজ ক্যানেলের রাজনীতিটি ভারতকে এমন ভীষণভাবে জড়িয়ে ফেলেছে যে, ভারতীয় রাজনীতি বুঝবার জন্যই ও ব্যাপারের কিছুটা আলোচনা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ভারতের শান্তিবাদী রাজনীতি (peace-mongers politics) আজ যে কত ভীষণ নষ্টামী হিসাবে দেখা দিয়েছে, তার আলোচনার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। ভারতের এই সস্তায় নাম কেনার অসৎ ইচ্ছাই আজ মিশরের দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা, কে বলতে পারে! অদূর ভবিষ্যতে ভারতের এই রাজনীতি যে ভারতকেও কোথায় নিয়ে ফেলতে পারে, তাও বলা কঠিন। সুয়েজখালের ব্যাপারটা তাই বিশদভাবেই আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। আলোচনাটি অবশ্য, সাধারণত ভারত বা পাকিস্থানে সুয়েজখালের বিষয়ে যে ধরণের আলোচনা হয়, তার বিপরীত দিক থেকেই হচ্ছে; তাই কেউ যেন না মনে করেন যে ইংরেজ-ফরাসীর মিশর আক্রমণের কাজটি সমর্থন করা হয়েছে।

মিশর দেশের সুয়েজ নামক জায়গা দিয়ে একটি খাল কেটে পূর্বে লোহিত সাগর আর পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের সংযোগ সাধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব আর পশ্চিমের মধ্যে যাতায়াতের পথ সংক্ষিপ্ত করা। কাজটি করেছে

একটি ফরাসী কোম্পানী একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারের নেতৃত্বে। এই কোম্পানীর বেশীর ভাগ শেয়ার ফরাসীদের হাতে; অল্প কিছু শেয়ার অন্য কয়েকটি দেশের হাতেও ছিল। মিশরের খাদিভের একটা মোটা শেয়ার ছিল, এবং প্রথম দিকে ইংরেজের কোন শেয়ারই ছিল না। একটু বেশীমাত্রায় আমোদ-ফূর্তি করবার ফলে, মিশরের খাদিভের শেয়ারগুলি বিক্রী করে ফেলতে হয় এবং ইংরেজ সেগুলি সংগ্রহ করে বর্তমানে এক মোটা অংশের মালিক। এই খালের পরিচালনার ভার ঐ কোম্পানীরই হাতে, এবং ১৮৮৮ সালের 'কনস্টান্টিনোপল কনভেনসন' নামে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাব মতে ঐ কোম্পানী খালের কার্য পরিচালনা করেন। ঐ প্রস্তাবটি ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবার কথা।

ইতিপূর্বে, মানে এই খাল নিয়ে গণ্ডগোল বাধবার মাত্র এক মাস পূর্বেও প্রায় ৮০,০০০ ইংরেজ সৈন্য, এই খালের দুপাশে তাদের আস্তানাগুলিতে থাকত, খাল পাহারার জন্যই। স্বাধীন মিশরের সার্বভৌমত্বকে সম্মান দেখিয়ে মাত্র এক মাস আগে ইংরেজ বেশ ভদ্রভাবেই সুয়েজখাল থেকে তাঁদের পাততাড়ি গুটায়। তারপর একমাস না যেতেই মিশর তাঁর অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে সুয়েজখাল কোম্পানীকে জাতীয়করণ করে এবং খালের পরিচালনা ভারও দখল করে।

মিশর তাঁর দেশের ভেতর পরিচালিত একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করে নেবে, তাতে বাধা দেবার কোন উপায় নেই; সে অধিকার মিশরের অবশ্যই আছে। কিন্তু সুয়েজখাল কোম্পানী জাতীয়করণ, আর সুয়েজখালের পরিচালনা ভার দখল করা মোটেই এক বস্তু নয়। গণ্ডগোলও যা কিছু তা এই ব্যাপারটি নিয়েই, কারণ একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ীই ঐ কার্যটি পরিচালিত হ'ত, আর সেই সম্মেলনের মিশরও একজন সদস্য ছিল। আন্তর্জাতিক আইনের দিক থেকে মিশরের এই কাজটি একেবারেই বেআইনী হয়েছিল। মিশর পক্ষীয় অনেক বক্তাকে অবশ্য বলতে শোনা যায় যে, মিশর সে সময় অতি দুর্বল ছিল, তাই সেই সম্মেলনে মিশরের মতটা ঠিক স্বাধীন মিশরের মত বলা যায় না; এবং বোধহয় এই অজুহাতেই তাঁরা বলতে চান যে মিশর ঐ কারণেই ওটি মানতে বাধ্যও নয়। এই দুর্বলতার অজুহাতকে যদি কোন মূল্য দিতে হয়, তাহলে কোন আন্তর্জাতিক আইনেরই কোন মূল্য থাকে না, কারণ কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সই করবার সময় সবগুলি

দেশ সমান সবল হবে, এটা একটা অবাস্তর কল্পনামাত্র। বর্তমান ভারত আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে বিমান চলাচলের চুক্তি হয়েছে, সেটাও নিশ্চয়ই সমান সবলতার ভিত্তির উপরই করা হয়েছে বলা চলে না। আর মিশর পক্ষীয় বক্তারা আজ যেসব জাতীয় সর্বভৌমত্বেরই দোহাই পারছেন, তাও একেবারেই অচল। আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যিখানে সভ্যতার অগ্রগতি এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে ঐ বড় বড় লম্বাই লম্বাই সার্বভৌমত্বের কথাগুলি অনেকটাই সেকেলে হয়ে গেছে। আজ পৃথিবীর এমাথা থেকে ওমাথা এত কাছে, আর প্রত্যেকটা দেশ একে অপরের উপর এত নির্ভরশীল যে, প্রতি মুহূর্তে প্রায় প্রত্যেক দেশকেই তার জাতীয় সার্বভৌমত্ব খর্ব করেই প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে কাজ-কারবার করতে হচ্ছে।

তবুও মিশর সুয়েজখালের পরিচালনার ভার দখল করে এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে সমর্থনও পায়। সমর্থকদের মধ্যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুই সবচেয়ে জাঁদরেল লোক। রাশিয়া এবং তাঁর তাঁবেদার দেশগুলি ত ইংরেজ আমেরিকার অসুবিধা হতে পারে এমন সব কাজই এবং সব সময়েই সমর্থন করবেই। কিন্তু মিশর যখন ইংরেজ আর ফরাসীদের কাছে মার খেল, চুরমার হয়ে গেল, তখন তাঁর বন্ধু বা সমর্থকদের কাউকে আর দেখা গেল না। তাঁরা দূর থেকেই সোরগোল তুল্লেন, কাছে এগোলেন না। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর মত মিশরের বিরাট বন্ধুও বিশেষ কিছুই করলেন না। এমন কি মিশরকে নৈতিক সমর্থন দেবার জন্য বৃটিশ কমনওয়েলথ্ থেকে বেরিয়েও আসলেন না। অবস্থা যখন এই রকমই, মিশরকে একলাই মার খেতে হবে, আর সুয়েজখালও আন্তর্জাতিক পরিচালনায় যাবে, তখন এত সব বদামি বুদ্ধি দিয়ে বেচারা মিশরকে বিপদে ফেলবার কি প্রয়োজন ছিল ?

প্রয়োজন অবশ্যই ছিল। সেটা আমি আগেই বলেছি যে ভারতীয় রাজনীতি আজ এক ফাঁকা প্রেস্টিজের বোঝা মাথায় নিয়ে পাগলের মত লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, কোথায় আবার ঐ প্রেস্টিজ বাড়াবার সুযোগ পাওয়া যাবে তারই খোঁজে। তাই ইংরেজ-ফরাসীর সাথে ঘোঁট পাকিয়ে বসতেই ভারত একেবারে মিশরের গার্জিয়ান সেজে বসল। এবং ঐ কারণেই, লণ্ডনে সুয়েজখাল নিয়ে প্রথম যে কনফারেন্স হল সেখানে ভারতীয় প্রতিনিধি এমনভাবে কথাবার্তা চালালেন যে, মনে হল ভারতের প্রতিনিধিই হচ্ছেন মিশরের আসল মালিক। সাধারণ লোক এবার ইংরেজ-ফরাসীদের ভাবগতিকটা বিশেষ সুবিধের নয়

মনে করলেও অতি বুদ্ধিমান ভারতীয় নেতারা কিন্তু প্রথম থেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে, যতই হাঁক-ডাক করা হোক না কেন শেষ পর্যন্ত ইংরেজ-ফরাসীরা লড়াই করবে না। কোন না কোন একটা উপায়ে মিটমাট করে নেবে। তাই ভারতের পক্ষ থেকে নূতন নূতন পিস ফর্মুলা আবিষ্কারেরও অন্ত ছিল না। ইংরেজ-ফরাসীরা ত শেষ পর্যন্ত নরম কাট্‌বেই; এখন মিশরকে হাতে রাখতে পারলেই কাজ। তাই ভারতের যত বক্তৃতা ছিল মিশরকে উস্কিয়ে দেবার মতভাবেই। ভাবটা এই যে মিশরকে উস্কিয়ে দিয়ে গণ্ডগোলটা ভালভাবে পাকিয়ে নিয়ে, পরে মিশরকে চেপে দিয়ে একটা ফর্মুলায় আপোষ করাতে পারলে আর মারে কে! আন্তর্জাতিক প্রেস্টিজের চোটেই ভারত সবাইকে কদলী প্রদর্শন করে শূন্যমার্গে বিচরণ করবে। ভারতের এই প্রেস্টিজের নেশাই হল মিশরের কাল।

ভারতের বিশ্ব-বিচরণকারী দপ্তরবিহীন মন্ত্রী (বর্তমানে প্রতিরক্ষামন্ত্রী) আর ভারতের প্রধান মন্ত্রীর চোখে আর ঘুম নেই। কেবল ছুটাছুটি করতে লাগলেন, বশংবদ খবরের কাগজগুলো কত ছবি ছাপলেন, কত মজার মজার কার্টুন এঁকে বাহাদুরী বাড়ালেন। আপোষের নূতন নূতন ফর্মুলাও এগিয়ে দেওয়া হতে থাকল, কিন্তু অনেকগুলি ফর্মুলা পার হবার পরও যখন আপোষ হল না, হাঙ্গামা মিট্‌ল না, তখনও যদি মিশর বা তার গার্জিয়ান ভারত ইংরেজ-ফরাসীর সত্যিকারের ভাবখানা কি বুঝবার চেষ্টা করতেন, এবং সত্যিকারের আপোষ ফর্মুলায় নেমে আসতেন, তাহলেও হয়ত মিশরের এই বিপর্যয় ঠেকান যেত। কিন্তু কে আর কাকে কি বুঝাবে! তাঁরা ত সবাই দিগ্‌গজ, একেবারে সবই বুঝে বসে রয়েছেন। আর এদের এম্বেসী বা হাইকমিশন যা লণ্ডন বা প্যারীতে রয়েছে, সেগুলি ত আসলে ফুর্তি-ফার্তার আড্ডাখানা ভিন্ন আর কিছুই নয়, তারা আর ভেতরের কি খবর সংগ্রহ করে পাঠাবে? লণ্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনার মাদাম বিজয় ত এই দুর্যোগের মুহূর্তে ছুটি উপভোগ করবার জন্য দেশে এসেই বসে থাকলেন। হাঙ্গামা মিটে গেলে আবার লণ্ডনে গিয়ে খানাপিনা, সাজগোজের ব্যবস্থা করা যাবে, বোধ হয় এই রকম মনে করেই। ইংরেজ-ফরাসীরা অবশ্য মিশরের বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে U. N. O. তে গিয়েছিল; কিন্তু রাশিয়ার ভেটোতে বাধা পেয়ে ফিরে এসে যে কাজটি করবার জন্য আগে থেকেই প্ল্যান ঠিক করা ছিল, সেই কাজই করে বসল। মিশর পঞ্চাশ বছরের জন্য পেছিয়ে গেল।

নিজের শক্তি না বুঝে বেশী বাড়াবাড়ি করতে গেলে এই রকমই হয়। দাবি, অধিকার, মর্যাদা এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার আগে নিজের শক্তিটাও যাচাই করে নেয়া উচিত। বিশেষ করে এটা যখন অতি সত্যি কথা যে সুয়েজখালটা অতি সত্যিসত্যিই ইংরেজ-ফরাসী এবং অন্য সব বড় দেশগুলির কাছে অতি অপরিহার্য, প্রায় জীবন-মরণের ব্যাপার আর কি। ওটা জোর করে দখল করতে গেলে যে তাঁরা মরণ কামড়ও দিতে পারে সে কথাটাও ভাবা উচিত ছিল।

মিশরের এই বিপর্যয়ের জন্য যে একনম্বর দায়ী ঐ মিলিটারী ডিক্টেটার নাসের সে বিষয়ে কোন ভুলই নেই। যেদিন থেকে এই লোকটি মিশরের ভাগ্যাকাশে উদিত হয়েছেন, প্রায় সেদিন থেকেই মিশরের বিপর্যয় শুরু হয়েছে। প্রথম সামরিক বিদ্রোহের পর ফারুককে তাড়িয়ে নাগিব ক্ষমতায় আসেন—বেশ ভাললোক, ভালভাবেই কাজ চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁকে তাড়িয়ে নাসের মিয়ার ক্ষমতা দখলের কারণ আর যাই হোক না কেন, মিশরের ভালর জন্য কখনই নয়। সুদানী নাগিবকে তাড়িয়ে নাসের মিয়া যে মিশরের সঙ্গে সুদানের মিলনের আশা শেষ করে দিয়েছিলেন, সেকথাটা আজ আর কারও বিশেষ মনে নেই। থাকলে লোকে নাসেরের বীরত্বটা একটু তলিয়ে বুঝে দেখবার চেষ্টা করতেন। মিলিটারী ডিক্টেটার, অতএব বিরাট শক্তিমান পুরুষ, কথায় কথায় লড়কে লেঙ্গে ভাব ; তবে তাঁর লড়াইয়ের সখ বোধ হয় মিটেছে।

মিশরের এই বিপর্যয়ে ভারতের রাজনীতির অবদানটুকুও বিশেষ কম নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু একজন অতিবড় আদর্শবাদী মহাপুরুষ। ডিক্টেটারী তিনি কখনই বরদাস্ত করতে পারতেন না। হিটলার, মুসোলিনী ত তাঁর জাতশত্রু ছিলেন। স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্কো ত এখনও শ্রীনেহেরুর কাছে কল্কে পাননি। তবে হঠাৎ তিনিই বা ঐ মিলিটারী ডিক্টেটার নাসেরের সাথে এত দোস্তি পাকালেন কিভাবে? সুয়েজ খালের পরিচালনা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক না হয়ে নাসেরের হাতে থাকাই কি তিনি পছন্দ করতেন নাকি? ইংরেজ-ফরাসীরা যদি কখনও সত্যি সত্যিই সুয়েজ খাল ছাড়তে বাধ্য হয় তাহলে যে তারা ঐ 'ইসরাইলের' মধ্য দিয়ে আর একটা নূতন খাল অবশ্যই কাটবে, সেটা সম্ভবও, এবং ইসরাইলকে ওখানে বসান হয়েছে ঐ উদ্দেশ্যেই এটুকু কি শ্রীনেহেরুর মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ করেনি নাকি? আর, অন্য একটা খাল কাটা হলে পরে, বর্তমান খালটি মিশরের পক্ষে রক্ষা করাই কঠিন কাজ হয়ে

দাঁড়াবে, সেটাও বুঝা কিছু কঠিন নয়। গরীব দেশ মিশরকে বন্ধু হিসাবে সৎবুদ্ধি দিতে হলে শ্রীনেহেরুর অবশ্যই উচিত ছিল মিশরকে বলা যে, ইংরেজ-ফরাসীর সাথে গণ্ডগোলটা যেন মিটিয়ে নেয়া হয়। ইংরেজ-ফরাসীরাও খাল কোম্পানী জাতীয়করণে আপত্তি করেনি, তাদের আপত্তি ছিল ঐ পরিচালনা ব্যবস্থা দখলে। কিন্তু বন্ধু শ্রীনেহেরু এসব কিছুই করেননি, শুধুই নাসেরকে উস্কানি দিয়ে মজা দেখেছেন, এই আশা নিয়ে যে তাঁর আবিষ্কৃত একটা না একটা ফর্মুলায় আপোষ অবশ্যই হতে বাধ্য। তিনি তাঁর ফাঁকা আন্তর্জাতিক প্রেস্টিজ বাড়াবার অসৎ আকাঙ্ক্ষায় মিশরকে বিপদে ঠেলে দিয়েছেন। এই হচ্ছে শ্রীনেহেরুর স্বরূপ। তিনি শুধুই মিশরকে বিপদে ঠেলে দেননি, তাঁর ঐ অসংযত আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করবার আশায় তিনি তাঁর নিজের দেশের স্বার্থও প্রতিনিয়তই বলি দিচ্ছেন। অদূর ভবিষ্যতে তাঁর নিজের দেশেও মিশরের অবস্থা হলে আশ্চর্য হবার কিছুই থাক্‌বে না। মিশরের মত অনেক বন্ধুর সহানুভূতি হয়ত সেদিন ভারতেরও অভাব হবে না, U. N. O.ও হয়ত বিরাট প্রস্তাব পাস করে অনেক কাণ্ড করবে, কিন্তু মার যা খাবে তা ঐ ভারতীয় জনসাধারণই শুধু বুঝবে যে সে কি! ক্ষতি যা হবে তা ঐ জনসাধারণেরই হবে, সহস্র ভাল ভাল প্রস্তাব এবং লক্ষ লক্ষ সহানুভূতিসূচক কথাবার্তায় সে ক্ষতির কিছুই পূরণ হবে না।

হাঙ্গেরীর হাঙ্গামা

সুয়েজ খালের এই গণ্ডগোলের সময়েই আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে আর একটি প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেছে, হাঙ্গেরীতে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের ব্যাপার নিয়ে। হাঙ্গেরীর ব্যাপারটা কমুনিস্ট সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্য হাঙ্গেরীয়দের একটা মরণ পণ বিদ্রোহ সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এতকাল ইংরেজ, ফরাসী বা অন্যসব সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর অত্যাচারিতেরা যা করে এসেছে, হাঙ্গেরীতে রক্তশোষক রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও তাই আরম্ভ হয়েছে। কমুনিস্ট সাম্রাজ্যবাদের শেষদিন যে আর খুব বেশীদূর নয়, সেও খুবই স্পষ্ট। তবে হাঙ্গেরীর ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যতটা বিপর্যয় আনা উচিত ছিল, ঠিক ততটা আন্‌তে পারেনি; কারণ ইংরেজ-ফরাসীরা ঐ হাঙ্গেরীর গণ্ডগোলের মাঝখানেই মিশরকে সায়েস্তা করতে গিয়ে এক বিরাট বেচাল কাজ

করে বসেন, যার ফলে সব মাটি হয়ে যায়। ইংরেজ-ফরাসী পক্ষীয় জাতিগুলির মধ্যে এমনকি খাস বৃটেন বা ফ্রান্সে আজ মিশর আক্রমণের বিরুদ্ধে যে বিরাট নিন্দাবাদ উঠেছে, তার কারণও ঐ বেচাল কর্মটি, নাসেরকে সহানুভূতি দেখাবার জন্য মোটেই নয়। আসল শত্রু রাশিয়াকে দুর্বল মুহূর্তে সুযোগ মত একটা খোঁচা না দিতে পারার জন্যই আজ ইংরেজ-ফরাসীরা এবং তাঁদের বন্ধুরা ইংরেজ-ফরাসী নেতৃত্বের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। নাসের ত আর সুয়েজ ক্যানেল বন্ধ করে দিয়ে বসেছিলেন না! তাঁকে ত আর দুদিন পরেও সায়েস্তা করা যেত।

যাই হোক, হাঙ্গেরীর ব্যাপারে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু যেরকম বহুমুখী কথাবার্তা বললেন তা শুধুই তাঁর বহু-বিঘোষিত বিরাট নীতির বিপরীতই নয়,—বেশ সন্দেহজনকও বটে। মিশরে বৃটিশ-ফরাসী বোমারু বিমানের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ত প্রায় তাড়িতাহত লোকের মতই লাফিয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু হাঙ্গেরীতে রুশ বর্বরতা যখন চরমে উঠেছিল তখনও তিনি বেশ নীরবই ছিলেন। তারপর নানা দিকের চাপে পড়ে যখন মুখ খুলতে বাধ্য হলেন তখনও সোজা কথা মোটা ভাবে বললেন না। যেটুকু বললেন তাও আবার নিজ ডেপুটি আজাদ সাহেবকে দিয়ে রাশিয়ার প্রশংসা করিয়ে অন্যরকম মানে দাঁড় করালেন। কলকাতাতে এ, আই, সি, সির মিটিং করতে এসে অনেক অবান্তর প্রস্তাবের সাথেই হাঙ্গেরীর প্রস্তাব চেপে যেতে চেষ্টা করলেন। দিল্লীতে ফিরে গিয়ে কলম্বো শক্তিদের বৈঠকে, অন্যের চাপে পড়ে, হাঙ্গেরীর বিষয়ে যেটুকু বললেন তাও খুব পরিষ্কার নয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিজ দেশের মধ্যেই যখন তাঁর এই দুমুখী কথাবার্তা নিয়ে নানা রকমের কথাবার্তা শুরু হল, তখন তিনি হাঙ্গেরীর বিষয়েও অনেক কিছুই বললেন ; তবুও তাঁর কথাগুলিকে মোটেই তাঁর মনের কথা বলে মনে হল না।

আর তাঁর বন্ধু কেষ্ট মেনন সাহেব U. N. O. তে হাঙ্গেরীর উপর প্রস্তাবে এমন সব কাজকর্ম করলেন যে সবাই একেবারেই থ মেরে গেল। প্রত্যেকবারই তিনি রাশিয়ার পক্ষে ভোট দিয়ে এমন নজির তৈরী করলেন যে, মনেই হল না যে ভারত রাশিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির বাইরে। মূর্খ সাধারণের অবশ্য বুঝতে বাকি থাকলনা যে কালোবাজারী বা ঠিকাদারী ইন্দং মিন্দং ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক ভোট কেনার ব্যাপারেও চালু জিনিস।

কেষ্ট মেননকে ত তারা না জানে তা নয়, তিনি ত বিলেতে রাজনীতি করা বনেদী চালাক লোক ; তাঁকে ঠকাবার উপায় নেই। মাগ্‌না কোন কাজ তিনি করেন না। 'ফেল কড়ি মাখ তেল'—এই হচ্ছে তাঁর সোজা কথা। এসব সুনাম ত তিনি লণ্ডনে থাকতেই অর্জন করেছেন। রাজনীতির ঐ একটি ভোটই যখন সম্বল, তখন ওটি ভাঙ্গিয়ে যতটুকু উশুল করা যায় তা আর মন্দ রাজনীতি কি! তবে বিক্রয় কার্যটি কালোবাজারে না হয়ে প্রকাশ্য নিলামে হয়ে মূল্যটি যথাস্থানে জমা হয়েছে দেখতে পেলে আর কারুর কোন ক্ষোভ থাকত না। শ্রীনেহেরু অবশ্য কেষ্ট ভায়াকে সমর্থন দিয়েছেন, না দিয়ে আর উপায়ই বা কি। সবাইকে ত আর একসঙ্গে ঘাঁটিয়ে নেয়া যায় না—অনেক গোপন তথ্য ফাঁস হতে কতক্ষণ! কিন্তু হাঙ্গেরীর ব্যাপারে শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীনেহেরুর মতিগতির এরকম অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনক মোড় নেবার কারণ কি? বলা কঠিন। তবে এইটুকু খুবই সত্যি যে, কোন অজানিত কারণে তিনি দেশে কমুনিস্ট-বিরোধী হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমুনিস্ট প্রচারকারী, এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধতা ভয়ে ভীত।

রাশিয়ান চালিয়াতী

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই সুয়েজ এবং হাঙ্গেরীর হাঙ্গামা চলা কালে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে যার উল্লেখ না করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না ; কারণ, যে রকম দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় ঐ ঘটনাটিই অদূর অবিষ্যতে পৃথিবীতে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছে। অবশ্য সে ইতিহাস যে ঠিক কি তা এখনই বলা কঠিন, তবে ভারত কিংবা পাকিস্থানও যে ইতিহাসের এই নূতন সৃষ্টির আওতার বাইরেই থেকে যাবে সেরকম কিছু সম্ভাবনাও নেই।

হাঙ্গেরীতে বিদ্রোহের জন্য রুশ সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা যখন চরমে উঠেছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই ইংরেজ এবং ফরাসীরা নাসেরকে সায়েস্তা করবার জন্য মিশরের উপর বোমা বর্ষণ শুরু করে। এই বেচাল কাজের জন্য ইংরেজ-ফরাসীদের বন্ধুরা ভ চটেই যায়, এমন কি ইংরেজ ফরাসীদের নিজেদের দেশের মধ্যেও সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষ অসন্তোষ দেখা দেয়। এই অবস্থায় রাশিয়া আবার এমন একটি বেচাল চালিয়াতি করে বসে যে তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটিও আছে কিনা তা আগামী

কালের ইতিহাসই শুধু বলতে পারে। রাশিয়া এক চরমপত্র দিয়ে ইংরেজ-ফরাসীদের জানিয়ে দেয় যে, ইংরেজ ও ফরাসীরা যদি মিশরের উপর আক্রমণ বন্ধ না করে তাহলে রাশিয়া ইংরেজ-ফরাসীদের উপর এমন এক নূতন ধরণের রকেট অস্ত্র ব্যবহার করবে যে তাতে ইংরেজ-ফরাসীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। এই চরমপত্র পাবার পরদিনই ইংরেজ-ফরাসীরা মিশরের উপর আক্রমণ বন্ধ করেছে ঠিকই; এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোন উত্তেজনামূলক কথাবার্তাও বলেনি, সেও অতি সত্যি কথা। তবুও ইংরেজ ফরাসী বা তাদের বন্ধুরা যে রাশিয়ার এই ঔদ্ধত্য মোটেই হজম করে নেয়নি, বরং তারা অতি ধীর মস্তিষ্কে ঐ ঔদ্ধত্যের উত্তর দেওয়ার প্রস্তুতিই চালাচ্ছে, সেটাও খুবই পরিষ্কার। ইতিমধ্যেই জার্মানী-ফ্রান্সের সব গণ্ডগোল প্রায় মিটে গেছে, N. A. T. O. স্থল সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে জার্মান জেনারেল স্পাইডেল ফরাসীদের সম্মতিক্রমেই বৃত হয়েছেন। জার্মানী-ফ্রান্সের মধ্যে পাসপোর্ট উঠে গেছে; কাস্টম্‌সও তুলে দেবার কথাবার্তা হচ্ছে। আরও অনেক কিছুই হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও যে হবে তারও বহু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মোট কথা, জার্মানী আর ফ্রান্সের গণ্ডগোলের জন্য পশ্চিমী দলে যে দুর্বলতা ছিল, সে দুর্বলতা শেষ হয়ে গেছে। এখন রাশিয়ার নূতন গোপন অস্ত্র কি আছে তার উপরই রাশিয়ার অস্তিত্ব নির্ভর করবে বলেই মনে হচ্ছে।

আণবিক অস্ত্র রাশিয়ার আছে কিনা তা কেউই দেখেনি; কিন্তু ইংরেজ আমেরিকার (বর্তমানে ফ্রান্সেরও) আণবিক অস্ত্র পৃথিবীর লোকের অদেখা নয়। রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহারের সুবিধা ইংরেজ এবং আমেরিকার যতটা রয়েছে, ইংরেজ আমেরিকার বিরুদ্ধে রাশিয়ার সে তুলনায় অনেক কম। আর বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে যে জার্মানী, ফ্রান্স, ইংরেজ ও আমেরিকা থেকে রাশিয়া অনেকটাই পেছনে সে বিষয়েও সন্দেহ করার বিশেষ কিছু নেই। তাই এই অবস্থায় ইংরেজ-ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রাশিয়ার ঐ হুমকী যে প্রলয় কাণ্ডের উস্কানী হিসাবেই দেখা দিয়েছে, তাতে আর কোন ভুল নেই, যদিও প্রমাণ এখনও ভবিষ্যতের গর্ভেই রয়েছে।

এ বিষয়ে বেশী কিছু বলা আজ কারও পক্ষে সম্ভব নয়, সম্ভব নয় কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা। তবে কয়েক বছর আগে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ' যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাই শুধু আজ নূতন করে মনে পড়ছে। বার্ণার্ড শ' বলেছিলেন, "আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই রাশিয়াকে একেবারে ধ্বংস

করবার জন্যই যে ইংরেজ আমেরিকার রাজনীতি কাজ করে চলেছে, এই সত্য-টুকু বুঝে না থাকলে রাশিয়ার রাজনীতিকরা রাজনীতিকই নয়। আণবিক অস্ত্রের গোপন সংবাদ রাশিয়ার হস্তগত হবার আগেই যে ঐ আণবিক অস্ত্রের সাহায্যেই রাশিয়াকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে, এটুকু না বুঝলেও রাশিয়ার রাজনীতিকরা কিছুই বুঝেননি। আজ এইটুকু বুঝেই রাশিয়ার রাজনীতিকদের তাদের রাজনীতি ঠিক করতে হবে"। বার্ণার্ড শ'র এই ভবিষ্যদ্বাণীও যে কতখানি সত্য, তাও হয়ত অদূর ভবিষ্যতেই প্রমাণ হবে। অন্তত পৃথিবীর রাজনীতিতে আজ সেই অবস্থাই দেখা যাচ্ছে।

ভারত ও পাকিস্থানী রাজনীতির বিপরীত মুখে গমন

পাকিস্থানের রাজনীতিতে পররাষ্ট্রনীতিটা খুব বড় ব্যাপার নয়। পাকিস্থান পররাষ্ট্র ব্যাপার নিয়ে হৈ হল্লা করে বিশ্বনেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষাও রাখে না। পররাষ্ট্র ব্যাপারে পাকিস্থানের নীতি একমাত্র ভারত বাদে অন্য যে কোন দেশের নীতিরই মত, মানে, দেশের বৃহত্তর স্বর্থের খাতিরে যা হওয়া উচিত তাই। সুয়েজ খালের ব্যাপারে পাকিস্থানের চালচলন নিজের দেশে বা আরব জগতে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু তাই বলেই যে পাকিস্থানের সুয়েজ নীতি ভীষণ একটা অন্যায় কিছু হয়েছে, এরকম মনে করবারও বিশেষ কোন কারণ নেই। অন্ততপক্ষে, পাকিস্থান মিশরকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে পেছন থেকে সরে পড়েছে এরকম ত নয়ই। আরব জগতে বা পাকিস্থানের ভেতরে এই ব্যাপার নিয়ে যে ভুল বুঝাবুঝির পালা শুরু হয়েছে, সেটা ঐ সুয়েজ ক্যানেলের হাঙ্গামার গরমটা কেটে গেলেই ঠিই হয়ে যাবে, তাতেও কোন সন্দেহ নাই। এই গরম কমে গেলে ভারতের অবস্থা আরবজগতে কি হবে, সেটাই দেখবার জিনিস। হাঙ্গেরার ব্যাপারে পাকিস্থানের পররাষ্ট্রনীতি খুবই পরিষ্কার, ঠিক যতখানি অপরিষ্কার হচ্ছে ঐ ব্যাপারে ভারতীয় নীতি।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত আর পাকিস্থানের মধ্যে এক বিরাট ভেদের সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজ এবং আমেরিকার আওতায় 'বাগদাদ' এবং 'সিটো' প্যাক্ট নামে দুটো সামরিক জোটে পাকিস্থান প্রবেশ লাভ করছে; আর ভারতের প্রধান মন্ত্রী মস্কো এবং পিকিং ঘুরে এসে কম্যুনিস্ট প্রচারকারীতে

পরিণত হয়েছেন। ভারত এবং পাকিস্থানের এই বিপরীতমুখে গমন ভারত এবং পাকিস্থানের রাজনীতিতে যে আগামীতে বহু রকমের গণ্ডগোলের সৃষ্টি করবে, সেও প্রায় এরকম নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

আর অন্যান্য ঘটনার মধ্যে,—পাকিস্থানের রাজনীতিতে আবার বেশ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্থানে মুসলিম লীগ ভেঙ্গে গিয়ে যে রিপাব্লিকান দল গঠিত হয়েছিল, যাঁরা ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্থানের সরকার চালাচ্ছিলেন তাঁদের দলে আবার ভাঙ্গন ধরেছে, যার ফলে ডাঃ খান সাহেবের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্থানে আজ প্রেসিডেন্টের শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। মনে হয় অনাগত ইলেকশন পর্যন্ত ঐ ব্যবস্থাই কায়েম থাকতে বাধ্য হবে। আবার এদিকে পূর্ববঙ্গের রাজনীতিও এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। পূর্ববঙ্গের এই পরিস্থিতির কারণ আওয়ামী লীগ সভাপতি মৌলানা ভাসানীর আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ ত্যাগ করা, আর এই আওয়ামী লীগ দলই হচ্ছে পূর্ববঙ্গের কোয়ালিশন সরকারের প্রধান দল। মৌলানা ভাসানীর আওয়ামী লীগ সভাপতির পদ ত্যাগ করা যে বিপর্যয়েরই পূর্বাভাষ তাতেও সন্দেহ করবার কিছুই নেই, কারণ মৌলানা ভাসানীই আজ পূর্ববাংলার রাজনীতিতে সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী লোক। রাজনীতিক হিসাবের চেয়ে মানুষ হিসাবেই তিনি যে আরও অনেকটাই বড়, তাও অজানা নয়; তাই আওয়ামী লীগের বিপর্যয়ও আজ অবধারিত বলেই ধরা চলে। উপরন্তু পূর্ববাংলার প্রায় কোন সমস্যারই আজ পর্যন্ত কোন সমাধান হয়নি, অথচ খাদ্যশস্যের দরও আবার বেশ দ্রুত-গতিতেই উর্দ্ধমুখী। তাই অদূর ভবিষ্যতে পূর্ববাংলায়ও গভর্ণরী শাসন প্রবর্তিত হলে খুব আশ্চর্য্যের কিছুই থাকবে না। আর, একবার যদি আবার ঐ গভর্ণরী শাসন আরম্ভ হয় তাহলে তার শেষ যে কোথায়, সে কথা আজ আর বেশী চিন্তা না করাই ভাল। ঐ ভালর জন্যই আমিও আজ আর কোন ভবিষ্যৎ বাণী করতে চাই না। শেষ যখন হবে তখন ত সবাই দেখতেই পাবে।

১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচন

এই আবোল তাবোল লেখাটি (প্রথম সংস্করণ) শেষ হবার পর কিন্তু ছাপাখানায় যাবার আগেই ১৯৫৭ সালের ভারতীয় সাধারণ নির্বাচন শেষ হয়েছে। বেশীর ভাগ নির্বাচনকেন্দ্রের ফলাফলও প্রকাশিত হয়েছে, অল্প

কয়েকটিই মাত্র বাকি। এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল, কেন্দ্রের এবং প্রদেশগুলোর প্রায় প্রতিটি আসনের জন্যই প্রতিযোগিতা করেছে, আর তাদের বিরুদ্ধে ছিল অসংখ্য ছোট ছোট দল বা স্বতন্ত্রপ্রার্থীরা। বিরোধী দলগুলো এবারের নির্বাচনেও নিজেদের মধ্যে মারামারি বন্ধ করে অন্তত নির্বাচনে সুবিধার খাতিরেও কোন যুক্তফ্রণ্ট গঠন করতে পারেনি। দু'এক জায়গায় কয়েকটি দল মিলে যে যুক্ত ব্যবস্থা করেছিল, তা শুধু অকিঞ্চিৎকরই নয়, নির্বাচনের সুবিধার ব্যাপারে প্রায়ই মূল্যহীন, কারণ তাদের বিপক্ষে আরও অনেক ছোট ছোট দল নিজেদের প্রার্থীদের দাঁড় করিয়েছিল। ফলে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ বা বহুকোণ নির্বাচন দ্বন্দ্বই হয়েছে প্রায় প্রতিটি জায়গায়ই, এবং ঐ কারণে সুবিধা যা কিছু তা হয়েছে ঐ ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলেরই। দুটো প্রদেশ বাদে অন্য সবগুলোতেই কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। পার্লামেণ্টের নির্বাচনেও কংগ্রেস দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে, বেশ পরিষ্কারভাবেই। অল্প কিছু ফল এখনও যা বের হতে বাকি আছে, তাদের ফল বের হলেও অবস্থা বিশেষ এদিক ওদিক হবার সম্ভাবনা নেই। তবে এবারের নির্বাচনে বিরোধীরা যে গতবারের নির্বাচন থেকে অনেকটাই ভাল করেছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই ; আর সন্দেহ নেই যে, কংগ্রেস এবারও আইনসভার আসনের তুলনায় ভোট পেয়েছে অনেক কম।

১৯৫৭ সালের এই সাধারণ নির্বাচনের মোট ফল হিসাবে কংগ্রেস দলই যে আগামীতে আরও পাঁচ বৎসরের জন্য ভারতের শাসন ক্ষমতা লাভ করেছে তাতেও কোন সন্দেহ নাই। তবে শাসনক্ষমতা ফিরে পেলেও এবারের নির্বাচনে কংগ্রেসের যে সব দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে গেছে, তাও খুব পরিষ্কার ভাবেই। তাই আগামীতে শাসনকার্য পরিচালনা যে বর্তমানের মত একেবারে নির্বিঘ্ন হবেনা সেকথাও একরকম ধরে নেয়াই যেতে পারে। এই ধরে নেওয়ার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, দুটি প্রদেশ এবার পরিষ্কারভাবেই কংগ্রেসের আওতার বাইরে চলে গেছে, অন্য আরও কয়েকটিতে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও বিরোধীদের অবস্থাও খুব খারাপ নয়। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসদল আইন সভার মোট আসনের অর্ধেকের বেশী আসন ইতি-মধ্যেই পেয়ে গেছে, যদিও কয়েকটি আসনের ফলাফল বের হতে এখনও বাকি আছে। তাহলেও বিরোধীদের অবস্থা যে পশ্চিম বাংলায়ও এবার অনেকটাই ভাল তাতেও কোন সন্দেহ নাই। মনে হয় কংগ্রেসী ডিক্টেটরী শাসন এবার এখানেও

কিছুটা দুর্বল থাকতে বাধ্য হবে। বোম্বাইতে, বিহারে এমন কি উত্তর প্রদেশেও এবার বিরোধীদের অবস্থা পূর্বের চেয়ে অনেকটাই ভাল। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টেও এবার বিরোধীদের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। তারপর কংগ্রেসের অন্য কতকগুলো দুর্বলতা যা এবার অতি প্রকাশ্যভাবেই প্রকাশ পেয়ে গেছে সেগুলোও অবশ্যই কংগ্রেসকে অনেকটাই কাবু রাখবে। উপরন্তু কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মান যে আজ নিম্নমুখেই ধাবিত হচ্ছে, এবং বেশ দ্রুতগতিতেই তাও এবারের নির্বাচনে খুবই পরিষ্কার হয়েছে। যার ফলে কংগ্রেস দলের মধ্যেও নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলাবোধ বজায় রাখা এবার বেশ একটু কঠিন হবে বলেই মনে হয়। কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মান এই গতিতে নিম্নমুখে এগোতে থাকলে আগামী পাঁচ বৎসর পরে কংগ্রেসের কি অবস্থা হবে, আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিট নিয়ে নির্বাচন-প্রার্থী হবার কোন মানে হবে কি না—এসব কথা অতি অবশ্যই অনেক কংগ্রেসী অতি-চালাক এম, পি, বা এম, এল, এ-রা আজ ভেবে দেখবেন—তাই কংগ্রেস দলেও শৃঙ্খলা বজায় রাখা পূর্বের মত অত সোজা আর কখনই হবে মনে হয় না।

ভাবাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবিকে উপেক্ষা করে, বোল-চালসে কাজ বাগাবার তালই যে এবার অনেক জায়গায় কংগ্রেসের বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে সে বিষয়েও কোন সন্দেহই নেই। ঐ কারণটিই উড়িষ্যাতে কংগ্রেসকে ডুবিয়েছে। বোম্বাই আর বাংলাতে কংগ্রেসের ভরাডুবি না হলেও অবস্থা যে অনেকটাই খারাপ তারও কারণ প্রধানত ঐটিই। কংগ্রেসের বড়কর্তারাও যে ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি তাও নয়, এবিষয় নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা তাঁরা ইতিমধ্যেই করেছেন। তবে শ্রীজহরলালও তাঁর মতামত ইতিমধ্যেই ব্যক্ত করে বসে আছেন,—মতামত প্রকাশ করতে তিনি কখনও কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না, দেরি ত নয়ই। এই দ্বিধা এবং দেরি না করা মতামতই তিনি ব্যক্ত করেছেন—"ওসব কিছু হবে না ; এখনই আবার রাজ্যপুনর্গঠনের প্রশ্নকে নূতন করে বিচার করা কখনই সম্ভব নয়"। নিশ্চয়ই ত, দেশের ছোটলোকদের মতামত দেখে ত আর শ্রীজহরলাল মত ঠিক করতে পারেন না! পাঁচবছর পরে আবার কবে ভোট হবে সে কথা ভেবে ব্যস্ত হওয়ার আজকেই কোন প্রয়োজন নেই। কেরেলা বা উড়িষ্যাতে যাহোক একটা কিছু করা যাবে,—টালিবালি করে কংগ্রেসকে যদি গদিতে বসান না-ই যায়, গভর্ণর ত গদিতে আছেনই। ঐ সব জায়গাগুলোতে কংগ্রেস-কর্মীদের অবস্থা যে দিন দিনই আরও কাহিল হতে

থাকবে সে সব কথা চিন্তা করবারও তাঁর আজ প্রয়োজন নেই ;—ক্ষমতার দাপট, টাকা আর বোলচালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

পশ্চিম বাংলায় যে এবারেও কংগ্রেস মেজরিটি পাবে তা ভোটের পূর্ব পর্যন্ত একরকম অবিশ্বাস্যই ছিল, তবুও কংগ্রেস মেজরিটি পেয়েছে। পশ্চিম বাংলায় এবারও কংগ্রেসের মেজরিটি হবার প্রধান কারণ অবশ্যই ডাঃ বিধান রায়ের ব্যক্তিত্ব, তাঁর উপর সাধারণের আস্থা। ডাঃ রায় সম্মুখে না থাক্‌লে পশ্চিম বাংলায় আজ কংগ্রেস নামে কোন দলের অস্তিত্ব থাকা আদৌ সম্ভব কিনা, তাও বলা কঠিন। কিন্তু ডাঃ রায়ই সব নয়,—মুসলমানরা এবারও দলবেঁধে কংগ্রেসকেই ভোট দিয়েছে ; এবং বিরোধীরা এবারও তাদের দলাদলি ছাড়তে পারেনি। (অবশ্য, ডাঃ রায়ের উপর বাঙ্গালীর যে বিশ্বাস ছিল, পরে ডাঃ রায় আর সে বিশ্বাস রাখেননি।)

মুসলমানদের ভোট পাবার জন্য কংগ্রেস পক্ষ থেকে এবার যে ধরণের সাম্প্রদায়িকতা ছড়ান হয়েছে সে এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার। তবে ঐ সাম্প্রদায়িকতার বিষ উস্কানি দিয়ে যে বিরোধীরাও কাজে লাগাতে পারে, এবং তাতে বেশ কাজ হয়ও, তা অন্য আর কেউ না হোক, ডাঃ বিধান রায় এবার বেশ হাড়ে হাড়েই বুঝেছেন। তাঁর নিজের ভোট-কেন্দ্রের একটি-মুসলমান ভোটারও তাঁকে ভোট দিয়েছে কিনা সন্দেহ,—তিনিত প্রায় হেরেই গিয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে কংগ্রেসের জন্য ভোট সংগ্রহ করা অনেকটা সহজ্ হলেও ঐ বিষকে যে কংগ্রেসের বিপক্ষেও কাজে লাগান একেবারে অসম্ভব নয়, একথাটি যদি ডাঃ রায় বুঝে থাকেন তাহলে ফল ভালই হবে আশা করা যায়।

এবারের নির্বাচনে সারা ভারতেই অনেক বিশিষ্ট নেতারা যেভাবে পরাজিত হয়েছেন তা এক অতি দর্শনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা যেভাবে পরাজিত হয়েছেন তা একেবারেই অদ্ভুত। পার্লামেন্টের আসনপ্রার্থী শ্রীনির্মল চ্যাটার্জি আর প্রাদেশিক আইন সভার আসন-প্রার্থী শ্রীসৌম্যেন ঠাকুর এবং শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ এবারের নির্বাচনে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রার্থী ছিলেন বলেই মনে হয় ; কিন্তু তাঁরা সবাই অতি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন। তাঁদের পরাজয়ে যদি কিছু প্রমাণ হয়ে থাকে, তাহলে এটুকুই প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতের মত দেশে এই ধরণের প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের গণতন্ত্রের কোন মানেই হয় না। দেবজ্যোতি

বাবু অবশ্য ভারতের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত এবং এরিস্ট্রোক্র্যাট কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত কলিকাতার 'রাসবিহারী' কেন্দ্র থেকেই দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু এই অতি-শিক্ষিত এবং এরিস্ট্রোক্র্যাট কেন্দ্রেও ভোটদান কার্য যে রকম নিম্নতম হারে হয়েছে, তা ঐ শিক্ষিত এবং এরিস্ট্রোক্র্যাটদের পক্ষে মোটেই গর্বের কথা নয়,—মনে হয় এই কেন্দ্রের শিক্ষিত এবং এরিস্ট্রোক্র্যাটদের অনেকেই শুধু শিক্ষিত এবং এরিস্ট্রোক্র্যাটই নন, আরও একটু বেশী,—মানে একটু আপস্টার্টও বটেন।

যাহোক, ইলেকশন শেষ হয়েছে, কংগ্রেস আবারও ক্ষমতায় এসেছে। কপালে থাকলে তারা আরও পাঁচবছর দুনিয়া উপভোগ অবশ্যই করবে। দেশকেও নিশ্চয়ই এগিয়ে নিয়ে যাবে আরও অনেক নূতনতর উপভোগের পথেই ; ঐ উদ্দেশ্যে নূতন ধরণের হিসাব কষাকষিও নিশ্চয়ই আরম্ভ হয়ে গেছে। লম্বাই চৌড়াই কথাবার্তাও ইতিমধ্যেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এসব বক্তৃতাবাজী যে এবার আরও অনেক বেড়ে যাবে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। দুর্বলতাই হচ্ছে বেশী বক্তৃতার কারণ। এবার কংগ্রেস সংস্থার অনেক দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়ে গেছে। উপরন্তু, কেন্দ্রীয় রাজস্বমন্ত্রী আর রেলমন্ত্রী, অন্তর্বর্তীকালীন সাধারণ এবং রেল বাজেট পেশ করতে গিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যে ছবি প্রকাশ করেছেন, তাতে বক্তৃতাবাজী আরও অনেকগুণ বাড়িয়ে দিতে না পারলে যে কিছুই আর চেপে রাখা যাবে না, তাও খুবই পরিষ্কার। মোট কথা, "ভারতের ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তা করবার কোন কারণই নেই ; ভারতের ভবিষ্যৎ একেবারে সোনায় বাঁধান ; ভারত প্রগতিশীল এবং বিশ্বনেতা ; ভারত নিরপেক্ষ, কোন দলেই না ; ভারত U. N. O.তে রাশিয়ার পক্ষে ভোট দেয় শুধুই ন্যায় এবং প্রগতিশীলতার খাতিরেই ; ভারত কাউকে ভয় করে না ; ভারত একাই একশো", এসব বা এই ধরণের বক্তৃতাবাজী ভারতীয় জনসাধারণকে আরও পাঁচ বছরের জন্য শুনতেই হবে—উপায় নেই।

তবে কিনা, ভারতের এই অতি-প্রগতিশীল কংগ্রেসী শাসন দেশের কোন্ সব প্রগতিশীল লোকদের সমর্থনে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় দুনিয়ার মালিক সেজে বসে আছেন, এবারের ইলেকশনে সেসব রহস্যেরও কিছু কিছু বেফাঁস হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। মনে হয় এই রহস্য ফাঁসই হচ্ছে এই ইলেকশনের সবচেয়ে বড় লাভ। কংগ্রেসের ইলেকশন ফাণ্ড এবং অন্যান্য সব ফাণ্ডের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা যে কোথা থেকে কিভাবে আসে, সে সব খবর ভারতীয়েরা

যে একেবারেই জানতনা, তাও নয়। তবে এবার যতটা পরিষ্কারভাবে জানা গেছে, ব্যাপারটি ততটা পরিষ্কার আগে কখনই ছিল না। ইতিপূর্বে একবার শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া নামক এক অতি-প্রগতিশীল (মানে, যাঁদের ব্যবসায় পদ্ধতি, হিসাব নিকাশ এবং খাতাপত্র সদাই পরিবর্তনশীল) শিল্পপতি, রাগের মাথায় অনেক কিছুই হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন; যার ফলে তিনি আজ খুবই বিপদে পড়েছেন। আর এবার ঐ ইলেকশন ফাণ্ডের বেআইনী ট্যাক্স জোগাতে গিয়েই ভারতের দুটি সর্ববৃহৎ শিল্প সংস্থ,—'টাটা' এবং 'মার্টিন-বার্ণ' যা করেছে, তা খুবই পরিষ্কার এবং সারগর্ভমূলক। 'টাটা' এবং মার্টিন-বার্ণ এবার কংগ্রেসের ইলেকশন ফাণ্ডে টাকা দিয়েছেন, প্রকাশ্যভাবেই দিয়েছেন—রসিদ না নিয়ে হলেও ব্যাঙ্কে চেক কেটেই দিয়েছেন; চোরা কিল খেতে তাঁরা আর রাজী নন তা বুঝিয়েই দিয়েছেন। এজন্য তাঁরা তাঁদের কোম্পানির গঠনসংস্থার পরিবর্তনও করেছেন, অতি প্রকাশ্যভাবেই, এবং নাকি শেয়ার-হোল্ডারদের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরেই। বোধ হয় তাঁরা অন্যান্যদের মত অতটা প্রগতিশীল নন, তাই এভাবে দান করা ছাড়া তাঁদের আর উপায়ও ছিল না। তবে এইভাবে দানকার্য সম্পাদন করে তাঁরা যে দেশের জনসাধারণের কাছে ধন্যবাদ লাভের যোগ্যতাই অর্জন করেছেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কারণ, জনসাধারণের মধ্যে যাঁরা সমঝদার তাঁরা এবার অনেকেই সমঝে নিয়েছেন; বুঝে নিয়েছেন যে ঘোমটার নীচে ডাইনামিক ভারতীয় রাজনীতির প্রগতিশীলতা জন্ম নিচ্ছে কোথা থেকে, কোথা থেকে রস সংগ্রহ করে এই প্রগতিশীল রাজনীতি রসিক সেজে বসে আছেন।

টাটা আর মার্টিন-বার্ণই শুধু কংগ্রেস ইলেকশন ফাণ্ডে চাঁদা দিয়েছেন আর অন্য সব শিল্পপতিরা মুখে সহানুভূতি জানিয়েই কাজ শেষ করেছেন, একথা নিশ্চয়ই আমার চেয়েও বেশি মূর্খেরা ভিন্ন অন্য কেউই বিশ্বাস করে না। কংগ্রেস ইলেকশন ফাণ্ডে এবার সব পতিকেই চাঁদা দিতে হয়েছে, তা তিনি শিল্পপতি, বাণিজ্যপতি বা ভগ্নিপতি যাই হোন না কেন। তবে টাটা বা মার্টিন-বার্ণের মত প্রকাশ্যভাবে রসিদ নিয়ে বা ব্যাঙ্কে চেক কেটে দান করা তাঁদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। নয় এই জন্যই যে তাঁরা সবাই কংগ্রেসী নেতাদের মতই নীরব কর্মী এবং দাতা,—তাদের কাজ কারবারও যেমন প্রকাশ করতে লজ্জা পান, দান করেও সেইরকমই প্রচারকার্য চান না।

উপরন্তু তাঁরা ঐ কংগ্রেস নেতাদের মতই প্রগতিশীলও বটেন, যার ফলে ইনকাম ট্যাক্সের খাতায় প্রকাশ্য টাকার চেয়ে অনেক গুণ বেশি টাকা তাদের পকেটে সব সময়েই থাকে,—তাই ব্যাঙ্কে চেক কেটে বা রসিদ নিয়ে দান কার্য করা তাঁদের পক্ষে কথনই সম্ভব নয়। কালোবাজারীদের যে নিকটতম আলোর খুঁটিতে ঝোলান কখনই সম্ভব নয়, সেত দেশের লোক ভালোভাবেই বুঝে নিয়েছে; কিন্তু এই প্রকাশ্য দানকার্যের দুঃসাহসিকতা দেখাবার জন্ম 'টাটা' বা 'মার্টিন-বার্ণকে' যে শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার মত বিপদে পড়তে হবে না সে গ্যারান্টি আজ দেয়া কঠিন। তবে আশা করি 'টাটা' এবং 'মার্টিন-বার্ণ' এসব দিক বুঝেশুনেই প্রকাশ্য দান কার্যের ঝুঁকি নিয়েছেন; তাই আমিও তাঁদের সাধুবাদ জানাই।

ভারতের সমস্যা জহরলাল

(এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ ছাপাখানায় থাকা কালে যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল সেগুলোই পরিশিষ্ট নামে বইয়ের শেষে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই পরিশিষ্টই আবার এখানে বর্ত্তমান নামে বসান হল।)

গত ১লা এপ্রিল, এপ্রিলফুলের দিন থেকে ভারতের টাকায় ৬৪ পয়সার পরিবর্তে ১০০ নয়া পইসা পাওয়া যাচ্ছে। পয়সার সাথে নয়া পইসার বিনিময় হার যে অঙ্কশাস্ত্র অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে, সে শাস্ত্র শুধুই আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থিওরী সাহায্যেই প্রকাশ সম্ভব। ফলে রিলেটিভিটি অজ্ঞ ভারতীয় মূর্খ-সাধারণ এবার বেশ একটু বেকায়দায়ই পড়েছেন, এবং ঐ কারণেই স্বাধীন ভারতের সরকারী নয়া পয়সা এখনও বাজারে চালু করা সম্ভব হয়নি। তবে রিলেটিভিটি জ্ঞানী মহাজনেরা, এমন কি মহাজ্ঞানী ভারত সরকারও নয়া পইসার রিলেটিভ সুযোগ বুঝেই তাদের হিসাব শুরু করেছেন, আশাকরা যায় যদি নয়া পইসা সত্যি সত্যিই চালু হয়, তাহলে তার রিলেটিভ সুবিধাটুকু তাঁরাই পাবেন। আর সমস্যাসঙ্কুল ভারতে নয়া পইসার নূতন সমস্যার ভয়ে যে সব কাপুরুষ বেসুরো কথা বলছিলেন, শ্রীজহরলাল তাঁদের উদ্দেশ্য করে ইতিমধ্যেই এক বাণী হেঁকে বসে আছেন। মনে হয় এই বাণীই হচ্ছে আজ ভারতীয় রাজনীতির মর্মবাণী। তিনি বলেছেন, "যারা কাপুরুষ, যারা নিশ্চল স্থাণু, গাছ, পাথর তারাই সমস্যাকে ভয় পায়, আমি সমস্যাকে ভয় পাইনা;

সমস্যার সৃষ্টিও করছি আমি, সমাধানও করব আমি।" শ্রীজহরলাল যে বীরপুরুষ, কাউকে ডরান না, সেত তাঁর মুখ থেকে সহস্র সহস্রবার শুনে সবাই জেনে ফেলেছে; আর তিনিই যে সর্ব সমস্যার স্মৃষ্টিকর্তা তাও অতি সত্যি কথা, সত্যির সত্যিকথা—তিনি দম্ভভরে ঘোষণা করে না জানালেও কারও জানতে অসুবিধা ছিল না। আর তিনিই যে সর্বসমস্যার সমাধান করবেন সেও ত অতি নিশ্চয় কথা। তবে "সমাধান করব" কথাটি ভবিষ্যতকালের উদ্দেশ্যে বলা হয় কিনা তাই সমাধান কার্যটি আর কারুর দেখা হয়ে উঠেনা। যেদিন ভারতের ভবিষ্যৎ বলে আর কিছু থাকবে না, সেদিন ভারতে সমস্যা বলেও আর কিছু থাকবে না। আজ তাই ভারতকে সেই ভবিষ্যৎবিহীন কালের অপেক্ষায় বসে থাকা ভিন্ন উপায়ই বা কি! তবে সেদিন যে খুব বেশী দূরে নয়, তারও ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে।

বিগত সাধারণ নির্বাচনে জয়ের অধিকার বলেই কংগ্রেস দল আবার ভারতের সরকারী গদি জাঁকিয়ে বসেছেন—আপাতত পাঁচ বছরের জন্য তাঁরা নিশ্চিন্ত। নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় নূতনত্ব বিশেষ কিছু নেই; সেই—থোর-বড়ি-খাড়া, আর খাড়া-বড়ি-থোর। তবে এবার কোন বঙ্গ-সন্তান আর পুরো মন্ত্রী হতে পারেন নি। বঙ্গ-সন্তানদের দৌড় এবার আধা-মন্ত্রী পর্যন্তই। ভারতের রাজনীতির মাঠে বঙ্গ-সন্তানদের দৌড় যে শেষ হয়ে গেছে, তার প্রমাণ এবার ভালভাবেই পাওয়া গেল। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে বঙ্গ-সন্তানদের যে কি উপায়ে অন্নসংস্থান করতে হবে তারও ইঙ্গিত রয়েছে ঐ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠনেই,—হুমায়ুন কবীর হয়েছেন লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ডেপুটি!

অন্য সব জায়গায় নূতনত্বের মধ্যে হয়েছে কেরলে কমুনিস্ট মন্ত্রি-সভা। ফলে কমুনিস্টরা আজ ভারতে দ্বিতীয় রুলিং পার্টিতে পরিণত হয়েছেন। আশাকরা যায় এবার কমুনিস্ট-কংগ্রেস প্রেম হতে আর বেশী অসুবিধা হবে না। অনেকের কাছে শুনেছি অতি-বুদ্ধিমানেরা মরলে পরজন্মে কমুনিস্ট হয়, ভারতের রাজনীতির ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে কথাটা বোধ হয় একেবারে মিথ্যা নয়। যাক তবুও মন্ত্রিগিরি করা যাবে ত!

আর পার্লামেণ্ট-কংগ্রেসীদলের নেতা নির্বাচিত হবার পর শ্রীজহরলাল হঠাৎ অনেক ভাল ভাল কথা বলেছিলেন। এবারের কাজ কর্মও প্রথম থেকেই ঐ ভাল কথা অনুযায়ীই আরম্ভ করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "একই লোককে বিশিষ্ট পদে বারে বারে নির্বাচিত করবার কোন মানে হয়

না। কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে একই লোক বেশীদিন থাকাটা শুধুই বিসদৃশ নয়—কাজকর্মের দিক থেকেও ক্ষতিকর,” ইত্যাদি। এই জন্যই কয়েক দিন পরেই শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ ঐ জহরলালের নমিনেশন নিয়েই ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে পুনঃ নির্বাচিত হয়েছেন; এবং অন্যান্য সব বিশিষ্টরাও স্ব স্ব পদে আবারও বাহাল হয়েছেন। শুধু তাই নয়, ডাঃ রাধাকৃষ্ণাণ উপরাষ্ট্রপতি পদে পুনঃ নির্বাচন প্রার্থী হতে গররাজি হলে ঐ শ্রীজহরলাল এবং সাগরেদরা সপ্তাহব্যাপী পদলেহন প্রক্রিয়াদিদ্বারা আচার্য রাধাকৃষ্ণাণের হৃদয় বিগলিত করত আবারও তাঁকে ঐ পদে পুনর্বহাল করেছেন। অনেককেই আজ প্রশ্ন করতে শুন্‌ছি, ব্যাপার কি? এরকম করার মানে কি? ব্যাপার কিছুই নয়। নিজেকে জায়গামত পুনঃ নির্বাচিত করে নেবার পর ওসব বেশী বাজে কথা বলে কিছু লাভ হয় না—তখন “আরে ইয়ার, তুম একেলা মৌজ লুটেগা আর হাম লোগ নোকরী ছোড়কে ভেরেণ্ডা ভাজেগা?” যুক্তিকে অকাট্য যুক্তি বলে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই থাক্‌তে পারে না। হয়েছেও তাই।

যাই হোক, পুরাতনেরা সবাই স্ব স্ব পদে বহাল হয়েছেন বলেই যে বসে আছেন, তাও নয়। সবাই যার যার কাজকর্মে লেগে গেছেন, সেই পুরাতন অভ্যাস অনুযায়ীই। নূতনত্বের মধ্যে দেখছি শুধুই যে পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনার অনেক-কিছুই যে করা সম্ভব হবে না, তাও প্রকাশ্য ঘোষণা করেই জানান হয়েছে,—বোধ হয় ইলেকশন সবেমাত্র শেষ হয়েছে এখনই মিথ্যাচারিতায় নিমগ্ন হতে কারও কারও সঙ্কোচ লাগছে, তাই। রেল মন্ত্রী প্রকাশ্যভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে রেলের কাজকর্ম অনেক কিছুই করা সম্ভব হবে না। কোশী ড্যামের কাজও পেছিয়ে দেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য আরও অনেক কাজও যে বন্ধ হয়ে গেছে বা শীগগীরই বন্ধ হবে, তা প্রকাশ্য ঘোষণা করে না জানালেও অনেকেরই আর জান্‌তে বাকি নেই।

আবার ইতিমধ্যেই সমগ্র ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলা, বিহার এবং উত্তর প্রদেশে খাদ্য পরিস্থিতি যে পর্যায়ে নেমে এসেছে, তাকে সরকারী ভাষায় যাই বলা হোক না কেন, দুর্ভিক্ষ ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। বেকায়দা বুঝে এমন কি সরকারকেও অনেক জায়গায় সাহায্য বিতরণ বা লাপ্‌সী খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সরকারীভাবে অভয়ও দেওয়া হয়েছে, ঘোষণা করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, “প্রতি একদিন অন্তর আমেরিকা থেকে এক জাহাজ বোঝাই খাদ্যশস্য আস্‌ছে”। আর খাদ্য মন্ত্রী পার্লামেণ্টে সদম্ভে

ঘোষণা করেছেন, "খাদ্যের দর উপরে উঠছে ঠিকই, কিন্তু খাদ্য পাওয়া যাচ্ছেনা একথা কখনই ঠিক নয়"। নিশ্চয়ইত! আমেরিকা থেকে একদিন অন্তর এক জাহাজ খাদ্য আসছে, এরপরও কি বলা চলে দেশে খাদ্য পাওয়া যচ্ছে না! ভারত এখন তার আমেরিকার জমিদারীর ধান গম খাচ্ছে। মাত্র দশ বৎসর স্বাধীনতার অধীনে বাস করেই, এবং একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ করেই ভারত শুধুই পৃথিবীর নেতা হয়ে গেছে তাই নয়, দুনিয়ার মালিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ভারতের আমেরিকান প্রজারা তার খাদ্য যোগাচ্ছে। এই ভাবেই আর কিছুদিন কাটাতে পারলেই আর দেখতে হবে না, ভারত তখন পরের উপর খেয়েই সবার মাথায় লাথি মারতে পারবে,— মানে, সভ্য-দুনিয়ার স্কন্ধে চিরস্থায়ী বোঝা (Permanent liability) হিসাবেই চলতে পারবে।

উদ্বাস্তুদের নিয়ে ভারতে নানা রকম রসের খেলা চলেছে তা আগেই বলেছি। ইতিমধ্যে সে খেলা বোধ হয় চরম পর্যায়ে এসে পৌছেছে—তবে এ রস যে কি রস তা এখনও বুঝতে পারা যাচ্ছে না। বিহারের বেতিয়া ক্যাম্প থেকে হাজার কুড়ি উদ্বাস্তু কলকাতায় ফিরে এসেছে এবং যেখানে সেখানে রাস্তায়, ফুটপাতে, হাওড়া ময়দানে আস্তানা করে আছে। এতগুলো লোক ফুটপাতে, রাস্তায় বা খোলা ময়দানে ১০৮।১১০ ডিগ্রি গরমে কিভাবে বেঁচে আছে, সে খবর অন্য সকলেরই মত আমারও জানা নেই। আর তাঁরা সরকারী পুলিশের রাইফেল বুলেট ভক্ষণ বাদে আর কি যে ভক্ষণ করছে তাও আমার কল্পনার বাইরে। তবে খবরের কাগজেই দেখেছি যে তাঁদের অল্প কয়েকজন করে যাঁরা প্রতিদিন মারা যাচ্ছেন, তাঁদের সৎকারেরও ব্যবস্থা নেই। মৃত দেহগুলো নাকি গঙ্গায় ফেলে দেয়া হচ্ছে—হিন্দুর ছেলের স্বশরীরে (মানে পুড়ে ছাই না হয়ে) গঙ্গালাভ, সে ত অতি উত্তম ব্যবস্থা! তাই দুঃখ করবার কিছুই নেই। সরকারী ঘোষণায় আরও শুনেছি যে তাঁরা বেতিয়াতে ফিরে না গেলে তাঁদের কোনরকম সাহায্য দেওয়া হবে না। ঠিকই ত, যাঁরা বেতিয়ার নির্জনে মরতে ভয় পেয়ে কলকাতার রাস্তায় এসে মরবার স্পর্ধা রাখে, তাঁদের কি কখনও সাহায্য দেয়া যায়! আর যাঁরা দু'একজন এ নৃশংস দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে উদ্বাস্তুদের জেলে যাবার পরামর্শ দিচ্ছেন, সরকারী মতে তাঁরা সবাই রাজনৈতিক-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।

মোটকথা ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার, বুঝতে একটুও অসুবিধা নেই।

উদ্বাস্তুগুলো যে চরম নিমকহারাম তাতেও কোন সন্দেহ নেই; বেঁচে থেকে ত উৎপাত করছেই মরেও রেহাই দিতে চায় না—ব্লাকমেল করে মরতে চায়, কলকাতার রাস্তায় এসে মরতে চায়! আর যাঁরা আজ উদ্বাস্তুদের জন্ম কিছু করতে চাচ্ছেন তাঁরাও যে ঐ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই করছেন তাতেও কোন ভুল নেই; কারণ তাঁরা উদ্বাস্তুদের নিয়ে সভা-সমিতি করে বা জেলে গিয়ে সর্বশেষ যেটুকু আশা করতে পারেন তা ঐ ভোট ভিন্ন অন্য কিছুই হতে পারে না। যদি সত্যিই তাঁদের কিছু সৎউদ্দেশ্য থাকৃত, তাহলে তাঁদের বুঝা উচিত ছিল যে উদ্বাস্তুদের জন্য সহানুভূতি উদ্রেকের চেষ্টা করবার ক্ষেত্র কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বা স্বাধীন ভারত নয়। ও সব জায়গার অধিবাসীদের আজ আর মানুষের দুঃখ, কষ্ট বা লাঞ্ছনা দেখে কোন সহানুভূতির উদ্রেক হয় না—সব অহিংস হয়ে গেছে। তাঁরা বুঝতে পারতেন যে উদ্বাস্তুদের জন্য সহানুভূতি পেতে হলে সে চেষ্টা করতে হবে এই অহিংস জগতের বাইরে, মানুষের জগতে। পৌঁছে দিতে হবে মানুষের জগতে এই চরম বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী, পৃথিবীর বৃহত্তম নরঘাতকতার সংবাদ। মুখোস খুলে প্রকাশ করে দিতে হবে ইতিহাসের জঘন্যতম ভণ্ডামীকে; পৃথিবীর জনমতের বিচার-সভায় হাজির করাতে হবে ঐ ভণ্ডদের। তবেই জানা যাবে হাইড্রোজেন বোমা মানুষের বেশী ক্ষতি করবার ক্ষমতা রাখে, না ভারতের এই ভণ্ডামিই মানুষের বেশী ক্ষতি করেছে। হাইড্রোজেন বোমার মানুষ ধ্বংস করবার ক্ষমতা যতই থাকুক না কেন, মনুষ্যত্ব ধ্বংস করবার কোন ক্ষমতাই নেই; কিন্তু ভারতের ভণ্ডামি নির্বিচারে ধ্বংস করে চলেছে মানুষ এবং মনুষ্যত্ব। ভারতে যে আজ মনুষ্যত্বের অবশেষ আর নেই বেতিয়ার উদ্বাস্তুরাই তার প্রমাণ।

ইতিমধ্যে আবার ভারতের রেল এবং সাধারণ বাজেট পুরোপুরিভাবে পার্লামেন্টে উপস্থিত করা হয়েছে। এতেও নূতনত্ব কিছুই নেই, ধারাবাহিক ভাবেই প্রায় সব-কিছুর উপরই ট্যাক্স বসান হয়েছে। এমন কি স্টীল এবং সিমেন্টও বাদ পড়েনি। মোটকথা টাকা চাই, আরও বেশী টাকা চাই; তা না হলে পরিকল্পনার কাজ হবে কিভাবে? স্টীল আর সিমেন্টের উপর ট্যাক্স বসিয়ে পরিকল্পনার কাজ কিভাবে এগোতে পারে, সেটা সাধারণের বুঝবার মত নয়। তবে যাঁরা ভারতের পরিকল্পনাকে জানেন তাঁদের ব্যাপারটা বুঝতে ভুল হয়নি। ভারতের পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে টাকা খরচ, তাই টাকা সংগ্রহ করতে হবে যে কোন উপায়ে; এই আর কি! তবে বাজেটে নূতনত্ব

যে কিছুই হয়নি তাও নয়, রেলের টিকিটের উপর ট্যাক্স বসান হয়েছে। এই নূতনত্বটি দেখে যাঁরা বুঝে নিয়েছে যে ট্যাক্স বসাবার সব জিনিষ শেষ হওয়ায় এবার ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স বসান শুরু হোল, তাঁরা ব্যাপারটিকে ভুলই বুঝেছেন, কারণ ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স এই প্রথম নয়, আরও অনেকরকম ভাবে ইতিপূর্বেও বসান হয়েছে। রেলের ভাড়ার উপর ট্যাক্স বসান হয়েছে এই জন্যেই যে, রেলভাড়া বৃদ্ধির জন্য যে কমিশন বসান হয়েছিল তারা রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করতে হলে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি করেই করতে হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। ভারত-সরকার ত আর স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিকারী সরকার নয়, ট্যাক্স-আদায়কারী সরকার! তাই তাঁরা রেলের ভাড়া বৃদ্ধি না করে ভাড়ার উপর ট্যাক্স বসিয়েছেন, তাঁদের স্বরূপ প্রকাশের জন্যেই। নূতনত্ব আরও আছে, সম্পত্তির উপর ট্যাক্স বসেছে, এবং নূতন ট্যাক্সের আওতা থেকে প্রায় সমস্ত বিলাসদ্রব্যই বাদ পড়েছে। তবে তাই বলে বিলাসীরা যেন বেশী কিছু কল্পনা না করে বসেন। ভারতে আজকাল বাজেট একবারই আসেনা, আরও ট্যাক্স বসাবার প্রস্তাব এই হাল বছরেই আরও অনেক বার আস্‌তে পারে।

আর নূতন নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব না এসে উপায়ই বা কি ; ভারত যে আজ বিশ্ববিজয়ে বের হয়েছে। শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীনেহেরুর গ্রীষ্মকালীন বিদেশ সফর সূচী ইতিমধ্যেই কিছু প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও দেখা যায় তিনি এই গ্রীষ্মেই ডজন খানেকের বেশী দেশ বিজয় না করে ছাড়বেন না। ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড থেকে আরম্ভ করে সিংহল এবং মধ্য প্রাচ্যের বহুদেশ বিজয়ে বের হচ্ছেন তিনি। তাঁর এই বিজয় বাহিনীর খরচও ত ঐ বাজেট থেকেই আস্‌বে কি না, তাই!

এবারের বাজেট দেখে নাকি অনেকেই হতভম্ব হয়ে গেছেন। জানিনা ব্যাপার সত্যিই সেইরকম কিনা। রাজাজী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় এক মন্তব্য করে জানিয়েছেন যে, ভারত সরকার বাজেটে যে স্বরূপ প্রকাশ করেছেন, তার চেয়ে কমুনিস্ট রাজত্ব অনেক ভাল। অনেককে আবার বলতে শুন্‌ছি যে আফ্রিকার জঙ্গলও নাকি এর চেয়ে ভাল, তাই সত্যি সত্যি বলা কঠিন কে বা কারা বেশী ভাল। তাহলেও রাজাজী ভারত সরকারকে গালাগালি করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যে তার আদি শত্রু কমুনিস্টদেরই গালি দিয়েছেন তাতেও আর কোন ভুল নেই। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ভারত

সরকারের সাথে অন্ত কারুর তুলনা করলে যে তাকে গালি দেওয়াই হয় সেটুকু রাজাজীর অবশ্যই বুঝা উচিৎ ছিল।

আর ইতিমধ্যেকার শেষ কথা যা ডাঃ রাধাকৃষ্ণাণ অতি পরিষ্কারভাবেই বলে দিয়েছেন সেটাই হচ্ছে আসল এবং নম্বরী কথা। রাজ্যসভায় সম্বর্ধনার উত্তরে এক বক্তৃতায় তিনি পরিষ্কারভাবেই বলে দিয়েছেন যে আগামীতে যদি সততা এবং সাহসিকতার সঙ্গে প্রগতিশীল নেতৃত্ব দান করা সম্ভব না হয়, তাহলে আর পাঁচ বৎসর পরে দেশ বর্তমানের চেয়ে আরও অনেক বেশী দুর্দশায় তলিয়ে যাবে। যদি আচার্য রাধাকৃষ্ণাণের এই বক্তৃতার মানে ঠিক মত বুঝে থাকি, তাহলে নিশ্চয়ই বুঝা উচিত যে দেশের বর্তমান দুর্দশার কারণ হচ্ছে নেতৃত্বের সততা, সাহসিকতা এবং প্রগতিশীলতার অভাব এবং যদি দেশকে আরও দুর্দশার পথে ঠেলে দেবার ইচ্ছা না থাকে তাহলে এই নেতৃত্বকে সরিয়ে দিয়ে এমন নেতৃত্ব আন্‌তে হবে, যে নেতৃত্ব সততা সাহসিকতার সঙ্গে প্রগতিশীল পথে যেতে পারবে। মনে হয় এসব বুঝে শুনেই আচার্য রাধাকৃষ্ণাণ এবার সরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, এবং ভাব বুঝেই শ্রীজহরলালও তাই বহু রকমের পদলেহন প্রক্রিয়াদি দ্বারাই তাঁকে সরকারের গদিতে আটক রেখেছেন, মুক্তি পেয়ে বাইরে এসে আচার্য সব গোপন তথ্য ফাঁস করে না দেন। হাজার লোক আচার্য রাধাকৃষ্ণাণ যে ব্যবসাদারী রাজনৈতিক নন, সেটা তাঁর দেশবাসী ভালভাবেই জানেন।

ইতিমধ্যে পাকিস্থান রাজনীতিতে বিশেষ কিছু নূতনত্ব দেখা যায়নি, তবে ইতিপূর্বে পূর্ববাংলা আইন-সভায় স্বায়ত্তশাসন দাবি করে যে প্রস্তাব পাশ হয়েছে, সেই প্রস্তাবই যে পাকিস্থানের রাজনীতিতে ঝটিকা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠছে তাতে কোন ভুল নেই। আর অন্যান্য অনেক বারের মতই এবারও আবার পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে; তবে ভয়ও কিছু নেই, দেশে খাদ্য না থাকলেও আমেরিকান জমিদারী আছে। আমেরিকান প্রজারা খাদ্য জোগাচ্ছে, কোনরকমে চালিয়ে নেয়া যাবে। পরের উপর খেয়ে বেঁচে থাকবার যে মহৎ আদর্শটি স্বাধীন ভারত এবং পাকিস্থান গ্রহণ করেছেন, তার আর তুলনা হয় না। আর যে রকম সাফল্যের সঙ্গে তাঁরা তাঁদের আদর্শটিকে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন তাও এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার। সময় সময় আমার মনে হয় যে আমেরিকানরা একটা অতি বড় গবেটের জাত, সব আমার চেয়েও গণ্ডমূর্খের দল; তা না হলে এরকম হওয়া কখনই সম্ভব হ'ত না।

ডাইনামিকতত্ত্ব

ইতিমধ্যে—মানে এই আবোল তাবোলের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হবার পর থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত, ভারত বা পাকিস্থানে যে বিশেষ ঘটনাগুলো ঘটেছে তাদের উল্লেখ করতে হলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে সারা ভারতব্যাপী যে বিরাট আমোদ-ফুর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেই ব্যাপারটিকেই। ভারতে আমোদ-ফুর্তির ব্যবস্থা কিছু একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার কখনই হতে পারে না, অতি সত্যিকথা। ভারতের স্বাধীনতা ত ভারতীয় নেতাদের কাছে একটা অতি বড় আমোদ-ফুর্তির ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু নয়—ভারতে আমোদ-ফুর্তি, সেরিমনি ত লেগেই আছে। তবুও সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকীর এই উৎসবটি একটু তাৎপর্য্যপূর্ণ তাই উল্লেখ করতে হল। উল্লেখ করতে হল এই জন্যই যে ভারতীয় নেতাদের ডাইনামিক আদর্শ, তাদের ডাইনামিক চালচলন বুঝবার পক্ষে এটি খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ, এবং ভারতীয় রাজনীতিকে বুঝতে হলে এই ইঙ্গিতগুলি বুঝবার চেষ্টা যে একান্তই প্রয়োজনীয়, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীজহরলালের আদর্শবাদিতা যে কত গভীর এবং কোন পর্য্যায়ের, সে বিষয়ে আলোচনা যথাস্থানে অনেকটাই করা হয়েছে। তাঁর কার্য্যকলাপে তাঁর আদর্শবাদিতা এতই পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে যে বুঝিয়ে বলবারও কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। অবশ্য যারা এসব বুঝতে চান না, বা যাদের কাছে এধরণের বোধশক্তি নিজ স্বার্থ প্রতিকূল, তাদের কথাই আলাদা। দেশ স্বাধীন হবার পর, স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম শহীদ ক্ষুদিরামের এক মর্ম্মর মূর্তি স্থাপনের ব্যবস্থা হয় ক্ষুদিরামের ফাঁসিক্ষেত্র মজাফঃরপুর সহরে। স্থানীয় নেতৃবর্গ ঐ মূর্তির শুভ উন্মোচনের জন্য শ্রীজহরলালকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু শ্রীজহরলাল আমন্ত্রণ গ্রহণে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেন,—অন্য কোন কারণে নয়; শুধুই এই জন্য যে ক্ষুদিরাম হিংসাপন্থী ছিলেন। ক্ষুদিরামের মত এবং পথের সঙ্গে জহরলালের মত এবং পথের কোন সম্পর্ক ছিলনা বা আজও নেই সে ত খুবই পরিষ্কার। তাই আদর্শবাদিতার অজুহাতেই শ্রীজহরলাল ক্ষুদিরামের মূর্তি উন্মোচন করতে রাজী হন নি।

কিন্তু তার অল্প কিছুদিন পরেই, ১৯৫২ সালের ইলেকসনের মাত্র কয়েক দিন আগে, শ্রীজহরলাল বজবজে বক্তৃতা করতে এসে সেখানে 'কামাগাটামারু' শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ উন্মোচনে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ ত করেনই নাই, বরং ঐ

স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পঅর্ঘ প্রদান করে নিজেকে ধন্য বলেই ঘোষণা করেছিলেন। অথচ যাঁরাই খবর রাখেন তাঁরাই জানেন যে ঐ 'কামাগাটামারু' শহীদরা কোন দিনই নপুংসক বা অহিংসাজীবি ছিলেন না, কিংবা তাঁরা অহিংসা যুদ্ধের ঢং দেখিয়েই তাঁদের কর্ত্তব্য শেষ করবার চেষ্টাও করেন নি। তাঁরা ক্ষুদিরামেরই মত সশস্ত্র পন্থায়ই তাদের দেশকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীজহরলালের পক্ষে এ ব্যাপারটা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল, সে প্রশ্ন তুলে আজ আর কোন লাভ হবে না, কারণ শ্রীজহরলাল ওসব প্রশ্নের উর্দ্ধে। আর ঐ প্রশ্ন তুলবার একটু অসুবিধাও আছে এই জন্যেই যে, 'ইলেকশনে নিয়ম নাস্তি' ব্যাপারটি মোটামুটি প্রায় সবাই বিশ্বাসও করেন।

কিন্তু আরও পরে বর্ত্তমানে, ১৯৫৭ সালের ইলেকশনের পর; ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে ঘোষণা করে শ্রীজহরলাল দেশব্যাপী যে আমোদ-ফূর্তির ব্যবস্থা করেছিলেন, সেটাই একটু কি রকম কি রকম মনে হয় না কি? বিদ্রোহী সিপাহীরা যে অহিংস সত্যাগ্রহ করেছিলেন এরকম খবর ত কারও জানা নেই কিনা, তাই! আর 'ইলেকশনে নিয়ম নাস্তি' ধারাটিকেও প্রয়োগ করবার সুযোগও এবার আর নেই বল্লেই চলে, কারণ এবারের ব্যাপারটি হচ্ছে ইলেকশনে উৎরে যাবার ঠিক পরেই। এই ভাবেই শ্রীজহরলালের আদর্শবাদিতা ক্রমেই আরও গতিশীলতা লাভ করে বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে হতভাগা ক্ষুদিরামদের কদলী প্রদর্শন করেই।

এই সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে ঘোষণা করবার আরও একটা দিক আছে; এবং সেটাও শ্রীজহরলালের আদর্শের গতিশীলতার দিক থেকে কম সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। শ্রীজহরলাল তাঁর লিখিত ভারতের ইতিহাসে (Discovery of India) কোন দিনই সিপাহী বিদ্রোহকে একটা জাতীয় অভ্যুত্থান বা স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে ওটা ছিল একটা জায়গীরদারী হাঙ্গামা মাত্র। এই জায়গীরদারী হাঙ্গামা যে কিভাবে বা কি উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম বলে সম্মান লাভ করল এবং ঐ জহরলালের কাছ থেকেই; তাও কম রহস্যপূর্ণ নয়। আপাতত এই রহস্যভেদ মোটেই সহজকর্ম হবে না, আমিও আর সে চেষ্টা করছি না। শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ সম্বন্ধে মত বিরোধ যেটুকু তা ঐ জহরলালদের মত বিদ্বান বা মহা-বিদ্বানদের মধ্যেই। মূর্খ সাধারণ সিপাহী বিদ্রোহকে, ইংরেজ

বিতাড়নের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবেই জানে কারণ, বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রাণকে তারা বুঝতে মোটেই ভুল করেনি। দিল্লী প্রাসাদের উৎসব মহলে বসে, কোথায় কোন বাদসাহ বা বেগম বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করেছিল, সেটা মূর্খ সাধারণের কাছে কোন ধর্তব্যের ব্যাপার নয়। কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলেই অন্য সকলের আত্মত্যাগ নস্যাৎ হয়ে যাবে, মূর্খ সাধারণের কাছে এ যুক্তির কোন মূল্য নেই। বাদসাহরা চিরকালই বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছেন, এখনও করছেন, এবং এর পরেও করবেন; তাই বলেই বিদ্রোহী সিপাহীদের, ক্ষুদিরামদের বা কামাগাটামারু শহীদদের আত্মত্যাগ মূর্খ সাধারণের কাছে ছোট হয়ে যাবে না কখনও। তাই সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ সম্বন্ধে মতবিরোধ যেটুকু, তা শুধুই ঐ বিদ্বান বা মহা-বিদ্বানদের মধ্যেই—যারা প্রাণকে জানেন না বা বুঝেন না, তাদের মধ্যেই। যাঁরা শুধুই খুঁজে মরেন কীটদষ্ট দলিল, যা সাজিয়ে তাঁরা লিখবেন তথাকথিত ইতিহাসের ফিরিস্তি, নিজেদের বিদ্যা জাহির করবার জন্যই। এই প্রাণহীন ইতিহাসের ফিরিস্তি লেখক শ্রীজহরলাল আবার সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করবার চেষ্টা করছেন;—সন্দেহ এবং রহস্য সেই কারণেই। এবং প্রশ্নও ঠিক এই কারণেই যে, 'আর কত রূপে দিবে দরশন'।

ইতিহাসের জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিশ্বাসঘাতকদের জন্ম

এবার (ডিসেম্বর ১৯৫৭) শেষ পর্যন্ত শ্রীজহরলাল মুখ খুলেছেন, খুলেছেন শুধু এইটুকু বলবার জন্যই যে, 'আর আইতে দিমু না'। খুবই সোজা এবং পরিষ্কার কথা তিনি বলেছেন, এবার তাকে বুঝতে আর কোন ভুলই থাকতে পারে না। তাঁর স্বরূপের আদি এবং অন্ত ঐ কথাটুকুর ভেতরেই, ওতেই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মোহনরূপের অপরূপ পরিচয়। যে রূপের ছটায় ভারতবাসী মোহগ্রস্ত হয়েছে, যে বহুরূপী রূপে ভারতের গোপীনীরা বিভ্রান্ত বসনা হয়ে তাঁর পদতলে লুণ্ঠিতপ্রায়, সেই অপরূপ রূপই তিনি এবার দেখিয়েছেন। পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু উদ্বাস্তুদের তিনি আর আসতে দেবেন না। তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি ভারতভূমিতে তিনি আর ওসব উৎপাৎ সহ্য করতে রাজী নন। পরিষ্কার ভাবেই বলেছেন, পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়েই বলেছেন, শুধু তাই নয় মেজাজ দেখিয়েই বলেছেন। নিশ্চয়ই ত! এত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে, এত রূপ আর

রসের পরিবেশে বাস করে, অতসব উৎপাৎ সহ্য করা কি সম্ভব! তাই তিনি যা সম্ভব, সে কথাই পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, বলে দিয়েছেন 'আর আইতে দিমু না'।

ব্যাপারটা হঠাৎ বা অস্বাভাবিক কিছুই নয়; খুবই স্বাভাবিক। কারণ, খেলা চলছিল অনেক দিন থেকেই এবং সে খেলা যে ক্রমেই শেষ পরিণতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল, তাও বুঝতে ভুল হবার কোন উপায়ই ছিলনা। '৫০' সালের দাঙ্গার ফলে যারা এসেছিল তাদের যথাসম্ভব মিথ্যা স্তোক দিয়ে ফিরিয়ে পাঠান। পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্তন করা। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দেয়া বন্ধ করা। উদ্বাস্তুদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। তাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে রেখে ডোল খাইয়ে শেষ করবার চেষ্টা। পাহাড়ে, জঙ্গলে, মরুভূমিতে পাঠিয়ে নিকেশ করবার প্রয়াস বা শিয়ালদহ ষ্টেশনে ফেলে রেখে সোজাসুজি হত্যা করে শেষ করবার ইচ্ছা; এসবই ঐ শেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল শ্রীজহরলালের নাটককে। শুধু একটা সুযোগের অভাবেই তিনি কথাটা ঠিক মুখ ফুটে বলতে পারছিলেন না। অপেক্ষায় ছিলেন শুধুই একটা নাটকীয় মুহূর্তের। সে সুযোগের মুহূর্ত আজ সমুপস্থিত, তাই যবনিকা পাত হয়েছে ঐ নাটকের—নাটকীয় মুহূর্তেই এবং নাটকীয় ভাবেই। ভারতীয় রাজনীতি এবং অর্থনীতির লালবাতি জ্বালাই আজ শ্রীজহরলালকে দিয়েছে সেই সুযোগ। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন তিনি খুব ভাল ভাবেই,—ভাল ভাবেই তিনি প্রমাণ করে ছেড়েছেন, চল্লিশ কোটি ভারতবাসী বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাস-ঘাতকদের দেশ ভারতবর্ষ।

যাঁরা ইংরেজ অধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল, প্রাণ দিয়েছিল ইংরেজদের কামান বন্দুকের সম্মুখে, তিলে তিলে বিসর্জন দিয়েছিল তাদের নশ্বর দেহকে ইংরেজ কারা প্রাচীরের নিভৃত অন্তরালে, উষ্ণ বক্ষ রক্তে রঞ্জিত করে তুলেছিল ভারতের মাটিকে। তাদের অদেহী আত্মারা আজ ভারতের এই দুর্দশা দেখে শিউরে উঠেছে কিনা জানি না। আর তাদের মধ্যে পূর্ববাংলার শহীদদের সংখ্যার অনুপাতও যে কত তাও আমার সঠিক-ভাবে জানা নেই। তবে বর্তমান ভারতে যে সে সব লোক আর জন্মায় না, সেত দেখতেই পাচ্ছি। শুধু এইটুকুই জানি এবং বিশ্বাস রাখি যে, তাদের একজনও যদি আবার ঐ মরদেহে ফিরে আসতে পারতেন তাহলে ভারতে আজ নূতনভাবে ছিন্নমস্তার আবির্ভাবই দেখতে পেতাম। দেখতে পেতাম

আগুন আর উষ্ণ রক্ত, রক্তের বন্যা। যে বন্যায় ধুয়ে মুছে ভেসে যেত সকল ভণ্ডামী আর বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু তাদের ফিরে আসবার আপাততঃ আর কোন সম্ভাবনা নেই এইটুকুই ভরসা,—এই ভরসাতেই আজ ভারতে সম্ভব হয়েছে ইতিহাসের জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতা। সম্ভব হয়েছে ভণ্ডামির চরম প্রকাশ। একটা সমগ্র দেশের মুখে, একটা সমগ্র জাতির নামে এত বড় কলঙ্ক-কালিমা-লেপন ইতিহাসে আর কখনও সম্ভব হয়নি, হয়নি কখনও সম্ভব একটা সমগ্র জাতিকে পশুতে পরিণত করা। বর্তমান ভারতে সবই সম্ভব, কারণ ভারতের ইতিহাস আজ স্তব্ধ, আজ ভারতবাসী মৃত,—তাই তাদের আত্মার শুভ কামনা করি।

ভিক্ষের চাল যেমন কাঁরা কি আকাঁরা বাছলে চলে না, ভিক্ষেয় পাওয়া স্বাধীনতারও সেই রকমই ভালমন্দ দেখে কোন লাভ হয় না। তাই ভারত যে স্বাধীনতা পেয়েছে তাও ঐ ভিক্ষুকের স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য কিছু নয়—ভাল-মন্দের বাইরে। তবুও স্বাভাবিক ভাবেই আশা করা গিয়েছিল যে, ঐ স্বাধীনতার ভালমন্দের ফলে যদি কেউ বিপদে পড়ে, তাহলে অন্যেরা তাকে ফেলে দেবে না,—সাধ্যমত সাহায্য করবার চেষ্টা করবে। ভণ্ডামির নিম্নতম শেষসীমা জানা ছিলনা কিনা, তাই আশাকরা গিয়েছিল। তারপর স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যখন দেখা গেল যে, পশ্চিম পাকিস্থানে হিন্দু এবং পশ্চিম ভারতে মুসলমানদের আর থাকা সম্ভব নয়, তখন ঐ স্বাধীনতা ভাগা-ভাগির নেতারা তাদের বিনিময় করে নিতেও দ্বিধা করলেন না। দেশটাকে যখন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতেই ভাগ করে নেয়া হয়েছে, তখন এ ধরণের সম্প্রদায়গত অসুবিধা যে অতি স্বাভাবিক উপায়েই সৃষ্টি হতে বাধ্য তাতেও কোন সন্দেহ ছিল না। তবুও বহু মুসলমান ভারতের অন্যান্য অংশে এবং বহু হিন্দু পূর্ব বাংলায় থেকে গেলেন। খুব যে নিশ্চিন্তে তা নিশ্চয়ই নয়; এবং ঐ অনিশ্চিত কারণেই পূর্ব বাংলা ছেড়ে বহু—মানে হাজারে হাজারে, হিন্দু ক্রমা-গতই ভারতের দিকে চলতেও থাক্‌লেন। আর কিছু কিছু মুসলমানও যে ভারত ছেড়ে পাকিস্থানে গেলেন না তাও নয়। দু'দেশেই ঐ উদ্বাস্তদের সাহায্য দেবারও কিছু কিছু ব্যবস্থা হল।

'৫০' সালের দাঙ্গার ফলে পূর্ব বাংলা ছেড়ে বেশ মোটা দাগেই হিন্দুরা পশ্চিম বাংলা, আসাম এবং বিহারে প্রবেশ করলেন। আর ওসব জায়গা ছেড়ে যত মুসলমান পাকিস্থানে গেলেন তাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। অবস্থা

যে পর্যায়ে নেমে এসেছিল তাতে আর সন্দেহ করবার বিশেষ কিছুই ছিল না যে, এবার পূর্ববাংলার হিন্দু এবং পূর্ব ভারতের মুসলমানদেরও বিনিময় হওয়া ছাড়া অন্য গতি নেই। কিন্তু বিপদ বাধল ঐ বিনিময় প্রশ্নেই—পূর্বে বিনিময় হতে পারে না। কেন বিনিময় হতে পারে না, কেউ জিজ্ঞেস করবেন না; অঙ্ক শাস্ত্রে বাধা আছে। শাস্ত্রজ্ঞ ভারতীয় নেতারা অঙ্ক কষে বুঝে নিয়েছেন যে, বিনিময় কখনই সম্ভব নয় কারণ, পূর্ববাংলার সোয়া কোটী হিন্দুর বদলে যদি মাত্র সোয়া কোটী মুসলমানকেই ভারত থেকে পাঠাতে হয়, তা হলে কোথায় পাওয়া যাবে অত মুসলমান। পশ্চিম বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষের বেশী কখনই নয়। তাই, যদি সোয়া কোটী মুসলমান পূর্ব বাংলায় পাঠাতে হয় তাহলে পশ্চিম বাংলা, আসাম এবং বিহারের সমস্ত মুসলমানকেই পাঠাতে হয়। তাও কি সম্ভব! পশ্চিম বাংলা বা আসামের বাঙ্গালী মুসলমানদের পূর্ববাংলায় পাঠাতে হয়ত কোন অসুবিধা নেই কিন্তু রাষ্ট্র-ভাষাভাষী বিহারী মুসলমানদের পাঠান কখনই সম্ভব নয়,—পূর্ববাংলায় গিয়ে তাদের স্বাস্থ্য টিকবে না বা তারা ভাষার অসুবিধায় পড়বে সেজন্য অবশ্যই নয়। নয় এইজন্যই যে হিন্দীভাষীদের সংখ্যা কমিয়ে বাংলা-ভাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আজ ভারতের বৃহত্তর স্বার্থে একান্তই অচিন্তনীয় ব্যাপার। উপরন্তু মুসলমানদের পরিবর্তে পূর্ববাংলার হিন্দুরা এসে যদি বিহারেও বসবাস সুরু করে, তাহলে বিহারের আরও অনেক অংশও হয়ত বাংলা-ভাষী-প্রধান হয়ে যেতে পারে। ফলে বিহারে অবস্থিত বাংলা-ভাষী এলাকাগুলো বাংলায় ফেরৎ দেবার দাবীও হয়ত আরও জোরদার হয়ে উঠতে পারে। এইসব বৃহত্তর স্বার্থের কথা অতি বৃহৎভাবে চিন্তা করবার ফলেই পূর্বে লোক বিনিময় আর হতে পারে না। এমনিতেই ত ঐ খণ্ড, বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র পশ্চিম-বাংলা ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের ব্যাপারে শুধু শীর্ষ স্থনীয়ই নয়—অন্য সকলের অনেক উর্দ্ধে। ভারত সরকারের ট্যাক্সের অতি মোটা অংশও আসে ঐ পশ্চিম বাংলা থেকেই; রাষ্ট্রভাষীরা সবাই ত প্রায় শুধুই খানেওয়ালার দল। তার উপর যদি আবার বিহারের দখলীকৃত বাংলা-ভাষাভাষী এলাকা ধলভূম, ধানবাদ শুদ্ধ মানভূম, সাঁওতাল পরগণা এবং কিষণগঞ্জ এলাকাগুলোও ঐ বাংলাতেই ফেরৎ দিতে হয়, এবং যদি একদিন সত্যি সত্যিই বাঙ্গালী আবার আত্মস্থ হয়। তাহলে কি হবে? রাষ্ট্রভাষাবিদ পালোয়ানেরা তখন কোথায় যাবেন! প্রশ্ন এইখানেই এবং এইজন্যই পূর্বে আর লোক বিনিময় হতে পারে না,—ভারত আজ এক অতি সেকুলার সতী।

এই সেকুলার সতীর সতীত্ব রক্ষাকারী নেতাদের একজন (ডাঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ) একদিন সুরাবর্দি সাহেবকে বলেছিলেন, "বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলো ফিরে পেতে চাচ্ছ, খুব ভাল কথা ; কিন্তু ওগুলো বাংলায় ফেরৎ গেলে তোমার নিজের কি অবস্থা হবে সেটা ভেবে দেখেছ কি ?" এইভাবেই সেইদিন সুরাবর্দি সাহেবকে নিরস্ত্র করা সম্ভব হয়েছিল। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, অবিভক্ত বাংলায় যখন সুরাবর্দি সাহেব প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি একবার বিহারের বাংলা-ভাষী অঞ্চলগুলো ফেরৎ পাবার জন্য ভারত সরকারের উপর চাপ দিতে থাকেন। ভারত সরকার সে চাপে কতখানি কাবু হয়েছিলেন তা জানা না গেলেও, মহান ভারতীয় নেতাদের অনেকেরই যে অবস্থা কাহিল হয়েছিল সে কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাই ঐ অতি-মহানদেরই একজন সুরাবর্দি সাহেবকে উপরের ঐ কথাটি বলে নিরস্ত্র করেছিলেন,—মহান ভারতের 'বৃহত্তর' স্বার্থেই নিশ্চয়ই।

এই ধরণের অতি মহান পন্থাতেই গান্ধীবাদী ভারতীয় রাজনীতি তাদের নীতির ধ্বজা উড়িয়ে বেরিয়েছেন, তাই পূর্বে লোক বিনিময় আর কখনও সম্ভব হতে পারে না। তবে লোক বিনিময় না হয়েও যদি পূর্ববাংলা থেকে হিন্দুরা ক্রমাগতই আস্‌তে থাকে, তাহলেও ঐ একই সমস্যাগুলো আবারও সম্মুখে আস্‌তে বাধ্য। তাই যে কোন উপায়েই হোক পূর্ববাংলার হিন্দুদের আটকাতেই হবে,—পূর্ববাংলার হিন্দুদের হুণ্ডির টাকার প্রয়োজনও নিশ্চয়ই ভারতের শেষ হয়ে যাবে না। কাজও আরম্ভ হল সেই প্ল্যান অনুযায়ীই। '৫০' সালের দাঙ্গার পর নেহেরু-লিয়াকৎ আলী প্যাক্টের ভাঁওতা দেখিয়ে আরও নানা রকমের মিথ্যা স্তোক দিয়ে বহু হিন্দুকে আবার পূর্ববাংলায় ফেরৎ পাঠান সম্ভবও হল। আর ভারত থেকে যেসব মুসলমান পূর্ববাংলায় গিয়েছিলেন তাদের ত প্রায় সবাই আবার ফিরে এলেন। কিন্তু তবুও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুস্রোত বন্ধ করা গেল না,—তারা আস্‌তেই থাক্‌লেন। এখন কি করা যায়!

সর্বভারতীয় মহান নেতাদের কার্য্যকলাপ দেখে তাদেরকে যতটা নির্বোধ মনে হয়,—তারা ততটা নির্বোধ কখনই নন। বরং রাষ্ট্রভাষা-ভাষী স্বার্থ এবং অন্যান্য আরও অনেক স্বার্থের ব্যাপারে, তাদের বুদ্ধি অতি সূক্ষ্মস্তরের,—তাই তাঁরা এবার বেশ বৈজ্ঞানিক পন্থাতেই কার্য্য আরম্ভ করে দিলেন। কার্য্য আরম্ভ করলেন বিনা পুনর্বাসনেই উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধান করবার। নানা জায়গায় তৈরী হতে থাক্‌ল ডোল খাওয়াবার ক্যাম্প, পাঠান হতে থাক্‌ল তাদের

পাহাড়ে, জঙ্গলে, মরুভূমিতে বা ঐ ধরণের অন্য সব জায়গায়,—শুধু যে জায়গাগুলোতে পাঠালে অতি সহজেই তাদের পুনর্বাসন হতে পারে ঠিক সেই জায়গাগুলো বাঁচিয়ে অন্য সব জায়গায়। কিন্তু তা সত্বেও উদ্বাস্তু স্রোত বন্ধ হল না। তখন তাঁরা আরও নূতনতর পন্থা আবিষ্কারে মন দিলেন এবং এই নূতনতর পন্থা হিসাবেই যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করবার জন্য সৃষ্টি করা হল পাসপোর্টের প্রাচীর, ১৯৫২ সালে। এখন এই প্রাচীর ডিঙ্গিয়েই উদ্বাস্তুদের ভারতে প্রবেশ করতে হবে। অনেকের ধারণা আছে যে, ঐ পাসপোর্টপ্রথা প্রবর্তনে পাকিস্থানই অগ্রণী হয়েছিল,—কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়। তবে আরও সত্যি কথাটি হচ্ছে যে, ভারত ঐ সুযোগটির প্রতিক্ষায়ই ছিল এবং বেশ কায়দামত ঐ সুযোগটির সদ্ব্যবহার করেছে। আর অন্য সত্য কথাটি হচ্ছে যে, পাকিস্থান শেষ মুহূর্তে ঐ প্রথা প্রবর্তনে ইতঃস্তত করেছিল এবং আপাতত ব্যাপারটা বন্ধ রাখবার জন্য ভারতের কাছে প্রস্তাবও করেছিল, কিন্তু ভারত তাতে রাজী হয়নি। এহেন একটা সুযোগের মোকা ছাড়বার পাত্তর অতি-চালাক ভারতীয় নেতারা কখনই নন।

পাসপোর্ট প্রবর্তনের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে মাইগ্রেশন অনেকটা কণ্ট্রোল করা গেল ঠিকই, কিন্তু একেবারেই বন্ধ করা সম্ভব হল না কখনই। এই ভাবেই কণ্ট্রোলের লাইন ধরেই উদ্বাস্তরা আস্‌তেই থাক্‌লেন। আরও মজা হচ্ছে যে, যে রেটে তারা আস্‌তে থাক্‌লেন, ঠিক সে রেটে মরে শেষ হতে থাক্‌লেন না। তাই ডোল খাইয়ে নিকেশ করবার আস্তানাগুলোতে বা ঐ ধরণের অন্যান্য গ্যারাকল সমূহে, এবং পশ্চিম বাংলায় আবারও স্থান অকুলান দেখা দিল। উপরন্তু পূর্ববাংলা সরকার সেখানের সব জমিদারী দখল করে নিয়ে প্রায় লাখখানেক হিন্দু পরিবারকে উদ্বাস্তু হবার সোজা পথ বাৎলে দিলেন ; এবং প্রায় একই সময়ে পাকিস্থানে ইসলামিক গঠনতন্ত্র পাস করে হিন্দুদের একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হল। যার ফলে পাকিস্থানে পুরো সম্মান নিয়ে বসবাস করবার আইনগত অধিকারটুকুও হিন্দুদের আর অবশিষ্ট থাকল না। ভারতীয় নেতারা এবার সত্যি সত্যিই বিপদ দেখলেন। আবারও তাই, তাদের চিন্তা করতে হল ; কি করা যায়! বেশী ভেবে সময় নষ্ট করবার মত সময় মোটেই ছিল না তাই তাঁরা অতি সোজা উপায়েই সর্টকাট পথেই, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়া বন্ধ করলেন। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আসা বন্ধ হল।

এইত হচ্ছে পূর্ববঙ্গ-উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ হবার অতি প্রকাণ্ড ইতিহাস। খুবই সরল এবং সহজবোধ্য। একটা বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভারতে এসে বসবাস বা মরবার জন্য সাহায্য করতে গিয়ে ভারত ত আর ফতুর হতে পারে না; রাষ্ট্রভাষীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে পারে না; এ তারই ইতিহাস। কিন্তু তবুও কোথায় যেন একটা খট্‌কা ছিল, সে জন্য মুখফুটে কথাটা বলতে বাধছিল। তাই একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন ভারতের এক এবং অদ্বিতীয় নেতা শ্রীজহরলাল, অপেক্ষায় ছিলেন একটা নাটকীয় মুহূর্ত্তের। সে সুযোগ তাঁর এসে গেছে, এবং তিনি মনের কথাটি পরিষ্কার করেই বলে দিয়েছেন, একটুও দ্বিধা বা সঙ্কোচ করেন নি। অর্থনীতিক্ষেত্রে লালবাতি জ্বালবার ফলে ভারতীয়দের আশা আকাঙ্ক্ষায় যে হতাশা নেমে এসেছে, তাদের চিন্তাধারায় আজ সে স্তব্ধতা বিরাজ করছে; সেই হতাশা এবং স্তব্ধতার সুযোগেই শ্রীজহরলাল তাঁর নাটকের যবনিকাপাত করেছেন। এমন সুযোগমত সময়ে কাজ করেছেন যে ভারতীয়েরা এখনও বুঝতেই পারেনি,—কোথায় তিনি ভারতকে ফেলে দিলেন; কোন অতলে তলিয়ে দিলেন ভারতকে।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের অনন্তকাল ধরে বহে বেড়ান আর কখনই সম্ভব নয়—কথাটি যে শ্রীজহরলাল হঠাৎ বা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উগ্র বাদসাহী মেজাজ দেখাবার জন্যই বলে ফেলেননি, তাও বুঝতে কষ্ট হয় না; কারণ নাটকের পট পরিবর্তন হচ্ছিল ছক মত ঠিক পূর্ব-নির্দিষ্ট পথেই। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দেয়া বন্ধ হবার পর থেকেই যবনিকাপাতের প্রস্তুতির কাজও এগিয়ে চলেছিল। তারপর কিছুদিন আগে যখন হঠাৎ দেখা গেল যে পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে আসতে হলে শুধু এক ভিসা নিলেই হচ্ছেনা; রেসিডেন্ট সার্টিফিকেটের গ্যারাকল মারফৎ ডবল ভিসার ব্যবস্থা হয়েছে। তখনই বেশ বোধ করা যাচ্ছিল যে, শ্রীজহরলাল কিছু বলতে চাচ্ছেন। তাঁর বাণী তৈরী হয়েই গেছে, শ্রোতারা একটু তৈরী হলেই আর বলতে অসুবিধা নেই। আরও পরে মাত্র কিছুদিন আগে, বাংলার অধঃপতনের মাপকাঠি অতুলনীয় ঘোষ মশাইদের নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস যখন উদ্বাস্তু আস্‌তে দেয়া বন্ধ করবার প্রস্তাব করলেন, এবং ভারতের উদ্বাস্তুমন্ত্রী খানদানী উদ্বাস্তু শ্রীখান্না সাহেব কংগ্রেস অফিসে উপস্থিত থেকে সে প্রস্তাবের পক্ষে ওকালতিও করলেন; তখনই আর বুঝতে ভুল হল না যে এবার ক্ষেত্রও প্রস্তুত।

অচিরেই শ্রীজহরলাল মুখ খুলবেন। পরে কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীজহরলাল পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে মুখ খুল্লেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মেজাজ দেখিয়েই মুখ খুল্লেন (ঐদিন শ্রীবিমল ঘোষের বক্তৃতার মধ্যে বাধা দিয়ে উগ্র মেজাজ দেখিয়েই শ্রীজহরলাল কথাগুলো বলেছিলেন)। একমাত্র পুরুষের দেশ ভারতে তিনি পুরুষ হয়েই জন্মেছেন, তাই আর কিছু বুঝুন আর নাই বুঝুন এটুকু ভালভাবেই বুঝে ফেলেছেন যে মেজাজ দেখালেই কাজ। তাই অন্য সব ব্যাপারেও যেমন, এখানেও তেম্নি মেজাজ দেখিয়েই কথা বলেছেন। 'জানিস, আমার মা অমুক বড়লোকের রক্ষিতা' একথা বলে কেউ কোথাও মেজাজ দেখিয়েছে কিনা জানিনা; কিংবা ঐ কথাটি বা ঐ ধরণের কথা বলে আদৌ মেজাজ দেখান সম্ভব কিনা তাও জানিনা। তবে নিজেকে নিম্নতম স্তরের মিথ্যাবাদী এবং ইতিহাসের নিকৃষ্টতম বিশ্বাস-ঘাতক প্রতিপন্ন করবার পরও যে মেজাজ দেখান যায়, তা ত শ্রীজহরলালের কার্য্যকলাপেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই; ভারতের আজ এই অবস্থাই হয়েছে। আশ্চর্য্য শুধুই যে, ভারতে আজ দ্বিতীয় পুরুষ কেউ নেই যে বাধা দেবার সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। ব্যাপারটা যে কী ভীষণ সাংঘাতিক তা বুঝবার মত বিদ্যাবুদ্ধিওয়ালা লোকের ভারতে অভাব নেই। তবুও সবাই নির্বাক। হয়ত অনেকেই ভাবছেন, ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তিই যখন বিপন্ন, তখন আরও উদ্বাস্তুদের আসতে দিলেও কোনও লাভ হবে না। তারাও বিপদে পড়বে, ভারতেরও অবস্থা আরও বিপন্ন হবে। তাঁরা যে ঠিকই বুঝেছেন এবং সার কথাটুকুই বুঝেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ যেটুকু তা হচ্ছে যে তাঁরা শুধু অর্থটুকুকেই বুঝেছেন নীতিটুকুকে বুঝতে পারেন নি; তাই তাঁদের অর্থনীতি বুঝাও পূরো হয়নি। পূরোটুকু বুঝতে পারলে তাঁরা অবশ্যই বুঝতে পারতেন যে, যে কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করাই অর্থনীতি নয়। একটু তলিয়ে দেখলে আরও বুঝতে পারতেন যে অর্থের অজুহাতটুকুও একটি অতি-অবান্তর অজুহাত ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। বুঝতে পারতেন যে ভিন্ন রাষ্ট্র থেকে উদ্বাস্তু এসে ভারতে উৎপাত সৃষ্টি করার সমস্যাটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। তাই সে সমস্যা সমাধানের সাহায্যের জন্য ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাহায্য দাবী করতে পারত। সাহায্য পাক আর নাই পাক চেষ্টা করতে কোনই অসুবিধা ছিল না; অন্ততপক্ষে প্রশ্নটিকে আন্তর্জাতিক সভায় উপস্থিত করতে কোন বাধাই থাকতে পারে না। কক্ষ

ভারত আজ পর্যন্ত সে ধরণের কোন চেষ্টাই করেনি। তাই ভারতের অর্থাভাবের অজুহাতটিরও কোন মানে হয় না। এই একই ধরণের সমস্যা সমাধানে অন্যান্য অনেক দেশ (জার্মানী এবং আরব রাষ্ট্রগুলো) যে বাইরে থেকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য পেয়েছে, তাও অজানা নয়। আর এটাও মোটেই ঠিক কথা নয় যে বাইরে থেকে সাহায্য গ্রহণ করা কর্মটিকে ভারত খুব একটা মর্যাদাহানিকর কর্ম বিবেচনা করে। ভারত ত হামেশাই যেকোন ব্যাপারে, যেকোন অজুহাতে বাইরে থেকে ভিক্ষে পাবার জন্য হাত বাড়িয়েই বসে আছে। তবে এই উদ্বাস্তু সমস্যা, যা গত দশ বৎসর ধরে ভারতের সর্ববৃহৎ সমস্যা হিসাবেই চলে আসছে; সেই সর্ববৃহৎ সমস্যাটির সমাধানের জন্য ভারত একবারও কোন সাহায্যের চেষ্টা করেনি কেন? এ রহস্যের মূল কোথায়? মূল অন্য কোথাও নয়, মূল বিশ্বাসঘাতকতায়। শ্রীজহরলালের বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রকাশ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে মাত্র কয়েকদিন আগে ঠিকই; কিন্তু ঐ প্রকাশ করবার দিনই যে তিনি হঠাৎ বিশ্বাসভঙ্গ করে বসেছেন তা মোটেই ঠিক নয়। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে আসছেন প্রথম থেকেই, এবং বেশ প্ল্যান করেই। যদি তা না হ'ত তাহলে তিনি অনেক আগেই লোক বিনিময় করে নিতেন। আর যদি কোন কারণে একান্তই ঐ বিনিময় কার্যটি সম্ভব না হ'ত, তাহলে তিনি ঐ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেন; এবং অতি অবশ্যই বাইরে থেকে সাহায্যলাভের চেষ্টাও কম করতেন না—তাঁর চীৎকারের চোটে সারা দুনিয়ায় সোরগোল পড়ে যেত। তিনি এসব পথে যাননি। তিনি ঐ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন তাঁর নিজস্ব পন্থায়, যে পন্থায় কার্য্য করতে হলে বাইরে থেকে সাহায্য গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ কখনই নয়। তিনি অবশ্যই বুদ্ধিমান, শুধু তাই নয় অতি বুদ্ধিমান। তাই তিনি ঐ ব্যাপারে বাইরে থেকে সাহায্য ভিক্ষা করেন নি। বাইরে থেকে সাহায্য গ্রহণ করলে, অতি অবশ্যই ঐ সাহায্যকারীদের কাছে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ কিভাবে এগোচ্ছে, তারও কিছু কিছু জানাতে হ'ত। কিন্তু তিনি যে পন্থায় কাজ শেষ করতে চাচ্ছেন, তা বাইরে জানান সম্ভব নয় কখনই। তাঁর ক্যাম্পে ক্যাম্পে ডোল খাইয়ে বা শিয়ালদহে না খাইয়ে শেষ করবার প্ল্যান, বিহারের বাংলাভাষাভাষী এলাকায় বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের বসাবার চেষ্টা করে; রাজস্থানের মরুভূমিতে, হায়দ্রাবাদের পাহারে বা বিন্ধপ্রদেশের জঙ্গলে নিয়ে নিকেশ করবার প্ল্যান, কখনই বাইরে জানান সম্ভব নয়। তাই বাইরে থেকে

সাহায্য তিনি চাননি। এবং সুযোগমত নাটকীয় মুহূর্তে তাঁর নাটকের যবনিকাপাত করছেন।

আমি পাকিস্থান চেয়েছিলাম কি চাইনি সে প্রশ্ন আজ আর তুলে কোন লাভ নেই। নিজেকে আমি ও প্রশ্ন কোনদিন করিওনি কারণ, আমাকে ওখানে থাকতেই হবে। ঐ পূর্ব-বাংলাই আমার নিজস্থান, আমার জন্মভূমি। আর ঐ ব্যাপারে যে আমার কতকগুলি সুবিধাও আছে সে ত আগেই বলেছি। কিন্তু তাই বলেই, যারা থাকতে পারছেন না, বাড়ীঘর উচ্ছন্ন দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াচ্ছেন, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পাবার তদ্‌বির করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন, ভারতে এসে ভিক্ষুকে পরিণত হচ্ছেন কিংবা শ্রীভগবানের চরণলাভ করে ধন্য হচ্ছেন, তাদেরও যে বুঝি না তাও নয়। সেই একান্ত অসহায় বিশ্বাস-হতদেরও বুঝতে পারি; অতি মর্মে মর্মেই বুঝতে পারি। তাদের অসহায় করুণ চোখের চাহনি, তাদের ভীত, স্তব্ধ, অব্যক্ত, নীরব আবেদন আমাকে প্রতিনিয়তই বিচলিত করে আসছে। কিন্তু আরও অসহায়, মূর্খ এবং কাপুরুষ আমি, তাদের কোনই সাহায্য করতে পারিনি, পারিনি আমার কর্তব্য নির্দ্ধারণ করতে, কিংবা হয়ত কর্তব্য বুঝেও কর্মে সাহস পাইনি। তবুও যখনই কলকাতা বা ভারতের কোথাও পুরোন আমলের বন্ধু বা নূতন কংগ্রেসী নেতাদের সাথে দেখা হয়েছে; তাদের সাথে পূর্ববঙ্গ হিন্দুদের বিষয় আলোচনা করেছি। পূর্ববঙ্গ হিন্দুদের কি করা উচিৎ বা কি করলে ভাল হবে, সে বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছি। সর্বত্রই এবং সকলেই পরামর্শ দিয়েছেন "থাকা যদি সম্ভব নাই-ই হয় তাহলে চলে আসতেই হবে, কিন্তু দেখো যেন একটু আস্তে আস্তে আসে। সব একসঙ্গে এসে পড়লে তারা আরও বিপদে পড়বে।" '৫০'-এর দাঙ্গার অল্প কয়েকদিন পরেই পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গেও একবার ঐ বিষয়ের পরামর্শ করবার সুযোগ হয়েছিল এবং তিনিও ঐ একই পরামর্শ দিয়েছিলেন। ঠিক এই কথা কটি বলেছিলেন "যদি পূর্ববাংলার এককোটি হিন্দুই আজ একসঙ্গে এসে পড়ে, তাহলে আমরা সাহায্য দেবার যত ভাল ব্যবস্থাই করি না কেন, তাদের অর্দ্ধেকের বেশি লোককে কখনই বাঁচাতে পারব না। তাই পূর্ববাংলায় থাকা অসম্ভব হলেও, তাদের নিজেদের ভালর জন্যই একটু আস্তে আস্তে আসতে হবে।" এই আস্তে আস্তে আসতে হবে কথার মানে যে বিনা নোটিশে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দেয়া বন্ধ করবার আগেই বা পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে শ্রীজহরলালের 'আর আইতে দিমুনা' ঘোষণার আগেই:

সে কথা কিন্তু বন্ধুরা কেউই বলেন নি—বিধান বাবুও না। তাই আজকে জান্‌তে ইচ্ছে হয়, বন্ধুরা বা বিধানবাবুও ওবিষয়ে কি বলেন! অবশ্য তাঁরা কি বলেন বা না-বলেন তাতেও আজ আর খুব কিছু এসে যায় না কারণ, আমারই মত শ্রীজহরলালও তাদের বুঝে ফেলেছেন। বুঝে ফেলেছেন যে তাঁরা আমার চেয়েও বেশি মূর্খ, অসহায় এবং ক্লীব, তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের শেষ চিহ্নটুকুও আর অবশিষ্ট নেই।

ভারতের নৈতিক এবং অর্থনৈতিক চরম অধঃপতনকে শ্রীজহরলাল তাঁর কাজে লাগিয়েছেন। লাগিয়েছেন তাঁর চরম বিশ্বাসঘাতকতার কাজে। এবার শ্রীজহরলাল ঐ বিশ্বাসঘাতকতার টাকা দিয়েই গড়ে তুলবেন ভারতকে, চালিয়ে চলবেন তাঁর পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনার সেরিমণি উৎসব। মানুষ যে অমর নয় সেটুকু জহরলাল জানেন, আরও ভালভাবে জানেন যে তিনিও অতি-মানুষ কিছু নন—তাঁকেও একদিন মরতেই হবে। তাই, এই রূপ, রস, গন্ধেভরা সুন্দরী বীরভোগ্যা বসুন্ধরাতে আরও যে কটা দিন তিনি বিচরণ করবেন, সে কটাদিন বীরেরই মত বিচরণ করবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন তিনি। সে কটা দিনের রেস্ত তাঁকে সংগ্রহ করতেই হবে; যে কোন উপায়েই হোক। তিনি সেই চেষ্টাই করেছেন। যদি তার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাক্‌ত, যদি উদ্দেশ্য থাক্‌ত ভারতকে মানুষের দেশ হিসাবে গড়ে তুলবার, তাহলে তিনি বিশ্বাস-ঘাতকতার পথে যেতেন না। বিশ্বাসঘাতকতার পথে ক্ষমতা হাতরাতে যেতেন না, প্রয়োজন হ'ত না তাঁর আজ এই চরম বিশ্বাসঘাতকতার করবার। বিশ্বাস-ঘাতকতার পথে, বিশ্বাসঘাতকতার টাকায় যে মানুষ তৈরী হয় না, বিশ্বাস-ঘাতকদেরই শুধু বংশবৃদ্ধি হয়, সেটুকুও বুঝতে পারতেন তিনি। কিন্তু তিনি অতসব বুঝাবুঝির বাইরে,—তাই তিনি তাঁর নিজপথেই চলেছেন, চলেছেন ভারতকে বিশ্বাসঘাতকের দেশে পরিণত করতেই। করে ফেলেছেনও। ঐ বিশ্বাসঘাতকদের সাথে হয়ত তাকেও একদিন মোকাবিলা করতে হবে। আজ ভারতে জন্মাচ্ছেও শুধুই বিশ্বাসঘাতকেরাই—বিশ্বাসঘাতকদের সন্তানেরা যে বিশ্বাসঘাতক হয়েই জন্মাবে, সেত খুবই স্বাভাবিক। তবে সেটুকুই সব নয়;—বিশ্বাসঘাতক শ্রীজহরলালের দশবছরী নেতৃত্বেই আজ ভারতে নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ যা সৃষ্টি হয়েছে; সেই পরিস্থিতিতে মানুষের জন্ম হওয়া আর কখনও সম্ভব নয়, সম্ভব শুধুই বিশ্বাস-ঘাতকদের জন্ম। জন্মাচ্ছেও সেই বিশ্বাসঘাতকেরাই, বিশ্বাসঘাতকতার পথেই,

—জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই। জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিশ্বাসঘাতকতাই আজ ভারতে সন্তান জন্মের প্রধান কারণ,—কাম্য সন্তান জন্ম দেবার পরিবেশ আর নেই। বিশ্বাসঘাতকতার টাকায়, বিশ্বাসঘাতকতার পথে সে পরিবেশ সৃষ্টি হবার আর কোন সম্ভাবনাও নেই। ভারতে আজ শুধুই জন্ম হবে জহরলালদের, জহরলালদেরই দেশ হচ্ছে ভারত। ভারত শেষ হয়ে গেছে, মানুষের দেশ ভারত মৃত,—তাই তার মৃত আত্মার আবারও শুভ কামনা করি।

পাকিস্থান ও ভারতের শেষ অবস্থা

এই 'আবোল তাবোলের' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাখানায় থাকার মধ্যে পাকিস্থানী রাজনীতিতে অনেক অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে! পূর্বে আওয়ামী লীগ ভাগ হয়ে দু'টো হয়েছে; কৃষক শ্রমিকদলও দু'টো হয়েছে। পশ্চিমে রিপাব্লিকান দল আবারও গদি পেয়েছেন, এবং ঐ দলই আবার পশ্চিম পাকিস্থানকে চারটি প্রদেশে ভাগ করবার জন্য প্রস্তাব পাশ করেছেন। কেন্দ্রে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে সুরাবর্দি সাহেব বিতারিত হয়েছেন; মুস্লিম লীগ নেতা ইসমাইল ইব্রাহিম চুন্দ্রিগড় সাহেবের নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। পাকিস্থানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার উদ্দেশ্যে যে ভোটার তালিকা প্রস্তুত হচ্ছিল, তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মুস্লিম লীগের পক্ষ থেকে আবার তাল তোলা হয়েছে, যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা পালটিয়ে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। যুক্ত এবং পৃথক নির্বাচন প্রশ্নে পূর্ববাংলায় আবারও গণ্ডগোল বেশ পাকিয়ে উঠেছে। কোথাকার জল কোথায় গড়াবে বলা কঠিন, তবে জল যে গড়াতে শুরু করেছে সে ত দেখাই যাচ্ছে। আরও পরে, এই নির্বাচন প্রশ্নের হাঙ্গামাতেই চুন্দ্রিগড় মন্ত্রীসভাও পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। মালিক ফিরোজ খাঁ নুনের নেতৃত্বে অন্য আর এক কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়ে পাকিস্থানী রাজনীতি আবার চালু হয়েছে।

এত অল্প সময়ের মধ্যে এত পরিবর্তন অতি অবশ্যই পাকিস্থানী রাজনীতির সজীবতা ঘোষণা করে। প্রশ্ন শুধুই যে, এই সজীবতা কোন্ পর্যায়ের? পাকিস্থানে ঘন ঘন মন্ত্রীত্ব পতনের ব্যাপার দেখে যারা পাকিস্থানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বিষয়ে হতাশ হয়েছেন। তারা ভুল করেছেন বলেই মনে হয়।

একটা দেশের অগ্রগতি তার মন্ত্রী সভার স্থায়িত্বের উপর খুব বেশী নির্ভর করে না; নির্ভর করে মন্ত্রীদের সততা, দূরদৃষ্টি এবং কর্মক্ষমতার উপর। আরও বেশী নির্ভর করে দেশের জনগণের নৈতিক এবং রাজনৈতিক চেতনার উপর। জনগণের চেতনা যেখানে প্রায় শূন্যমাত্রায় এবং রাজনৈতিক নেতাদের গুণাবলীও সন্দেহাতীত নয়, সেখানে মন্ত্রীসভা স্থায়ী না হতে পারাটা মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের কিছুই নয়। পূর্ব আমলের ষ্টেটবল আনষ্টেবল মিনিষ্ট্রির থিওরীর আজ আর বিশেষ মূল্য নেই। বিগত কয়েক বৎসরে ভারতের জগদ্দল প্রস্তরবৎ নিশ্চল স্থায়ী মন্ত্রীসভার এবং ফ্রান্সের একান্ত স্বল্পস্থায়ী মন্ত্রীসভা সমূহের কার্যকলাপ দেখে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা গেছে, সে অভিজ্ঞতা স্থায়ী মন্ত্রীসভার থিওরীর পক্ষে খুব গৌরবের কখনই নয়। তাই মনে হয়, পাকিস্থানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ যদি অন্ধকারময় রূপেই দেখা দেয়, তাহলে সে তার অন্য শত দুর্বলতার জন্যই দেখা দেবে—মন্ত্রীসভার অস্থায়ীত্বের জন্য কখনই নয়। অন্ততপক্ষে ভারতের মত পাকিস্থানের মন্ত্রীসভা সমূহের কোন সদস্যই আজ পর্যন্ত প্রকাশ্য পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে চোরকে সমর্থন জানিয়ে বক্তৃতা করতে সাহস করেনি। পাকিস্থানী রাজনীতির সজীবতার সুফল অন্তত এইটুকু।

পাকিস্থানের এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে সুরাবর্দি সাহেবের বরখাস্তের ব্যাপারটাই যে প্রধান এবং বিস্ময়কর তাতেও কোন সন্দেহ নেই। সভাপতি ইস্কান্দার মির্জ্জা শাক্তিমান পুরুষ খুবই সত্যিকথা, কিন্তু সুরাবর্দ্দি সাহেবও যে খুব দুর্বল নন, সে কথা পাকিস্থানের রাজনীতি বিষয়ে যারই কিছুমাত্র জ্ঞান আছে সেই স্বীকার করতে বাধ্য। সেই সুরাবর্দি সাহেবকেও সোজা রাস্তা দেখিয়ে দেয়া হল, খুবই আশ্চর্য্যের ব্যাপার। তবে এবার সুরাবর্দি সাহেব যে নিজেরই কতকগুলো দুর্বলতার জন্য এই বিপদকে ডেকে এনেছেন, সে আরও বড় সত্যিকথা। প্রধান মন্ত্রী হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজেকে এত বেশী শক্তিমান বলে ধরে নিয়েছিলেন যে আর কাউকেই কিছু পরোয়া করলেন না। বেপরোয়াভাবে উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলে নিজের অস্থির-চিত্ততার প্রমাণ ত দিলেনই; উপরন্তু পক্ষীয় বা বিপক্ষীয় রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর নানা রকমের সংঘাত সৃষ্টি করে চূরমার করতে থাকলেন তাদের, এমন কি তাঁর নিজের দলটিকেও আর আস্ত রাখলেন না—স্তম্ভস্থানীয় মৌলানা ভাষানী সমেত সত্যিকারের কর্ম্মীদের একটা বৃহৎ অংশকে নিজদল থেকেও বিতাড়িত করে

তবে ছাড়লেন। এইভাবেই তিনি তাঁর নিজের দুর্বলতাকে অতি নগ্ন করেই প্রকাশ করে দিলেন। সভাপতি ইস্কান্দার মির্জ্জা সাহেবের সাথে তাঁর কিছুটা মনকষাকষি চলছিলই; ফলে এর পর আবার যখন তিনি রিপাব্লিকান দলকে আক্রমণ করে বসলেন, তখন তাঁর উপরও প্রতি-আক্রমণ আসতে দেরি হল না,—তিনি গদীচ্যুত হয়ে আবার বিরোধী নেতা হলেন।

তবে এটাও কম সত্যিকথা নয় যে সুরাবর্দি সাহেবকে বিরোধী নেতা হিসাবে যতটা বুঝা যায়, সরকারী নেতা হিসাবে তা মোটেই নয়। বরং সরকারী নেতা হিসাবে উল্টো পাল্টা কথাবার্তা বলে তিনি যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন তা একান্তই দুর্বোধ্য। বিরোধীদলের নেতা হিসাবে পাকিস্থানের রাজনীতিকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামীপথে তিনি যতটা এগিয়ে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর সফলতা সে তুলনায় কিছুই হয় নি বল্লে মোটেই বেশী বলা হবে না। বর্তমান অবস্থায় তিনি আরও কিছুদিন ঐ বিরোধীদলের নেতা হিসাবে কাজ করলে পাকিস্থানের রাজনীতির পক্ষে ভালই হবে আশা করা যায়। বর্তমানে পাকিস্থানে রাজনৈতিক পরিবেশ যা সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সরকারী পর্যায়ে সরকারের কর্ণধার হিসাবে অনেক কিছু করাও যে খুব সহজসাধ্য নয়, তাও খুবই পরিষ্কার কথা। তাই সুরাবর্দি সাহেব গদীচ্যুত হওয়ায় বিশেষ দুঃখিত হবারও কিছুই নেই।

পাকিস্থানের বহুধা বিভক্ত রাজনীতি এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিচালিত রাজনৈতিক নেতাদের কার্য্যকলাপ, পাকিস্থানকে আজ যে অবস্থায় এনে ফেলেছে তাতে পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কিছু বলা খুবই দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি যে হবে কিছুই বলা যায় না। তবে সাধারণ নির্বাচন যে বর্তমান বৎসরের (১৯৫৮) শেষের দিকেও হচ্ছে না সে কথা একরকম জোরের সাথেই বলা যায়। মনে হয় পাকিস্থানের ক্ষমতাশীলদের অনেকেই আজ নির্বাচন-ভীতি রোগে আক্রান্ত; কিন্তু এই রোগ-মুক্ত হতে না পারলে গণতন্ত্রের মুখোসও যে আর কতদিন বজায় রাখা সম্ভব হবে তাও বলা কঠিন। অবশ্য নির্বাচন হয়ে গণতান্ত্রিক প্রথায় মন্ত্রীসভা গঠিত হলেই যে পাকিস্থানের সর্ব সমস্যার ফয়সালা হয়ে যাবে, এরকম কেউই বিশ্বাস করে না। বরং মনে হয় আজকাল ঐ নির্বাচনের গণতন্ত্রের উপরও অনেকেই আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। ডাঃ খান সাহেবের মত বিজ্ঞ রাজনৈতিকদের মুখেও আজকাল 'রেভুলেশনারী কাউন্সিল' তৈরী করে শাসনকার্য্য চালাবার কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

তাই শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্থানে ঐ কাউন্সিলই যে হবেনা তারও গ্যারান্টি দেওয়া কঠিন। অন্ততপক্ষে ঐ রকম হলে আশ্চর্য্য হবার কিছুই থাকবেনা। আর ঐ রকম রেভুলেশনারী কাউন্সিলের সাহায্যে শাসনকার্য্য চালালেই যে পাকিস্থানী স্বাধীনতার ভাগবৎ অশুদ্ধ হয়ে যাবে, তারও কোন মানে নেই। দশ বৎসর ধরে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার এক্সপেরিমেণ্ট ত ভালভাবেই দেখা গেল, এখন কিছুদিন ঐ লাইনে কাজ করে দেখলে খুব খারাপ কিছু হবে বলে মোটেই মনে হয় না। অন্ততপক্ষে গত দশ বৎসরে যা হয়েছে, তার চেয়ে খারাপ যে হবে না সে কথা খুব জোরের সাথেই বলা যায়। মোট কথা আজ পাকিস্থানী জনসাধারণ কোন রকমে খেয়ে পরে বাঁচতে চায়—রাজনৈতিকদের সার্কাসী কসরৎ দেখবার সখ আর তাদের নেই। তাই 'রেভুলেশনারী কাউন্সিল' হলেও জনসাধারণ বিশেষ আপত্তি করবে বলে মনে হয় না।

ইতিমধ্যে পাকিস্থানের অর্থনৈতিক এবং খাদ্য পরিস্থিতি যে আরও অনেকটা নীচু পর্য্যায়ে নেমে এসেছে, তাও পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে। আর নূতনত্বের মধ্যে হয়েছে পূর্ব পাকিস্থানে আধা-সামরিক শাসনের প্রবর্তন। সীমানার চোরাই চালান বন্ধ করবার নামে পূর্ব পাকিস্থানের জেলায় জেলায় সৈন্য পাঠান হয়েছে। কিন্তু তাদের হাতে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে ঐ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী। ফলে তারা অতি স্বাভাবিক ভাবেই অনেক বেশী কাজই করছে। এমন কি রাজনৈতিক কর্মীদের উপরও তাদের ক্ষমতা দেখাতে কসুর করছেনা। ব্যাপার দেখে যে রকম মনে হচ্ছে তাতে পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ সামরিক কর্তাদেরই হাতে একথা বলা কঠিন হলেও, পাকিস্থানে যে আজ বেসামরিক শাসন কার্য্য পর্য্যাপ্ত বিবেচিত হচ্ছে না সেইটুকু ত দিনের আলোর মতই পরিষ্কার।

আর ইতিমধ্যে ভারতে অন্য যেসব ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে, ভাষা সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ও পূর্বভারতে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে সেটিই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। রাজাজীর নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতীয় নেতৃবর্গ প্রায় আর কি চরমপত্র দিয়েই জানিয়ে দিয়েছেন যে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের ইয়ার্কী আর সহ্য করা হবে না। বাংলার জ্ঞানী-গুণীদের নেতৃত্বে পূর্বভারতীয় চিন্তাশীলেরাও ঐ একই ধরণের নোটিশ দিয়েছেন; এবং দু'জায়গাতেই সক্রিয় প্রতিরোধ করবার জন্য ব্যবস্থাও হচ্ছে। তবে শ্রীজহরলালও চুপ করে বসে নেই, তিনিও তাঁর কথা বলে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন "যতসব nonsense" আরও বলেছেন,

"সাহিত্যের যাই হোক না কেন ভারতের একতার জন্ম হিন্দি অবশ্যই চাই"। তাই আশাকরা যায় এবার ব্যাপারটা বেশ জমাটভাবেই দেখা যাবে।

ব্যাপারটা বেশ জমে উঠবে মনে হচ্ছে এই কারণেই যে, অহিন্দি এলাকাগুলোতে, হিন্দিওয়ালাদের তাঁবেদার দু'চারজন বাদে সবাই এবার হিন্দির বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে উঠেছেন। কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ইত্যাদি জ্ঞানী-গুণীরা ত বটেই, এমনকি রাজনৈতিক দল মত নির্বিশেষে অন্য সকলেও ক্রমেই হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে স্বরু করেছেন; তাই। তবে দলগত স্বার্থের উপরে যারা কখনই উঠতে পারেন না, দল পাকিয়ে ক্ষমতা সংগ্রহ করবার চেষ্টাই যাদের একমাত্র আদর্শ, সেই কমুনিস্ট পার্টিও আবার তাঁদের সেই বহু পুরাতন খেলাই আরম্ভ করেছেন,—তাঁরা হিন্দির পক্ষেই রয়েছেন। ব্যাপারটি যে আশ্চর্যের কিছুই নয়, তা যাঁরা কমুনিস্ট পার্টিকে জানেন তাঁরাই স্বীকার করবেন। গত মহাযুদ্ধের সময় এই কমুনিস্টরাই "জাপানকে রুখতে হবে" শ্লোগান তুলে ইংরেজ পক্ষে জুটে গিয়েছিল এবং ঐ কাজের বাহাদুরী দেখাতে গিয়েই নেতাজীর প্রতিমূর্তিকে গর্দভ পৃষ্ঠে চড়িয়ে রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা বের করতেও কসুর করেনি তারা। যুদ্ধের পর এই কমুনিস্টদেরই শ্লোগান হয়েছিল "পাকিস্থান মান্‌তে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে"। এরাই রাজ্য পুনর্গঠনের হাঙ্গামার সময় দার্জিলিংকে বাংলা থেকে বের করে দেবার এবং কিষণগঞ্জকে বাংলায় না দেবার আন্দোলন করেছিলেন,—দার্জিলিংকে বের করবার আন্দোলন তাঁরা এখনও চালাচ্ছেন। তাই কমুনিস্টরা হিন্দিওয়ালাদের পক্ষে থাকবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আশ্চর্য এইটুকুই যে কমুনিস্ট-দল এখনও একটা রাজনৈতিক দল হিসাবে বিচরণ করতে পারে। কমুনিস্টরা যে খুবই চালাক তাতে কোন সন্দেহই নেই; তা না হলে ভারতে তাদের অস্তিত্ব অনেক আগেই লোপ পেত। অন্তত "পাকিস্থান মান্‌তে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে," এই শ্লোগানের পর তাদের অবস্থা বর্তমান ভারতে মুসলিম লীগের অবস্থার চেয়ে ভাল থাকবার কোন কারণই থাকতে পারে না। তাই স্বীকার করতেই হবে যে কমুনিস্টরা শুধু চালাক নয়, অতি চালাক। তবে মনে হচ্ছে এবার তাঁরা তাদের শেষ চালাকীই দেখাচ্ছেন—ঠিক '৫৬' সালের হাঙ্গেরীয় কমুনিস্টদেরই মত। চালাকী করেই তারা পার্টি ফেঁদে বসেছেন, চালাকী দ্বারাই চালিয়ে চলেছেন তাদের পার্টি; কিন্তু ঐ চালাকীতেই যে শেষ হতে হবে সেইটুকুই শুধু তারা বুঝতে নারাজ।

আর হয়েছে গৌহাটিতে (প্রাগজ্যোতিষপুরে) কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন। অন্যান্য প্রত্যেকবারের মতই কোটিখানেক টাকার আদ্য শ্রাদ্ধ সহকারে কংগ্রেসী সার্কাসের খেল সম্পন্ন করা হয়েছে। কংগ্রেসে অনেক মোটা মোটা প্রস্তাবও নিশ্চয়ই পাশ করা হয়েছে। তবে এবার কংগ্রেসী খেল-এ চারপেয়ে জানোয়ারদের খেলাই নাকি জমেছিল ভাল। তেষট্টি হাতীর শোভাযাত্রা এবং চারপেয়ে জানোয়ারদের যে চিড়িয়াখানা সাজান হয়েছিল, তারাই এবার কংগ্রেসী খেল-এর সব দর্শকদের টেনে নিয়েছে—বক্তৃতা প্যাণ্ডেলের খেলায় লোক হয়নি মোটেই। এবার ফাঁকা মাঠেই বক্তৃতা শেষ করতে হয়েছে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে এবং বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের ব্যাপারে, আসাম ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেও, আজ স্বাধীনতার দশ বৎসরে আসামে একটিও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। আসামের তেলের রিফাইনারী বিহারে চালান করবার চালবাজী খেলা এখনও চলছে। এমন কি নূতন যে তেলের খনিগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলো থেকেও তেল উঠাবার কোন ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় শুধুমাত্র সার্কাসী খেল দেখিয়ে যে বজীমাৎ করা সম্ভব হবে না, সেটুকু বুঝবার মত বোধ-শক্তিওয়ালা লোক যে কংগ্রেসী নেতৃত্বে নেই তাও ভালভাবেই প্রমাণ হয়েছে। তাই আসামীরা এবার চারপেয়ে জানোয়ারদেরই বেশি সম্মান দিয়ে কংগ্রেসী সার্কাসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। যেরকম দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, আগামীতে কংগ্রেসকে অনেক জায়গায়ই ঐ আসামী প্রথায় সম্মানলাভ করতে হবে।

তবে শিল্প বা ঐ ধরণের অন্য কিছু আসামে গড়ে তোলবার চেষ্টা না হলেও আসামীরা যে কিছুই পান নি তাও নয়। তাদের খুসী করবার জন্য কিছু কিছু করাও হয়েছে। মাত্র কয়েকদিন আগে আসামের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধীকে প্রমোশন দিয়ে একেবারে মাদ্রাজের গভর্ণর করে পাঠান হয়েছে। আসামী নেতার এহেন প্রমোশনে আসামীরা যে আহ্লাদে আটখানা হয়েছেন তাতে আর সন্দেহ কি? সময় থাকৃতে আরও দু'চারজনকে এই ধরণের প্রমোশন দিতে পারলেই আর কথা ছিল না,—আসামীরা তাহলে অতি অবশ্যই প্রাগজ্যোতিষপুর কংগ্রেসে শুধুমাত্র চারপেয়ে জানোয়ারদের চিড়িয়াখানায়ই ভীড় জমাতেন না,—কংগ্রেসী প্যাণ্ডেলের খেলায়ও খানিকটা ভীড় অবশ্যই হ'ত। আসলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মারফৎ আসামীদের উন্নতি

বিধানের যে চেষ্টা হয়েছে, শ্রীবিষ্ণুরাম মেধীর প্রমোশন তার মধ্যে সর্বপ্রথম না হলেও সর্বপ্রধান যে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তবে উন্নতি পরিকল্পনার কাজটি একটু দেরিতে আরম্ভ হয়েছে, এই আর কি! ঠিকমত সময়ে কাজটি আরম্ভ করে আরও কয়েকজনকে প্রমোশন করিয়ে দিতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যেত। হয়ত তাহলে তেলের রিফাইনারী বিহারে চালান করতেও আর বিশেষ অসুবিধা হ'ত না।

শ্রীমেধীর প্রমোশনে যে আসামীদের প্রমোশন হয়েছে, এইটুকুই সব নয়। শ্রীমেধীর এই উন্নতিমূলক চাকুরী লাভে আরও কিছু গোপন রহস্য প্রকাশ পেয়ে গেছে, কারণ শ্রীমেধী আসামের মুখ্যমন্ত্রীর চাকুরীতে ইস্তফা দিয়েছিলেন এই অজুহাতে যে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাওয়ায় বা বয়স বৃদ্ধির ফলে অন্য কোন পেশা দ্বারা জীবিকা নির্বাহে অপারগ হওয়াটাই যে ভারতে গভর্ণরী লাভের যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হয়, সে কথাটি জানা ছিল না কিনা, তাই! আসলে ভারতে গভর্ণর হতে হলে কি কি গুণাবলীর অধিকারী হওয়া দরকার, তা আজ পর্যন্ত কিছুই বুঝা যাচ্ছিল না। শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু কি কি গুণাবলীর জোরে পশ্চিমবাংলার গভর্ণর হয়েছেন, কেউ জানেন কি? শ্রীমেধীর চাকুরীর ব্যাপারে অন্তত এটুকু জানা গেল যে শরীর বিকল না হলে গভর্ণরী পাওয়া যায় না। ভারতের প্রধান মন্ত্রী বা সভাপতি হতে হলে কি কি গুণাবলীর প্রয়োজন হয় তাও হয়ত একদিন এইভাবেই জানা যাবে। সম্ভবত মন বিকল হলে প্রধান মন্ত্রী, এবং শরীর ও মন দুইই বিকল হলে ভারতের সভাপতিত্ব লাভ হয়। ভাবগতিক দেখে অন্তত সেই রকমই মনে হচ্ছে।

আর নূতন গরম খবরের মধ্যে হচ্ছে সেখ আবদুল্লার মুক্তি। কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী সেখ আবদুল্লা আবার ছাড়া পেয়েছেন; এবং বাইরে এসেই ভারতের বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তৃতা শুরু করেছেন। অনেক ভারতীয় বন্ধুকেই আজ প্রশ্ন করতে শুনছি, ব্যাপার কি? এই সময়ে সেখ আবদুল্লাকে ছেড়ে দেবার মানে কি? প্রশ্নকর্তাদের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন, যাঁরা নিজেরাই ইতিপূর্বে বিনা বিচারে বন্দী থাক্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা যায় যে, তাঁরা কি কোন লোককে অনন্তকাল ধরে বিনা বিচারে বন্দী রাখাটাই সমর্থন করেন নাকি? যদি তা না হয়, তাহলে এ ধরণের প্রশ্ন তুলবারই বা মানে কি? আমার ত মনে হয়,

শেখ আবদুল্লাকে কেন ছাড়া হল এটা কোন প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে কেন তাঁকে ধরা হয়েছিল? যখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তখন দেশদ্রোহিতা-মূলক কার্যকলাপ, বিদেশী শক্তিদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র ইত্যাদি অনেক কথাই তার বিরুদ্ধে বলা হয়েছিল। অথচ দীর্ঘ সাড়ে চার বৎসর আট্‌কিয়ে রাখবার সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে এসব ব্যাপারের কোন মাম্‌লাই আনা হল না। কেন? তবে এ প্রশ্ন তুলেও কোন লাভ হবে না। এ সবই অতি সুদূরের প্রশ্ন! শেখ্ আবদুল্লা বাইরে থাক্‌লে কাশ্মীর ভারতে রাখা যাবে কিনা এসব প্রশ্ন নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁরা অতি সুদূরের প্রশ্ন নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন। আসল এবং নিকট প্রশ্নগুলো তাদের মাথায় কিছুতেই ঢুক্‌ছে না। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, জহরলাল থাক্‌লে ভারত নিজেই আর কতদিন থাক্‌বে? ভারত শূন্যে বিলীন হতে আর কত সময় লাগবে? গত ২৩শে জানুয়ারী (৫৮) 'যুগান্তর' এবং 'অমৃতবাজারে' শ্রীজহরলালকে ফুলের মুকুট মাথায় ফুলের সাজে সেজে ঐ সাজে সাজা একদল ছুক্‌রী মেয়ের সঙ্গে বেশ সিনেমার পোজে ছবি তুলতে দেখেছি কিনা, তাই! তাই মনে প্রশ্ন জেগেছে যে জহরলাল থাক্‌লে ভারত নিজেই আর কতদিন থাক্‌বে? ছবিখানা দেখে হিংসে হয়েছিল কি না কেউ জিজ্ঞেস করবেন না। হিংসে না হওয়াটাই অস্বাভাবিক,—রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে নেই বলেই যে একেবারে, মানে ইয়ে হয়ে গেছি, তা ত নয়। আমেরিকার কাছ থেকে ভিক্ষে করে অনেকগুলো টাকা পাওয়া গেছে,—তাই একটু ফুল-শয্যার ব্যবস্থা হয়েছে! রাজনীতিটা যে এতখানি উপভোগ্য জিনিষ তা মধ্য-যুগের পাঠান-মোগল বাদশাহরাও জান্‌তেন না। আর আগেই ত বলেছি "জীবনটাকে কতরকমভাবে উপভোগ করা যায় সে বিষয়ে মূর্খ মোগল-পাঠান বাদশাহদের জ্ঞানই বা ছিল কতটুকু"। তবে মোগল-পাঠান বাদশাহরা যে ভিক্ষের টাকায় ফুলশয্যার আসর জমাতেন, তা কিন্তু ইতিহাসেও পাওয়া যায় না। ভারতে আজ নূতন ইতিহাস তৈরী হচ্ছে,—ভিক্ষের টাকায় ফুলশয্যার ইতিহাস। তাই কাশ্মীর ভারতে থাক্‌বে কি না প্রশ্নটি ভারতীয়দের কাছে অতি সুদূরেরই প্রশ্ন।

আর ভারতব্যাপী যে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া আজ দেখা যাচ্ছে, সেটাই বর্ত্তমান ভারতের সর্বপ্রধান এবং নিকটতম সমস্যা। এমনিতেই ত স্বাধীনতা এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সেরিমণি উৎসব সফল করে তুলবার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে ভারতের অনেককেই আজ অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে।

তার উপর আবার দুর্ভিক্ষ! তবে খুব ভয়েরও বিশেষ কিছুই নেই। না খেয়ে বেঁচে থাকবার কসরৎ ভারতবাসী ক্রমেই অনেকটা আয়ত্ত করে ফেলেছে;—আসল ভরসাও সেইটুকুই। উপরন্তু শ্রীজহরলাল ত উপদেশ বাৎলেই রেখেছেন "দেশে চাল গম যখন কম রয়েছে তখন তোমরা দুধ, মাছ, ডিম, মাংস বেশী করে খাওয়ার অভ্যাস কর"। বিখ্যাত ফরাসী নরপতি ষোড়শ লুইয়ের আরও বিখ্যাত মহিষী 'মেরী আতোয়াঁও' বুভুক্ষু প্রজাসাধারণকে রুটির অভাবে কেক খাবার উপদেশ দিয়েছিলেন—শ্রীজহরলালের উপদেশটিও প্রায় সেই ধরণেরই আর কি! তবে কেক খাবার সদুপদেশ লাভের পর অকৃতজ্ঞ ফরাসী সাধারণ ষোড়শ লুই ও তদীয় পত্নী 'মেরী আতোয়াঁর' যে অবস্থা করেছিলেন, সেরকম কিছু হওয়া ভারতে কখনই সম্ভব নয়—গান্ধী মহাত্মার কল্যাণে ভারত একেবারেই অহিংস হয়ে গেছে। অহিংসার সাফল্যও এইখানেই; এবং এই ভরসাতেই শ্রীজহরলাল ক্রমাগতই এবং ক্রমবর্দ্ধমান হারে তার উপদেশবাণী বর্ষণ করে চলেছেন। তাই আপাতত ভারতীয়দের দুধ, ঘি খেয়েই বাঁচতে হবে। বাঁচতে হবে শ্রীজহরলালের সেরিমোণি উৎসবে ভীড় পাকিয়ে 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি করবার জন্যই।

তবে সব চেয়ে রোমাঞ্চকর ব্যাপার যা ইতিমধ্যে ঘটেছে, সেটি হচ্ছে 'চাগ্‌লা-কমিশন' কর্তৃক ইন্‌সিওরেন্স কর্পোরেশনের টাকা ভাগাভাগির তদন্ত। গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় পার্লামেণ্টে এক রোমাঞ্চকর ভাগাভাগির কাহিনী প্রকাশ পায়। প্রকাশ পায় রাজস্ব মন্ত্রী এবং বন্ধুরা মিলে বন্ধুদের মধ্যে ইন্‌সিওরেন্সের টাকা ভাগ করে দেবার। দেশের লোক আৎকে উঠে। কর্মকর্তারাও বেগতিক বুঝে, 'চাচা আপন পরাণ বাঁচা' হিসাবেই এবং নিজেদের নির্লিপ্ততা প্রমাণ করবার আকুল আগ্রহেই তাড়াহুড়ো করে এক তদন্ত কমিশন গঠন করে পাশ কাটাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভয়ে জ্ঞান কাণ্ড হারিয়ে কাজ-কারবার করলে অনেক সময় যা হয় এ ব্যাপারেও সেই রকমই হয়ে পড়ে,—বোম্বাই হাইকোর্টের স্বনামধন্য বিচারপতি চাগ্‌লা সাহেবের উপর ঐ তদন্ত কমিশনের ভার দেওয়া হয়। চাগ্‌লা সাহেব তদন্ত আরম্ভ করেন, অতি প্রকাশ্যভাবেই আরম্ভ করেন—এবং আরম্ভতেই কারও বুঝতে ভুল হয় না যে তদন্তের রিপোর্ট কমিশন গঠনকারীদের আয়ত্তের বাইরেই যাবে। ফলে অতি-মানব ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে এবার বে-পরোয়া হয়েই মাঠে নামতে হয়—ভুল শোধরাবার চেষ্টায়। ঐ তদন্ত কার্য্য চলতে থাকা কালেই, তিনি

নানা স্থানে বক্তৃতায় রাজস্ব মন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী ভায়ার গুণকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেন ; এমন কি বন্ধু কৃষ্ণমাচারী ঐ ভাগাভাগির বিষয় কিছুই জানতেন না, এ ধরণের সার্টিফিকেট ঝাড়তেও কসুর করেন না। কিন্তু তবুও ঐ নিরেট হৃদয় বিচারপতি চাগ্‌লাকে বিচলিত করা সম্ভব হয় না। তিনি তাঁর রিপোর্টে বন্ধু কৃষ্ণমাচারীকে ত দোষী সাব্যস্ত করেনই, উপরন্তু আরও মন্তব্য করেন যে, ভেতরে আরও অনেক রহস্য আছে যা ভেদ করা সম্ভব হয়নি, এবং ঐ রহস্য ভেদ করতে হলে আরও বিশদভাবে তদন্তের প্রয়োজন আছে। ফলে বন্ধু কৃষ্ণমাচারীর পদত্যাগ করা ভিন্ন আর উপায় থাকে না। তিনি তাই করেনও। কিন্তু ঐ পদত্যাগ পত্রে এবং পার্লামেণ্টে তার বিদায়ী বক্তৃতায়ও তার গরম মেজাজ দেখাতেও কসুর করেন না। নিশ্চয়ই ত! এ রকম আহাম্মুখী কাজ-কারবারে কার না মেজাজ গরম হয়ে পারে—আর লোক ছিল না, একেবারে চাগ্‌লাকে দিয়ে কমিশন! তদন্ত কমিশন ত আরও কত হয়েছে, কিন্তু কৈ কোন রিপোর্ট ত আয়ত্তের বাইরে যায়নি—আর সেগুলো পড়েই বা দেখেছে কে! তার উপর আবার প্রকাশ্য তদন্ত।

অতি-মানব শ্রীনেহেরুকে তাই এবার বেশ কাবু হতে হয়েছে। কৃষ্ণমাচারীকে ঠাণ্ডা করতে গিয়ে খোসামোদের কথা তিনি আর কিছুই বাদ রাখেননি,—কৃষ্ণমাচারী না থাকলে ভারতের অর্থনীতি একেবারে অচল হয়ে যাবে, এ সব ত বলেছেনই ; কৃষ্ণমাচারী যে আবার শীগ্‌গীরই ফিরে আসবেন এ ধরণের ইঙ্গিতও প্রায় দিয়েই রেখেছেন। এমন কি বে-সামাল হয়ে তিনি বিচারপতি চাগ্‌লার রিপোর্টের উপরও বক্র-কটাক্ষ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। শ্রীনেহেরু অতিমানব, তিনি না থাকলে ত ভারত একেবারেই অচল হয়ে যাবে। তাই তাঁর এ সব কার্য্য-কলাপ বা কটাক্ষের বিষয় কোন বিরূপ আলোচনা ভারতে আর সম্ভব নয়—ভারতকে সচল রাখতে হলে তাঁকে সব কিছুতেই ক্রিহ্মাও দিতেই হবে। তবুও বাদশাহ শ্রীনেহেরুর এই বেসামাল 'আলুথালু' ভাবটা যেন কেবলই কেমন কেমন লাগছে—তিনি কি ভারসাম্য একেবারেই হারিয়ে ফেলেছেন নাকি? জানি না। তবে মনে হচ্ছে বন্ধু কৃষ্ণমাচারীও বন্ধু কৃষ্ণমেনন ভায়ার মতই কিছু গোপন দলিল হাতের মুঠোয় রেখেই চলতেন—যে দলিল প্রকাশ পেলে অনেকের অনেক গোপন রহস্যই বেফাঁস হতে পারে। তাই তিনি চুটিয়েই মন্ত্রীত্ব করেছেন ; কাউকে কেয়ার না করেই। ইতিপূর্ব্বেও তিনি দুবার মন্ত্রীত্বে ইস্তফা দিয়েছিলেন মেজাজ

দেখিয়েই, এবং দুবারই তাকে খোসামোদ করেই ধরে রাখা হয়েছে। তাই তিনি আবার শীগগীরই ফিরে এসেছেন দেখলে আশ্চর্য্য হবার কিছুই থাকবে না। জীপ স্ক্যাণ্ডেলে হাত পাকাবার পর কৃষ্ণমেনন যদি মন্ত্রী হয়ে হিরো হতে পারেন, তাহলে তারই বা হিরো হতে বাধা কি! এই ভাবেই ভারতে কৃষ্ণ অবতার কৃষ্ণ-লালেরা হিরো হতে থাকবেন এবং গোপন রহস্যও আর কখনই ফাঁস হবে না,—ভারতকে সচল রাখবার জন্যই।

পাকিস্থান ও ভারতের শেষের পরের অবস্থা

'আবোল তাবোলের' দ্বিতীয় সংস্করণে পাকিস্থান ও ভারতের শেষ অবস্থা বিষয়ে যে আলোচনা হয়েছে, তার পরে আলোচনা করবার মত অনেক কিছুই দেশ দুটিতে ঘটে গেছে যাদের আলোচনা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু ঘটনাগুলোকে ঠিক স্বাভাবিক বলা চলে না বলেই তৃতীয় সংস্করণে ঐ ঘটনাগুলোর আলোচনা আর 'শেষের অবস্থার' মধ্যে স্থান দেয়া উচিত হবে বলে মনে হয় না। তাই 'শেষের পরের অবস্থা' নাম দিয়েই ওগুলির আলোচনা করা হল। অবশ্য শেষের পরের অবস্থা বলেই এরকম মনে করবার কোন কারণ নেই যে, পাকিস্থান এবং ভারত শেষ হয়ে গেছে। পাকিস্থান বা ভারত মোটেই শেষ হয়ে যায় নি; স্বশরীরেই বর্তমান রয়েছে এবং রয়েছে বলেই আবারও আলোচনা করতে হচ্ছে। আর এ আলোচনাও যে শুধুই শ্রাদ্ধশান্তির বিষয় আলোচনা তাও মোটেই নয়। তবে কিনা শুধু ঐ বিষয়ে আলোচনা করে শেষ কার্য্য সমাধা করে দিতে পারলেই বোধ হয় ভাল হ'ত—সভ্য দুনিয়ার স্কন্ধের বোঝা অনেকটা লাঘব হ'ত।

আগেই বলেছি ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিচালিত দল এবং নেতাদের নেতৃত্বে পাকিস্থানের রাজনীতি যে অদ্ভুত পরিস্থিতির ভেতর এসে পড়েছে তাতে পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কিছু বলা কঠিন। তবে কঠিন হলেও একেবারে অসম্ভব যে ছিল না তাও ভালভাবেই প্রমাণিত হয়েছে, কারণ দ্বিতীয় সংস্করণের 'শেষ অবস্থার' শেষ লাইনে ঠিক এই কথা কটিই বলা হয়েছিল, "পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ সামরিক কর্তাদেরই হাতে একথা বলা কঠিন হলেও পাকিস্থানে যে আজ অসামরিক শাসনকার্য্য পর্য্যাপ্ত বিবেচিত হচ্ছে না সেটুকু দিনের আলোর মতই পরিষ্কার"। ঠিক দিনের আলোর মত পরিষ্কারভাবেই কথাটি করে

গেছে—পাকিস্থানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। যে পরিস্থিতির পটভূমিকায় কার্য্যটি সাধিত হয়েছে, তাও যে মোটেই অসচ্ছ ছিল না সেওত ভবিষ্যৎ বাণীটি সফল হবার মধ্যেই প্রমাণিত হচ্ছে।

আর ভারতের উত্তর সীমান্তে চীনের আক্রমণে আজ যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং সেই পরিস্থিতিতে ভারতীয় নেতৃত্ব যে খেল দেখাতে সুরু করেছেন, তার ভেতরও আচমকা, আকস্মিক বা নূতন কিছুই নেই কারণ, 'আবোল তাবোলের' বহু জায়গায় এবং বহুবার, তিব্বত চীনের হাতে ছেড়ে দেয়া মানে যে ভারতের উপর চীনা আক্রমণ নিমন্ত্রণ করে আনা, একথা অতি পরিষ্কার ভাবেই বলা হয়েছে। আর তিব্বত হাতছাড়া হবার পর চীনের বিরুদ্ধে ভারতের রক্ষা ব্যবস্থার যে কোন মূল্যই নেই, বা ভারতকে তখন চীনের পদলেহন করেই তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে—মানে তখন ভারতের স্বাধীনতা হবে পদলেহনকারীর স্বাধীনতা, তাও অতি পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে। আর সেই সঙ্গে এটুকুও বলা হয়েছে যে, "তাঁর (শ্রীনেহেরুর) অধনীস্থ থাকাকালে ভারতের সৈন্যবাহিনী যে ভারতের কোন অংশকে স্বাধীন করবার জন্যত দূরের কথা ভারতের কোন অংশকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যও এগিয়ে যাবে না, সে কথাও যাদের বুঝবার ক্ষমতা আছে তারাই বুঝে নিয়েছেন।" তাই আজ ভারতেও অবস্থা নূতন কিছুই নয়; অবস্থা শুধুই শেষের পরের অবস্থা।

তবুও অবস্থাটা আবারও আলোচনা করতে হবে শুধু এই জন্যই যে 'আবোল তাবোলের' আরও আবোল তাবোল পাঠকেরা যেন ব্যাপারটা বুঝতে ভুল না করেন, যেন তারা কোদালকে কোদাল বলেই বুঝতে পারেন। তারা যদি ভুল করেন তবেই শেষ। তখন আর শ্রাদ্ধ শান্তির বিষয় আলোচনা করা ছাড়া আলোচনা করবার অন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ভুল করা বা ভুল বুঝা তাদের জন্য নয়। ভুল করলেই যাদের মহত্ব প্রকাশিত হয়, তারা সে দলেও নিশ্চয়ই নন। ভুল করবার বা বুঝবার জন্য বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, গুণী, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের দেশে কোন অভাব নেই। ভুল করবার বা বুঝবার একচেটে অধিকার ঐ সব বিকৃত এবং বিক্রীত মস্তিষ্ক লোকদেরই। তাদের ভুল বোঝাবুঝিতে এসে যায়ও অতি সামান্যই কিন্তু ঐ সঙ্গে যদি 'আবোল তাবোলের' পাগল পাঠকেরাও ভুল বুঝতে সুরু করেন, তবেই আসল বিপদ,—বিপদ যা কিছু তা পাগলদের জন্যই। সুস্থমস্তিষ্ক

শুধুই টাকা রোজগার করবেন, এবং টাকার মাধ্যমেই নিজেদের মহত্বকে আরও ফাঁপিয়ে তুলবেন। তাই এ আলোচনা হচ্ছে শুধুই পাগলের এবং পাগলদের জন্যই।

যাই হোক, আসল ব্যাপার হচ্ছে যে সুরাবর্দি সাহেবের প্রধান মন্ত্রীত্ব খতম হবার পর থেকেই পাকিস্থানের রাজনীতি ক্রমেই আরও ঘোরাল হয়ে উঠতে থাকে। কারণ প্রধানত, সুরাবর্দি সাহেব যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান মন্ত্রীত্ব থেকে বিতারিত হয়েছিলেন, তবুও পূর্ববাংলার সরকারী গদী তাঁর দলের হাতেই ছিল; এবং এই সুযোগ নিয়েই অতি-বুদ্ধিমান সুরাবর্দি সাহেব নানারকমের খেল সুরু করেছিলেন। কিন্তু সভাপতি ইস্কান্দার মির্জা সাহেবও কাঁচা লোক ছিলেন না, তাই খেল বেশ জমেও উঠেছিল। যার ফলে সম্ভব হয়েছিল পূর্ববাংলায় একরাত্রে দু'বার মন্ত্রীত্ব পতন;—এমন কি সেই সঙ্গে গবর্ণর ফজলুল হক সাহেবেরও পতন। সুরাবর্দি সাহেব বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন সভাপতি ইস্কান্দার মির্জা সাহেবকে বিতারিত করতে, আর ইস্কান্দার মির্জা সাহেব বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন পেশাদার রাজনীতিকদের সায়েস্তা করতে। এইভাবেই খেল বেশ জমে উঠেছিল। কিন্তু এই জমাট খেলার মধ্যে হঠাৎ করে এমন একটি ঘটনা ঘটে গেল যার ফলে সভাপতি ইস্কান্দার মির্জা সাহেবের হাতে Direct Action ভিন্ন অন্য কোন পথ আর অবশিষ্ট থাকল না। ইস্কান্দার মির্জা সাহেবও সেইভাবেই প্রস্তুত হতে থাক্লেন। অবশ্য, ইস্কান্দার মির্জা সাহেব যে অনেক আগে থেকেই শেষ পন্থা হিসাবে Direct Action-এর কথাই চিন্তা করছিলেন, তাও কিছু কিছু অবশ্যই বুঝতে পারা যাচ্ছিল। যার ফলে সম্ভব হয়েছিল এই ভবিষ্যৎ বাণী করা যে, পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ সামরিক কর্তাদেরই হাতে। তবুও ইস্কান্দার মির্জা সাহেব, তাঁর নিজ নেতৃত্বে গঠিত পাকিস্থানের গঠনতন্ত্রকেও যে চালু রাখবার শেষ চেষ্টা না করে ছাড়বেন না তাও বুঝা যাচ্ছিল পরিষ্কারভাবেই। কিন্তু বাদ সাধল ঐ ঘটনাটি। ঘটনাটি অন্য কিছুই নয়—আততায়ীর ছুরিকাঘাতে ডাঃ খান সাহেবের মৃত্যু। ইদানিং ডাঃ খান সাহেবকে সঙ্গে নিয়েই সভাপতি ইস্কান্দার মির্জা সাহেব রাজনীতি করতেন। বলতে গেলে ডাঃ খান সাহেবই ছিলেন সভাপতি মির্জা সাহেবের দক্ষিণ হস্ত। সেই দক্ষিণ হস্ত ডাঃ খান সাহেবই যখন নিহত হলেন, তখন মির্জা সাহেবের সম্মুখে আর অন্য পথ খোলা থাক্ল না, চিন্তা করবারও বিশেষ কিছুই থাক্ল না। তিনি শুধুই একটা সুযোগের মুহূর্ত খুঁজতে থাক্লেন।

সে সুযোগ সমুপস্থিত হতেও খুব বেশী দেরী হল না। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি পূর্ববঙ্গ আইন সভায় সরকার এবং বিরোধীপক্ষের মারামারির মধ্যে আইনসভার স্পীকার নিহত হলেন। আইনসভার মধ্যে স্পীকার নিহত হওয়া ব্যাপারটা ঠিক চেপে যাবার মত নয়—চাপা থাকলও না। পাকিস্থানময় হৈ-হল্লা সুরু হয়ে গেল। বাইরেও বিশেষত ভারতে এ নিয়ে কম হল্লা হল না। অনেকে অনেক ধরণের কথা বল্লেন, বিচার চাইলেন হত্যাকারীর। পূর্ববঙ্গ আইনসভার নিন্দাবাদে ভরে উঠল খবরের কাগজের পাতা। সভাপতি ইস্কান্দার মির্জা সাহেব চুপ করেই থাকলেন। কিন্তু ৭ই অক্টোবর যখন মুখ খুললেন তখন পাকিস্থানের গঠনতন্ত্র বাতিল হয়ে গেছে, এবং পাকিস্থানে সামরিক শাসন কায়েম হয়েছে। আপাতত এই খানেই পাকিস্থানে গণতন্ত্রী স্বাধীনতার ইতিকথা শেষ হল ধরে নেয়া যেতে পারে! পরে যা সব হচ্ছে তা সবই শেষের পরের কথা এবং কাহিনী।

পাকিস্থানে গঠনতন্ত্র বাতিল এবং সামরিক শাসন প্রবর্তনের ফলে আর যাই হোক স্পীকার হত্যার ব্যাপারটা যে চাপা পড়ে গেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। আইন বা রাজনৈতিক কোনদিক থেকেই ঐ অদ্ভুত ব্যাপারটির আলোচনা আর কাউকে করতে শুনা যায়নি। হত্যাকারীর অনুসন্ধানও বিশেষ কিছুই হয়নি। ব্যাপারটা বেশ ভালভাবেই ভুলে যাওয়া গেছে। তবুও আসলে ব্যাপারটা ঠিক ভুলে যাবার মত ছোট মোটেই নয়, কারণ, স্পীকার নিহত হয়েছিলেন এইজন্য যে তিনি তার নিরপেক্ষতা বর্জন করে, সরকারীদলের পক্ষভুক্ত হয়ে, নিজ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেছিলেন। সরকারী পুলিশ এবং গুণ্ডাদলের সাহায্যে আইনসভায় বিরোধীদলের সকল অধিকারকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন।

পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র সফল হতে হলে একজন নিরপেক্ষ স্পীকার যে অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাতে কোনই দ্বি-মত নেই। সেই স্পীকার, আইনসভার ভেতরে যার রুলিংই হচ্ছে প্রায় শেষ কথা, তিনিই যদি ঐ ধরণের ব্যবহার করেন, তাহলে গণতন্ত্রী স্বাধীনতা রক্ষার উপায় কি? পূর্ববঙ্গ আইনসভার স্পীকার নিহত হওয়ায় এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করবার একটা সুযোগ এসেছিল কিন্তু সামরিক শাসনের ফলে প্রশ্নটি চাপা পড়ে গেছে। তবে প্রশ্নটি চাপা পড়া যে উচিৎ হয়নি তা হয়ত অনেকেই স্বীকার করবেন। বিশেষত এইজন্য যে, শুধু পূর্ববঙ্গেই নয়, পাকিস্থান, ভারত এবং আরও অনেক অনগ্রসর

দেশেই হামেশাই সরকার পক্ষ বিরোধীদের বক্তব্য স্তব্ধ করে দিচ্ছেন ঐ স্পীকারদের সাহায্যেই। তাই আবারও প্রশ্ন, স্পীকার যদি নিরপেক্ষ না হয় তাহলে স্বাধীনতা রক্ষার উপায় কি? কেউ হয়ত বলবেন গণতন্ত্রের অনেক দুর্বলতা আছে, এটিও তারই একটি। রাজনৈতিক দার্শনিকেরা হয়ত নানা-রকমের ফর্মূলা কষে বহুরকমের উপায় বাৎলে দিতেও কসুর করবেন না; এবং কেউ-ই হয়ত স্বীকার করতে চাইবেন না যে পূর্ববঙ্গ আইনসভার বিরোধী সদস্যরা সেদিন যা করেছে, এই সমস্যা সমাধানের সেটাও একটা উপায়। তবুও অস্বীকার করবার কোনই উপায় নেই যে, সেদিন পূর্ববঙ্গ আইনসভার বিরোধীরা যা করেছে তা ভিন্ন তাদের অধিকার রক্ষার অন্য কোন উপায়ও আর ছিলনা। স্বাধীনতা বড়ই কঠিন জিনিষ, কঠিন হস্তেই তাকে রক্ষা করে চলতে হয়। শুধু নরহত্যার নিন্দাবাদ করে বেড়ালেই সব রাজনৈতিক প্রশ্নের সমাধান হয় না,—চাপা দেয়া যায় হয়ত অনেক কিছুই।

পাকিস্থানে সামরিক শাসন প্রবর্তনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী চোখে লাগে যে ব্যাপারটি তা হচ্ছে গঠনতন্ত্র বাতিল। কারণ গঠনতন্ত্র বাতিল না করেও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সভাপতির অনেক বিশেষ ক্ষমতা ঐ গঠনতন্ত্রেই দিয়ে রাখা হয়েছিল। তাই গঠনতন্ত্র বাতিলের ব্যাপারটা বুঝা সত্যিই একটু কঠিন। কিন্তু তার চেয়েও কঠিন হচ্ছে বুঝা সভাপতি ইস্কান্দার মির্জা সাহেবের গদীচ্যুতির ব্যাপারটা। কারণ, এই সামরিক শাসন প্রবর্তনের ব্যাপারে ইস্কান্দার মির্জা সাহেবই যে ছিলেন আসল কর্মকর্তা সে বিষয়ে কারুরই কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আসলে তার চাল চলন এবং কাজকর্ম দেখেই পাকিস্থানে সামরিক শাসন যে অবশ্যম্ভাবী তা ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব হয়েছিল। তাই, সেই কর্মকর্তা ইস্কান্দার মির্জা সাহেবের গদীচ্যুতি ব্যাপারটা সত্যিই দুর্বোধ্য রয়ে গেছে।

পাকিস্থানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়ে ভাল হয়েছে কি খারাপ হয়েছে এ প্রশ্নের খুব সোজা কোন উত্তর নেই। তবে এটুকু বলতে মোটেই ইতস্ততঃ করতে হয়না যে এভিন্ন অন্য উপায়ও আর কিছুই ছিল না। আর সেই সঙ্গে আরও একটু বলা যায় যে সামরিক শাসনের আগের দশ বৎসরে পাকিস্থান যে হারে অধোন্নতির পথে এগিয়ে গেছে, পরের দশবৎসরে সে হারে নীচে কখনই যাবে না। তবে কিনা অনেক বিজ্ঞ রাজনৈতিক যারা ইংরেজী বই পড়ে কথাবার্তা বলা অভ্যেস করেছেন; তারা ইতিমধ্যেই

বলতে সুরু করেছেন—"any way, good government is no substitute for self government." সাজিয়েগুছিয়ে একটা মুখরোচক কথা বলতে পারলেই যেখানে শত যুক্তিকে নস্যাৎ করে দেয়া যায়, সেখানে বিজ্ঞ লোকেরা যে এ ধরণের মুখরোচক কথা আবিষ্কার করতে থাকবেন তাতেও আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। আশ্চর্য্য এইটুকুই যে "self government" কথাটির তারা যে কি মানে বুঝেন, তা তাঁরা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেন না। সম্ভবত তারা নিজেরাও কথাটির মানে বুঝবার চেষ্টা কোন দিনই করেন নি। হয়ত তাদের ধারণা, যে কোন লোক যে কোন উপায়ে কিছু ভোট বাগিয়ে গদী দখল নিলেই দেশের সকলের 'self government' হল। যেমন শ্রীনেহেরুর শাসনাধীনে 'self government' হয়েছে ভারতবাসীর এবং সুরাবর্দি এবং তস্য সাগরেদের অধীনে self government হয়েছিল পাকিস্থানবাসীর। তাই তারা পাকিস্থানে Military Dictatorship কায়েম হওয়ায় খুবই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। ক্ষুণ্ণ হবারই কথা! দশ বৎসরের চেষ্টায় ভোট বাগাবার কায়দাটা তাঁরা যেভাবে রপ্ত করে নিয়েছিলেন তার কিছুই কাজে লাগান গেলনা কিনা, তাই!

তবে সাধারণ লোকে যে আজ ঐসব সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুপ্রাণিত কথাবার্তায় বিশেষ উৎসাহ অনুভব করেনা তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কারণ তাতে তাদের পেট ভরে না। তাদের ধারণা, যে গভর্ণমেণ্ট তাদের মানুষ হিসাবে বাঁচবার ব্যবস্থা না করে শুধুমাত্র 'self government' বিতরণ করে, সে গভর্ণমেণ্ট 'self government' নয় selfish government. ঠিক এই কারণেই পাকিস্থানে সামরিক শাসন কায়েম হতে সেখানের জনসাধারণ তাকে স্বাগতই জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, পাকিস্থানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ায় ভারতেও যে reaction দেখা গিয়েছিল তাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে ভারতীয় জনসাধারণও ব্যাপারটিকে স্বাগতই জানিয়েছে। সবাইত 'self government'-এর স্বাধীনতায় হাবুডুবু খাচ্ছেন কিনা, তাই!

সামরিক শাসনের অধীনে পাকিস্থান কি গতিতে এবং কোন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে তার হিসার করবার সময় হয়ত এখনও হয় নি। তবুও সত্যের খাতিরে এটুকু না বলে উপায় নেই যে, জনসাধারণ যতটা আশা করেছিল পাকিস্থানে সামরিক শাসন ঠিক ততটা সফলতা লাভ করতে পারেনি। সামরিক শাসনের অধীনে পাকিস্থানের অর্থনৈতিক ভিত্তি যে অনেকটাই টাল

সামলে নিয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সীমানার চোরাই ব্যবসা এবং কালোবাজারীও যে অনেকটাই কমেছে তাও অতি সত্যি কথা। তবুও সাধারণের সাথে সরকারের সম্বন্ধের কেন্দ্রগুলো যে এখনও দুর্বলই রয়েছে তা আরও বড় সত্যি কথা। সরকারী পর্য্যায়ে দুর্নীতি, যা হচ্ছে কিনা সাধারণের সাথে সরকারী সম্বন্ধের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। সেই দুর্নীতি সামরিক শাসনের প্রথম ধমকে বেশ কমে গিয়েছিল, কিন্তু ইদানিং আবার বেশ ভালভাবেই স্বস্থানে ফিরে এসেছে। ফলে সরকার থেকে জনসাধারণ আবারও দূরে সরে যেতে আরম্ভ করেছে। অন্যান্য আরও অনেক বিষয়েই উন্নতির বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হয়ত জনসাধারণ কিছুটা বেশীই আশা করেছিল, তবুও আর খানিকটা আশা পুরণ না হবারও কোন মানে হয়না।

ঠিক কি কি কারণে যে সামরিক শাসনও আবার জনসাধারণ থেকে দূরে সরে যেতে আরম্ভ করেছে, তা এখনই বলা কঠিন। সামরিক শাসনের সাফল্যের হিসাব করবার সময় এখনই হয়ে গেছে তাও মনে হয় না। তবুও সামরিক শাসনে দুর্বলতার যে লক্ষণটি প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে তার কারণ হিসাবে একটি ধারণার দিকেই বিশেষভাবে আঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা যায়। সে ধারণাটি হচ্ছে, সরকারী কর্মচারীরা মানে যারা সরকার চালান, তারা মোটামুটি ভাল এবং কাজের; যত অনর্থের মূল ছিল ঐ পেশাদার রাজনৈতিকের দল। তারাই সব নষ্ট করেছে। রাজনৈতিকদের মধ্যে ভাললোক প্রায় ছিল না বল্লে হয়ত খুব ভুল হবে না; কিন্তু সরকারী কর্মচারীদেরও বেশীরভাগই ভাল এবং কাজের এধারণাটিও ঠিক অতখানি ঠিক নয়। এই কর্মচারীদের দুর্বলতাই আবার সরকারকে সাধারণের থেকে দূরে সরিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে। শুধু তাই নয়, অনেক সময় হাবভাব দেখে এমনও মনে হয়েছে যে তারা ইচ্ছা করেই একাজ করছে। বেশ প্ল্যান করেই সামরিক শাসনকে অপদস্থ করবার চেষ্টায় আছে। সামরিক শাসন কায়েম হওয়ায় সরকারী কর্মচারীদের হাতে ক্ষমতা এসেছে প্রচুর, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের ভয়ও বেড়ে গেছে অনেকগুণ। সম্ভবত এইসব কারণেই একদিকে অতিক্ষমতা আর অন্যদিকে ধরা পড়বার ভয়, তাদের এই পথে ঠেলে দিয়েছে। ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে তারা সাধারণকে আবারও সরকারের থেকে দূরে সরিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে। অপদস্থ করতে আরম্ভ করেছে সামরিক শাসনকে সাধারণের সম্মুখে।

কিছুদিন হল পাকিস্থানে সামরিক শাসনের অধীনে 'বেসিক ডেমোক্রেসি' নাম দিয়ে এক নূতন ধরণের গণতন্ত্রের গঠনতন্ত্র গড়ে তুলবার কাজে হাত দেয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক এক হাজার জনসংখ্যার জন্য একজন নির্বাচিত 'বেসিক ডেমোক্রাট' থাকবেন এবং এঁরাই হবেন স্থানীয় ইউনিয়ন কমিটির সদস্য। পরে এদের মধ্য থেকেই ক্রমান্বয়ে থানা, সাবডিভিসন, জেলা প্রভৃতি কমিটিতে প্রতিনিধি যাবেন। এবং সম্ভবত পার্লামেণ্ট প্রবর্তিত হলে সেই পার্লামেণ্টের সদস্যদেরও নির্বাচিত করবেন এঁরাই। এই বেসিক ডেমোক্রেসির প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন শেষ হয়েছে এবং কাজও কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে। তবে এ জিনিষ একেবারেই নূতন এবং সবেমাত্র আরম্ভ করা হয়েছে, তাই এর সফলতার বিষয় এখনই কিছু বলা কঠিন। কিন্তু পাকিস্থান বা ভারতের মত অনগ্রসর দেশে, যেখানে ভোটের মূল্য বিষয়ে অশিক্ষিতদের ত দূরের কথা শিক্ষিতদের মধ্যেও বিশেষ ধারণা নেই, সেখানে যে British Parliamentary Democracy-র অনুকরণে পার্লামেণ্টারী সরকার মারফৎ জনসাধারণের উপর Self Government চাপিয়ে দেবার কোন মানে হয় না, তাও আজ অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন। ঐ পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেসির চাপেই যে জনসাধারণ চেপ্টে যাচ্ছে, তাদের মুখে রক্ত উঠেছে সে ত গত চৌদ্দ বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। তাই 'বেসিক ডেমোক্রেসির' মত নূতন কিছুর প্রবর্তন যে খুব খারাপ হবে তা মোটেই মনে হয় না। অন্তত-পক্ষে এই ধরণের নূতন কিছু পরীক্ষা করে দেখবার যে নিতান্তই প্রয়োজন আছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। পাকিস্থানে সামরিক শাসনের মতই 'বেসিক ডেমোক্রেসি'ও সাধারণের কাছ থেকে স্বাগতই লাভ করেছে। তবে এরও সফলতা অনেকটাই নির্ভর করছে ঐ সরকারী কর্মচারীদের সততা এবং কর্মদক্ষতার উপর, তাই এখনই 'বেসিক ডেমোক্রেসি'র সাফল্যের বিষয় বেশী আশা না করাই ভাল।

আর এটুকুও ভুললে মোটেই চলবে না যে পাকিস্থানের মত দেশে ডেমোক্রেসির সমস্যাটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা কখনই নয়। ডেমোক্রেসির সমস্যা ত নয়ই, এমন কি রাজনৈতিক সমস্যাকেই প্রথম বা এক নম্বরের সমস্যা বলে অভিহিত করা উচিত হবে না কখনই। পাকিস্থান বা ভারতের বড় সমস্যা হচ্ছে অর্থনৈতিক, সমস্যা হচ্ছে—কিভাবে জনসাধারণ খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে তারই। নৈতিক বা সামাজিক সমস্যাগুলোও ভারত বা পাকিস্থানের সম্মুখে

নেহাৎ ছোট কিছু নয়। বরং সময়েতে মনে হয় সবচেয়ে বড় সমস্যাই হচ্ছে ঐগুলো। সমস্যা হচ্ছে কিসের জোরে তারা সম্মুখ চিনে সবলে এগোতে পারবে, তারও। তাই পাকিস্থানে শুধুই ডেমোক্রেসির এক্সপেরিমেণ্ট নিয়ে মাথা ঘামালেই অনেক কিছু হবে না। অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা ত করতেই হবে, আর সেই সঙ্গে করতে হবে যত অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারের মূলোৎপাটন। এখানে চাই একজন কামাল আতাতুর্ক যিনি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে এই নৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলোও মোকাবিলা করতে পারবেন। পাকিস্থানের বর্তমান কর্ণধার এবং প্রধান নেতা ফিল্ডমার্শাল মহম্মদ আয়ুব খান কতখানি শক্তিধর পুরুষ তা এখনই বলা কঠিন। তবে রাজনৈতিক ছাড়াও অন্যান্য সমস্যাগুলোর কথাও যে তিনি চিন্তা করছেন সেটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তার চেষ্টা কিছুটা এখনই বুঝতে পারা যাচ্ছে, আর ঐ সামাজিক সমস্যাগুলোও যে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি তাও বুঝতে পারা যায় তার একটি বক্তৃতা থেকে। তিনিই একদিন বলেছিলেন,—"For historical reasons, Islam came into being to destroy idolatry, but the tragedy is, Islam became the Idol of the Muslims"—ঐতিহাসিক কারণেই পৌত্তলিকতা ধ্বংসের জন্যই ইসলামের জন্ম হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ইসলামই মুসলমানদের পূজার পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, আপাতত আয়ুব খানই হচ্ছে পাকিস্থানের আশার আলো; তার কার্য্যকলাপের উপর দৃষ্টি রেখে অপেক্ষা করা ভিন্ন অন্য উপায়ও কিছুই নেই।

আর ভারতে গত তিন বৎসরে (দ্বিতীয় সংস্করণ বাজারে চালু থাক্‌বার সময়ে) যা সব ঘটেছে সে বিষয়ে বেশী বলবার কিছুই নেই, বলা সম্ভবও নয়, বিশদভাবে ত নয়ই। কারণ ভারতের রাজনীতি আজ আর খুব প্রকাশ্য কিছু নয়। অপ্রকাশ্য অন্ধকার পথেই আজ ভারতীয় রাজনীতির আনাগোনা। এই অন্ধকারের রাজনীতির যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে বা পাচ্ছে, তা অতি সামান্যই। তবে সামান্য হলেও ইঙ্গিতপূর্ণ,—ইঙ্গিত চরম অন্ধকারের। ভারত আজ অন্ধকারের পথেই এবং অন্ধকারের দিকেই এগিয়ে চলেছে, কারণ বাধা দেবার কেউ নেই। ভারতবাসী অহিংস, পরমসহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীল ইত্যাদি আরও অনেক গুণের অধিকারী, তাই আশা করা যায় যে একেবারে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা ধৈর্য ধরেই অপেক্ষা করবে। তাদের শেষ ভরসা পরকালকে ত আর কেউ নষ্ট

করতে পারবে না! সেই ভরসাতেই তারা নিশ্চিন্ত আছে। অবশ্য কিছুই করবার ক্ষমতা যাদের একেবারেই নেই, তাদের শুধুই চিন্তা করে সময় নষ্ট করবারও খুব কিছু মানে হবে না।

যাই হোক গত তিন বৎসরের ভারতীয় ঘটনাগুলো খুব প্রকাশ্য না হলেও একেবারেই যে দুর্বোধ্য তাও মোটেই নয়। যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তা থেকেই অনেক কিছু বুঝে নিতে পারা যায়। যদিও গান্ধীবাদী ভারতীয় রাজনীতি কোনদিনই খুব প্রকাশ্য কিছুই ছিল না, তাহলেও বর্তমানের মত অন্ধকারের পথই তার একমাত্র পথ ছিল এটুকুও খুব সত্যি মনে হয় না। তাই প্রশ্ন, আজ এ রকম হল কেন? এই কেনর যে একটা খুব সোজা উত্তর আছে তাও মোটেই নয়। তবে এটুকু ঠিক যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে ভারতীয় নেতৃত্ব রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য অনেক ব্যাপারের সাফল্যের বিষয় যে বহ্বারম্ভ করে আসছিলেন, যেভাবে বহ্বারম্ভ দ্বারাই ভারতীয়দের ত বটেই, বাইরের পৃথিবীকেও বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে ভারত একটা অতি-ভীষণ কিছু। সেইসব বহ্বারম্ভের চালবাজী ধরা পড়তে সুরু করেছে। শুধু চালবাজীর ভাঁওতায় আর কুলোচ্ছে না। রাজনৈতিক চাল-বাজীর 'নিরপেক্ষতা' আর 'পঞ্চশীল' আজ শীলরূপ ধারণ করেই ভারতের দাঁত ভাঙ্গা সুরু করেছে। আর অর্থনৈতিক চালবাজীর 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' ভারতকে এখনও সেই কল্পনার যুগেই রেখে দিয়েছে। আজ ভারতের দিকে দিকে বেড়ে উঠছে শুধুই অনশন, অর্দ্ধাশন, নগ্ন, অর্দ্ধনগ্নদের ভীড়, বেকার আর ভিক্ষুকদের শোভাযাত্রা। আজ স্বাধীনতার চৌদ্দ বৎসর পরেও ভারতকে খাদ্যের জন্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ফিরতে হচ্ছে বিদেশীদের দ্বারে। শুধু তাই নয় 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার' নামে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা, কো-অপারেটিভ বেসিসে বন্ধুদের মধ্যে ভাগ করে নেবার যে খেলাটি চলছিল গত দশ বৎসর ধরে, তাও মাঝে মাঝে বেফাঁস হতে আরম্ভ করেছে। ভি, ভি, সি অকেজো হয়েছে, ভাকরা ডামের তলা ফেঁসেছে, দুর্গাপুরের ব্লাস্ট ফার্ণেস বসে গেছে, কল্যাণীর ড্রেন তলিয়েছে; আরও এই ধরণের ছোট-বড়-মাঝারি অকেজো হওয়া, ফাঁসা, তলান, বা বসানর শত সহস্র খবর প্রকাশ পাচ্ছে প্রতিদিনই। সম্ভবত এইসব কারণেই কর্তারা বেশ চালাক হয়েছেন, তাই তারা আলোর থেকে অন্ধকারের পথ ধরেছেন। অন্ধকারে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করা যত সহজ, আলোতে তা কখনই নয়।

উপরন্তু ১৯৫৮ সনের অক্টোবরে পাকিস্থানে মিলিটারী 'কোদেতা' হবার পর থেকে তারা আর কারুর উপরই ভরসা করতে পারছেন না, এবং ঐ ভয়েও তারা আরও দ্রুতগতিতে অন্ধকারের পথে নেমে যাচ্ছেন। পাকিস্থানে মিলিটারী 'কোদেতা' হবার পক্ষে যে কারণগুলো ছিল, ভারতেও যে সে কারণগুলোর কিছুমাত্র অভাব ছিল না বা নেই তা নয়, বরং মনে হয় অনেকটা বেশী পরিমাণেই আছে। আর সে খবর ভারতীয়রা না জানলেও কর্মকর্তারা খুব ভালভাবেই জানেন। অন্ততপক্ষে, পরমসহিষ্ণু ভারতীয় জনসাধারণও যে আজ একটা পরিবর্তন চাচ্ছে,—তা সে যে-কোন উপায়েই হোক; আয়ুব খাঁ যে অনেক ব্যাপারে ভারতীয়দের কাছেও হিরোর আসন পেয়েছে, এসব খবর ভারতীয় নেতারা বেশ ভালভাবেই জানেন। এইসব কারণেই প্রকাশ্য পথ তাদের আজ আর নেই, অন্ধকারের গলিঘুঁজিই আজ তাদের একমাত্র সোজা পথ।

আসলে পাকিস্থানে মিলিটারী 'কোদেতা' হবার পর থেকেই ভারতীয় রাজনীতির শেষ প্রকাশ্য পথ শেষ হয়ে গেছে—নিভিয়ে দেয়া হয়েছে সব আলো, অন্ধকারে ভূতের নাচ ভালভাবে জমবে এই আশাতেই। রাজনীতির প্রেতনৃত্য ভারতে যে আজ ভালভাবেই জমে উঠেছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। আর ঐ ভূতের ভয় থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই ভারতীয় সামরিক বাহিনীকেও বেশ ঘায়েল করে আনা হয়েছে—তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়েই। অন্ধকারের জীব বন্ধু কেষ্ট-মেনন ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ক্রমেই আরও অন্ধকারে ঠেলে দিতে ব্যস্ত রয়েছেন। আর 'বাইরের শো'টি বজায় রাখবার জন্যই পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং তাঁর মেজাজটিকে চড়িয়ে দিয়েছেন বেশ কয়েক গুণ উঁচুতেই। বেশ চড়া মেজাজেই তিনি চলে বেড়াচ্ছেন। কারণে অকারণে এবং যত্রতত্র গালাগালি করে মেজাজ দেখান তার আজ স্বভাবে পরিণত হয়েছে। এমন কি তিনি সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের জজদের (চাগলা এবং বসু) উপরও তার মেজাজ দেখাতে কসুর করছেন না। মেজাজ দেখিয়েই তার খেলের 'শো' বজায় রাখতে চাচ্ছেন।

তবে তার গরম মেজাজের ধরণটি যে সেই "মারিবু ত মারিবু ধক্কা দিবু কাঁহি," তা সমজদারেরা অনেক আগেই বুঝে ফেলেছেন। ফলে তার খাস-তালুকের পদ-পদলেহনকারী প্রজাকুল বাদে অন্য কেউই আজ আর তার মেজাজকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছেন না। বাইরে থেকে কিল, চড় বা পদাঘাত

আজ তার হামেশাই লভ্য। নানা ধরণের বিপদও আজ তার উপর চেপে আসতে আরম্ভ করেছে, তার মেজাজকে কেয়ার না করেই। একের পর এক বিপদেরা আসতে সুরু করেছেন—প্রায় প্রসেশন করবার মত ভাবেই। এই ভাবেই ১৯৫৯ সালের বসন্তকালে এক বিপদ এসে ভারতের ঘাড়ে চাপে। ব্যাপারটি অন্য কিছুই নয়, চীনা আক্রমণ এবং অত্যাচারের দাপট সহ্য করতে না পেরে তিব্বতীয় বিদ্রোহীরা দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে আসতে আরম্ভ করে। এমন কি স্বয়ং দালাই লামা পর্যন্ত দেশ ছেড়ে ভারতেই চলে আসেন।

তিব্বতের ব্যাপারটা যে এই ধরণেরই একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তা অবশ্য সাধারণের পক্ষে বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি; যাঁরা আবোল তাবোল তাদেরত নয়ই। তিব্বত চীনকে উপঢৌকন দিয়ে ভারত যে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেই বসেছিল, এ ধরণের আলোচনা 'আবোল তাবোলে' অনেক আগেই এবং বিশদভাবেই করা হয়েছিল। তবে কিনা যাঁরা অসাধারণ, যাঁরা ভুল করলেই মহত্তর হবার সুযোগ পান তাদের কথাই আলাদা। তাঁরা ঐ পঞ্চশীলের নামাবলী গায়ে এঁটে বেশ নিশ্চিন্তই ছিলেন। তারপর তিব্বতের ব্যাপারটা যখন ঘটেই গেল এবং খবরটাও চেপে রাখা গেল না; তখন ঐ অসাধারণেরা এমন ভাব দেখালেন যে ব্যাপারটা খুবই হঠাৎ এবং আচমকা ঘটে গেছে। যদিও চীনা সাম্রাজ্যবাদী জবর দখল এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিব্বতে যে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেছে এ সংবাদটি বহু ভারতীয় সংবাদ পত্রেরাও বহু রকম ভাবে প্রকাশ করেছিলেন; আর বহু বিদেশী সংবাদপত্র ত ব্যাপারগুলো বেশ বিশদ বিবরণ সহই প্রকাশ করছিলেন। তবুও অসাধারণ ভারতীয় নেতৃত্বের ঘুম কিছুতেই ভাঙেনি, তারা ঘুমিয়েই ছিলেন। অবশ্য যারা না ঘুমিয়ে ঘুমাবার ভান করেন, তাদের ঘুম ভাঙা সহজ কখনই নয়। যারা চীনা সাম্রাজ্যবাদকে তিব্বত ঘুষ দিয়ে নিজেদের লুঠের সাম্রাজ্য বজায় রাখবার ফিকিরে ছিলেন তাদের ঐ ধরণের ঘুমের ভান করা ভিন্ন আর উপায়ই বা কি ছিল! আর ভারতের চল্লিশ কোটী জনসাধারণই যেখানে বেহুঁশ নিদ্রামগ্ন, সেখানে শুধু নেতারা জাগ্রত থাকবেন, লাঠি হাতে করে পাহারা দেবেন, অতখানি আশা করবারও খুব মানে হয় না। তাঁরা বরং ঘুমিয়েই থাকুন। ঘুমবার ভান করে পড়ে থেকে তাঁরা যা ক্ষতি করেছেন, জাগবার ভান করে থাকলে (এখন যে রকম আরম্ভ করেছেন) ক্ষতি করবেন আরও বহুগুণ বেশী—একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

উপরন্তু চীনা সাম্রাজ্যবাদী লোভ যে তিব্বত দখল করেই থেমে যাবে না তাও না বুঝবার মত ছিল না। তাই দালাই লামার ভারত আগমনের অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সংবাদে প্রকাশ পায় যে চীনা সৈন্যবাহিনী ভারতেরও কোন কোন অংশ দখল করে বসে রয়েছে। এমন কি লংজুর ভারতীয় ঘাঁটিটি তারা লড়াই করেই দখল করেছে। লড়াইয়ের ফলে ভারতীয় পক্ষে কিছু হতাহতও হয়েছে। সংবাদটী প্রকাশ পেতে ভারতে বেশ একটু সোরগোল পড়ে যায়। অনেক যায়গা থেকে নেতৃত্বের উপর অনেক রকমের দাবী উঠতে থাকে—"চীনাদের হটিয়ে দাও," "চীনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ কর" ইত্যাদি অনেক ধরণের দাবীই উঠতে থাকে। ফলে 'হিন্দি চীনি ভাই ভাই' এর অহিংস, শান্তিবাদী এবং পঞ্চশীল কবচ ধারণকারী ভারতীয় নেতারা এবার সত্যিই একটু বেকায়দায় পড়েন। তাই দেশের লোককে ঠাণ্ডা করবার জন্য তারাও বেশ গরম সুরে বক্তৃতা আরম্ভ করে দেন। চীনকে এবার দেখে নেবেন ভাবটা অনেকটা এই ধরণের আর কি! চীন বেদখলীকৃত যায়গা ছেড়ে না গেলে তার সঙ্গে আর আলাপ আলোচনা করা হবে না; ভাল কথায় না গেলে সমস্ত পন্থায়ই তাদের হটিয়ে দিতে হবে, ইত্যাদি মুখরোচক অনেক গরম কথাই ভারতীয় নেতারা বক্তৃতা মারফৎ বলতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই যখন গরম কথা বলে আর গরম কথা শুনে, সব গরম গ্যাস বের হয়ে যেতেই ঠাণ্ডা হয়ে যায় ভারতের ফানুষের মানুষগুলো; তখন সেই ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু চীনা প্রধানমন্ত্রীর সাথে পত্র বিনিময় আরম্ভ করতেও দেরী করেন না। পত্রাঘাতেই চীনকে ঘায়েল করতে তিনি এবার বদ্ধপরিকর। কিন্তু পদাঘাতের উত্তরে পত্রাঘাত করতে গেলে স্বভাবতই যা হয়ে থাকে এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পত্র মারফৎই আবার তিনি পদাঘাত লাভ করেন চীনা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে—চীন 'ম্যাকমোহন লাইনকে' ভারত এবং তিব্বতের সীমারেখা বলে স্বীকার করতে গররাজী হয়, এবং তাদের পূর্ব প্রকাশিত মানচিত্র, যাতে ভারতের প্রায় চল্লিশ হাজার বর্গ মাইল ভূমি চীনের মধ্যে দেখান হয়েছে; সেই মানচিত্রকেই ভারত এবং চীনের সীমারেখার শেষকথা হিসাবে মেনে নেবার দাবী জানায়। ফলে ব্যাপারটা আরও ঘোরাল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু দমবার পাত্র শ্রীনেহেরু কখনই নন, তাই তিনি ঐ প্রেমপত্রালাপ চালিয়েই চল্লেন। অবশ্য দমবার কোন উপায়ই তাঁর আর নেই—একবার দমলেই তাঁর এবার দম ফুরোবে।

শ্রীনেহেরুর প্রেম পত্রালাপ অনন্তকাল ধরে চলতে থাকলেও লংজু এবং অন্যান্য ভারতীয় ঘাটিগুলো যে চানেদের দখলেই থেকে যাবে, সেইটুকু বুঝাবার জন্যই শ্রীনেহেরু এমন কথাও বলতে থাকলেন যে যুদ্ধ বাধলে ভারত এবং চীন উভয়েই ধ্বংস হয়ে যাবে, এ্যাটম বোমার লড়াই এসে যাবে ভারতের মাটিতে। দেশের সাধারণের উপর ট্যাক্সের বোঝা যে আরও অনেক বেড়ে যাবে একথাও বলতে ভুললেন না। আর সেই সঙ্গে একথাও বারবার ঘোষণা করতে থাকলেন যে তিনি কোন সামরিক জোটে আবদ্ধ হতে নারাজ। এমনকি পাকিস্থান সভাপতি ফিল্ডমার্শাল মহম্মদ আয়ুব খান, চীনের ভারত আক্রমণকে পাকিস্থান আক্রমণেরই সামিল ঘোষণা করে, ভারত এবং পাকিস্থানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে একত্রীকরণের প্রস্তাব দিয়ে যে বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন, সেই বন্ধুত্বের হস্তটিকে বিনা দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করতে বিন্দুমাত্র দেরী করলেন না তিনি। মোটকথা শ্রীনেহেরু ঐ বেদখলীকৃত যায়গাগুলোকে চীনকে উপহার দিয়েই তার নিজ সিংহাসনের শান্তি বজায় রাখতে চাইলেন। আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, এইত হচ্ছেন শ্রীনেহেরু ; এইত হচ্ছে ভারতের ইতিহাস—যুগ-যুগান্তরের ভারতের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। ভারতের রাজ বা রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের যদি কিছু বিশেষত্ব থেকে থাকে, তাহলে তা হচ্ছে তার পাতায় পাতায় ভণ্ডামি, নপুংসকতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। শ্রীনেহেরু কাহিনীও নূতন কিছুই নয়।

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে চীনা আক্রমণের সংবাদ প্রকাশ হবার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই আরও একটি সংবাদ যা বহুদিন থেকেই গুজব হিসাবে চালু হয়েছিল, আবারও শুনতে পাওয়া যেতে থাকে। সংবাদটি হচ্ছে, কাশ্মীরের 'লাদাক' প্রদেশের অনেকাংশ চীনারা দখল করে বসে রয়েছে। শুধু বসে নয়—ঐ বেদখলীকৃত যায়গার ভেতরে তারা একটা সামরিক সড়ক এবং বিমান অবতরণ ক্ষেত্রও তৈরী করে ফেলেছে। এই সংবাদটিকে গুজব হিসাবেই যে আরও কতকাল চালান হ'ত তাও বলা কঠিন, কারণ, চীনা সৈন্যেরা লাদাকের ঐ অংশ দখল করে বসেছিল বিগত পাঁচ বৎসরেরও অধিককাল থেকে। ব্যাপারটা যে স্বাধীন ভারতীয় সরকার বা তার স্থায়ী এবং একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর অজানা ছিল তাও নিশ্চয়ই নয়। তবুও ঐ গুজবের বেশী ভারতবাসী কিছুই ঠিক জানতে পারেনি। এমনকি ভারতীয় পার্লামেণ্টেও ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করে কেউ কোন সদুত্তর আদায় করতে পারেনি,—ব্যাপারটিকে গুজব বলেই উড়িয়ে

দেবার চেষ্টা হয়েছে। আর সেই সঙ্গে হয়েছে "হিন্দি চীনী ভাই-ভাই"য়ের শ্লোগানবাজী, এবং চীন যাতে U. N. O.-তে আসন পেতে পারে তারই জন্য ভারতের পক্ষ থেকে আপ্রাণ চেষ্টা। কিন্তু ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে চীনা হামলা আরম্ভ হবার কয়েকদিনের মধ্যেই যখন পাকিস্থানের বৈদেশিক বিভাগ থেকে 'লাদাক' বে-দখল হবার সংবাদটা সরকারী ভাবেই প্রকাশ করে দেয়া হল, তখন আর ব্যাপারটা চেপে রাখা সম্ভব হল না। ভারতীয় পার্লামেন্টে শ্রীনেহেরুই স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে 'লাদাকের' অনেকাংশ (১৪০০০ বর্গ মাইল) চীনারা বহুদিন আগে থেকেই দখল করে বসে রয়েছে। কিন্তু সংবাদ-টিকে স্বীকার করা পর্য্যন্তই—আর কিছুই নয়। কি করে যে আবার ওটা ফেরৎ পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে তিনি কিছুই বললেন না। বরং পার্লা-মেন্টে 'লাদাক' বে-দখল হবার সংবাদটি স্বীকার করতে বাধ্য হবার সময়ই তিনি এমন কয়েকটি কথা বলে রাখলেন যা থেকে বুঝতে মোটেই কষ্ট হল না যে তিনি 'লাদাকের' ঐ যায়গাগুলোর বে-দখল মেনেই নিয়েছেন। তিনি বললেন, "They occupied certain hill tops where not even a blade of grass grows"—ভাবটা খুবই পরিষ্কার,—ঘাসই যেখানে গজায় না তা নিয়ে অত হাঙ্গাম করে কি হবে। নিশ্চয়ই ত ঘাসই যদি না গজায় তাহলে তিনি কাটবেন কি? তিনি ত গত চৌদ্দ বৎসর ধরে শুধুই ঘাস কেটেই চলেছেন কিনা, তাই!

তবে শুধু পাকিস্থানের পররাষ্ট্র বিভাগ থেকে 'লাদাক' বে-দখল হবার সংবাদ প্রকাশ করবার ফলেই যে শ্রীনেহেরু সংবাদটিকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাও মোটেই মনে হয় না। কারণ, ঠিক ঐ সময়ের কাছাকাছি সময়েই ভারতে এমন আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে শ্রীনেহেরুর পক্ষে ঐ সংবাদটিকে চেপে থাকা আর কোন মতেই সম্ভব ছিল না। সেই ঘটনাটি হচ্ছে, ভারতীয় সামরিক কমাণ্ডারদের একযোগে পদত্যাগের হুমকি। যদিও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কেষ্ট মেননের সন্দেহজনক কার্যকলাপে উত্যক্ত হয়েই সামরিক কমাণ্ডারেরা ঐ পথ ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন; তবুও তাদের ঐ হুমকি যে প্রধান মন্ত্রীর সন্দেহজনক বৈদেশিক পলিসি,—বিশেষভাবে তাঁর চীনা প্রেমের পলিসির বিরুদ্ধেও ছিল না, একথাও বলা কঠিন। কারণ 'লাদাক' বে-দখল হবার খবর সামরিক কমাণ্ডারেরা অবশ্যই জানতেন। সামরিক কমাণ্ডারদের এই হুমকির মূল উদ্দেশ্য ঠিক

কতখানি সফল হয়েছে তা জানা না গেলেও, শ্রীনেহেরু যে 'লাদাক' বে-দখল হবার খবরটি পাঁচ বৎসরেরও অধিককাল চেপে থাক্‌বার পর স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, এটুকু অতি-অবশ্যই সত্যি। তাই বলা খুবই কঠিন যে ঐ সময়ে এই ব্যাপারগুলো না ঘটলে আরও কতকাল 'লাদাক' বে-দখলের খবর ভারতীয়দের কাছে গুজব হিসাবেই থাক্‌ত।

ভারতীয় সামরিক কমাণ্ডারদের পদত্যাগের হুমকির পেছনেও যে ঘটনাগুলো রয়েছে সেগুলোও মোটেই কম রোমাঞ্চকর নয়। এই রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলোকে একটু তলিয়ে বুঝতে পারলেই ভারতীয় রাজনীতির মূল উদ্দেশ্যকে বুঝে নেয়া যাবে অতি সোজাভাবে। গত চৌদ্দ বৎসর ধরে ভারতীয় রাজনীতি কার স্বার্থে, কি গতিতে এবং কোন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, তা সবই অতি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যাবে। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, পাকিস্থানে মিলিটারী কো-দেতা হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীনেহেরুও বুঝতে ভুল করেন না যে তারও দিন ঘনিয়ে এসেছে। শমন সম্মুখে দাঁড়িয়ে! শুধু ভণ্ডামির কথাবার্তাই তাকে আর ফেরান যাবে না। তার দেশের লোক তাকে চিন্‌তে ভুল করলেও তিনি নিজেকে ভালভাবেই চেনেন কিনা, তাই। কিন্তু ফেরান যাবে না বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন, কিংবা গদা ছেড়ে দিয়ে আত্মহত্যা করবেন, এমন কখনই হতে পারে না। তাই তিনি শেষ-বারের মত ঐ শেষ চেষ্টায় মন দিলেন। ফলে পাকিস্থানে মিলিটারী কো-দেতা হবার পরদিনই ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে অনেকগুলো বড় বড় অফিসারের পোষ্ট তৈরী করা হল, এবং প্রমোশন পেয়ে নীচের থেকে সব হাতের লোকেরা সেইসব পোষ্ট দখল করতে থাক্‌লেন। তারপরও এই নূতন অফিসারের পোষ্ট তৈরী করা এবং নূতন লোকদের সেখানে নিয়ে বসাবার খেলা ক্রমাগত চলতেই থাকে। এবং শেষ-পর্যন্ত যখন ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে ডিসিপ্লিন রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তখনই মাত্র কমাণ্ডারেরা পদত্যাগ করবার হুমকি দিতে বাধ্য হন। এইভাবেই শ্রীনেহেরুর গদী বজায় রাখবার স্বার্থে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকেও ফাঁসিয়ে দেয়া হয়।

ভারতীয় মিলিটারী অর্গানিজেশনকে ঘায়েল করবার কাজগুলো অবশ্য শ্রীনেহেরু নিজ হস্তে করেননি; করিয়েছেন তার মোসায়েব এবং দালাল বন্ধু কেষ্ট মেননকে দিয়ে,—যিনি ইদানিং নেহেরু-কৃপায় ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সেজে বসে ভারতের প্রতিরক্ষা কর্মকে শেষ করতে লেগে গেছেন। কেষ্ট মেনন

যে খুবই চালাক লোক সে ত তার চেহারাতেই মালুম হয়—লণ্ডন থেকে আরম্ভ করে কত যায়গায়ই না তিনি কত রকমের চালাকির খেল দেখালেন! তাঁর খেলা সবাই দেখলেন, বুঝতেও যে না পারলেন তাও নয়; কিন্তু তাকে ধরতে কেউই পারলেন না। সুইজারল্যাণ্ডের কোন ব্যাঙ্কে কার কত টাকা জমা হয়েছে, কার একাউণ্ট নম্বর কত এসব খবর কেষ্টভায়া সবচেয়ে ভালভাবে রাখেন কিনা, তাই তার চালাকি ধরা আর কারও পক্ষে সম্ভবও নয়। কিন্তু শ্রীনেহেরু যে কেষ্টভায়ার চেয়েও অনেক বেশি ঘুঘু এবং ঘোড়েল লোক সেটুকু এখনও অনেকেই বুঝতে পারেননি। এবং বুঝতে পারেননি বলেই এখনও অনেকে কেষ্টভায়ার চেয়ে শ্রীনেহেরুকে উচ্চস্তরের জীব বলেই মনে করেন। এখনও অনেকেই বুঝতে চান না যে একমাত্র নিজ গদী বাঁচাবার স্বার্থেই শ্রীনেহেরু দুনিয়ার যত অ-কাজ এবং কু-কাজ করে চলেছেন; এমন কি ঘায়েল করে চলেছেন ভারতের মিলিটারী অর্গানিজেশনকেও। শুধু তাই নয়, এই ব্যাপারটা যে কত ভীষণ সাংঘাতিক, মাত্র সেটুকু বুঝবার মত ক্ষমতাও যে ভারতে কারও আছে তাও বুঝা কঠিন। কারণ এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনাও ভারতে বিশেষ হয় না (ইদানিং অবশ্য আচার্য্য কৃপালিনী এসব ব্যাপার নিয়ে কিছু আলোচনা আরম্ভ করেছেন)। এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা যা কিছু হয় তা বিদেশেই হয় এবং বিদেশী সংবাদপত্র মারফৎই এই অন্ধকারের খেলার বিষয় যা কিছু জান্‌তে হয়।

তবে আর যাই হোক, মোট ব্যাপারটা হচ্ছে যে শ্রীনেহেরু এখনও ভারতে সিংহাসনজাত হয়েই আছেন এবং তার সেই বহু পুরাতন খেলা—বাৎচিৎসে সব ফয়সালা করে দেবার খেলা, এখনও বেশ তাকতের সঙ্গেই চালিয়ে চলেছেন। পঞ্চশীলি চৈনিক বন্ধুর আক্রমণে যে ভারতভূমির অনেকাংশ বে-দখল হয়ে গেছে, তাতেও তার অবস্থা বা মেজাজের কিছুই পরিবর্তন হয়নি। আশ্চর্য্য হবারও কিছুই নেই, একমাত্র পুরুষ এবং গোপিনীদের দেশ ভারতে, এভিন্ন অন্য কিই বা হওয়া সম্ভব! উপরন্তু কমুনিস্ট আতঙ্কগ্রস্ত আমেরিকা এখনও শ্রীনেহেরুর পেছনেই রয়েছে। সম্ভবত আমেরিকার ধারণা শ্রীনেহেরুরা না থাক্‌লে ভারত কমুনিস্ট হয়ে যাবে। এই আতঙ্কগ্রস্ত ধারণার ফলেই তারা যেখানে যত অপদার্থ আছে তাদের কোলে যাপ্টে ধরে রক্ষা করবার চেষ্টা করছে। কম্যুনিস্ট আতঙ্কে বুদ্ধিভ্রম হবার জন্যই আজও তারা বুঝতে নারাজ যে এই শ্রীনেহেরুরাই তাদের দেশগুলোকে লাথি মেরে কমুনিজিমের পথে ঠেলে

দিচ্ছে, নয়ত বা বেচে দিয়ে নিজেদের সিংহাসন রক্ষা করবার চেষ্টা করছে। তবে আমেরিকা বাদে কিনা জানি না, বাইরের পৃথিবীতে যে শ্রীনেহেরু বেশ খানিকটা প্রকাশ্য হয়ে পড়েছেন তাতে বোধ হয় ভুল নেই। তবুও শ্রীনেহেরু যতদিন স্বজাত হয়ে বসে আছেন ততদিন পর্যন্ত ভারতের কোন ভরসাও নেই।

বিশ্বাসঘাতকতার সস্তা পথে একবার নেমে আসলে, সেই পথ ছেড়ে আসা যে আর সম্ভব নয় শ্রীনেহেরুর চৈনিক পলিসিই তার প্রমাণ। সত্তায় ক্ষমতা হাতরাতে গিয়ে শ্রীনেহেরু যে বিশ্বাসঘাতকতার পথে পা দিয়েছিলেন, সেই বিশ্বাসঘাতকতাই তাঁকে পূর্ববঙ্গ হিন্দুদের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধ্য করেছে। আর আজ তিনি চীনকে ভারতভূমির অনেকাংশ ছেড়ে দিয়ে ভারতবাসীর সঙ্গে যে চরমতম বিশ্বাসঘাতকতা করলেন তাও তার ঐ আদি [illegible] তারই পরিণত ফল। এ ভিন্ন অন্য পথও তার আর নেই। যারা পূর্ববঙ্গ হিন্দুদের সাথে শ্রীনেহেরুর বিশ্বাসঘাতকতাটাকে পাশ কাটিয়ে চলতে চাচ্ছিলেন, তারা আজ কি বলেন সে প্রশ্ন তুলবারও কোন সার্থকতা নেই। নেই এই কারণেই যে, পুরো পাঁচ বছরেরও বেশী সময় চীনের ভারত আক্রমণের ব্যাপারটাকে ভারতবাসী এবং ভারতীয় পার্লামেন্টের কাছে চেপে থাকবার পর যখন তিনি ব্যাপারটা প্রকাশ করতে বাধ্য হলেন, অথচ চীনকে বাধা দেবার কোনই ব্যবস্থা করলেন না বরং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা হবে বলে কার্য্যত জায়গাগুলো চীনকে উপহার দিলেন; তখনও ঐ পাশ-কাটান ভদ্রমহোদয়গণ নির্বাকই থাকলেন। তাদের এখনও কিছুই বলবার বা করবার নেই। সম্ভবতঃ তারা এ ব্যাপারগুলোকেও পাশ কাটিয়েই চলতে চাচ্ছেন,—যেন পাশ কাটিয়েই যমকে ফাঁকি দেয়া যায়। এইভাবে পাশ কাটিয়ে কেউ কোথাও যমকে ফাঁকি দিতে পেরেছে কিনা জানি না, তবে এটুকু ভালভাবেই জানি যে এইভাবে নিজ দায়িত্বকে পাশ কাটিয়ে চলবার চেষ্টার ইতিহাসই হচ্ছে ভারতের আদি এবং অকৃত্রিম ইতিহাস। সেই আদি এবং অকৃত্রিম ভারতীয় ইতিহাসের পালাই আবার নূতন করে অভিনীত হতে সুরু হয়েছে।

আসলে শ্রীনেহেরুর অন্য অনেক কার্যকলাপের মতই এবারও তিনি যা করলেন তা একমাত্র ভারতেই সম্ভব,—অন্য কোথাও কখনও নয়। অন্য যে কোন দেশের প্রধান মন্ত্রী যদি শ্রীনেহেরুর কায়দায় নিজ দেশের ভূমি শত্রুর

হাতে ছেড়ে দিতেন, তাহলে সে দেশের জনসাধারণ যে তাকে কি করত তা কল্পনা করতেও ভয় হয়। দেশের যায়গা শত্রুকে ছেড়ে দেয়া ত দূরের কথা, দেশের সীমানা বিদেশী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে আর প্রধানমন্ত্রী ব্যাপারটি পার্লামেণ্ট বা জনসাধারণের কাছে চেপে রেখে, "হিন্দি চীনী ভাই ভাই"য়ের মত শ্লোগানবাজী চালিয়ে বেড়িয়েছেন। এই ধরণের কিছুও যদি কোথাও হ'ত তাহলে সে দেশের জনসাধারণ যে প্রধানমন্ত্রীর বিচারের ব্যবস্থা করে প্রথম সুযোগেই তাকে firing squadএর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিত, সে বিষয়ে কিছুমাত্র ভুল নেই। অহিংস ভারতে এসব হওয়া আর সম্ভব নয়, তাই অহিংসা প্রচারের প্রয়োজন এখানে এত বেশী।

অবশ্য শ্রীনেহেরুর নানা ধরণের বোলচাল এবং বিভ্রান্তিকর কথাবার্তায়ই যে কিছু কিছু লোক সত্যিই বিভ্রান্ত হয়েছেন তাতেও হয়ত ভুল নেই। তবুও তাঁর এই কথাগুলোকে শুধু মাত্র বোলচাল বলে বুঝে নেয়া কি এতই কঠিন? "চীন সৈন্য সরিয়ে না নিলে তার সঙ্গে আর কোন আলাপ আলোচনা করা হবে না", বা "চীনকে এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেয়া হবে না, প্রত্যেক ইঞ্চি ভারতীয় ভূমির জন্য লড়াই করা হবে।" এসব উক্তি তারই। তিনিই আবার চীনের সাথে আলাপ আলোচনা সুরু করে দিয়েছেন। আর প্রত্যেক ইঞ্চি ভারতীয় ভূমির জন্য তিনি যে কি ধরণের লড়াই করছেন তা ত চীনের সঙ্গে আবার আলাপ আলোচনা আরম্ভ হতেই পরিষ্কার বুঝা গেছে। সীমান্তের দিকে কিছু কামান বন্দুক আর সৈন্য যাতায়াত করছে দেখেই যদি কেউ বুঝে থাকেন যে শেষ পর্যন্ত অত সহজে ছাড়া হবে না। তাহলে তারা স্রেফ কিছুই বুঝেননি। সীমান্তে কিছু কামান বন্দুক আর সৈন্য পাঠালেই বর্তমান কালে যুদ্ধের প্রস্তুতি হচ্ছে বুঝা যায় না। বর্তমান কালে যুদ্ধের প্রস্তুতি মানে, প্রথমতঃ, দেশের জনগণের মনকে যুদ্ধের স্বপক্ষে উত্তেজিত করে তোলা; দ্বিতীয়তঃ, দেশের ভেতরে যে পঞ্চম বাহিনী রয়েছে তাদের সমূলে বিনষ্ট করা এবং তৃতীয়তঃ, অন্যদের সাথে জোট পাকিয়ে মিলিটারী প্যাক্ট আটা। এসবের কিছুই শ্রীনেহেরুর দ্বারা সম্ভব নয়। বরং বর্তমানে তিনি যা করে চলেছেন তা ঐ ব্যাপারগুলোর সম্পূর্ণই উল্টো। বিভ্রান্তিকর উক্তি করতে গিয়ে সময় বিশেষে সশস্ত্র যুদ্ধের কথাও যে তিনি বলেন নি তাও নয়; কিন্তু অন্য কেউ ঐ ধরণের কোন কথা বললেই তিনিই আবার তাকে যুদ্ধবাজ ইত্যাদি বলে কোণঠেসা করতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করছেন না। চীনের ভারত আক্রমণের সংবাদ

প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় মনে যে উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, সে চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনাকে সমূলে বিনষ্ট করে দিয়ে ভারতীয় রাজনীতিকে আবারও হাল্কা হাওয়ায় ভাসিয়ে দেবার কৃতিত্ব একমাত্র তারই। দেশের মধ্যে কম্যুনিস্ট পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপ প্রতিরোধের ব্যাপারেও তার কার্যকলাপ ঐ একই ধরণের সন্দেহজনক। কম্যুনিস্টরা ক্রমেই আরও প্রকাশ্য ভাবে চীনের দালালি করতে থাকলেও তিনি আজ তাদের কিছু বলতে নারাজ; বরং তিনি ক্রমেই আরও প্রকাশ্যভাবে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে আরম্ভ করেছেন। এমন কি, চীনা আক্রমণের খবর প্রকাশিত হবার অল্প পরে পশ্চিম-বাংলা সরকার কম্যুনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করতে গিয়ে শ্রীনেহেরুর বিরোধীতায়ই আটকে গেছেন। ভারতে কম্যুনিস্টরা আজ তার সবচেয়ে বড় সমর্থক, আর কম্যুনিস্টদের সবচেয়ে বড় সমর্থক হচ্ছেন তিনি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এবং সন্দেহের ব্যাপার হচ্ছে যে তিনি আজও তার নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করতে রাজী নন। কারও কাছে কোন রকম সামরিক সাহায্য নিতেও তিনি একেবারেই নারাজ। তার মতে নিরপেক্ষতা কখনই ত্যাগ করা যেতে পারে না, কারণ, নিরপেক্ষতা ত্যাগ করে কোন দলে জুটলেই "ভারত রক্ষার নামে বিদেশী সৈন্যদের আবার ভারতে আসতে দিতে হবে।" তাও কি সম্ভব! চীনেরা আক্রমণ মারফৎ ভারতভূমি দখল করে বসে থাকলে তার কিছুই এসে যায় না। তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্য যদি বিদেশী সৈন্যদের ভারতে আসতে দিতে হয়, তাহলেই সর্বনাশ—একেবারে ভারতীয় স্বাধীনতার সতীত্বের বিনাশ আর কি! এই ধরণের যুক্তি তর্ক এবং বক্তৃতা মারফৎই শ্রীনেহেরু একাই ভারতের স্বাধীনতার সতীত্ব রক্ষা করে চলেছেন। আর পোষ-মানা-প্রাণ ভারত সন্তানেরা বিভ্রান্ত হবার ভাণ করে তাদের দায়িত্বকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করছেন।

তবে ভারতে এবং বাহির বিশ্বেও যে আজ শ্রীনেহেরুর কার্যকলাপের বিষয় আলোচনা সুরু হয়েছে, এবং অনেক ধরণের দৃষ্টিকোণ থেকেই, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। একটা মানুষ ভণ্ডামী এবং বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্য কতদূর নীচে নামতে পারে নেহেরুকে নিয়ে এ আলোচনা কিছুদিন থেকেই চলে আসছিল, বর্তমানে অনেকে নেহেরুকে মতলববাজ প্রচ্ছন্ন কমুনিস্ট বলেও সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছেন। চীনা আক্রমণের পর শ্রীনেহেরুর কার্যকলাপই যে এ ধরণের সন্দেহ উদ্রেকের কারণ, তাতে আর সন্দেহ কি! তবুও সন্দেহটি

যে একেবারেই মূল্যহীন সে বিষয়েও সন্দেহ করবার কিছুই নেই। কারণ, কমুনিস্টরাও এত নীচ বোধ হয় কখনই নয়। কমুনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং নষ্টামির পেছনে যত বিকৃত, ভুল এবং অসৎ-উদ্দেশ্যমূলকই হোক না কেন একটা মতবাদ আছে, এবং ঐ কারণেই এটুকু বলা কঠিন যে কমুনিস্টরা তাদের নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বিশ্বাসঘাতকতা করে। কিন্তু নেহেরুর সকল কর্ম এবং অকর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তার গদী। 'শুধুমাত্র ঐটিকে আকৃরে থাকবার জন্যই তিনি হুহু করে নীচুতার নিম্নতম সীমা ছাড়িয়েও আরও বহু নীচে নেমে গেছেন।

তবে আজ শ্রীনেহেরুর সমর্থকের সংখ্যা যে ক্রমেই এবং বেশ দ্রুতগতিতেই কমে আসছে তাতেও বোধ হয় ভুল নেই। দেশে ত বটেই, বিদেশেও আজ অনেকেই তাকে চিনে ফেলেছেন—তাঁর বিদেশী সমর্থকদের অনেকেই বেশ স্তম্ভিত হয়ে গেছেন বলেই মনে হয়। আজ অনেকের মুখেই নেহেরুর বিষয় অনেক ধরণের সত্যি কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এমন কি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা ইতিপূর্বে নেহেরুর বিষয় কিছু সত্যিকথা সোজাভাবে লিখবার জন্য 'আবোল তাবোল' লেখকের উদ্দেশ্যে নানা রকম গালাগালি করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি, তারাও অনেকে আজ সুর বদলেছেন। অনেক খবরের কাগজত 'আবোল তাবোলের' অংশবিশেষ চুরি করেই শ্রীনেহেরুর সমালোচনা সুরু করেছেন। তবে এটুকুও কম সত্যিকথা নয় যে ভারতের মত দেশে শ্রীনেহেরুর সমর্থকদের অভাব কখনই হবে না। আর হবে না বলেই তিনি আজও স্বশরীরে বর্তমান থেকে অবাধে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন। উপরন্তু বর্তমানে কমুনিস্টরা তার সবচেয়ে বড় সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমুনিস্টদের প্রচার মতে ভারতের বর্তমান শাসকদের মধ্যে শ্রীনেহেরু আর কেষ্টমেননই হচ্ছেন প্রগতিশীল, আর সবাই প্রতিক্রিয়াশীল। এক কমুনিস্ট বন্ধু, যিনি বর্তমানে নেহেরু এবং কেষ্টমেননের উগ্র সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তিনি শ্রীনেহেরুর কার্যকলাপ সমর্থন করতে গিয়ে তাদের বিশিষ্ট কায়দায় একদিন বলছিলেন, "নেহেরু বা কমুনিস্টদের বিশ্বাসঘাতক বলে সমালোচনা করা খুবই সহজ; কিন্তু সমালোচনায় কোন সমস্যার সমাধান হয় না। চীন ভারত আক্রমণ করেছে বলে উত্তেজনা সৃষ্টি করে একটা যুদ্ধ বাধালে যে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে সেটুকুও ভেবে দেখতে হয়।" যুক্তিটি যে একেবারেই অকাট্য তাতে আর সন্দেহ কি! দুঃখ শুধুই যে এহেন অকাট্য যুক্তিটি

দেশ বিভাগ করে ক্ষমতা হাতরাবার সময় কারও মনে উদয় হয় নি—না শ্রীনেহেরুর, না তার সমর্থক কমুনিস্টদের। উদয় হলে ইংরেজ তারাবার নামে দেশ বিভাগ এবং তজ্জ ফল হিসাবে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী লোকের জীবন এবং মনুষ্যত্ব বিনাশ ব্যাপারটি আর ঘটত না। যাইহোক ইংরেজ বিদায়ের দিনে যুক্তিটি মনে উদয় না হলেও, চীনা আগমনের দিনে যে উদয় হয়েছে, সেটুকুই লাভ। লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নাশের যখন সম্ভাবনা তখন দেশের জমি শত্রুকে বিলিয়ে দেয়া ভিন্ন আর উপায় কি !

এ ধরণের যুক্তি বর্তমান ভারতে বেশ চালু এবং জনপ্রিয় বলেই মনে হয়, কারণ, বিশ্বাসঘাতক, যারা দেশকে বিভ্রান্ত করতে চায় তাদের এধরণের যুক্তির জাল বিস্তার করতেই হবে। আর, কাপুরুষ এবং নপুংসক যারা সব কিছুই বুঝতে পারছেন অথচ কিছুই করবার ক্ষমতা বা সাহস নেই, তাদের পক্ষেও নিজ নিজ বিবেককে ধোকা দেবার জন্য এধরণের যুক্তি একান্তই প্রয়োজনীয়। তাই প্রশ্ন যে, শুধুমাত্র বেঁচে থাকাই কি মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য? শুধুমাত্র বেঁচে থাকতে পারাই কি মানুষের বাহাদুরী? যে মানুষ জন্মাচ্ছে মরবার জন্যই, এবং বেঁচেও থাকে ঐ মরবার উদ্দেশ্যেই; যে মানুষ শত চেষ্টা করলেও তার নির্ধারিত সময় সীমা অতিক্রম করে এক মুহূর্তও বেশী বেঁচে থাকতে পারে না, তার শুধুই বেঁচে থাকবার মধ্যে কোনই বাহাদুরী নেই। আর, লক্ষ কোটী বৎসর ধরে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণের তুলনায় মানুষের জীবনের সময়সীমাই বা কতটুকু! ঐ একান্ত নগণ্য সময়সীমার মধ্যে দু'চার বৎসর বেশী বাঁচবার আশায়ই কি শত্রুর পদলেহন করতে হবে না কি? আসলে মানুষ জন্মান, বেঁচে থাকা বা মরার কিছুরই খুব মানে নেই—এর উপর মানুষের কোন হাতও নেই। এমনকি পৃথিবীই যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলেও কারও কোন ক্ষতি হবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। তবুও মানুষ যে বেঁচে থাকতে চায় সেটাও খুবই সত্যিকথা। কিন্তু মানুষ শুধুমাত্র বেঁচে থাকবার জন্যই বেঁচে থাকতে চায় তা কখনই সত্যি নয়। মানুষ বেঁচে থাকতে চায় কারণ—মানুষ তার মনের কল্পনা দিয়ে সৃষ্টি করেছে কতকগুলো সুখ-দুঃখের অনুভূতি, কতকগুলো আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বেঁচে থাকবার কতকগুলো আদর্শ। নিজ কল্পনা সৃষ্ট, অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শের পরিপূর্ণতাতেই মানুষের আনন্দ। আর ঐ আনন্দই হচ্ছে মানুষের জীবনের মূল, তার বেঁচে থাকবার প্রেরণা। মানুষের মান

সম্মান, স্বাধীনতা, মাতৃভূমি ইত্যাদি, তার কল্পনাসৃষ্ট আনন্দের উৎস ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। ঐ আনন্দ উৎস সন্ধানে মানুষ ছুটবেই। সেই চলার পথে মৃত্যু, যার উপর মানুষের কোনই হাত নেই, যদি এসেই পড়ে, স্বাগতই জানাবে সে মৃত্যুকে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যেতে পারে বলেই ঐ আনন্দের উৎসগুলোকে মানুষ কখনই ত্যাগ করতে পারে না। তাহলে তার বেঁচে থাক্‌বার কোনই মানে হবে না। মানুষ আর জঙ্গলের জানোয়ারদের বেঁচে থাক্‌বার মধ্যে তফাৎ এইখানেই। তাই, ঐ ধরণের যুক্তির জাল বিস্তার করে আজ যারা জীবনের জয়গানে মত্ত হয়েছেন তাদের সঙ্গে মানুষের জীবনের তফাৎ অনেকখানিই।

উপরন্তু চীনা আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করতে হলে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই যে একমাত্র পন্থা, তাও নিশ্চয়ই নয়। নিরপেক্ষতার ভণ্ডামি ত্যাগ করে চীনের শত্রুপক্ষীয় শক্তিদের সাথে মিলিটারী প্যাক্ট করলেও কাজ অনেকেটাই হতে পারে। অন্ততপক্ষে, চীন যে তাহলে আরও অগ্রসর হতে সাহস করবে না সেটুকু বুঝাবার জন্যই 'হংকং' এবং 'ম্যাকাও' এখনও চীনের দখলের বাইরেই রয়েছে। কিন্তু ভারতে আজ সেটুকুও হওয়া সম্ভব হচ্ছে না, আসল সন্দেহও সেইখানেই। ভয় এইটুকুই যে, যদি চীনা অধিকৃত ভারত-ভূমিটুকুকে স্বাধীন করবার জন্য নিদ্রামগ্ন ভারত সন্তানদের উত্তেজিত করে তোলা হয়, তাহলে সেই উত্তেজিত ভারত সন্তানেরা কি শুধুই চীনের সঙ্গে মোকাবিলা করেই ক্ষান্ত দেবে, না শ্রীনেহেরু অধিকৃত ভারতভূমিটুকুকেও স্বাধীন করবার জন্যও আবার রুখে দাঁড়াবে? এই কারণেই আপাতত ভারত সন্তানদের ঘুমিয়ে বা নেশা করে পড়ে থাকৃতেই হবে, এবং কেউই তাদের ঘুম ভাঙ্গাবে না।

আর ইতিমধ্যে আসামে যে সব ঘটনা ঘটে গেল বা এখনও ঘটছে সে এক অতি-অদ্ভুত ব্যাপার। তবে অদ্ভুত হলেও ব্যাপারটি যে অন্ধকেও চক্ষুদান করে গেছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আজ আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই বুঝতে—যে ভারতের দিন হয়ে এসেছে। ভারতের দিন যে হয়ে এসেছে তা অবশ্য চক্ষুষ্মানেরা দেখতেই পাচ্ছিলেন, শুধু যারা অন্ধ তারাই কিছু না দেখতে পাবার ভাণ করে এদিক ওদিক হাতরে বেড়াচ্ছিলেন। এবার আসাম তাদেরও সব কিছুই দেখিয়ে ছেড়েছে। অবশ্য আসামের ব্যাপারটা নূতন কিছুই নয়। ছোট খাটভাবে অনেক দিন থেকেই যা চলে আসছিল, গত জুলাই

মাসে (১৯৬০) যা ঘটেছে তা ঐ ছোট ব্যাপারগুলোরই একটি বৃহৎ সংস্করণ মাত্র। অসমীয়া ভাষীরা আসামের রাজ্যভাষা হিসাবে একমাত্র অসমীয়া ভাষাকে চালাবার চেষ্টা অনেক দিন থেকেই করে আসছিলেন। আর তাদের ঐ চেষ্টা মানেই যে বাংলাভাষী অসমীয়াদের উপর অত্যাচার করা, তাও চলে আসছিল অনেকদিন থেকেই। এবার শুধুই ব্যাপারটাকে চরমে ঠেলে নেয়া হয়েছে। যার ফলে বহু বহু বঙ্গভাষী নিহত হয়েছে, ধর্ষিতা হয়েছে আরও অনেক বেশী বঙ্গভাষী মেয়ে। সহস্র সহস্র বঙ্গভাষীর বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে; আর উদ্বাস্তু হয়েছে প্রায় লক্ষাধিক বঙ্গভাষী। অথচ আসাম ভারতেরই একটি প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় সরকার নামে একটি বস্তু ভারতে এখনও বিদ্যমান। তবে এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারটি যে আর কতদিন বিদ্যমান থাকতে পারবে বা পারা উচিৎ, সেটাই প্রশ্ন।

এবার অন্তত বাঙ্গালী বুঝতে পেরেছে যে সে কোথায়। বাঙ্গালীকে রক্ষা করবার জন্য যে ভারতে কোন আইন নেই তাও খুবই পরিষ্কার হয়েছে। আসামে যখন বাঙ্গালী নিধন যজ্ঞ চলছিল তখন কেন্দ্রীয় সরকার নামে চীজ্‌টি বেশ নীরবই ছিলেন। সম্ভবত আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করবার দায়িত্ব প্রধানত প্রাদেশিক সরকারের, এই অজুহাতেই। কিন্তু তার পর যখন প্রাদেশিক সরকার অচল হলেন এবং মিলিটারীকে ডাকতে হল তখনও কেউই উচ্চবাচ্য করলেন না। একদিন নয়, দুদিন নয় এইভাবে মিলিটারী ডাকবার পরও যখন দশটি দিন কেটে গেল, অথচ অবস্থার কোনই উন্নতি হল না—সহস্র সহস্র উদ্বাস্তু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল। তখনও সবাই নীরবই থাকলেন। অবশেষে যখন শিলিগুড়িতে এবং বাংলার অন্যান্য স্থানেও প্রতিক্রিয়া সুরু হল, তখনই মাত্র ভারতের বাদশাহ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র মালিক শ্রীজহরলালের মুখে কথা ফুটল,—তিনি সবাইকে শান্ত হবার উপদেশ দিলেন। কিন্তু ঐ উপদেশ পর্য্যন্তই আর কিছুই নয়। আসামে শাসন ভেঙ্গে পড়েছে বলে সেখানে সামরিক শাসন বা প্রেসিডেন্টের শাসন কিছুই করা তার পক্ষে সম্ভব হল না। এমনকি ঐ ব্যাপারে দোষী লোকদের খুঁজে বার করবার জন্য একটি এনকোয়ারী কমিশন বসাতেও তিনি রাজী হলেন না। উপরন্তু আসামের সবাই—মানে গবর্ণর এবং মন্ত্রীদের থেকে আরম্ভ করে আসামী দাঙ্গাকারীরা পর্যন্ত, যে বেশ ভাল লোক এ ধরণের সার্টিফিকেট মাঝে মাঝেই ঝাড়তে থাকলেন। শুধু তাই নয়, দাঙ্গাকারী অসমীয়াদের নেতৃস্থানীয়

কয়েকজনকে দিল্লীতে ডেকে নিয়ে চায়ের নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়িতও করলেন। তাই, এবারের গণ্ডগোলের মূলে যে শুধুই ভাষার প্রশ্ন সেটুকু বিশ্বাস করবার কোনই মানে নেই।

আসামের ভাষা সমস্যাকেই, অবশ্য এবারের গণ্ডগোলের মূল হিসাবে দায়ী করা হয়। অসমীয়ারা একমাত্র অসমীয়া ভাষাকে আসামের রাজ্যভাষা হিসাবে চালাতে চাচ্ছে, আর বাংলাভাষী এবং উপজাতীয় ভাষী অসমীয়ারা তাতে আপত্তি করছে। এটাকেই কারণ হিসাবে বলা হয়। অসমীয়াদের ভাষার জিদ যে ঐ ব্যাপারের একটা প্রধান কারণ তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু আক্রমণের প্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্য শুধুমাত্র বাঙ্গালীরা যে কেন হল, সেটাই প্রশ্ন। আর মাড়োয়ারী মহাজনেরাই বা কেন টাকা দিয়ে, ট্রাক দিয়ে এবং যায়গা বিশেষে নিজেদের নেতৃত্ব দিয়ে এই হাঙ্গামায় উস্কানি দিলেন, তারও উত্তর জানা দরকার। বাঙ্গালী মুসলমানেরাই বা কেন অসমীয়াদের পক্ষ হয়ে বাঙ্গালী-হিন্দু নিধন কার্যে লেগে গেলেন, তাও জানা যায়নি। তাই শুধুমাত্র অসমীয়া ভাষার স্বার্থই যে এই অসমীয়া লঙ্কাকাণ্ডের একমাত্র কারণ তা বুঝলে অনেকটাই ছেলেমানুষী বুঝা হবে। কেন শুধুমাত্র বাঙ্গালীদের আক্রমণ করা হল, কেন কেন্দ্রীয় সরকার নীরব থাকলেন, কেন মাড়োয়ারীরা এর ভেতর নাক গলাতে এল, আর কেনই বা বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাঙ্গালী পক্ষ ছেড়ে অসামী পক্ষে গেল,—এ সব না জানলে আসল কিছুই জানা যাবে না। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেলেই জানা যাবে, কে কার হাতে খেলছে, কাকে কে কিভাবে খেলাচ্ছে, এবং কোন 'বৃহত্তর' স্বার্থে?

তবে সুখের কথা এই যে, এই অসমীয়া লঙ্কাকাণ্ড নাটকের প্রধান অভিনেতারা এবার নিজেদের বেশ কিছুটা প্রকাশ করে ফেলেছেন; আর সেই সঙ্গে মূল কারণটাও প্রকাশ হয়ে গেছে অনেকটাই। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, এই হাঙ্গামার গরম থাকতে থাকতেই অসমীয়ারা যখন অসমীয়া ভাষাকে আসামের একমাত্র ভাষা ঘোষণা করে, আইন পাস করবার জন্য আইনসভায় এক বিল নিয়ে এলেন, তখন ঐ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করবার নামে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ (হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের এক নম্বর স্তম্ভ) এলেন আসামে; এবং বিভিন্ন পক্ষদের সাথে আলাপ আলোচনা সাঙ্গ করে যে সালিশ দিয়ে গেলেন, তা আর কিছুই নয়—হিন্দী এবং অসমীয়া দুটি ভাষা হবে আসামের রাজ্যভাষা। যে হিন্দী আসামের আদি বাসিন্দাদের

শতকরা একজন ত দূরের কথা, একজনেরও ভাষা নয়, সেই হিন্দীভাষা হবে আসামের একটি রাজ্যভাষা। আর শতকরা ৩৩ ভাগ বাংলাভাষী এবং অন্য ৩৩ ভাগ পাহাড়িয়া-ভাষীদের ভাষার কোনই মূল্য থাকবে না আসামে। সালিশটি যে অতি উচ্চস্তরের তাতে আর সন্দেহ কি! তবে একটু বেশী মাত্রায় নয়, তাই যা সুবিধা। এই সুবিধাটুকুর জন্যই এবার অনেকে ভেতরের ব্যাপারটা আঁচ করে নিতে পেরেছেন। এমনকি, খাস অসমীয়া অভিনেতারাও অনেক কিছু বুঝে ফেলেছেন। তাই, শেষ পর্য্যন্ত হিন্দীকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অসমীয়াকে আসামের রাজ্য-ভাষা ঘোষণা করে আইন পাস করেছেন।

তবে আইন পাশ হলেই যে সব ব্যাপারের ফয়সালা হয় না তারও লক্ষণ ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেতে সুরু হয়েছে। আসামের সম্পূর্ণ বাংলাভাষী জেলা কাছাড়ে আবার ভাষা আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে—বাংলাভাষাকে অসামের দ্বিতীয় রাজ্যভাষা হিসাবে ঘোষণা করানই হচ্ছে উদ্দেশ্য। এই আন্দোলনকে সায়েস্তা করতে আসাম সরকার নৃশংসতার চরমে নামতেও কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। গত ১৯শে মে (১৯৬১) বেপরোয়া গুলি চালিয়ে শতাধিক আন্দোলনকারীকে হতাহত করেছেন। গুলির চেয়েও বেশী, অকথ্য এবং বর্বর অত্যাচার করা হয়েছে মেয়ে আন্দোলনকারীদের উপর। তবুও আন্দোলন বন্ধ না হতে সর্বশেষ পন্থা হিসাবে তারা যা করেছেন তা একেবারেই অচিন্তনীয়। তারা কাছাড়ের বাঙ্গালীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ঐ ব্যাপারে সাধারণভাবে সফল হতে না পারায় শেষ পর্যন্ত মুসলমান গুণ্ডাদের লেলিয়ে দিয়েছেন হিন্দুদের বাড়ীঘর লুঠ করে পুড়িয়ে দেবার জন্য। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে প্রতিশোধ নেবার জন্য ইংরেজ যেভাবে মুসলমান গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে চট্টগ্রাম সহরকে বিধ্বস্ত করেছিল, ঠিক সেইভাবেই কাছাড়ের হাইলাকান্দি সহরও বিধ্বস্ত হয়েছে। স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ!

তবে এই সব অসমীয়া নাটক অভিনীত হবার ফলে ভারতে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ যে অনেকটা উলঙ্গভাবেই প্রকাশ পেয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আর সে রূপ যে বাংলা এবং বাঙ্গালীর পক্ষে কত ভীষণ তাও অনেক বাঙ্গালীই এবার টের পেয়েছেন। হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী যে আজ ছলে বলে কৌশলে বাঙ্গালীকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে বদ্ধপরিকর, তাও অনেক বাঙ্গালীই সমূঝে নিয়েছেন। আসলে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদীরাও যেমন

বুঝে এবং জানে যে তাদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যদি সত্যিকারের বাধা আসে, তবে সে বাধা আসবে বাংলা এবং বাঙ্গালীর কাছ থেকেই—তাই বাঙ্গালীকে নিকেশ করাই হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রথম এবং প্রধান কর্মসূচী। সেই ভাবেই বহু বাঙ্গালীও আজ বুঝে নিয়েছেন যে যদি তাদের বাঁচতে হয় তাহলে তাদের বাঁচতে হবে ঐ হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই। ফলে আজ বাংলার মুখে মুখে শুধুই শোনা যাচ্ছে স্বাধীন বাংলার কথা। হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের বাইরে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা করাই আজ বহু বাঙ্গালীর প্রাণের কামনা। প্রাণের দায়েই আজ বাঙ্গালীর পক্ষে আর অখণ্ড ভারতের কথা ভাববার সময় নেই। এইভাবেই প্রাণের দায়েই ভারত আবারও বহুধা বিভক্ত হতে চলেছে, রোধ করবার কোন উপায়ই নেই। তাই এসবই হচ্ছে 'ভারতের শেষের পরের অবস্থা'। অন্য কিছুই নয়।

তৃতীয় ভাগ

স্বাধীনতার মানে খুঁজে হয়রান ও সস্তা স্বাধীনতা

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে আজ পর্যন্ত এই ত হচ্ছে পাকিস্থান ও ভারতের ইতিহাস। ইতিহাসের ঘটনাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সবাক, বুঝতে কিছুই ভুল হয় না। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের সাথে যে স্বাধীনোত্তর ভারতের ইতিহাস খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ তাতেও কোন ভুল নেই। ভুল নেই বুঝতে যে ভারতের স্বাধীনতা যেরকম সস্তায় এসেছে, তার স্বাধীনতার কার্যকলাপও ঠিক তেমনি সস্তা-পথেই এগিয়েই চলেছে। স্বাধীনতা পেয়ে ভারত বা পাকিস্থান যে কিভাবে, কি রকম দ্রুতগতিতে এবং কোন্ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, তা এই ঘটনাগুলি ভালভাবে বুঝতে পারলেই বেশ ভালভাবে বুঝা যায়। তবুও দুই দেশেই আরও অন্য যেসব কাজকর্ম হয়েছে বা হচ্ছে সেগুলিও জানা দরকার। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, যার প্রথমটা অতি অবশ্যই শেষ হয়েছে, এবং অন্যান্য কল্পনাগুলিও জেনে নিতে হবে বৈকি! পাকিস্থানেরও কল্পনা এবং বাস্তব যে কি রকম আসমান-জমীন ফারাক হতে চলেছে, তাও বুঝতে হবে। তবেই সত্যি সত্যি জানা যাবে যে আমরা স্বাধীনতার নামে কি চেয়েছিলাম, আর কি পেয়েছি।

স্বাধীনতা-সূর্যের আলোর স্পর্শে আমাদের মনুষ্যত্ব কতটা ফিরে পেয়েছি, সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন; আমরা দুনিয়ার সাথে সমান তালে কতটা ইয়ার্কি করতে পারছি, সেটা নয়। পরাধীন বলে আজ আমাদের কেউ ঘৃণা করে কি করে না সেটাও আসল প্রশ্ন নয়। আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কতটা বেড়েছে, আমরা বিদ্যাবুদ্ধি, সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যে কতটা ঐশ্বর্যবান হয়েছি; শারীরিক, মানসিক বা নৈতিক বলেই বা আমরা আজ কতটা বলীয়ান হয়েছি —এ সবের মাপকাঠিতেই আজ আমাদের স্বাধীনতাকে মেপে যাচাই করে দেখতে হবে। শুধু, আমরা স্বাধীন হয়েছি, বিরাট হয়েছি, ফুলে উঠেছি, ফেঁপে উঠেছি, বিশ্বের নেতা হয়েছি, বিশ্ব আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আর ইংরেজ থার্ড ক্লাস পাওয়ার, ফরাসীরা ফোর্থ ক্লাস পাওয়ার, এইসব চীৎকার করে বেড়ালেই আমাদের এমন কোন লেজ গজাবে না, যাকে নাড়াতে গিয়ে

মহাবলী ভীমসেনেরা হিমসিম খেয়ে যাবেন। স্বাধীনতার অমৃতময় ফল আমাদের ফলিয়ে নিতে হবে, শুধুমাত্র রক্ত অশ্রু আর ঘর্মের পরিবর্তেই, আমাদের প্রতিমুহূর্তের ত্যাগ এবং কষ্টের পথেই। এই পথে আমরা কতটা এগিয়েছি, আমাদের নেতৃত্ব এই কণ্টকাকীর্ণ পথে কতটা এগিয়ে নিয়ে গেছেন—সেটা যাচাই করেই আজ আমাদের স্বাধীনতার সফলতা প্রত্যক্ষ করতে হবে।

১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল থেকেই কিন্তু আমরা স্বাধীনতা কথাটাকে ভুল বুঝতে শুরু করেছি। তবে ঠিক ভুলও বলা চলেনা, কারণ ঐ শব্দটির বিষয় খুব পরিষ্কার ধারণা আমাদের কোনদিনই ছিল না। আমরা বনেদী পরাধীন জাত ত! বহুশত বৎসরের পরাধীনতার ফলে স্বাধীনতা বিষয়ে সব ধারণাই, আমাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই যেদিন সত্যি সত্যি ইংরেজ আইন পাস করে আমাদের স্বাধীন এবং অসহায় করে দিয়ে চলে গেল, সেদিন থেকে আমরা আসলে স্বাধীনতা মানে কি তাই খুঁজে হয়রান হতে থাক্‌লাম। বিভিন্ন চিন্তাধারা মতে ভিন্ন ভিন্ন লোক স্বাধীনতার ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য আবিষ্কার করতে থাক্‌লেন।

অনেকেই ধরে নিলেন যে ইংরেজ চলে গেলেই স্বাধীনতা হল। সরকারী কর্মচারী, যাঁরা দেশ শাসন করেন তাঁরা বুঝে নিলেন যে স্বাধীনতা মানেই হচ্ছে, বিনা ঘুষেই কাজ চালিয়ে যাওয়া; কালোবাজারীদের ধারণা হল, কালবাজার আর চলবে না; বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীরাও ঐ রকমই বুঝে নিলে, —টিকিট এবার কিনতেই হবে। ছাত্ররা বুঝতে ভুল করলনা যে এবার পরীক্ষার হলে আর নকল করা চলবেনা—নকল বিদ্যার দিন শেষ হয়ে গেছে। শ্রমিকেরাও ডবল পরিশ্রম করবার জন্য প্রস্তুত হতে থাক্‌ল—দেশকে যে গড়ে তুলতে হবে। কেউ কেউ আবার এরকমও ধরে নিলে যে এবার আর বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার ব্যবহার করতে লাইসেন্স দরকার হবে না। আরও অনেক লোক অনেক অনেক রকমের ধারণা করে নিলে ঐ স্বাধীনতার স্বরূপ সম্বন্ধে। কিন্তু এ ভুল ভাঙ্গতেও বেশী দিন লাগল না। অচিরেই বুঝা গেল এসবই ভুল ধারণা, স্বাধীন ভারত বা পাকিস্থান অতি বৃহৎ ব্যাপার, ঐ সব ছোটখাট তুচ্ছ ব্যাপরগুলো নিয়ে মাথা ঘামায় না। ঘুষ, কালোবাজার, বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ, পরীক্ষায় নকল এসব এখানে বর্জনীয় নয়। স্বাধীনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে ওগুলোও বেশ কদমতালে চলতে পারে।

শ্রমিকদের ডবল খাটুনির কোন প্রয়োজন নেই, শুধু টাকা বেশী পাবার দাবি বৃদ্ধি করতে পারলেই হল। আগ্নেয়াস্ত্র বিনা লাইসেন্সে রাখা কখনই সম্ভব নয় কারণ, স্বাধীন ভারতের নূতন বাদশাহরা তাতে অস্বস্তিবোধ করেন। আর যারা মনে করেছিল যে স্বাধীনতা মানে খাওয়া-পরার আর অভাব থাকবে না, তারাও যে ভুল করেছিল তাও ত দেখতে পাচ্ছি। শুধুমাত্র যারা ভেবেছিলেন স্বাধীনতা মানে ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা আমাদের হাতে আসবে এবং আমরা ইচ্ছামত সেই ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে বেড়াতে পারব, বোধ হয় তাদের স্বাধীনতার ধারণাটাই হয়েছিল একমাত্র নির্ভুল ধারণা। ভারত বা পাকিস্থানে স্বাধীনতা তারাই পেয়েছে, একেবারে পুরোপুরিভাবেই। স্বাধীনতা ভোগও করছে তারা ঐ পুরোমাত্রায়ই। তবে বাধা নেই—আপনি, আমি, রাম, রহিম, যদু, মধু সবাই ঐ স্বাধীনতার দলে স্থান পেতে পারি, কেবল যদি মূর্খদের কাছ থেকে কিছু ভোট বাগিয়ে আনতে পারি। এই কটি ভোট পাওয়া কি এতই কঠিন ব্যাপার,—একটু চেষ্টা থাকলেই হয়। হচ্ছেও তাই, কেবল ঐ ভোট বাগাবার চেষ্টা। সব ক্ষমতা নিজেদের হাতে একত্রিত করে নিয়ে কেবল বক্তৃতা আর এরোপ্লেনবাজী করে বেড়াতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। দেশ হু হু করে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাবে, তাতে আর সন্দেহ কি! এগিয়ে চলছেও, এখনও তাল সামলিয়ে চলতে পারলেই হয়, খানায় পড়ে জানটিসুদ্ধ বরবাদ না হলেই বাঁচি!

ভারতের স্বাধীনতা যে কতদূর এগিয়ে গেছে তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না, যখনই শুনতে পাই, "এর চেয়ে ইংরেজের শাসন অনেক ভাল ছিল"। হামেশাই এবং যত্র তত্র এ কথাগুলো শুনতে পেতেও কোন বাধা নেই। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন ভূতপূর্ব সভাপতির মুখ থেকেই যদি এ ধরণের কথা বের হতে না বাধে তবে মূর্খ সাধারণের আর কথা কি! হ্যাঁ, ইংরেজ আমাদের ভালবেসে স্বাধীনতা গছিয়ে দিয়ে গেছে, তাই তাদের একটু সুখ্যাতি হওয়া চাই-ই ত! পাকিস্থানেও ঐ একই কথা, ইংরেজের সৎচরিত্রের সার্টিফিকেট পেতে কোন অসুবিধা হয় নি। উপরন্তু খাঁটি পাকিস্থানী সাজবার জন্য অনেক মিঞা, যাঁরা নূতন করে দাড়ি রেখে ব্লেডের খরচা কমিয়েছিলেন, তাঁরা আবার ব্লেড কেনা শুরু করেছেন। পাকিস্থানে যত সব বে-শরীয়তী কাণ্ডকারখানা দেখে অনেকেই তাজ্জব বনে গেছেন, অনেকেরই দিল ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু 'কম্বলী ত ছোড়নে বালে নেহি হ্যায়'।

আজ আমাদের বিপদ হচ্ছে ঐ স্বাধীনতা নিয়েই। কেউ জানিনা যে ওটা কি জিনিস; ওটা যে একটা খুব ভাল জিনিস, মস্ত দামী জিনিস সে ধারণাটাও ভেঙ্গে গেছে। ভেঙ্গে গেছে এই জন্যই যে আমরা খুবই সস্তায় ওটিকে সংগ্রহ করেছি, আর যে সব ভাল ধারণা ওটির বিষয় ছিল তাও সব ভেস্তে গেছে। তাই আমাদের সস্তার স্বাধীনতা অতি সোজা পথে এগিয়ে চলেছে। যদি উচিত মূল্যে স্বাধীনতা পেতাম, যদি রক্তের বিনিময়ে অর্জন করতাম স্বাধীনতা, তাহলে অবশ্যই রক্তের বিনিময়েই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হ'ত—ইয়াকি করে নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রলয়ের ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারসাম্যের যে ওলট-পালট হয়ে গেছে, তার ফলেই ইংরেজ ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছে—আমরা ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছি। তাই বলে, ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়া আর দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া মোটেই এক জিনিস নয়। সত্যিকারের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আরও বহু রক্ত দানের প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে আরও বহু ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার। কিন্তু এত সস্তায় অধীনতা মুক্ত হওয়ার ফলে, স্বাধীনতার মূল্য বিষয়ে আজও আমাদের কোন ধারণাই নেই; তাই আমরা শুধুই সস্তার রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছি। কারও কিছু করতে হবে না, যে যে জায়গায় আছ বসে থাক, যা করছ করে যাও, একা জহরলাল নেহেরুই যথেষ্ট। তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এমন এক চাল কষে দেবেন যে সব ঠিক হয়ে যাবে, দেশ আপ্‌সে বেড়ে উঠবে।

আন্তর্জাতিক ভারসাম্যে বিপর্যয়ের ফলে একটা দেশের পক্ষে অধীনতা মুক্ত হওয়া মোটেই আশ্চর্যের কথা নয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের খেলা খেলে যে একটা দেশ গড়ে উঠতে পারে এরকম অবাস্তব এবং অদ্ভুত কথা কেউই ভাবতে পারে না। ভারতে কিন্তু সেই খেলার চালবাজীই চলছে। ভাবটা এমন যে, জহরলালের ঐ এক চালের চোটেই রাশিয়া বা আমেরিকা, কিংবা দুজনেই আমাদের গড়ে পিটে মানুষ করতে বাধ্য। দেশের সাধারণ লোকের কাজ শুধুই জিন্দাবাদ করা আর নেতাদের কাজ হচ্ছে বক্তৃতা আর চালবাজী করা। পাকিস্থানের রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক ভারসাম্য নিয়ে চালবাজী খেলাটা বিশেষ প্রাধান্য পায়নি ঠিকই, তবে আসল যে দেশ গঠনের কাজ, তাও যে কোথায় কি হচ্ছে বুঝা কঠিন। আর পাকিস্থানে একটু সুবিধা হচ্ছে এই যে, কিছু যে হচ্ছে না তা ঢাকবার জন্যও খুব চেষ্টা নেই।

ইংরেজ দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, আমরা ইংরেজের অধীনতা মুক্ত হয়েছি, তাই আমরা ইংরেজের সমান হয়ে গেছি, এই যে একটা ধারণা, এটাই হয়েছে আমাদের কাল। U. N. O.-তে ইংরেজ, আমেরিকার এবং রাশিয়ারও এক ভোট আর আমাদেরও এক ভোট, ফলে আমরা সব সমান ইয়ার, কমরেড কমরেড ভাব, এই হচ্ছে আমাদের সর্বনাশের মূল। কারও কাছে আমাদের কিছু জানবার নেই, শেখবার নেই, বুঝবারও নেই—আমরা সবই বুঝে ফেলেছি। শুধু তাই নয়, আমরা পৃথিবীর সবার এক 'মরাল গার্জিয়ান' হয়ে বসেছি। অনর্গল কেবল উপদেশ আর বক্তৃতা, বক্তৃতা আর উপদেশ। একমাত্র শব্দব্রহ্মের শক্তি দ্বারাই বাজী মাৎ করবার তাল।

স্বাধীনতার অধীনে ভারত ও পাকিস্থানের শাসন ব্যবস্থা

যাকগে, আবার আসল কথায় আসা যাক। আমরা স্বাধীন হয়েছি, ক্ষমতা আমাদের হাতে এসেছে, দেশ শাসন করছি। উন্নতি কিংবা অধোন্নতির পথে দেশ অবশ্যই এগিয়ে যাচ্ছে,—মানে দেশকে বসিয়ে রাখিনি, আর আমরা নিজেরাও বসে নেই; দেশময় চষে বেড়াচ্ছি। তাই প্রথমেই দেখা দরকার যে আমাদের স্বাধীনতার অধীনে দেশের সাধারণ শাসন-ব্যবস্থার অবস্থা কি। ভারত এবং পাকিস্থানে বিগত দশ বৎসরে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, জালিয়াতি, পকেটমারী, মেয়েলোক ঘটিত অপরাধ বা অন্যান্য সাধারণ দুর্বৃত্তসুলভ অপরাধ-গুলো খুব কমে গেছে মনে হয় কি? পরিসংখ্যান বিভাগের সঙ্কলিত সংখ্যাগুলো আমার হাতে নেই বা দেখবারও সুযোগ হয়নি, তবুও খবরের কাগজ মারফৎ আপনি ও আমি অল্পবিস্তর যেটুকু জান্‌তে পাই, তাতে নিশ্চয়ই আপনাদের আমার সাথে একমত হতে দ্বিধা নেই যে, ঐ কাজগুলো মোটেই কমে যায়নি। বরং অনেকটাই বেড়েছে। আর ইংরেজ আমলে শতকরা যত সংখ্যক অপরাধী ধরা পড়ত, আজকাল সে সংখ্যাও অনেকটা নীচে নেমে এসেছে।

চুরি জোচ্চুরি যে কি পরিমাণ বেড়েছে তা মোটামুটিভাবে সবাই জানেন তাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা একান্তই নিষ্প্রয়োজন; তবে ঐ কাজের নূতন নূতন যে সব লাইন আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলো অতি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কলকাতা করপোরেশনের মালিক (councillor) কর্মচারী এবং আরও অনেক মিলে প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকার হাজার আটেক টিউবওয়েল তুলে কিভাবে খেয়ে নিয়েছেন, সে খবর খবরের কাগজেই সবাই দেখতে পাচ্ছেন।

করপোরেশনের রাস্তায় দামী বাতি জ্বালাবার উপায় নেই,—বাতি দিলেই প্রায় পরের দিনই লোপাট হয়ে যাচ্ছে। কলকাতার গ্যাসের লাইনেও নাকি আজকাল বিশুদ্ধ বায়ু পরিবেশিত হচ্ছে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের তার চুরি যাবার ফলে অনেক সময় টেলিগ্রাফ টেলিফোন বন্ধ হয়ে থাক্ছে, তাও অনেকেই খবরের কাগজেই দেখেছেন। এমন কি কলকাতার রেডিও ষ্টেশনও একদিন ঐ কারণেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সে খবরও কাগজেই দেখা গেছে। হাওড়া থেকে ইলেকটিক ট্রেণ চালু করবার জন্য যে ইলেকট্রিকের তামার তার বসান হয়েছে, সে তারও ইতিমধ্যেই একাধিকবার চুরি হয়েছে। কাজ কারবার এইভাবেই চলছে। স্বাধীন ভারতে চৌর্য্য এবং চৌর্য্য-নিবারণী কাজ কারবার ঠিক এই ভাবেই চলছে। তবে এগুলিই সব নয়, খবরের কাগজেই দেখেছি দুর্গাপুরের কাছে পূর্ব রেলের মেন লাইনের উপর থেকে একই জায়গায় একমাসে তিনবার রেললাইন চুরি হয়ে গেছে। রেল রাস্তা থেকে লাইন চুরি হওয়া ব্যাপারটা পৃথিবীর আর কোথাও সম্ভব কিনা জানিনা, তবে স্বাধীন ভারতে সম্ভব হয়েছে। চোরদের শাসনকর্ম যদি এইভাবেই চলতে থাকে তাহলে কবে হয়ত শুন্তে পাওয়া যাবে দিল্লীতে পার্লামেণ্ট ভবন বা কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং আর নেই, চুরি হয়ে গেছে। অবশ্য ওগুলো থেকেও যা কাজ হচ্ছে তাতে না থাক্লেও কারও বিশেষ কিছু অসুবিধা হবে মনে হয় না। বরং লোকে তখন বুঝতে ভুল করবেনা যে তারা কিসের রাজত্বে বাস করছে। এবং বোধ হয় ঐ কারণেই চোরেরা এখনও ওগুলোর উপর নজর দেয়নি। সবাই ত নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে চায় কি না, তাই।

আর স্বাধীন ভারতে চোরদের স্বাধীনতা যে কি রকম সম্প্রসারিত হয়েছে তাও আর কহতব্য নয়। উপরের ব্যাপারগুলো থেকেই ত ব্যাপারটা বেশ আঁচ করা যায়। কিছুদিন আগে 'যুগান্তর' কাগজের চোর ধরা কলমে (নেপথ্য দর্শনে) শ্রীনিরপেক্ষ দামোদর ভ্যালী করপোরেশনের চৌর্য্য কার্য্য-কলাপের বিষয় কিছু লিখলেন। লিখলেন চেয়ারম্যান রাও সাহেবের বাদসাহী লুটতরাজের এবং চৌর্য্য কাজ কারবারের বিষয়—অনেক গোপন দলিল সমাবেশ করেই লিখলেন। যার ফলে চৌর্য্য-নিবারণী ভারত সরকার দামোদর ভ্যালী করপোরেশনের হিসাবপত্র পরীক্ষার জন্য অডিটার জেনারেলকে হুকুম করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু ঐ হিসাব পরীক্ষার কার্য্য চলতে থাকাকালেই, ঐ ভারত সরকারেরই ঐ দপ্তর সংক্রান্ত মন্ত্রী পার্লামেন্টে

দাঁড়িয়ে জোর গলায় হেঁকে জানালেন যে, রাও সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সবই অলীক এবং অতিমাত্রায় দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত। চৌর্য্য নিবারণী কার্য যে ঐখানেই শেষ হয়ে গেল, তাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু তবুও অডিটার জেনারেল হিসাব পরীক্ষা করে তাঁর রিপোর্ট ভারত সরকারের কাছে পৌঁছে দিলেন; এবং শ্রীযুক্ত নিরপেক্ষও চৌর্য্যবৃত্তির সাহায্যেই ঐ রিপোর্ট আবারও 'যুগান্তরের' নেপথ্য দর্শন কলমে প্রকাশ করলেন। তাতে দেখা গেল যে শ্রীযুক্ত নিরপেক্ষ কৃত অভিযোগগুলিকে অডিটার জেনারেলও সত্যি বলেই স্বীকার করেছেন। ভারত সরকার কিন্তু অডিটার জেনারেলের ঐ রিপোর্ট আর প্রকাশ করেননি, তবে ইতিমধ্যে শ্রীরাও সাহেবের চাকুরীর মেয়াদ আরও অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভারতের অডিটার জেনারেলের রিপোর্টে চুরি ধরা এই প্রথম নয়, আরও অনেক হয়েছে; কিন্তু চোর কখনই ধরা পড়ে নাই। বর্তমান অবস্থায় সে সম্ভাবনাও আর নেই (বরং অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে অডিটার জেনারেল চুরি ধরে রিপোর্ট দিলে, জহরলাল এবং সাগরেদেরা প্রকাশ্য পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে তাকে গালাগালি দিচ্ছেন)। প্রশ্ন শুধুই যে ভারতে অডিটার জেনারেলের প্রয়োজনটি কোথায়? আর ভারতের সভাপতি যাঁর কাছে অডিটার জেনারেল রিপোর্ট পাঠান, তিনিই বা এত নীরব কেন? মাসিক দশ সহস্র মুদ্রা নগদ বেতন ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়ে তাঁকে কি শুধুই উৎসব বাড়ীতে ভুড়ি-ভোজন, জন্মতিথি উদ্‌যাপন এবং আত্মজীবনী প্রকাশ করে আরও সুমহান হবার সুযোগ দেবার জন্যই ভারতীয় গঠনতন্ত্রের রক্ষাকর্তা করে রাখা হয়েছে নাকি, ব্যাপার কি?

চৌর্য্যকর্ম ভারতে এই ভাবেই চলছে, বেশ সাজিয়ে গুছিয়েই চলছে। এ ব্যাপারগুলোকে যদি 'ভাগে কারবার' করা বলা না হয় তাহলে ভাগে কারবার কথার মানে কি, আমি জানি না। এই ভাবেই ভাগাভাগি চলছে। তাই চোরেদের স্বাধীনতাও বেড়ে যাচ্ছে ক্রমাগতই। এই চোরদের কথায় একটা কথা মনে পড়ে গেল, খুব ছোট বেলার কথা। যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন চোর কথাটার বিষয়ে একটা অদ্ভুত ধারণা ছিল, ধারণা ছিল যে চোরেরা মানুষ নয়। তারা অদ্ভুত কোন জীব,—হয়ত তাদের তিনটে পা, চারটে লেজ, পাঁচটা শিং আছে বা ঐ ধরণেরই কিছু; তারা মানুষ কখনই নয়। তারপর কিছু বড় হবার পর একদিন যখন সত্যি সত্যিই একটি চোর দেখবার সৌভাগ্য হল এবং দেখলাম যে, সেও আমারই মত দুই হাত দুই পা ওয়ালা

মানুষ, শিং বা লেজ মোটেই নেই। সেদিন সত্যিই খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম, এবং ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে চোরের বিষয় ঐ অদ্ভুত ধারণাটি শুধু আমারই নয় অনেকেরই আছে; এবং স্বাধীন ভারতের অধিবাসীরা যে এখনও ঐ শৈশব অবস্থা অতিক্রম করে উঠতে পারেন নি, তাও ত দেখতে পাচ্ছি। এখনও তারা চোরের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন।

ঘুষ দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা কমেছে, না কি পরিমাণ বেড়েছে সেটা সবাই হাড়ে হাড়ে জানেন, তাই বলাই বাহুল্য। উপরন্তু আগের আমলে অনেক বিশেষ বিশেষ জায়গায়, যেখানে কেউ কখনও ঘুষ দেবার কথা ভাবতেও পারেননি আজকাল সেখানেও ঘুষ অবাধে প্রবেশ লাভ করেছে। ঘুষ দিলে যে আজকাল অনেক কিছুই করা যায় এবং না দিলে যে কিছুই প্রায় করা যায় না, সে অভিজ্ঞতা লাভে বঞ্চিত অভাজন আজ ভারত বা পাকিস্থানে নিতান্তই বিরল।

কালোবাজারী কথাটি আমি প্রথম শুনেছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে। আসলে ঐ মহাযুদ্ধটুদ্ধ না বাধলে ঐ কাজটি আগে কখনও সম্ভব হ'ত না। দেশে বিক্রয়যোগ্য মাল যখন কম থাকে তখনই ঐ কাজটি সম্ভব হয়। যুদ্ধ ত বার (ষোল) বৎসর হল শেষ হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে দশ (চৌদ্দ) বৎসর হল, ভারতে একটা (দুটো) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজও শেষ হয়েছে, দেশ ত প্রায় 'ধনধান্যে পুষ্পে' ভরে উঠেছে! এখনও কি ঐ কালোবাজার চলে নাকি? যদি কেউ বলেন ডবল মাত্রায় চলে, আমি বিশ্বাস করবনা,—ডবল ঠিক চলেনা, দশগুণ চলে। স্বাধীনতা পাবার আগে অবশ্য জহরলাল হাঁক দিয়ে রেখেছিলেন, "কালোবাজারীদের নিকটতম আলোর খুঁটিতে ফাঁসি লটকান হবে"। কিন্তু কালোবাজারীরা যে আমাদেরই মত মানুষ, তাঁরই সব বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন, পৃষ্ঠপোষক এটা তাঁর খেয়াল ছিল না নাকি! তবে এসব অদ্ভুত উক্তি করবার মানে কি? অযথা এই সব নিরীহ লোকগুলোকে ভয় দেখাবার কোনই মানে হয়নি। ক্ষমতা পেতেই ত তাঁর দিব্যজ্ঞান ফুটে উঠল যে, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই, থাকতে পারে না। সবাই একেবারে সমান। তবে হ্যাঁ, আজ যুদ্ধের সময়ের মত বিক্রয়যোগ্য মালের অভাব পৃথিবীর বাজারে না থাকলেও ভারতের বাজারে রাখা হয়েছে—কালোবাজারীদের সুবিধার জন্য নয়; ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরেই। আর সাদাবাজার

জিনিসটি যখন সরকার নিজেই রাখতে চাচ্ছেন না, তখন আর কালোবাজারীদের দোষ দিয়েই বা লাভ কি। সরকারও কালোবাজারী একথা বলা উচিৎ নয়। তবে কি না ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, সাদা বাজার আর নেই, তাই! কলকাতার বাজারে দুরকমের সিমেণ্ট পাওয়া যায়। কণ্ট্রোলে অল্পদামী দেশী সিমেণ্ট আর খোলা বাজারে বেশি দামী আমদানি করা সিমেণ্ট, সবাই জানেন। আর সবাই জানেন যে ঐ আমদানি করা বেশি দামী সিমেণ্টটি বিদেশ থেকে আমদানিকৃত নয়? মাদ্রাজ থেকে জাহাজ চড়ে কলকাতা এলেই সিমেণ্ট বেশি দামী সিমেণ্ট হয়, বেশি ভাড়ায় রেলগাড়ী চড়ে এলে কমদামী দেশী সিমেণ্ট হয়। কলকাতার সিমেণ্টেরও নিশ্চয়ই মাদ্রাজে ঐ একই সম্মান। চিনি নিয়ে এ ক'বছর যে রসের খেলা চলেছে, তাও ঐ একই বস্তু, কোন তফাৎ নেই; কালোবাজারীও নেই। দোহাই আপনাদের, এগুলিকে কালোবাজারী বলবেন না। কেন এরকম করা হয় জহরলালকে জিজ্ঞেস করুন, জানতে পারবেন—'বৃহত্তর ভারতের স্বার্থে'। সবই ভারতের বৃহত্তর স্বার্থে; তাই কালোবাজার আর নেই, সমস্যাও নেই।

ভেজাল মেশাবার কারবারটি আগেও ছিল, যুদ্ধের বাজারে ফেঁপে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু স্বাধীনতার আমলে বোধহয় ফুলতে ফুলতে ফেটে উঠেছে, মানে নির্ভেজাল আর কিছুই নেই। খাবার জিনিস ত দূরের কথা, মানুষের জীবন-মরণ প্রশ্নের সাথে জড়িত ঔষধগুলিও আজ নিঃসন্দেহে কেনা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে এসব হচ্ছে বলেই যে দেশে শাসন চলছে না তা মোটেই নয়। দেশের লোকেরাই যদি এরকম করে তাহলে কিই বা করা সম্ভব। কয়েকজন সাধু মন্ত্রী ত আর লাঠি হাতে করে সবার পেছনে ঘুরে বেড়াতে পারে না। দেশের সব লোক সৎ হয়ে গেলেই এসব হাঙ্গামা আর থাকবে না। আর এসব বদামি দমন করবার জন্য যে চেষ্টা হচ্ছে না তাও মোটেই নয়। অনুষ্ঠানের ত্রুটি কিছুই নেই, এসব দুর্নীতি দমন করে সুনীতি ফিরিয়ে আনবার জন্য দুর্নীতি দমন বা সুনীতি বর্ধন বিভাগরা ত আছেই; সম্ভবত দুর্নীতি দমন বিভাগের দুর্নীতি দমন করবার জন্যও আরও অনেক বিভাগ রয়েছে। তবুও দুর্নীতি দমিত না হয়ে ক্রমেই বর্ধিত হচ্ছে, এই যা একটু সমস্যা! তবে এটাকে একটা সমস্যা বলাও বোধহয় ঠিক হবে না, কারণ যাঁদের ইতিহাসটাই হচ্ছে দুর্নীতির ইতিহাস, যাঁদের আদর্শই হচ্ছে যেন-তেন-প্রকারেন কিছু ক্ষমতা

সংগ্রহ করা, ক্ষমতাকে নিজেদের মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে থাকা, তাঁদের কাছে এটা কোন একটা সমস্যাই হতে পারে না। এই ত তাঁদের সোজা পথ। লণ্ডনে বসে জীপ কেলেঙ্কারী করবার পুরস্কার হিসাবেই যেখানে প্রমোশন পেয়ে দিল্লীতে গদি লাভ হয়, সেখানে দুর্নীতি কোন সমস্যা হতে পারে না। দুর্নীতিই উন্নতির সোজা পথ। যে শর্ষে দিয়ে ভূত তাড়াতে যাবে তাদের ভেতরই যখন ভূত রয়েছে, তখন ভূত তাড়াবার চেষ্টা বৃথা চেষ্টা হতেই হবে এবং ঠিক সেই কারণেই চেষ্টাটুকুও প্রাণহীন চেষ্টা না হয়েই পারে না।

সরকারের অথরিটির বিরুদ্ধে একটু লাগতে যাও তখনি টের পাবে আপ্রাণ চেষ্টা কাকে বলে। কথায় কথায় গুলি, লাঠি, গ্যাস চলবেই। রাইফেলে না কুলায়, মেশিনগান আসবে; তোমাকে শেষ করে তবে ছাড়া হবে। কোন মন্ত্রীর যাতায়াতের পথে ভিড় জমাও, অবশ্যই গুলি খাবে। যত ন্যায়সঙ্গত কারণ নিয়েই আন্দোলন কর না কেন, যদি সেটা সরকারী দম্ভের বিরুদ্ধে হয়, তবে তোমার খাদ্য-তালিকায় বুলেট থাকবেই। যতই নিরস্ত্র বা অহিংস তুমি হও না কেন, সরকারী দম্ভের বিরুদ্ধে গেছ কি তোমার মুখে বুলেট প্রবেশ করেছে। জেলখানার ভেতরে নিরস্ত্র রাজনৈতিক আসামীরাও হৈ-হল্লা করার অপরাধে বুলেট চিকিৎসায় ধরাশায়ী হয়েছে। আর কোন সভ্য দেশে এরকম অসভ্য চিকিৎসা ব্যবস্থার নজির আছে কিনা আমার জানা নেই, তবে ভারতে বহু নজির ইতিমধ্যেই তৈরী হয়েছে। মোটকথা ভারতের গান্ধীবাদী অহিংস সরকার গত দশ বৎসরে নিজেদের দেশের নিরস্ত্র জনগণের যত রক্তপাত করেছে, যতবার গুলি চালিয়ে নিজেদের দেশের লোককে সায়েস্তা করেছে, তার এক ভগ্নাংশও পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য বা অসভ্য দেশে ঘটেছে বা ঘটা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা কঠিন। সরকারী অথরিটিকে চ্যালেঞ্জ, এ স্বাধীন ভারতের সরকার কখনই বরদাস্ত করেন না। পাটনায় ছেলেরা একটা তিনরঙা জাতীয় পতাকাকে পুড়িয়েছিল বলে জহরলাল সদম্ভে ঘোষণা করে গেলেন যে, প্রয়োজন হলে তিনি দশলক্ষ লোককে গুলি করে শেষ করবেন, কিন্তু এসব কখনই বরদাস্ত করবেন না। স্বাধীন ভারতের সরকারী শাসনের সাফল্যও এইখানেই। সামান্য চোর, জোচ্চোর, খুনি, বদমায়েস, ঘুষখোর, কালোবাজারী বা ভেজালদারদের নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় সরকারের নেই। তারা ত আর সরকারী অথরিটি চ্যালেঞ্জ করছে না; বরং তাদের অনেকেই ত সরকারের পৃষ্ঠপোষক।

ভারতের গঠনতন্ত্রে একটি ধারা আছে, যার বলে যে কোন লোককে বিনা বিচারে আটক রাখা যায়। তাছাড়া, ভারতের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলিও ঐ ধরণের অনেকগুলি আইন পাশ করিয়েও রেখেছে। তবুও হামেশাই শোনা যায় যে, এই সব কালোবাজারী ঘুষখোর বা ভেজালদারদের সায়েস্তা করবার মত যথেষ্ট আইনের ক্ষমতা নাকি সরকারের হাতে নেই। নেই সত্যি কথা, তবে গঠনতন্ত্রে সে রকম আইন পাশ করবার কোন বাধাও দিয়ে রাখা হয়নি। ইচ্ছে থাকলে আরও অনেক আইন পাশ করে নেয়া যায়। কালোবাজারী, ঘুষখোর বা ভেজালদারদের ছ'মাস, ছ'মাস জেলের সুরসুরির ব্যবস্থা পালটে দিয়ে, শিরশ্ছেদ করবার ব্যবস্থাও করা যায়। কিন্তু কিছুই করা সম্ভব হয় নি শুধুমাত্র ঐ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই, এই দিব্য জ্ঞানের ফলেই। এমন কি কালোবাজারী বা ভেজালদাররা ধরা পড়লেও সরকার পক্ষ থেকে তাদের নাম প্রকাশ করা হয় না, ঔষধে যারা ভেজাল মেশাচ্ছে, তাদেরও না। সম্ভবত নাম প্রকাশ পেলে অনেকের আত্মীয়স্বজনের বা পৃষ্ঠপোষকদের নামই প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর বিনাবিচারে আটক রাখবার আইনটি ত রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের জন্যই করা হয়েছে। কালোবাজারী, ঘুষখোর বা ভেজালদারদের ঐ আইনে ফেলে আইনটির অমর্যাদা করা কখনই সম্ভব নয়।

এইভাবেই স্বাধীন ভারতের ষ্টিম রোলার শাসন এগিয়ে চলেছে। প্রতি মাসেই দশ বিশগণ্ডা করে নূতন আইন পাশ হচ্ছে, প্রধানত সরকারী ক্ষমতা দেখাবার জন্যই। প্রয়োজন, অপ্রয়োজন এবং একান্ত নিষ্প্রয়োজনেও অনেক আইন পাশ হচ্ছে, দম্ভী নেতাদের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যই। তিন হাজার বছরের চল্‌তি হিন্দু সামাজিক ক্রিয়াকলাপ পালটে দিয়ে নূতন ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করা হচ্ছে আইনের মাধ্যমে—সমাজ-ব্যবস্থাকেও সরকারী আইনের আওতায় আনতে হবে, তাই। হিন্দু সমাজকে জহরলালের মত আধুনিক আর প্রগতিশীল করে তোলবার জন্যই এসব ব্যবস্থা হচ্ছে। হিন্দুদের সবাইকে আজ এসব আইন মেনেই চলতে হবে। মুসলমানদের ঘাঁটাবার সাহস জহরলালের চিরদিনই একটু কম, তাই তাঁদেরকে আপাতত প্রগতিশীল করবার চেষ্টা হয়নি। দেশের বহুদিনের চালু মণ, সের, ছটাকের হিসাব আর থাকবে না, মেট্রিক টনের হিসাবে চালাতে হবে। চালু চৌষট্টি পয়সায় আর এক টাকা হবে না, টাকা হবে একশো সেণ্টে—ঠিক আমেরিকান কায়দায়।

দেশের দেশি পঞ্জিকার হিসাবে আর বছর গণনা করা হবে না, বছর গণনার জন্য চালু করা হবে ইংরেজী ধাঁচে নূতন ক্যালেণ্ডার।

এর পরও যদি কেউ বলে যে ভারত এগিয়ে যাচ্ছে না, তবে সে যে অতি মিথ্যাবাদী, তা আর প্রমাণ করবার প্রয়োজন হয় না। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, তার শাসন ব্যবস্থাও এগিয়ে যাচ্ছে, হু হু করেই এগোচ্ছে, সশব্দেই এগোচ্ছে। যদি এই আইনগুলি সত্যি সত্যিই চালু থেকে যায়, তাহলে জহরলালের শত বৎসর, এমন কি সহস্র বৎসর পরেও হয়ত স্কুলের ছেলেরা ইতিহাস পাঠ করবার সময় পড়া মুখস্থ করবে যে ১৯৪৭ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ভারতের সিংহাসনে জহরলাল নামধারী যে বাদশাহ রাজত্ব করেছিলেন তাঁরই আমলে এই সমস্ত নূতন আইন পাশ হয়ে দেশে নূতন রসের সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতের অনেক নূতনত্বের সাথেই জহরলালের নাম আঁটা থাকবে, এই হচ্ছে এসব আইনের সার্থকতা। নূতন যাকিছু জহরলালই করে যাবেন, ঠিক যেমন করেছিলেন দিল্লীর আর একজন জবরদস্ত মুসলমান বাদশাহ মহম্মদ তোগলক। ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে একটা বিশেষ চালু প্রবাদবাক্য ছিল এই যে, "What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow." এ প্রবাদবাক্য শেষ হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই; তবে নূতনটা এখনও চালু হয়নি। নূতনটা নিশ্চয়ই হবে, "What Nehru thinks to-day, Indian Parliament approves to-morrow."

জাতীয় জীবনের দুর্বলতার গলদগুলি দূর করে উন্নত ব্যবস্থার যে চেষ্টা হচ্ছে না, তাও নয়। বরং খুব বেশীই হচ্ছে। স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্মানিত নাগরিক হতে হলে কি কি করা উচিত আর কি কি নয়, সে বিষয়ে উপদেশের ফিরিস্তি দৈনিক খবরের কাগজ খুললেই অনেক দেখা যায়। নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ বাড়াতে হবে, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা পরিহার করতে হবে ইত্যাদি, বহু রকমের উপদেশ। তবে উপদেশের মাত্রাধিক্যেই কিনা জানিনা, ফল যে উল্টো হয়েছে সেটা অতি পরিষ্কার। প্রাদেশিকতা সরকারী নেতাদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে প্রাদেশিকতার বিষ এত ভীষণ-ভাবে দেশময় ছড়িয়েছে যে ভয় হয় কখন বুঝি গৃহযুদ্ধই শুরু হয়ে যায়। ছোট খাট যুদ্ধ যে হয়নি তাও নয়;—বিহারে এবং আসামে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে আর বোম্বাইতে মারাঠী আর গুজরাটীদের মধ্যে যা সব হচ্ছে তাকে যুদ্ধ ছাড়া আর কীইবা বলা যায়। প্রাদেশিকতা পরিহারের উপদেশ মুহুর্মুহু শোনা

গেলেও, সত্যি সত্যি ঐ বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন করবার চেষ্টা কখনই করা হয় না। বরং ভারতের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধকে জিইয়ে রেখে ঐ বিষবৃক্ষকে আরও ভালভাবে গজিয়ে উঠতেই সাহায্য করা হচ্ছে। এবং একাজটিও সম্ভবত ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরেই করা হচ্ছে। সর্বভারতীয় নেতারা হয়ত মনে করেন যে, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠির মধ্যে বিরোধ মিটে গেলে তারা আর হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে চাইবে না। আর হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে না থাকলে যে ভারতের ঐক্যই নষ্ট হয়ে যাবে, এটাত তাঁদের স্বতঃসিদ্ধ ধারণারই একটা। অতএব বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে খোঁচা-খুঁচি থাকা চাই। ইংরেজের কাছে কাজ কারবার শেখা ত, তাই Divide and Rule ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে বৈকি।

আর সাম্প্রদায়িকতা, যা দেশ ভাগ হবার পরে আস্তে আস্তে বেশ কমে আসছিল, তাকেও নানাভাবে উস্কিয়ে তোলা হচ্ছে, প্রধানত কংগ্রেসের পক্ষে ভোট সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই। কংগ্রেসের একচ্ছত্র নেতা জহরলালের কাছে হিন্দু মহাসভা, জনসংঘ বা ঐ ধরণের অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি ভীষণ সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং ঐ জন্যই ওগুলির নিপাতকার্য সাধন করা তাঁর কাছে একটা মহান কর্ম বিশেষ। সময়ে অসময়ে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে নানারকম, এমন কি অশ্লীল গালাগালি করতেও তিনি কখনও লজ্জা বোধ করেন না। কিন্তু ভোটের সুবিধার জন্য তিনি এবং তাঁর কংগ্রেস দল ঐগুলির চেয়েও অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক দলগুলির সাথে যখন হাত মেলান তখনই শুধু তাঁর কার্য কলাপের আসল উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়। ১৯৫২ সালের ইলেকশনের সময় কংগ্রেস দল মাদ্রাজে মুসলিম লীগের সাথে হাত মিলিয়েছিল, আর এবার ঠিক ঐ সুবিধার জন্যই শিখদের আকালী পার্টির মত একটি সাম্প্রদায়িক দলকে কংগ্রেসের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছেন, কেরেলায়ও তাই হয়েছে।

তবে আর যাই হোক স্বাধীন ভারতে আইন বলে মদ্যপান বন্ধ করবার চেষ্টা খুবই হচ্ছে। কয়েকটি বেশি গান্ধীভক্ত প্রদেশ ত মদ খাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে। জানিনা, অতশত ধরণের নেশা বাজারে চালু থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজির ঐ তরল পানীয়টির উপর এত আক্রোশ ছিল কেন। পৃথিবীর অন্য সব দেশ ত আইন মারফৎ ঐ তরল সুধাটির ব্যবহার বন্ধ না করেও বেশ এগিয়ে যাচ্ছে। একটু আধটু পান করে বলেই ত তারা কাজ না করে বেশি বকে বলে মনে হয় না; কাজ না করে বেশি বকার নেশা ব

দেখছি এই মদ্যহীন দেশ ভারতেই সবচেয়ে বেশি। আর আইন করেই কি ওসব রস বন্ধ করা সম্ভব নাকি? রসিক লোক যারা রসের সন্ধান দিতে পারেন তাঁদের কাছে শুনেছি যে, বোম্বাই, মাদ্রাজ যেসব প্রদেশে মদ্যপান একেবারেই বন্ধ করা হয়েছে সেখানে মদের কোন অভাব নেই। আর যারা আইনের সম্মান বজায় রেখে চুপে চাপে একটু সুধারসে সিক্তি হতে চান তাঁরা ওটি প্রাণ ভরেই পান করতে পারেন। অবশ্য মদ্যপান বন্ধ করে আইন চালু হওয়ায় ঐ জিনিসটির একটি বৃহৎ কুটিরশিল্প গড়ে উঠেছে,—ঘরে ঘরেই আজকাল ওটি তৈরী হচ্ছে। অনেক বেকারও কাজ পেয়ে বেঁচেছে, এইটুকুই লাভ।

বোম্বাইতে মদ্যপান বন্ধ করবার আর বেপরোয়া গুলি চালাবার বাহাদুরী দেখিয়েই শ্রীমোরারজী দেশাই ভারতের রাজনীতিতে এক অতি বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন,—তিনি আজকাল এক বিরাট নেতা, মস্ত strong man বলে পরিচিত। কিন্তু সত্যি সত্যি বোম্বাইতে মদ্যপান নিষেধের সাফল্য যে কতটা হয়েছে, তা অনেকেই জানেন, আমিও জানি। তাই একটা মুখরোচক খবর না বলে পারছিনা। কয়েক বছর আগে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ভারতের বড় বড় শহরগুলিতে মোটর দুর্ঘটনার সংখ্যা, অনুপাত এবং কারণ অনুসন্ধানে এসেছিলেন। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, বোম্বাইতে মোটর গাড়ীর সংখ্যা কলকাতার সংখ্যার অর্ধেক হলেও মোটর দুর্ঘটনার সংখ্যা কলকাতার প্রায় ডবল, এবং এই দুর্ঘটনাগুলির খুব বেশির ভাগই হচ্ছে অতিরিক্ত মদ্য-পানের জন্য। অথচ কলকাতা মদ্যপান নিষিদ্ধ এলাকা নয়, বোম্বাই হচ্ছে মদ্যপান নিষিদ্ধ এলাকা। ব্যাপারটা আশ্চর্যের নয় কি? ঐ আন্তর্জাতিক সংস্থার সভ্যেরাও অবাক হয়েছিলেন। তবে মোরারজী-ভাই কাজের লোক এবং strong man ত নিশ্চয়ই, তা না হলে কি আর জহরলাল তাঁকে এত পছন্দ করেন? উপরন্তু গুলি চালাবার বাহাদুরী ত তাঁর আছেই। আজ এই মোরারজী-ভাইরাই ভারতকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন!

স্বাধীন ভারতে সাধারণভাবে দেশ শাসনের কাজ এইভাবেই চলেছে। তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন যে কর্মীর অভাব আছে, কর্মীর সংখ্যা অনেকগুণ বেড়েছে। সাধারণ শাসনখাতে বাজেট ফুলে উঠে রাক্ষসের আকার ধারণ করেছে। আর কর্মীদের যোগ্যতার অভাব যতই থাকুক না কেন, অর্থরিটির অভাব মোটেই নেই। ফলে জনসাধারণের সাথে তাদের

ব্যবহারও দিন দিনই ইংরেজ আমলকে লজ্জা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কোন সরকারী অফিসে একখানা চিঠি লিখে উত্তর পাওয়া ত দূরের কথা, কেউ যদি বলেন যে চিঠিখানি পৌঁছবার স্বীকৃতিপত্র পেয়েছেন, তবে সন্দেহ করতে হবে তার বাবা কিংবা মামা একজন বিশেষ কেউ ছিলেন। আর ঐ অথরিটিওয়ালা চাকুরীগুলিতে কর্মী সংগ্রহের ব্যাপারটাও অনেকটা ঘরোয়া ব্যাপারেই দাঁড়িয়েছে। I.A.S., I.P.S., নামের বড় চাকুরিগুলোতে লোক সংগ্রহ করা হচ্ছে এখনও সেই সাবেক পদ্ধতিতেই—ভাইবা ভোসি (Viva voce) গ্যারাকলের মাধ্যমেই। যার সোজা মানেই হচ্ছে এই যে, সবচেয়ে ভাল ছেলেদের বাদ দিয়ে নিজেদের পছন্দমত ভাল ছেলেদের চাকরি দেওয়া। ইংরেজ এসব মহৎ পন্থা যা বাংলে রেখে গেছেন, তার কিছুই বদলান সম্ভব নয়। সরকারী চাকুরিয়াদের সব রকমের অথরিটি এবং অন্যান্য সুযোগগুলি থাকা সত্ত্বেও একটা বিষয়ে বেশ অসুবিধা তৈরী করা হয়েছে; অবশ্য কাজ বেশী করাবার জন্যই। সরকারী ছুটির দিনের সংখ্যা ইংরেজ আমল থেকে অনেকটাই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে—বোধ হয় প্রমাণ করবার জন্যেই যে এখন কাজ অনেক বেশি হচ্ছে।

আর আগেই বলেছি, ভারতে এবং পাকিস্থানেও নানা বিষয়ে জ্ঞান দানের জন্য অসংখ্য—মানে হাজারে হাজারে বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ আর বিশেষজ্ঞ আমদানি করা হয়েছে; মাত্র এই একটি বিষয় বাদে। শাসনকার্যে ভারতীয়েরা সবাই এক একজন বিশেষজ্ঞ। বহুশত বৎসর পরের অধীন থেকে তাঁরা শাসনকার্যের সব কিছু শিখে নিয়েছেন যে! আর ভারতীয় নেতাদের কাছে ঐ শাসনক্ষমতা প্রয়োগই যে হচ্ছে, সত্যিকারের স্বাধীনতার স্বরূপ; তাই সেই শাসনকার্যের ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান নেই, একথা স্বীকার করা চলে না কোনমতেই। সবাই যে তাহলে ঠাট্টা করতে পারে! ইংরেজ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যে ভারত সবার সাথে সমান কমরেড হয়ে গেছে, জগৎ-সভায় ভারতের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ হয়ে গেছে। এখন কি আর বলা যায় শাসনকার্যে জ্ঞান দান করবার জন্য লোক পাঠাও!

বিচার ব্যবস্থা

স্বাধীন ভারতে বিচার বিভাগের কার্যকলাপ যে কতটা উন্নতি করেছে বা অধোন্নতির পথে গেছে, তা আমার ভাল জানা নেই, আর যেটুকু জানি তা

ব্যাখ্যা করাও বিশেষ সুবিধার নয়। শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে ঐ ব্যবস্থাকে উন্নত করবার কোন চেষ্টাই হয়নি। উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার, এ্যাটর্নি এরা সবাই পূর্ববৎ স্বস্থানেই আছেন; এবং 'ফি'র অনুপাতে ন্যায়বিচারে সাহায্য করছেন। গরীবদের জন্য ন্যায়বিচার পূর্বেও ছিল না, এখনও নেই। বড় লোকদের ব্যাপারেও তাই; তাদের জেল খাটান বা ফাঁসি লটকান আগেও যেমন অসাধ্য ছিল, এখনও সেই রকমই দুঃসাধ্য রয়েছে। ছোটখাট পুলিশ কেসগুলো যা পুলিশ কোর্টে পাঠালেই ফাইন দিতে হ'ত, সেগুলো এখনও সেই ভাবেই ন্যায়বিচার পরিবেশন করছে। মোটকথা উন্নতি কিছুই দেখছি না। তবে পরিবর্তনের মধ্যে দেখছি শুধু হাইকোর্ট আর সুপ্রীম কোর্টের জজেরা অনেকে প্রমোশন পেয়ে গভর্ণর বা এম্বাসাডর হচ্ছেন;—অবশ্য ঐ লোভ দেখিয়ে তাঁদের দিয়ে অকাজ কুকাজ করান হচ্ছে কিনা, সে খবর আমি জানি না।

সাধারণ শাসন ব্যাপারে পাকিস্থান ভারতের সঙ্গে একবারেই একদিল; কোন তফাৎ নেই। তাই অনেক সময় মনে হয়, ভাগ্যিস কাশ্মীরের গণ্ডগোলটা ছিল; তা না হলে যদি ভারত আর পাকিস্থানের শাসনকর্তারা একসাথে হাত মেলাতেন, তাহলে কি যে হ'ত বলা কঠিন। তবে মনে হয় পাকিস্থানে অযোগ্যতা বা অকর্মণ্যতা আরও বেশী, প্রায় চরম ছাড়িয়েও আর কি! তারপর ধর্মের দেশ পাকিস্থান, তাই অফিস টাইমে বার দুয়েক নামাজ পড়ার রেওয়াজ চালু।—অফিস টাইমে দুবার নামাজ পড়ার পর চায়ের দোকানে একটু আড্ডা জমাতেই দিন প্রায় কাবার; কাজ বেশী করতে হয় না। উপরন্তু পাকিস্থানের শাসন এবং বিচার বিভাগেও সাম্প্রদায়িকতা বিষটি বেশ একটু বেশী মাত্রায়ই প্রবেশ করেছে। তাই কাজও হচ্ছে সেই অনুপাতেই। ইদানীং মাত্র কয়েকদিন আগে আমেরিকার বৈদেশিক সাহায্য বিভাগের একজন কর্তা পাকিস্থানে এসেছিলেন খোঁজখবর নিতে যে, আমেরিকার কাছ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যটুকু পাকিস্থান কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে, তাই। দেখে নিশ্চয়ই তাঁর দর্শনেন্দ্রিয় ধন্য হয়েছে, ফলে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা খুবই পরিষ্কার এবং সহজবোধ্য, পাকিস্থানের কাজ কারবার বুঝতে ঐ মন্তব্যটির চেয়ে বেশী আর কিছুই প্রয়োজন নেই। তিনি মন্তব্য করেছেন "আমেরিকা পাকিস্থানকে যা সাহায্য দিয়েছে, তা কিছুই ঠিকমত কাজে লাগান সম্ভব হয়নি; এইভাবে কাজ কারবার করবার জন্য পাকিস্থানের বাইরে থেকে সাহায্য ভিক্ষা করবার কোন অধিকার নেই"। তিনি আরও বলেছেন যে, কাজ যদি এইভাবেই

এগোতে থাকে তাহলে আগামী ৫০ বৎসরেই পশ্চিম পাকিস্থান আবার মরুভূমিতে পরিণত হবে। ভাগ্যিস তিনি একজন আমেরিকান, তা না হলে পাকিস্থানী নেতারা, মানে সরকার তাঁকে কোতল না করে নিশ্চয়ই ছাড়তেন না।

তবে পাকিস্থানে নানা রকমের উৎকট নূতনত্বের সথ নেই, তাই বাঁচোয়া। আর সরকারী অথরিটির দন্তটিও এখানে ভারতের চেয়ে অনেক কম। বোধ হয় দন্তটি গজাবার সময় পায়নি। গত দশ (চৌদ্দ) বছরে বার সাতেক মন্ত্রিসভার অদল বদল এবং আরও অনেক কিছু হয়েছে ত—সময় কোথায় দন্ত গজাবার!

দেশরক্ষা ব্যবস্থা

স্বাধীন ভারত এবং পাকিস্থান দেশ শাসন ব্যাপারে যে অদ্ভুত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে তাতে মনে হয় এ দুটো দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার খুব বেশি কিছু প্রয়োজন আর নাই। বাইরের আক্রমণ থেকে ধ্বংস হবার অনেক আগেই এরা ভেতরের লাথিতেই কাবু হবেন। এদের ভয় যুদ্ধের নয়, গৃহযুদ্ধের। তাই প্রতিরক্ষার নামে আস্ফালন করে কোটি কোটি টাকার মিলিটারী পোষায় এদের কোন সার্থকতা নেই। তবুও প্রতিরক্ষার নামে দু'দেশেই যে পর্বতপ্রমাণ টাকার শ্রাদ্ধ কার্য হচ্ছে, তারও একটা আলোচনা হওয়া দরকার। প্রতিরক্ষার নামে ভারতে বৎসরে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা খরচ করা হয়, আর পাকিস্থানেও প্রায় ১০০ কোটি টাকা। দুটিই পৃথিবীর মধ্যে দরিদ্রতম দেশ-গুলির অন্যতম, তাই এতগুলি টাকা দেশের বৈষয়িক কাজে না লাগিয়ে যখন মিলিটারীর পেছনে খরচ করা হচ্ছে, তখন অবশ্যই ধরে নিতে হবে, এরা বিদেশী আক্রমণের ভয় করে।

কিন্তু পলিসির দিক থেকে ভারত তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে এমন দুর্বল অবস্থায় এনে ফেলেছে যে, তার ঐ মিলিটারী পোষার কোন মানেই হয় না। আধুনিক দুনিয়ায় কোন একটা দেশ, সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন একা খুব কিছু করতে পারে না। এই জন্যই আমেরিকার মত শক্তিশালী দেশকেও বন্ধুত্ব কামনা করে ভারত, পাকিস্থান এবং অন্যান্য আরও ক্ষুদ্র এবং দুর্বল দেশগুলোর দরজায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। আজ সত্যিকারের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মানেই হচ্ছে, অন্যের সাথে জোট পাকান; কিন্তু ভারতের গোড়ায় পলিসিই ঠিক এর উল্টো। সে কারও সাথে হাত মেলাতে চায় না। বড় বড় লম্বাই-

চৌড়াই বাৎচিৎ আর বিশ্বপ্রেম এবং বিশ্বশান্তির বুলি হাঁকিয়েই ভারত তার সব সমস্যার ফয়সালা করবে। যদি তাই সম্ভব হত, তাহলে বছরে ২৫০ কোটি টাকার বাজে খরচেরই বা প্রয়োজন কি!

তারপর সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যাপারে নিজের দেশের সীমারেখাই সব সময় শেষ কথা নয়, অনেক সময়েই আশে-পাশের অন্য সব দেশের উপরও খানিকটা কার্যকরী ক্ষমতা রাখতে হতে পারে। আজ রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য যদি হাঙ্গেরীর উপর কর্তৃত্ব রাখা প্রয়োজন হয়, তবে ভারতেরও নিজ প্রতিরক্ষা স্বার্থেই তিব্বতের উপর কর্তৃত্ব রাখার প্রয়োজন ছিল। তিব্বতের উপর ভারতের কর্তৃত্ব ছিলও। কিন্তু কাপুরুষ বা বুরবক ভারতীয় নেতৃত্ব, ভয়ে বা বোকামির জন্য স্বেচ্ছায় সে কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। তাই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয়, তবে আর বছরে ২৫০ কোটি টাকার শ্রাদ্ধ করে মিলিটারীর ঢং পোষার দরকার কি? ভারতের মিলিটারীরা কি ভারতীয় নেতাদের পার্সোনাল বডিগার্ড নাকি? কিংবা শুধু এক পাকিস্থানের অক্রমণের বিরুদ্ধেই আজ ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে নাকি? চীন যে কখনও ভারত আক্রমণ করবে না তার কোন গ্যারান্টী আছে কি? (চীন ইতিমধ্যেই ভারত আক্রমণ করেছে)। তিব্বত হাতছাড়া হবার পরে, চীনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোন উপায়ই নেই; একমাত্র চীনের পদলেহন করা ছাড়া। তবুও বছরে ২৫০ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, শুধুমাত্র শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্নের জন্যই। আর সেটা কিভাবে, কি উন্নতির জন্য খরচ হচ্ছে, তা অবশ্য গোপন ব্যাপার, সকলের জানবার জন্য নয়; আমিও জানি না। তবে আন্দাজ করলে ভুল হবে না যে, অন্যান্য প্রকাশ্য ব্যাপারগুলির মতই, এ টাকাগুলোরও বেশির ভাগই ঐ শ্রাদ্ধ কার্যেই ব্যয়িত হচ্ছে। মিলিটারীর জন্য জীপ গাড়ী কেনার কেলেঙ্কারীই ত আজ জীপ স্ক্যাণ্ডেল নামে সুপরিচিত হয়েছে, অন্যান্য মালপত্র কেনার ব্যাপারেও স্ক্যাণ্ডেল শোনা গেছে একাধিকবার। মোটকথা, এখনও বাইরে থেকে সব রকমের মালপত্র কিনেই ভারতের অস্ত্রসজ্জার কাজ চালান হচ্ছে,—এমন কি গোলাবারুদ তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক দ্রব্যটিও এপর্যন্ত ভারতে তৈরীর ব্যবস্থা হয়নি।

উপরন্তু অর্গানিজেশনের ব্যাপারেও যেসব প্রাদেশিকতা প্রকাশ পাচ্ছে, তাও ভারতের সামরিক সংস্থার পক্ষে খুব গৌরবের কিছু নয়। আজ ভারতকে

মিলিটারীর হেডকোয়ার্টার কোথায় করা হবে, সেটা মিলিটারীর সুবিধা অসুবিধা বুঝে ঠিক হচ্ছে না; ঠিক হচ্ছে ক্ষমতাশালী নেতাদের প্রাদেশিক স্বার্থে। রেলওয়ের একটা জোনাল হেড্‌কোয়ার্টার যেভাবে গোরক্ষপুরে চালান করা হল ঠিক সেইভাবেই ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের হেড্‌ কোয়ার্টার ইস্ট ছেড়ে গিয়ে হাজির হল লক্ষ্ণৌতে। আজ ভারতের সৈন্যদের ছাউনি কোথায় করা হবে তা নির্ধারিত হয়, কোন্ জায়গাকে আর্থিক উন্নতির জন্য সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন সেই প্রশ্নে। ফলে ভারতের বৈদেশিক সীমানাগুলিতে খুব কমসংখ্যক ভারতীয় সৈন্যই থাকে। মোটকথা, ভারতের সামরিক সংগঠনকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি না বলে আভ্যন্তরীণ অশান্তির বিরুদ্ধে প্রস্তুতি আখ্যা দিলেই বোধ হয় ঠিক হবে। (ইদানিং, কেষ্ট মেনন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হবার পর থেকে ভারতীয় মিলিটারী অর্গানিজেশনকে যে কিভাবে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে তা যথাস্থানে অনেকটাই আলোচনা করা হয়েছে। তবে বহিঃশত্রু চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধেই যদি না মিলিটারীকে কাজে লাগান হয় তাহলে ঐ অর্গানিজেশন থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি! বরং যত তাড়াতাড়ি লালবাতি জ্বালে তাই ভাল—জনসাধারণের স্কন্ধজাত ট্যাক্সের বোঝা কিছুটা লাঘবও হতে পারে। শুধুমাত্র কেষ্টমেনন এবং বন্ধুরা মিলে প্রতি বছর বিদেশ থেকে বহু শতকোটি টাকার ভাঙ্গা জীপ এবং অন্যান্য সামরিক মালপত্র কিন্‌তে পারবে এই উদ্দেশ্যে ভারতে মিলিটারী রাখবার কোন মানে নেই।)

পাকিস্থান কিন্তু তার প্রতিরক্ষা ব্যাপারে বেশ সজাগ এবং পাকিস্থানের প্রতিরক্ষা পলিসিও বৈজ্ঞানিক-মতসম্মত। নিজের ক্ষমতায় যতটুকু কুলায় সেটুকু পাকিস্থান করছেই; তারপর নানারকম সামরিক প্যাক্টে যোগদান করে বাইরে থেকে যতটুকু সাহায্য পাওয়া যায় তাও পাকিস্থান ছাড়ে নি। অসময়ে প্যাক্টের বন্ধুরা ত পেছনে থাকবেই। বিশ্বশান্তি, বিশ্বপ্রেম এসব বড় বড় ভণ্ডামি কথার পাকিস্থানে কোন মূল্য নেই, তাই ওসব ভাঁওতা মেরে পাকিস্থান নিজেকে ঠকাবার চেষ্টাও করে নি।

মিলিটারী অর্গানিজেশনের ব্যাপারে পাকিস্থানেও কি কাজ হচ্ছে সে সব অতি গোপনীয় ব্যাপার, কারও জানা সম্ভব নয়। তবে আশা করা যায়, ভারতের মত বৃহৎ নেতৃত্বের স্বার্থে সামরিক সংস্থাকেও দুর্বল করা হচ্ছে না। পাকিস্থানের মিলিটারীর নেতারা এসব ব্যাপারে বাইরের বড় বিশেষজ্ঞদের

মতে চলতে লজ্জা অনুভব করেন না বলেই মনে হয়, আশার কারণও ঠিক তাই। পাকিস্থানে সামরিক সংস্থা এখনও প্রাদেশিক স্বার্থের উর্দ্ধেই রয়েছে, এও মনে করবার কারণও ঐ।

তবে আধুনিক কালের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় কথা যেটি, তা হচ্ছে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে সামরিক শিক্ষা দিয়ে সশস্ত্র করে তোলা; এবং দেশের লোকদের লড়াই করবার মত মানসিক অবস্থা তৈরী করা। এ কাজটি ভারত বা পাকিস্থানে কোথাও বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। যেটুকু দেখান হচ্ছে তা শুধুমাত্র লোক দেখাবার জন্যই। ভারত বা পাকিস্থানে ওকাজটি খুব সম্ভবপরও নয়, কারণ ভারত বা পাকিস্থানী নেতৃত্ব জনগণকে বিশ্বাস করে না, তাই অস্ত্র হাতে দেবার সাহসও রাখে না। আর জাতীয়তাবোধ, যা দিয়ে কিনা লোককে দেশের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেবার আহ্বান করা হয়ে থাকে, সে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিরও কোন চেষ্টা হচ্ছে না। সেরকম জাতীয়তা-বোধের সৃষ্টি ভারতের বর্তমান রাজনীতিতে একরকম অসম্ভব বললেই চলে। পাকিস্থানে অবশ্য এ জিনিষটি সৃষ্টির চেষ্টা খুবই চলছে, তবে ভারতের বিরুদ্ধে ভিন্ন অন্য কোন ব্যাপারে আজও পাকিস্থানী জাতীয়তাবোধ বিশেষ জাগ্রত বলে মনে হয় না। ভারত এবং পাকিস্থানে শাসক এবং শাসিতদের মধ্যে যে বিশ্বাসের অভাব, এই অভাবই ভারত এবং পাকিস্থানকে ধ্বংস করবে, বিদেশী আক্রমণ নয়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

ভারতের সামরিক প্রস্তুতি যে কোন্ পর্য্যায়ের এবং ঐ প্রস্তুতির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা শক্তিধর জাতি হিসাবে ভারত যে কতটা সম্মান লাভের যোগ্য সে কথা বেশী না বলাই ভাল। তবুও ঐ সৈন্য-সামন্ত পুষতে গিয়েই ভারত আজ ফতুর হতে বসেছে, গঠনমূলক কাজের জন্য তার যথেষ্ট টাকা নেই। শিক্ষা, সংস্কৃতি, জনস্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট তৈরী এবং অন্য সব অতি-প্রয়োজনীয় কাজগুলির জন্য ভারতে আজ যে টাকা ব্যয় করা হয়, তা প্রয়োজনের অনুপাতে অতি সামান্যই। আর যেটুকু হয় তাও আবার ঐ লোক দেখাবার ভড়ংগুলির পেছনেই বেশী।

গত দশ (চৌদ্দ) বৎসরে ভারতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ পর্য্যায়ের শিক্ষায়তনগুলোর জন্য বৃহৎ বৃহৎ বাড়ী তৈরী করবার জন্য যত টাকা খরচ করা

হয়েছে, সে তুলনায় শিক্ষকদের মাইনে বাড়ান বা ছাত্রদের শিক্ষার সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে খুবই কম। ফলে শিক্ষাভবনের আর ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি বেশ বেড়ে গেলেও শিক্ষার মান মোটেই বাড়েনি, বরং বোধ হয় বেশ কিছু কমেছে। তাই বলে শিক্ষায়তনগুলোর সংখ্যাই যে খুব বেড়েছে তাও নয়। কলকাতার কলেজগুলো এবং অনেক স্কুলই ত তিন-চার শিফটে বিদ্যাদান কার্য্য চালাচ্ছে; ঠিক লড়াইয়ের বাজারের কারখানাগুলির মতই। আর বিদ্যাও যে হচ্ছে ঐ কারখানা মার্কাই তাতেও কোন সন্দেহ নেই!

অন্য কোনভাবে শিক্ষার মান যে উন্নত করবার কোন চেষ্টা হচ্ছে তাও মনে হয় না। শিক্ষাদান পদ্ধতির কোন পরিবর্তনই করা হয়নি, শিক্ষার বিষয়-গুলোরও নয়। ঠিক ইংরেজ আমলে যা ছিল এখনও তাই রয়েছে। ইংরেজ আমলে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা মোটেই ভাল ছিল না সে বিষয়ে সবাই একমত। তখন ঐ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কেরাণী তৈরী করবার ব্যবস্থা বলে বিদ্রূপ করা হলেও আজ স্বাধীনতার দশ (চৌদ্দ) বৎসর পরেও সে ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন করা হয়নি। কোন কাজে লাগুক আর নাই লাগুক হিন্দু ছেলেদের সংস্কৃত আর মুসলমান ছেলেদের আরবী বা ফারসী এখনও পড়তে হবে, মাতৃভাষা ত পড়তে হবেই, তার সঙ্গে ইংরেজী আর রাষ্ট্রভাষা হিন্দীও শিখতে হবে। এই চারটি ভাষা মগজে প্রবেশ লাভ করবার পর যদি স্থান সঙ্কুলান হয় তবে অন্য সব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। এই অত্যধিক ভাষার চাপে ছেলেদের অন্য বিষয়ের জ্ঞানগুলি যে ভাসা-ভাসাই হচ্ছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

বৃত্তিমুলক শিক্ষার ব্যবস্থাও কিছু কিছু হয়েছে। দু'তিনটি উচ্চ পর্য্যায়ের ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যালয় এবং কয়েকটি গবেষণাগারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এগুলোও যে নেহাৎ নগণ্য তা বলাই বাহুল্য। বিদেশে ছাত্র পাঠিয়ে নানা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষালাভের সুবিধাও কিছু কিছু করা হয়েছে অনেকগুলি সরকারী বৃত্তির মাধ্যমে। তবে এই সরকারী বৃত্তিগুলি কারা পায়, আর বিদেশ থেকে কি উচ্চ শিক্ষালাভ করে আসে: সে বিষয়ে বেশী না বলাই ভাল।

মোটকথা স্বাধীন ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি যতটা আশা করা গিয়েছিল তার কিছুই হয়নি। আর যেটুকু হয়েছে তাও মোটেই বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় নয়। দেশের শিক্ষায়তনগুলির উপরে সাধারণের আস্থা যে কতখানি

নষ্ট হয়ে গেছে, তা বুঝতেও কিছু কষ্ট হয় না যখনই দেখা যায় ইউরোপীয় মিশনারীদের পরিচালিত স্কুল কলেজে ছেলেদের ভর্তি করবার জন্য বাপ-মায়েরা কি অদ্ভুত কষ্ট স্বীকার করতে দ্বিধা করেন না। অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয়, ইউরোপীয় বা আমেরিকান মিশনারীরা যদি ব্যবসা হিসাবে এ দেশে অনেক অনেক স্কুল কলেজ স্থাপন করেন তাহলে সেটা তাঁদের মস্ত লাভের ব্যবসাই হবে।

ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে তুলবার জন্য যে পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তা একেবারেই হয়নি, বরং যা পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে বা হচ্ছে তা শিক্ষার উন্নতির পরিপন্থী ভিন্ন আর কিছুই নয়। ছাত্র সমাজের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রায় চরম আকার ধারণ করেছে; বিদ্যার্জনে অনাসক্তিও ঠিক সেই পরিমাণেই বেড়ে গেছে। আজ বিদ্যার্জন করাটা আর ছাত্র সমাজের কাছে একটা মুখ্য কিছুই নয়; কোন রকমে পরীক্ষা পাশের একটা সার্টিফিকেট যোগাড় করতে পারলেই হল। এমন কি ছাত্রদের মধ্যে খেলা-ধূলা বা স্বাস্থ্যচর্চাও প্রায় উঠে যাবারই মধ্যে,—আজকাল ছাত্রদের সর্বপ্রধান কর্ম হচ্ছে সিনেমা হলের সম্মুখে ভীড় পাকান। ভারতের রাজনীতি এবং বৃহৎ জাতীয় নেতৃত্বের চাল-চলনই যে এই দুরবস্থার সবচেয়ে বড় কারণ তাতেও কোন সন্দেহ নাই। দুর্বল এবং মেরুদণ্ডহীন ভারতীয় রাজনীতি এবং ততোধিক দুর্বল এবং নপুংসক ভারতীয় নেতারা, প্রতি মুহূর্তে দেশের ভবিষ্যতের সম্মুখে তাঁদের ভণ্ডামী, বিশ্বাসঘাতকতা এবং অপদার্থতার যে নজির তুলে ধরছেন, তার ফলেই এসেছে আজ দেশের ভবিষ্যৎ ছাত্র সমাজের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলতা। এর পরিণাম যে কত খারাপ হতে পারে সে ধারণা করাই কঠিন। এই ধ্বংসের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে ছাত্র সমাজকে সত্যের পথে পরিচালিত করবার মত শক্তিমান পুরুষ আজ ভারতে কেউ আছেন কিনা, জানিনা। তবে বর্তমান শাসক-গোষ্ঠীর মধ্যে যে নেই, সে অতি পরিষ্কার।

শিক্ষা বিস্তার, যার উপর জাতির উত্থান পতন নির্ভর করছে, যার উপর ভিত্তি করে জাতির উন্নতির সোপান গড়ে তুলতে হবে, সেই শিক্ষা-বিস্তারের জন্য টাকার অভাব খুবই আপশোষের কথা। ইংরেজ আমলের চেয়ে আজ শিক্ষার জন্য অনেক বেশী পরিমাণ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে খুবই সত্যি কথা, কিন্তু তার চেয়েও বেশী সত্যি কথা হচ্ছে যে, শিক্ষা ব্যাপারে আরও বহুগুণ বেশী টাকার প্রয়োজন। আধপেটা খেয়ে শিক্ষকরা যে পুরো শিক্ষাদান করতে

পারেন না, সে কথা বুঝবার মত লোক আজ ভারতের শাসকশ্রেণীর মধ্যে নেই। অবশ্য ন্যাকামি কথা বলে সহানুভূতির ঢং দেখাবার অভিনয় করতে নেতাদের অনেক সময়ই দেখা যায়। এরকম কথাও তারা হামেশাই বলে থাকেন যে আমাদের দেশে শিক্ষকদের মাইনের চেয়ে চাপরাশীদের মাইনেও বেশী; কিন্তু কি করা যাবে, উপায় নেই! উপায় নিশ্চয়ই নেই, এই সব উপায়হীন নেতারা থাক্‌তে উপায় হবার কোন সম্ভাবনাও নেই। তবে শুধু জান্‌তে ইচ্ছে হয় যে, ঐ কথাগুলি বলে তাঁরা কি সত্যিই শিক্ষকদের সহানুভূতি দেখাতে চান, না তাঁদের বিদ্রূপ করাই আসল উদ্দেশ্য!

ভারতের এডুকেশন পলিসিও আজ তাই ঐ উদ্দেশ্যবিহীন হয়েই চলেছে। সত্যিকারের কোন পলিসি যে আজ ভারতে আছে তা মনেও হয় না। যা আছে তা ঐ ভোট সংগ্রহের সুবিধার জন্য একটা ঠাট বজায় রাখা। খবরের কাগজে অনেকবার দেখেছি যে, দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অতিমাত্রায় বেড়ে যাচ্ছে; বেকারদের কাজ দিতে হবে অতএব গ্রামে গ্রামে কতকগুলো স্কুল খোলা হোক—ভারত সরকার এই রকম সিদ্ধান্ত করেছেন। ভাবটা এই যে শিক্ষা-বিস্তারটা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; শিক্ষিত বেকারদের ভয়টাই আসল। তাই তাদেরকে কিছু কিছু ঘুষ দিয়ে গ্রামে গ্রামে বসিয়ে রাখ। কিন্তু সত্যিই কি ভারত সরকারের টাকার এতই অভাব যে শিক্ষার মত অতি-প্রয়োজনীয় কাজটির জন্যও উপযুক্ত মত টাকা সংগ্রহ করতে পারছেন না? ভারতের পররাষ্ট্র-বিভাগ ত আন্তর্জাতিক প্রেস্টিজ বাড়াবার জন্য কোটি কোটি টাকা জলের মত উড়িয়ে দিচ্ছেন। বোধ হয় ভারতের বৈদেশিক বিশারদদের ধারণা এই যে, দেশে শিক্ষাদীক্ষা থাক আর নাই থাক, এরোপ্লেন দাবড়িয়ে পৃথিবীময় চষে বেড়াতে পারলে, আর খানাপিনার সাথে কতকগুলো অবান্তর লম্বাই চৌড়াই ঝাড়লেই বোকা বিদেশীরা তাঁদের খুব মেগদারী আদমী বলে ঠাউরে নেবে। এটা যদি ইয়ার্কি করা না হয়, তবে ইয়ার্কি কি জিনিস আমি জানি না, ভিক্ষেনারী দেখে ইয়ার্কির মানে জানবারও ইচ্ছা নেই।

তবে এই ইয়ার্কিই সব নয়, আরও আছে। আজ ভারতে শিক্ষার বাহন স্কুলগুলোকে সরকার পক্ষের ভোট সংগ্রহ করবার গ্যারাকল ভিন্ন অন্য কিছু বলা কঠিন। তাই স্কুলদের প্রসারও হচ্ছে ঐ ভোট সংগ্রহের প্রয়োজন অনুযায়ীই; এবং ঐ একই কারণে পাঠ্যপুস্তকও আজ তৈরী করা হচ্ছে রাজনৈতিক প্রচার কার্য্যের বিজ্ঞাপনের মতন ভাবেই। শুধু তাই নয়, নানা

ধরণের পুরস্কার এবং প্রলোভনের সাহায্যে আজ ভারতে তৈরী করবার চেষ্টা হচ্ছে ভাড়াটিয়া কবি, সাহিত্যিক এবং চিন্তাশীলের দল,—সত্যিকারের প্রতিভাবানেরা স্বাধীন ভারতে কোন রকমের পাত্তাই পাচ্ছেন না। একটা জাতিকে ধ্বংস এবং পঙ্গু করে দেবার পক্ষে এর চেয়ে সাংঘাতিক যে আর কি হতে পারে, জানি না।

এই আপষ্টার্ট কবি, সাহিত্যিক এবং চিন্তাশীলদের কলমের মাধ্যমেই আজ বিশ্বাসঘাতকতা মহিমান্বিত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে সাহিত্যে, তৈরী হচ্ছে ক্লীবের ইতিহাস, এবং নপুংসকের দর্শন। বিকৃত ফরমাইসী ইতিহাস লিখবার চেষ্টাও কম হচ্ছে না, ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায়ই আজ লিখবার চেষ্টা হচ্ছে বিকৃত ইতিহাস। যারাই খবর রাখেন তাঁরাই জানেন যে কয়েক বৎসর আগে ভারত সরকার স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে এক কমিটি গঠন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের এক ইতিহাস রচনা করবার চেষ্টা করছিলেন। কয়েক বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অনেক মাল মসলা সংগ্রহ করে যখন সত্যি সত্যিই ঐ ইতিহাস লিখবার কাজ আরম্ভ করা হল তখন জানা গেল যে, ভারত সরকার যা পয়দা করতে চাচ্ছেন তা ইতিহাস নয়,—ইতিহাসের নাম দিয়ে নিজেদের প্রচার কার্যের বিজ্ঞাপন বা ফরমাইসী ইতিহাস। সে ইতিহাসে স্থান দেয়া যাবে না বাংলার বা ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের কথাকে, থাকবেনা তাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতা যুদ্ধের কোন কথা, এবং সম্ভবত সিপাহী বিদ্রোহকেও বাদ দেবার চেষ্টা হবে। সে ইতিহাস আরম্ভ হবে গান্ধীতে এবং সম্ভবত শেষ করতে হবে শ্রীজহরলালে। গান্ধী জহরলালই যে ভারতের স্বাধীনতাকে শেষ করেছেন, তাঁরাই যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে শেষ করবার আদি এবং অন্ত—তা খুবই বড় ঐতিহাসিক সত্য, কোনই ভুল নেই। কিন্তু লিখতে হবে স্বাধীনতা যুদ্ধকে ধ্বংস করবার ইতিহাস নয়, ঐ গান্ধী এবং জহরলালকে আদি এবং অন্তের হিরো করে স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসকেই। এইভাবেই আজ ইতিহাসকেও বিকৃত করবার চেষ্টা হচ্ছে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়ই সে বিকৃত ইতিহাস তৈরী হচ্ছে। তবে আচার্য রমেশচন্দ্র যে ঐ বিকৃত ইতিহাস লিখবার জন্য নিজেকে বিক্রীত করে বসেছিলেন না এইটুকুই আশার কথা। তিনি যে সাহস করে ঐ ইতিহাস তৈরীর গোপন ইতিহাসকে ফাঁস করে দিতে পেরেছেন, সেইটুকুই ভরসা। ভারতের এই একান্ত অন্ধকারময় ইতিহাসের ক্ষণে একজনও অবিক্রীত

রমেশচন্দ্র যে আছেন সেইটুকুই একমাত্র সান্ত্বনা। (পরে ডাঃ তারাচাঁদ নামক এক ভারাটিয়া ঐতিহাসিককে দিয়ে ঐ ফরমাইসী ইতিহাস লিখিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সারা ভারতে ঐ ইতিহাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের তুফান উঠেছে; তবে কর্মকর্তারা এখনও অটলই রয়েছেন এবং বইখানিকেও বাজারে চালু রাখা হয়েছে।)

আর স্বাধীন ভারতে শিক্ষার ব্যাপারে নূতনত্ব যে কিছুই হয়নি তাও নয়। নূতনত্ব আমদানী করা হয়েছে অনেক ব্যাপারেই। স্কুলের দশ ক্লাশের বদলে এগার ক্লাশ হয়েছে, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা ডিসেম্বরের পরিবর্তে মার্চে হবার ব্যবস্থা হয়েছে, তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স করা হয়েছে। অনেক ডিগ্রি কলেজ ত নিজেরাই সরকারী আইনের ডিগ্রীলাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতিলাভ করেছেন এবং সরকারী বদান্যতার টাকায় অনেক দালান কোটা তৈরী করে বেশ ফেঁপেও উঠেছেন,—তবে অবশ্য তারা ঐ নিজেদের কলেবরের মতই বিদ্যাকেও ফাঁপিয়ে তুলে শুধুই ফাঁপা বিদ্যা পরিবেশন করছেন কিনা, তা এখনও বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

স্বাধীন ভারতে নূতনত্বের মধ্যে আরও হয়েছে এই যে, শিক্ষার সঙ্গে 'কলা' ও 'সংস্কৃতি' নামে দুটো শব্দ জুড়ে দিয়ে ব্যাপারটাকে বেশ গালভরা নামে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু এই 'কলা' যে কি কলা বা কি বস্তু, আর 'সাংস্কৃতি' মানেই বা কি, তা কোথাও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা হয়েছে বলে জানি না। তাই বোধ হয় স্বাধীনতার স্বরূপের মতই সাধারণের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা মতে ঐ শব্দ দুটোরও ভিন্ন ভিন্ন মানে আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেকেই বুঝে নিয়েছেন যে কলা মানে ছবি আঁকা আর সংস্কৃতি মানে নাচ, গান, বাজনা করা। অনেকে আবার ঐ কলা আর সংস্কৃতি দুটোকে এক করে ফেলে বুঝে নিয়েছেন যে থিয়েটারে ভাল পার্ট করতে পারাটাই হচ্ছে কিনা কলা এবং সংস্কৃতি। অনেকের মতে আবার ও-দুটো কিছুই নয়, অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত অদ্ভুত কিছু কাজ করাটাই হচ্ছে কলা বা সংস্কৃতি। আরও অনেক রকমের মত এবং মানে করা হয়েছে। ভারত সরকারের বিজ্ঞ নেতৃত্ব ও-দুটোর কি মানে বুঝেছেন জানি না, বা আদৌ বুঝেন কিনা তাও জানি না। তবে তাঁরা দেশে কলা আর সংস্কৃতি বৃদ্ধিকল্পে একটা কলা-একাডেমি খুলেছেন,—যার উদ্দেশ্যই হচ্ছে কিনা নাচ, গান, বাজনায় উৎসাহ দান করা। মাঝে মাঝে সরকার থেকে যেসব পুরস্কার দান করা হচ্ছে, তাও ত দেখতে পাই ঐ সিনেমাওয়ালা বা গাইয়ে-

বাজিয়েরাই কিংবা নাচনে-ওয়ালীরাই পাচ্ছেন। তাই মনে হয় তাদের কলা-সংস্কৃতির দৌড়ও ঐ নাচ, গান, বাজনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কলা সংস্কৃতি যে কি বস্তু তা নিয়ে মাথা ঘামান আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু কলা এবং সংস্কৃতির নামে ভারতে আজ যে সব অদ্ভূত কাণ্ডকারখানা শুরু হয়েছে তারই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। সিনেমাতে পার্ট করা আজকাল এক অতি কলাসিদ্ধ কার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই সিদ্ধ-কলাকে নূতন নূতন রূপে রসে সাজিয়ে এক শ্রেণীর সিনেমাওয়ালারা যে জিনিষ সাধারণের সম্মুখে পরিবেশন করছেন, তা আর যাই হোক কলাও নয়, সংস্কৃতিও নয়,—বোধ হয় তাদের বিকৃত রুচির পরিচয় মাত্র। কিন্তু তাদের ঐ বিকৃতি রুচির গান, বাজনা, কথা বলার ঢং আর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি সহকারে নাচ, বাজারে কলা বলেই চালু হয়েছে, এবং ছেলে ছোকড়াদের মধ্যে বেশ প্রসারও লাভ করেছে। অথচ এতে কেউ বাধাও দিচ্ছেন না, ভারত সরকারও না। কলকাতার বারোয়ারী পূজাতলায় আজকাল যে সব কলাসিদ্ধ গান-বাজনা পরিবেশিত হচ্ছে আর প্রতিমা বিসর্জনের সময় রাস্তায় রাস্তায় ছেলেরা যে রকম সিদ্ধকলা নাচ নেচে বেড়াচ্ছেন তা অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। অনেক সময় দেখে লজ্জায় মাথা নতও হয়ে পড়েছে, কিন্তু বাধা কেউই দিচ্ছেন না। ভারতীয় কলা বোধ হয় এইরূপ অনাদরেই দিন পুষ্ট হয়ে উঠছে, পাক্‌লে পরে যা দাঁড়াবে তা আর কহতব্য নয়!

রাস্তায় রাস্তায় এসব যারা করে বেড়াচ্ছে তারা সব বাজে লোক নয়, সবই প্রায় স্কুল কলেজের ছাত্রের দল। এমনিতেই ত কমুনিস্টদের কল্যাণে ছেলেরা আজকাল বেশ চালাক হয়ে উঠেছে, তাদের ঠকান কঠিন। তারা পুরো পয়সা দিয়ে সিনেমা দেখতে গেলে পুরোটাই দেখতে চায়। সিনেমা ওয়ালারাও ব্যাপার বুঝে পুরো পয়সা আদায় করতে অনেকখানিই খুলে দেখাচ্ছেন। তারপর আবার ঐ সিনেমাওয়ালারাই যদি কলাসিদ্ধ বলে পুরস্কার লাভ করতে থাকেন, তবে আর তাদের রোখে কে! শাসক গোষ্ঠীর অনেকেই ত আজকাল রাষ্ট্রভাষা হিন্দির মাধ্যমে সংস্কৃতিবান কিনা, তাই ভয় হিন্দি কলা সংস্কৃতিতেই দেশটা তলিয়ে না যায়! ভারত সরকার কলা সংস্কৃতি জিনিষটা যে কি বস্তু তা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করুন। সস্তায় কাজ হাসিল করতে গিয়ে সস্তা কলার প্রচলন করে কিছু ভাল হবে না। জায়গায় বেজায়গায় কয়েকটা পুরস্কার গুঁজে দিলেই কলায় আর সংস্কৃতিতে দেশ ভরে উঠবে না। কলা, সংস্কৃতি অত

ছোট জিনিস নয়, নিজেরাও তার দর বুঝতে চেষ্টা করুন। কলা বা সংস্কৃতি বুঝলে পরেও ইয়ার্কি করতে বাধা থাকবে না, হয়ত তখন একটু সংস্কৃত ইয়ার্কি করতে হবে এই যা একটু অসুবিধা।

জনস্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ বিভাগ

ভারতে জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে যেসব কাজ হচ্ছে সে বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান আমার বিশেষ নেই। বড় বড় হাসপাতাল তৈরীর ছবি অবশ্যই মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখেছি। কিছু কিছু হাসপাতালের দালান যে স্বচক্ষেও দেখিনি তাও নয়। তবে বড় বড় হাসপাতালের দালান হলেই সব সমস্যা সমাধান হয়ে গেল, এরকম সোজা বুঝবার অভ্যাস আমার মোটেই নেই, তাই সমস্যা কতদূর সমাধান হয়েছে বলা কঠিন। সাধারণ লোক কত সহজে ঐ সব বড় হাসপাতালের সুবিধা পাচ্ছে তাও ঠিক জানিনা, তবে বহু লোক যে এখনও বিনা চিকিৎসায় বেঘোরে মারা যাচ্ছে, তা জানতে কষ্ট নেই। আর ভারতের জনস্বাস্থ্য বিভাগটিও যে একটি অতি অনাদৃত বিভাগ সে বিষয়ে সন্দেহ করবার অবকাশ বিশেষ নেই। ভারতের মহিলা স্বাস্থ্যমন্ত্রী বছরে প্রায় ন'মাস বিদেশে ভ্রমণ করে বেড়ান, বোধহয় তাঁর নিজের স্বাস্থ্য ভাল রাখবার জন্যই। আর যখন ভারতে উপস্থিত থাকেন তখনও পার্লামেন্টে কোন প্রশ্নের ঠিকমত জবাব দিতে পারেন না, এটুকু অনেকের মতই আমিও ভালভাবেই জানি। তিনি অবশ্য এজন্য লজ্জিত মোটেই নন, আর তাঁর পদত্যাগ করবার প্রশ্ন ত উঠেই না; জহরলালজী যখন তাঁকে পছন্দ করেন, তখন ত তাঁর মন্ত্রীগিরি করবার অধিকার রয়েই গেছে। (ইদানীং অবশ্য ঐ মহিলা স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর নেই কিন্তু তার বদলে যিনি মন্ত্রী হয়েছেন তিনিও ঐ মহাজন পন্থাতেই চলেছেন) আর জানি যে জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারেও টাকার অভাব কথাটি হামেশাই প্রয়োগ করা হয়।

পশ্চিম-বঙ্গে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে যেসব কাজ হয়েছে, অনেকের মুখে তার প্রশংসা শুনেছি। ম্যালেরিয়া নাকি পশ্চিম বঙ্গে অনেকটাই কমে গেছে, তাও শুনেছি। পশ্চিম বঙ্গের খবরও আমার নিজের বিশেষ জানা-নেই এই কারণেই যে, ওবিষয়ে জানবার খুব উৎসাহ কোনদিনই হয় নি। কারণ যে দেশে স্বাস্থ্য নষ্ট হবার প্রধান কারণই হচ্ছে কিনা উচিৎ মত খাদ্যের অভাব, সে দেশে ঔষধ খাইয়ে জনস্বাস্থ্য ভাল করবার বাড়াবাড়ি আমার বিশেষ ভাল লাগে না, যানেও

বুঝিনা। যদি দুবেলা পেটপুরে খাওয়াবার ব্যবস্থাই করা সম্ভব না হয় তাহলে বরং জনস্বাস্থ্য বিভাগ তুলে দিয়ে দেশকে প্রকৃতির কোলে ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত কর্ম হবে। প্রকৃতিদেবী তাঁর নিয়ম মাফিক লোকসংখ্যা কমিয়ে দিলে হয়ত একদিন আবার সবাই পেটপুরে খাবার খেয়ে স্বাস্থ্য ফিরে পাবে। স্বাধীন ভারতে সব লোক দুবেলা পেটপুরে খেতে পাচ্ছে কিনা সেটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন, জনস্বাস্থ্য বিভাগ ক'ডোজ ঔষধ খাওয়াল, সেটা নয়। তাই ও নিয়ে মাথা ঘামান কোন বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

ভারতে গত দশবৎসরে যত রাস্তাঘাট তৈরী হয়েছে সেটা ঐ 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালর' চেয়ে খুব বেশী নয়। তবে খানিকটা হয়েছে, সেটাই আসল কথা। আগে যা প্রায় একেবারেই ছিল না, আজকাল হয়েছে বা হচ্ছে। কিছু কিছু রাস্তা যা আগে ছিল তারও অনেকগুলো খানিকটা ভাল করা হয়েছে। নূতনও কতকগুলো হয়েছে এবং পাকা রাস্তাও হয়েছে। তবে প্রয়োজন আরও অনেক বেশী। দশ (চৌদ্দ) বছরেই সব হয়ে যাবে এরকম অবশ্যই কেউই আশা করে না; তাহলেও দশ বছরে যতটা হওয়া উচিত ছিল, সে আশার মত হয়েছে বল্লেও অনেক বেশীই বলা হবে। রাস্তা তৈরী করবার মালপত্র দেশে যথেষ্ট থাকলেও ঐ সনাতন ওঁজুহাত টাকার অভাব এখানেও আছে। এই রাস্তাঘাট বিভাগের কাজের একটা সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এই যে, বহু জায়গায় রাস্তা তৈরী হয়ে গেছে হয়ত আজ দশ বৎসর আগে কিন্তু প্রয়োজনীয় পুলগুলি তৈরী হচ্ছেনা কিছুতেই। অনেক এমন সব ছোটখাট পুল রয়েছে যা দু'তিন মাসেই তৈরী হতে পারে, তাও হয়ত দশ বৎসর হল তৈরী না হয়েই পড়ে রয়েছে।

শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য বা রাস্তাঘাট ব্যাপারে গত দশ বৎসরে পাকিস্থানে যা হয়েছে তা বেশী না বলাই ভাল,—স্টেট সিক্রেট আউট হবার সম্ভাবনা আছে। শিক্ষার মাধ্যম স্কুল-কলেজগুলোর অবস্থা আজকাল যেরকম হয়েছে, তাকে আর যাই হোক না কেন খুব সুখকর বলা চলে না। অনেক স্কুল-কলেজ ত উঠেই গেছে। ভারতে এডুকেশনের নামে অনেক-কিছুই না থাক্‌লেও দৌড় ঝাঁপটা আছে, এখানে তাও আছে বলে মনে হয় না। শিক্ষকদের মাইনে এখানে আরও শোচনীয়, ফলে বিদ্যাদান কার্যটিও এখানে আরও শোচনীয়ভাবেই হয়ে থাকে। স্কুল-কলেজের সমস্যা বাদেও এখানে আরও অনেক কিছুর সমস্যা আছে। বই পুস্তক এবং অন্যান্য শিক্ষা সরঞ্জাম এখানে পাওয়া কঠিন। নূতন বই

পুস্তক এখানে যা প্রকাশিত হচ্ছে তার বেশীর ভাগ না হলেও, অনেকগুলোই অপাঠ্য এবং অসংস্কৃত। উপরন্তু পাকিস্থানের শিক্ষা-বিভাগেও ঐ সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করায় শিক্ষাদান কার্যটি আরও দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এসব ব্যাপারে যে কারও কোন দৃষ্টি আছে তা মোটেই মনে হয় না। গত কয়েক বছরে অনেকবার সরকারী ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়েছে যে বিদ্যার প্রসার কার্যটি বোধ হয় সরকার খুব ভাল নজরে দেখেন না। আমেরিকা থেকে বই ছাপিয়ে এসে পাকিস্থানের স্কুলের ছেলেদের পড়ান হবে, এই ব্যবস্থাটি শুধুই আশ্চর্যজনক নয়, রীতিমত রহস্যাবৃত।

পাকিস্থানে জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারেও তাই। হাসপাতাল এবং চিকিৎসালয়-গুলোর অবস্থা অতীব শোচনীয়। অনেকগুলো ত উঠেই গেছে। আর যেগুলো আছে, তাতেও ঔষধপত্র বিশেষ থাকে না। শুধু তাই নয়, সরকারী অব্যবস্থার ফলে অনেক সময় বাজারেও নানারকম অতি-প্রয়োজনীয় ঔষধ মেলা কঠিন হয়। তবে ভারতের মত পাকিস্থানেও জনস্বাস্থ্যের আসল সমস্যা হচ্ছে দুবেলা অন্নসংস্থানের সমস্যা। সেটি না হওয়া পর্যন্ত, ও ঠাট থাক্‌লেই বা কি আর না থাক্‌লেই বা কি!

রাস্তাঘাটের অবস্থা পাকিস্থানে আরও শোচনীয় হয়েছে। নূতন প্রায় কিছুই হয়নি, উপরন্তু যেগুলি ছিল সেগুলিও রীতিমত দেখাশোনার অভাবে প্রায় না-থাকারই মধ্যে। মনে হয় গত দশবৎসরে পাকিস্থানের রাস্তাঘাট-গুলো গড়পড়তা একফুট করে ধুয়ে নীচু হয়ে গেছে। আর পুল বা কালভার্ট-গুলো শতকরা পঞ্চাশটি অকেজো হয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলেই কি পাকিস্থানের শাসকগোষ্ঠী মুখে কম যাচ্ছেন নাকি! পাকিস্থান বিরাট, বিপুল, সুমহান—এসব তাঁদের মুখে লেগেই আছে। পাকিস্থান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র একথা হাঁক্‌তে পারলেই সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে, এই ভাব আর কি! এগুলিকেও ইয়ার্কি করা বলব না।

পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ বিভাগ ভারতের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় জনসেবা বিভাগ। ইংরেজ আমলে এই বিভাগটির খুবই সুনাম ছিল, খুবই অল্প খরচায় এবং অল্প সময়ে চিঠিপত্র বা তারবার্তা প্রেরণ করে এ বিভাগের সুনাম খুবই বেড়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতার দশ বৎসরে এই বিভাগটিকে বৃদ্ধি করা হয়েছে অনেকটাই, কিন্তু কাজের মান নেমে গেছে অতি নিম্নস্তরে। সাধারণ-ভাবে বলতে গেলে এইটুকুই বলা চলে যে, আগে যে সময়ে চিঠিপত্র বা

তারবার্তা ঠিক ঠিকানায় পৌছত, এখন কমপক্ষে তার ডবল সময় লাগে। (ইদানিং কাজকর্মের আরও উন্নতি হয়েছে, এমন কি Express telegraphও তিন, চার বা পাঁচদিনের কমে ঠিকানায় পৌছেনা।) অথচ খরচাও বেড়ে গেছে প্রায় ডবল মত। এই বিভাগটির কর্মচারীরা ইংরেজ আমলে খুবই অল্প বেতনে কাজ করত, বর্তমানে তাদের বেতনও আর খুব অল্প নেই, অথচ যোগ্যতার মান ক্রমশই নিম্নগামী। পূর্বে পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ বিভাগে ঘুষ বা অন্য কোন অসাধু উপায়ে টাকা রোজগারের কথা শোনা যেত না, এখন তাও শোনা যাচ্ছে। চিঠির উপর থেকে টিকিট চুরি হওয়া আজকাল আর খুব নূতন কিছু নয়। এসবই কপাল ভিন্ন আর কিছুই নয়। তা না হলে, ভারতের স্বাধীনতার ফল এ ধরণের হবে কেন? এই বিভাগের কার্যকলাপেও পাকিস্থান ভারতেরই সমগোত্র। তবে পাকিস্থানে ডাক মাশুলগুলো অতটা বাড়ান হয়নি, এই যা একটু সুবিধা এখনও আছে।

রেলের রসিকতা

রাস্তাঘাটের অবস্থার চরম দুর্দশা থাকলেও ইংরেজ আমলে ভারতে রেলওয়ের ব্যবস্থাটা খুব খারাপ ছিল না। বলতে গেলে রেলওয়েই ছিল ভারতের প্রধান এবং একমাত্র যাতায়াতের উপায়। স্বাধীনতার আমলেও ভারত এবং পাকিস্থানেও ঐ রেলওয়েই হচ্ছে প্রধান বাহন। তাই রেলরাস্তার উন্নতির উপরই এখনও ভারত বা পাকিস্থানের বৈষয়িক উন্নতি অনেকটাই নির্ভরশীল। কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় যাতায়াত ব্যবস্থাটিকে উভয় দেশেই যেভাবে অবজ্ঞা দেখান হয়েছে তা শুধুই সরকারী অযোগ্যতার নিদর্শন নয়, এক অতি অদ্ভুত এবং অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।

দেশ স্বাধীন হলে দেশে অনেক নূতন নূতন রেল লাইন খোলা হবে, অনেক গাড়ী বাড়ান হবে, ভাড়া কমিয়ে দেওয়া হবে; ফলে দেশের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত টহল দিয়ে বেড়ান বেশ আরামের কাজ হয়ে দাঁড়াবে। স্বাধীনতার ধারণার মধ্যে এধরণের ধারণা সকলের ছিল কিনা জানি না, তবে আমার মত ভবঘুরে অনেকের যে ছিল সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তাই আজ যখন এই কল্পনাগুলির ঠিক উল্টো ব্যাপারটাই শুধু দেখতে পাচ্ছি, তখন বলবার বেশী কি আর থাকতে পারে! তবে ভারতের রেলওয়ের যে কি ভীষণ উন্নতি হয়েছে বা হচ্ছে সে সুসমাচার খবরের কাগজ মারফত প্রতি-

নিয়তই জনসাধারণের নিকট পরিবেশিত হচ্ছে। সাধারণের মধ্যে যাঁরা রেল-ভ্রমণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাঁরা হয়ত ঐ সুসমাচারে কথিত গল্পগুলি বিশ্বাস করতেও আরম্ভ করেছেন ; কিন্তু যাঁরা মাঝে মাঝে রেল ভ্রমণ করতে বাধ্য হন তাঁরাই জানেন যে ঐ সুসমাচারগুলি কত মিথ্যা এবং অলীক। আর আমার মত ভবঘুরে বা ভ্যাগাবণ্ড, যাঁরা একটু সময় সুযোগ করতে পারলেই রেল বাহনে চড়ে লম্বা পাড়ি জমাবার তালে থাকেন, তাঁরা ত বেশ হাড়ে হাড়েই জানেন যে ভণ্ডামী কতদূর নীচ হতে পারে, আর অপদার্থতাও কত সীমাহীন।

খবরের কাগজ মারফৎ বিজ্ঞাপিত হলেও ভারতীয় রেলের যাত্রী বা মাল বহন ক্ষমতা যে উর্ধ্বগামী না হয়ে নিম্নগামীই হয়েছে, তা যে-কোন রেল যাত্রী বা মাল প্রেরকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান বলা চলে। মাল বুক করে রেল মারফৎ পাঠান বা যাত্রীহিসাবে নিজেকেই বুক করে রেল ভ্রমণ করা আজ যে কত দুষ্কর হয়েছে তা আর কহতব্য নয়। এই দুরবস্থার সাফাই হিসাবে হামেশাই বলতে শোনা যায় যে, বর্তমানে যাত্রী এবং মালের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। হয়ত বেড়েছে ঠিকই ; কিন্তু এটা আরও ঠিক যে, এই বৃদ্ধির মাত্রা কখনই গত মহাযুদ্ধের সময়ের মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায়নি। অথচ নূতন নূতন লাইনও অনেক কিছুই হয়নি। এক আসাম লিঙ্ক লাইনের কয়েক মাইল নূতন লাইন ছাড়া, কোন মুখ্য লাইন আর একটিও হয়নি। দু'দশ মাইল নূতন লাইন যা হয়েছে তা সবই অতি ক্ষুদ্র ব্রাঞ্চ লাইন হিসাবেই।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরাই ভারতীয় রেলপথের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার অথচ তাদের সুখ-সুবিধার জন্য প্রায় কিছুই হয়নি। যেটুকু হয়েছে তা শুধুই লোক দেখাবার জন্যই। আজও তৃতীয় শ্রেণী যাত্রীসাধারণকে মালগাড়ীর মাল ঠাসাইয়ের মত অবস্থায়ই রেল ভ্রমণ করতে হয়। অনেক সময়ই আবার ঐ রকম ঠাসাই করেও কুলায় না, বাইরে হ্যাণ্ডেল ধরে বা ছাদে চড়ে হাওয়া খেতে খেতে ভ্রমণ-কার্য সমাধা করবার প্রয়োজন হয়। এই তৃতীয় শ্রেণীর সমস্যার সমাধান যে কোনদিন হবে সেরকম কোন আশাও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। শ্রীজহরলাল ত ইতিমধ্যেই এক ধমক হেঁকে বসে আছেন। রেলের ভাড়া আরও অনেক বাড়িয়ে দিয়ে রেল-ভ্রমণকারীর সংখ্যা কমিয়ে দেবেন, কিংবা মহান চীনদেশের অনুকরণে ভারতেও রেলভ্রমণের জন্য পারমিট প্রথা চালু করবেন। মোটকথা থার্ডক্লাস আর তিনি রাখছেন না ; ওটি তুলে দিয়েই সমস্যা মেটাতে হবে। এইরকম সহজ পন্থায় ভারতে আজকাল অনেক

দুরূহ সমস্যারই সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে। কবে হয়ত শুনতে পাওয়া যাবে যে ভারতে গরীবলোকদের আর রাখা হবে না। গান্ধীজীর মানসপুত্র হিসাবে শ্রীজহরলালকে ভারতের ভ্রাতা হিসাবেই দেখতাম, এখন মনে হচ্ছে তিনি প্রমোশন নিয়ে একবারে ভগ্নীপতি হয়ে বসেছেন; তা নাহলে এ ধরণের রসিকতা করবার সাহস পাচ্ছেন কোথা থেকে? অবশ্য ইতিমধ্যে রেলভাড়া যে বাড়ান হয়নি তা নয়, বেড়েছে, অনেক বেড়েছে—বাড়তে বাড়তে ইংরেজ আমলের প্রায় ডবলের কাছেই উঠেছে। (বর্ত্তমানে ডবলেরও উপরে উঠেছে)।

তবে উন্নতির চেষ্টা যে হয়নি, এমন কথাও বলা চলে না। চেষ্টা হয়েছে, বহুবার হয়েছে, এখনও ভীষণভাবেই হচ্ছে। উন্নতিও হচ্ছে! ইণ্টার ক্লাস তুলে দিয়ে ক্লাস টু করা বা ঐ রকমের ক্লাসের অদল বদল বহুবার করা হয়েছে। বর্তমানে ত ইণ্টার ক্লাসকে প্রমোশন দিয়ে একেবারে সেকেণ্ড ক্লাসেই পরিণত করা হয়েছে। সেকেণ্ড ক্লাস হয়েছে ফার্স্ট; আর ফার্স্ট উঠে গিয়ে হয়েছে এয়ারকণ্ডিশণ্ড গাড়ী। এত প্রমোশনের পরেও কি আর বলা উচিত যে উন্নতি হচ্ছে না বা হয়নি! শুধু তাই নয়, দু'চারখানা থার্ডক্লাসেও ফ্যান দেখা যাচ্ছে, থার্ডক্লাসের কপাল খোলার প্রতীক হিসাবেই। আরও উন্নতি হয়েছে, থার্ডক্লাসের এয়ারকণ্ডিশণ্ড গাড়ী, থার্ডক্লাসের স্লিপিং কোচ, সিনেমা দেখান গাড়ী, আরও নানা রকমের নূতনত্বে। নূতনত্ব দেখাবার ঝোঁক ভারতীয় নেতৃত্বের একটা অতিবৃহৎ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জন্যই থার্ডক্লাসের এয়ারকণ্ডিশণ্ড গাড়ী, স্লিপিং কোচ, সিনেমা দেখানো গাড়ী প্রভৃতি চালু করা সম্ভব হয়েছে। উন্নতি যদি এই পথে এবং এই গতিতে আরও অগ্রসর হবার সুযোগ পায়, তাহলে বিশ্বাস রাখি যে, সেদিন আর বেশী দূরে নয়, যেদিন থার্ডক্লাসের যাত্রীরা শুধুমাত্র স্লিপিং কোচের সুবিধাই পাবে তা নয়, স্লিপিং কোচে হয়ত একজন শয্যা-সঙ্গিনীর ব্যবস্থাও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ করে রাখবেন। কথাটা ঠাট্টা করে বলা হচ্ছে এরকম মনে করবার কোন কারণ নেই। অন্য কোন দেশে শয্যা-সঙ্গিনীর ব্যবস্থা থাকেনা বলেই ভারতেও থাকেবনা এটা কোন যুক্তি নয়। ভারত ভারতই, এখানে কারুকে দেখে কিছু করবার চেষ্টা করা হয় না, সব নূতন ধরণের চেষ্টা করা হয়। তাই যাত্রীরা যখন স্থানাভাবে হ্যাণ্ডেল ধরে যাতায়াত করতে বাধ্য হয়; যখন ছাদে চড়ে হাওয়া খেতে বাধ্য হয়, এবং হামেশাই পুলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে স্বর্গলাভও করে, তখন তাদের বসে যাবার ব্যবস্থা না করে এয়ারকণ্ডিশণ্ড, স্লিপিং কোচ, সিনেমা

দেখান গাড়ী এদেশেই চালু করা সম্ভব, এবং একমাত্র এই দেশেই। এগুলো কিছুই ইয়ার্কি নয়, সব সিরিয়াস ব্যাপার। ভারতের শাসক নেতারা যে সব গান্ধীজির মানসপুত্র, বিশ্ববরেণ্য, স্বনামধন্য আদমী কি না, তাই।

কোন খবরের কাগজে একটা চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল এই প্রস্তাব দিয়ে যে, ভারতীয় রেলের গাড়ীর ছাদের চারিদিকে একটা রেলিং বসিয়ে দিলে, আর ছাদে উঠবার জন্য গাড়ীর গায়ে একটা মইয়ের ব্যবস্থা করে দিলেই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের আর বিশেষ অসুবিধা থাকে না ;—যাত্রীরা হুঁকো কল্কি সহ স্ত্রী কন্যা নিয়েই ছাদের হাওয়া খেতে খেতে দেশ ভ্রমণ করতে পারে। প্রস্তাবটি যে খুবই গঠনমূলক আর অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই জোরদার, তাতে কোন সন্দেহই নেই। অন্ততপক্ষে ভারতীয় রেলের কর্তারা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধার জন্য যা করেছেন, তার চেয়ে অনেক ভাল প্রস্তাব সে বিষয়েও কোন সন্দেহই নেই।

উন্নতি আরও হয়েছে এবং অতি অবশ্যই হয়েছে—চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিনের কারখানাটা ইঞ্জিন তৈরী করছে। এই কারখানাটি চালু হতেই তাই, রেলওয়ের উন্নতির প্রচার-কার্য এমন উগ্র আকার ধারণ করেছে যে, লোকে থ মেরে গেছে। এই কারখানাটিই বোধহয় ভারত সরকারের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কীর্তি। পেরাম্বুরে কোচ তৈরী করবার একটা কারখানাতেও কাজ শুরু হয়েছে, এবং অন্য যেসব কারখানা ছিল সেগুলিও নাকি অনেক বাড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তবে এখনও বেশীর ভাগ ইঞ্জিন এবং সম্ভবত কোচও বিদেশ থেকেই আসছে।

কলকাতার আশেপাশে যেসব ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা রয়েছে তারাও রেলের কোচ, ওয়াগন এবং অন্য সব জিনিসপত্র তৈরী করে দিচ্ছে। কলকাতার আশেপাশের কারখানাগুলো কিন্তু তাঁদের পুরো ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারে না এই জন্যই যে, তারা প্রয়োজন মত যথেষ্ট ইস্পাত পায় না। প্রয়োজনমত ইস্পাতের অভাবই নাকি সব কাজ ভেস্তে দিচ্ছে। তবে ইস্পাতের অভাবে কোচ, ওয়াগন তৈয়ারীর কাজ ব্যাহত হয়ে থাকলেও রেলওয়ে-ওয়ালারা ইস্পাতের কিছু কম শ্রাদ্ধ করছেন না। বহু স্টেশনে তাঁরা প্লাটফরম ভাল করে তার উপর শেড তৈরী করছেন। অনেক জায়গায় অতি নগণ্য স্টেশনেও প্লাটফরম এবং শেড তৈরী ঠিকই হচ্ছে। বোধ হয় তাঁদের

মতে ঐ কাজটির প্রয়োজনই হচ্ছে বেশী, ওয়াগন বা কোচ পরে তৈরী হলেও চলবে। ছোট খাট ঠিকাদার মারফৎ চোখের আড়ালে নির্জন জায়গায় এসব কাজ করাতে পারলে যে লাভ বেশী হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই লাভের কারবারটি খুব ভালভাবেই হচ্ছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। অনেক বড়, ছোট, মাঝারি স্টেশনের যাত্রী-বিশ্রামাগারের, রেস্তোরাঁ বা বাথরুমের মেঝে ভেঙ্গে ফেলে মোজাইক করতে দেখেছি; বোধ হয় ঐ একই কারণে, তাই আগে দরকার। সিমেণ্টের অভাবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অচল হলেই বা কি, আর সাধারণ লোকের বাড়ীঘর তৈরী বন্ধ থাকলেই বা কি! রেলের মেঝে মোজাইক না করলে কি আর প্রেস্টিজ থাকে, লাভ হয়!

এইভাবেই ভারতীয় রেলপথ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। এত উন্নতি করেছে যে কলকাতার শিল্প-এলাকা আর রেলের ভরসা রেখে কাজ চালাবার ভরসা পায় না,—কলকাতার শিল্প-এলাকার আজ লরীই প্রধান ভরসা। তবে হ্যাঁ, রেলের উন্নতি একটা বিষয়ে খুবই হয়েছে এবং হচ্ছে। এখন কেবল যদি এই উন্নতির রেটটা বজায় থাকে তবেই কাজ; দেশের অনেক সমস্যার সমাধান ঐ রেলই করে দিতে পারবে। এই উন্নতিটি বজায় থাকলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় রেলপথ শুধুমাত্র দেশের মধ্যেই ভ্রমণের জন্য টিকিট দেবেনা, দেশ ছাড়িয়েও, এমনকি পৃথিবীর বাইরে যাবার জন্যও টিকিট দিতে পারবে। ঐ প্যান-আমেরিকান এয়ারওয়েজের প্রচার ছবির কথা "To travel round the world fly Pan-American" এর মতই ছবি দিয়ে প্রচার করতে পারবে "To travel beyond the world travel by Indian railways"। ঠিক এই রকমেরই প্রচার করতে পারবে। উন্নতি হয়েছে রেল-দুর্ঘটনার। খবরের কাগজ খুললেই আজকাল প্রায় প্রতিদিনই দেখতে পাওয়া যাবে, কোথাও না কোথাও রেল দুর্ঘটনা হয়েছে। আর প্রতি মাসেই দুটি, চারটি বেশ বড় ধরণের দুর্ঘটনা সংঘটিত অবশ্যই হবে। দুর্ঘটনা অবশ্য ইংরেজ আমলেও হয়েছে এবং অন্যসব দেশেও হয়ে থাকে; তবুও ভারতীয় রেল-দুর্ঘটনার বেশ বিশেষত্ব আছে। শুধু সংখ্যায় নয়, আকারে এবং প্রকৃতিতেও এরা বেশ বিশেষত্বপূর্ণ।

কিছুদিন আগে পর পর দুটো যে বৃহত্তম দুর্ঘটনা ঘটে গেল, দুটিই পুল ভেঙ্গে গাড়ীসুদ্ধ নদীগর্ভে পতনের ব্যাপার! পুলের নাকি তদারকি ছিল না, আর তা দেখবার লোকও ছিল না। দ্বিতীয়টি ঘটবার পর রেলমন্ত্রী শাস্ত্রী মশাই পদত্যাগ

করে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। নির্দোষ ত তিনি অতি অবশ্যই। একলা তিনি আর কি করতে পারেন,—আর যা কিছু করার তা ত ঐ সেক্রেটারীরাই করেন, তিনি ত শুধুই জায়গামত সই বসাতে পারলেই খুসী। উপরন্তু এরকমের দুর্ঘটনা ঘটলে তিনি ত এরোপ্লেন-যোগে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে হতাহতদের সমবেদনাও জানিয়ে থাকেন। সেইত হচ্ছে তাঁর কাজ! অফিসে বসে কি আর সব কাজ হয়। তাই নির্দোষ শাস্ত্রী মশাইয়ের পদত্যাগে অনেকেই দুঃখিত হয়েছেন। কিন্তু শাস্ত্রী মশাইকে যতটা সাদাসিধে দেখা যায় তিনি ঠিক ততটা নির্বোধ নন। তিনি ব্যাপারটা বেশ আঁচ করে নিয়েছেন যে ভারতীয় রেলপথে তলা না থাকা পুল শুধু ঐ দুটিই নয়, আরও অনেক আছে, এবং সময় ও সুযোগ মত তারা রেলকর্তাদের অপদস্থ করতেও ছাড়বে না। হয়ত প্রতি মাসেই এখন ঐ ধরণের পুল আবিষ্কার হতে থাকবে। তাই সরে পড়ে নির্দোষ থাকাটাই আপাতত বুদ্ধিমানের কাজ; তিনি করেছেনও তাই। ইংরেজ আমলে তৈরী করা রেল লাইন স্বাধীন আমলে ভেঙ্গে পড়াই ত স্বাভাবিক, দেখাশোনা ত আর করা হয়নি! স্বাধীনতার ফূর্তিতেই যে সবাই বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন কিনা! নূতন যে সব পুল তৈরী হয়েছে তাও ত চেনা জানা ঠিকাদারেরাই করেছে; আর নূতনত্বের দেশ ভারত, সেখানে যে দু'চারটে বিনা পিলারেই ব্রিজ তৈরী করে নূতনত্ব করা হয়নি, তারই বা কে গ্যারান্টি দিচ্ছে!

কিন্তু এগুলিই সব নয়, আরও আছে; রেলওয়ে পরিচালনার যোগ্যতা দিন দিন যে হাঁরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেও এক গল্পেরই ব্যাপার। বড় কয়েকটি প্রধান লাইন বাদে অন্য কোন লাইনে রেলগাড়ী চালাবার সঙ্গে সময়ের কোন সংযোগ নাই। গাড়ী এক দেড় ঘণ্টা লেট ব্যাপারটা আজকাল আর ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। 'দশটার গাড়ী কটায় আসে' এ প্রশ্ন আজ আর কারুর কানে নূতনত্ব দেয় না। সম্পূর্ণ বিনা কারণে ড্রাইভার গার্ড বা ষ্টেশন মাস্টারের স্বাধীনতা জাহির করবার জন্যই যখন কোন গাড়ী পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, ফলে যাত্রী সাধারণের গন্তব্যস্থলে পৌছুতে দেরী হয়, বা পরবর্তী গাড়ী ফেল হয়, তখনই ভুক্তভোগীরা স্বাধীনতার ইয়ার্কি বুঝতে ভুল করে না। যাত্রী সাধারণের সাথে রেল-কর্মীদের ব্যবহারও অতি নীচু পর্যায়ে নেমে এসেছে। আর তাদের টাকা রোজগারের অসাধু পন্থাগুলি নিয়ে দেশে যে কতরকমের মুখরোচক গল্প প্রচলিত হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

ভারতীয় রেলের এই অবস্থাও যে দেশের 'বৃহত্তম স্বার্থের' খাতিরেই করা হয়েছে এরকম কথা জোর গলায় বুক ফুলিয়ে ঘোষণা না করলেও এর প্রতিকার করবারও কেউ নেই, চেষ্টাও নেই। সব স্বাধীন হয়ে গেছে, ভাবনাও তাই কিছুই নেই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জিনিষটি যদি শুধুমাত্র কল্পনার বস্তুই না হয়ে থাকে, তাহলে ভারতীয় রেলের অপদার্থতাই যে তাকে শেষ করে কল্পনায় ফিরিয়ে পাঠাবে, তা যেকোন মূর্খও অঙ্ক কষেই বুঝিয়ে দিতে পারে; তবে বুঝাবে কাকে এটাই হচ্ছে একমাত্র প্রশ্ন! [নূতন তিনটে স্টিলের কারখানায় কাজ স্থরু হবার পরে রেলের অপদার্থতার জন্য যে সেকাজ কি রকম ব্যাহত হচ্ছে তা আজ আর কারও অজানা নয়।]

পাকিস্থানের রেলওয়ের অবস্থাও প্রায় সব রকমেই ভারতেরই মত। গাড়ীর সংখ্যা পাকিস্থানে অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে যাত্রী এবং মাল চলাচলও অনেক কমে গেছে, তাই ভিড় বোধ হয় ভারতের তুলনায় খুব বেশী বাড়েনি। দুর্ঘটনার ব্যাপারেও পাকিস্থান রেলের নাম ভারতের মত এত উচ্চ স্থান এখনও অধিকার করেনি। নূতনত্বের মধ্যে পাকিস্থানে কয়লার অভাবে অনেক লাইনে ডিজেল ইঞ্জিন প্রবর্তন করা হয়েছে।

কৃষিকার্যে তৎপরতা ও গরুর উন্নতি

ভারত এবং পাকিস্থান দুটোই কৃষিপ্রধান দেশ। এই দুই দেশেরই আর্থিক উন্নতি তাই প্রধানতঃ নির্ভর করে ঐ কৃষিকার্যের উন্নতির উপরই। এই সহজ সূত্রটি যে নেতারা বুঝতে ভুল করেছেন তাও নয়। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই তাই অনেকগুলো নদীর উপর ডাম, ব্যারেজ ইত্যাদি তৈরীর কাজ খুবই সাড়ম্বরে আরম্ভ হয়েছে। কাজ কিছু কিছু এগিয়েছেও। অনেক জায়গায় নূতন নূতন কৃষিফার্মও তৈরী করা হয়েছে,—কৃষকদের উন্নত উপায়ে ফসল ফলাবার কায়দা শেখাবার জন্য। ছোট ছোট ইরিগেশন ব্যবস্থাও অনেক জায়গায় করা হয়েছে বা হচ্ছে। আবার অনেক জায়গায় পাম্প বসিয়েও কৃষিকার্যে জল সরবরাহ করবার ব্যবস্থা হয়েছে। ভাল বীজ বা সারের সরবরাহ ব্যবস্থাও কিছু কিছু করা হয়েছে,—এই সার সরবরাহ করবার জন্যই ত সিন্দ্রিতে এক বিরাট এমোনিয়াম সালফেটের কারখানার পত্তন করা হয়েছে। সিন্দ্রির এই এমোনিয়াম সালফেটের কারখানাই ভারতে সরকার কৃত শিল্পগুলির মধ্যে

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। মোট কথা, অনেক কিছুই হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। জমির মালিকানা যাতে কৃষকদেরই থাকে এবং কৃষকরা কৃষিকার্যে উৎসাহ পায়, তার জন্য অনেক প্রদেশেই ভূমি বিষয়ে নানারকমের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সোজা কথা কৃষির উন্নতির জন্য যে অনেক কিছু করা দরকার, কৃষিই যে ভারতের প্রধানতম উপজীবিকা, সেটা বুঝতে মোটেই ভুল হয়নি এবং কাজও অনেক দিক থেকেই আরম্ভ হয়েছে। 'অধিক খাদ্য ফলাও'-এর প্রচারকার্যও বাদ পড়েনি, বরং খুব জোরের সঙ্গেই চালান হয়েছে।

তবুও গত দশ বৎসরের এত চেষ্টার পরও খাদ্যশস্য বা টাকা আমদানীকারী কৃষি পণ্যের ফলন যে খুব বেড়েছে তা মনে করবার কোন কারণও দেখা যাচ্ছে না। দশ বৎসর পূর্বেও ভারত খাদ্যশস্যে ঠিক যতখানি অসম্পূর্ণ ছিল আজও প্রায় ততটাই রয়েছে, তা ত পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে। অন্য সব টাকা আমদানি-কারী কৃষিপণ্যের উৎপাদনও যে খুব বেড়েছে সেরকম কোন সংখ্যাতত্ত্বও দেখেছি বলে মনে হয় না।. ১৯৪৭ সালে ভারত যে পরিমাণ খাদ্যশস্য বাইরে থেকে আমদানি করেছিল, আজ ১৯৫৬ সালের শেষে বিদেশের সাথে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য যে চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে, যার ডেলিভারী আসবে ১৯৫৭ সালেও তাও প্রায় ঐ ১৯৪৭ সালের আমদানির সমপরিমাণই। ১৯৫৮ সালে ত আমদানির পরিমাণ আরও বেড়ে গেছে, (এবং পরে প্রত্যেক বৎসরই খাদ্য আমদানীর পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে।) আর ইতিমধ্যে কোন বছরই খাদ্য-শস্যের আমদানি কিছু কমতিও করা হয়নি। গত দশ বৎসরে দেশে লোক-সংখ্যাও কিছুটা বেড়ে গেছে নিশ্চয়ই। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অজুহাতটা যদি এখনও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হবার কারণ হিসাবেই ব্যবহার করা হয় তবে ভারত যে আর কোন দিনই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার আশা রাখে না, সেটা ত অতি সোজা হিসাব। আগামী দশ বৎসরে বা তার পরের অন্যান্য দশ বৎসরগুলিতেও যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবেই তাতেও কোন সন্দেহ নেই। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারটাও অবশ্যই কমাতে হবে। কিন্তু তবুও গত দশ বৎসরে এত হৈ হল্লা করে, এত ছবি ছেপে, ফাউণ্ডেশন স্টোন স্থাপন করে বা ওপেনিং সেরিমনি করে যে কাজ করা হোল তার ফসলটাই বা এতটা হতাশাব্যঞ্জক হোল কেন?

দশ বৎসর আগে হিসাব কষে বলা হ'ত যে, দেশে নাকি মাত্র শতকরা দশ ভাগ খাদ্যশস্যের অভাব রয়েছে। এই দশ ভাগ অভাবকে অন্ততঃ নয়

ভাগে পরিণত করা গেল না কেন? চারিদিকে যত খাল কাটা, ড্যাম, ব্যারেজ ইত্যাদির কাজ দেখেছি তাতে আমারই ত ধারণা হয়েছিল যে ভারত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেছে নিঃসন্দেহে। কখনও উল্টো দিক থেকে ভেবে দেখবার দরকার বোধ করিনি। স্বচক্ষে অনেকগুলো ড্যাম, ব্যারেজ ইত্যাদির কাজ দেখে আর খবরের কাগজে হাজারে হাজারে ছবি আর শ'য়ে শ'য়ে প্রবন্ধ পড়ে কল্পনায় যে ধারণাটা গড়ে উঠেছিল বাস্তবটা তার থেকে এতটা তফাৎ হয়ে গেল কিভাবে? বন্ধুরা, যাঁরা এ বিষয়ে চিন্তা করেন এবং খবরও রাখেন, তাঁরা কিন্তু ঐ বড় বড় নদী-উপত্যকা কাজগুলোকে খুব বড় চোখে কখনই দেখেন না। তাঁদের মতে ওগুলো ঐ বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার মতই ব্যাপার,—লোক দেখাবার পক্ষে ওগুলো যত প্রয়োজনীয় আসল কাজে ঠিক ততখানি নয়। যত টাকা খরচ করে ওগুলোকে তৈরী করা হচ্ছে, তার অনেক কম টাকায়ই নাকি ইরিগেশনের অনেক বেশি এবং ভাল ব্যবস্থা সম্ভবপর হ'ত। তবে বড় বড় প্রজেক্টগুলোর একটাও যে আজ দশ বৎসর পরেও পুরোভাবে কাজে লাগান সম্ভব হয় নি, সেটা অতি সত্যি কথা। আজ পর্যন্ত ক্ষেতে জল দেবার কাজে সহায়তা যেটুকু হয়েছে তা প্রায়ই ঐ অখ্যাত ছোট ছোট খাল-গুলো থেকেই। অদূর ভবিষ্যতে কিংবা আরও কিছুদিন পরে একদিন অবশ্যই ঐ বড় কাজগুলো থেকেও পুরো কাজ পাওয়া যাবে। কিন্তু তখনও যে ক্ষেতে জল সেচের ব্যবস্থার আরও প্রয়োজন হবে না, তা নয়। আরও অনেক সেচের ব্যবস্থার প্রয়োজন তখনও থাকবেই। তাই প্রশ্ন উঠে যে, যেসব ছোট ছোট কাজে অর্থব্যয়ের তুলনায় বেশি কাজ হয় এবং তাড়াতাড়ি হয়, সেগুলোর প্রয়োজনই বেশি, না প্রচার কার্যের পক্ষে সুবিধাজনক ঐ বড় কাজগুলোর প্রয়োজনই বেশি? যথেষ্ট টাকা থাকলে অবশ্য কোন কথাই ছিল না—বড়, ছোট, মাঝারি সব কাজগুলোই এক সঙ্গে আরম্ভ করে দেওয়া যেত। কিন্তু এই আসল চীজটিরই যখন বিশেষ অভাব, তখন আগের কাজ আগে না করে লোক দেখাবার জন্য হাইয়ো হাইয়ো বড় কাজ সব আরম্ভ করে বসে থাকবার মানে কি? প্রচারকার্যের প্রয়োজন অবশ্যই আছে; কিন্তু সব কাজের প্রধান উদ্দেশ্যই যদি হয় প্রচারকার্য, তবেই বিপদ। আসলে ভারতের কৃষি উন্নয়ন-মূলক কাজেও অন্যান্য সব কাজের মতই প্রচারকার্যই বেশি হয়েছে; যার ফল হয়েছে কিনা শূন্য, দশ বৎসরে এক পারসেণ্টও উন্নতি করা সম্ভব হয় নি।

সেচের জল বাদেও কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য অন্য যে সব কাজ হচ্ছে,

তাতেও ঐ প্রচারকার্যের মহিমাটাই বেশি, আসল কাজটা কম। জাপানি প্রথায় ধানের আবাদ করলে ফসল অনেক বেশি হয়,—এ বিষয় নিয়ে আলোচনা গবেষণা এত বেশি শুনেছি যে কান কালা হবার উপক্রম আর কি! কিন্তু সত্যি সত্যি ঐ সরকারী প্রদর্শনী ফার্মগুলির বাইরে আজ পর্যন্ত কত একর জমিতে ঐ প্রথায় চাষের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে, বলা কঠিন। ঠিক খবর আমিও বলতে পারবনা, ও ব্যাপারের কোন সংখ্যাতত্ত্বই আমি দেখিনি। তবে খুব বেশি হলেও দুচার হাজার একরের বেশি জমিতে যে কখনই নয়, সে বিষয়েও আমার কোন সন্দেহ নাই। আমি যত্র তত্র ঘুরে বেড়াই এবং অনেকের চেয়েই বেশি ঘুরি, কিন্তু সরকারী প্রদর্শনী ফার্মের বাইরে ঐ প্রথায় ধান চাষ আমার কোথাও চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না।

সিন্ধ্রির য়্যামোনিয়াম সালফেটের কারখানা খুলে ভারত সরকার ত এক মহাকাজ করে বসে আছেন। এপর্যন্ত কত লোককেই না ওটি দেখিয়ে ভারতের অগ্রগতির সাফল্যের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা হোল; কিন্তু আসলে ঐ য়্যামোনিয়াম সালফেট যে দেশের কৃষিকার্যের কতটুকু সহায়তা করল তাই জানা গেল না। সিন্ধ্রির কারখানায় য়্যামোনিয়াম সালফেট তৈরী করতে টন প্রতি যা খরচ হয়, জাপান থেকে য়্যামোনিয়াম সালফেট কিনে কলকাতার বাজারে পৌছাতে টন প্রতি তার চেয়ে একশো টাকা কম খরচ হয়। ফলে ঐ কারখানার মাল যে-দরে বাজারে ছাড়তে হয়, তা দুর্ভাগা ভারতীয় কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতার সম্পূর্ণই বাইরে। তাই কৃষকেরা ঐ কারখানার বিশেষ বড় খরিদ্দার নয়; ঐ কারখানার বড় খরিদ্দার হচ্ছে ভারতীয় চা বাগানওয়ালারা। চায়ের আবাদও অবশ্যই কৃষি কাজ, এবং সেটা অস্বীকার না করেও এটুকু বলা যায় যে, সিন্ধ্রির কারখানা ঠিক ঐ উদ্দেশ্যেই তৈরী করা হয়েছিল না। আর ঐ কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বড়জোর বছরে তিনলক্ষ টন, যেখানে সারা ভারতে হয়ত মোট প্রয়োজন তিন কোটি টনের চেয়েও অনেক বেশি। কিন্তু প্রচারকার্যটি এমন সচ্ছল ভাবে হয়েছে যে, অনেকেরই ধারণা হয়ে গিয়েছে, আর কিছুর অভাব নেই; কৃষকদের শুধু সার প্রয়োগের অভ্যাসটা করিয়ে দিতে পারলেই হয়।

এই সারের কথায় একটা কথা মনে পড়ে গেল। অনেক দিন আগের কথা, যখন কলেজে অর্থনীতির ছাত্র ছিলাম, তখনও ভারতের কৃষি-সমস্যা এবং দুর্দশার কারণ কি সে-বিষয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছি,—পরীক্ষা

প্রাশের জন্যই অবশ্য। ভারতের কৃষি-সমস্যা আরও বেশি জমিতে আবাদ করতে হবে সে সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে জমির উৎপাদন-ক্ষমতার ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখে গমন। পৃথিবীর অন্যান্য যে কোন দেশের তুলনায় ভারতের জমির একর-প্রতি উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ নিতান্তই কম। একর-প্রতি শতকরা দশভাগ শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলেই ভারত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে, অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় আবাদ করা হলে ভারতের জমির প্রতি একরে বর্তমানের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি শস্য ফলান মোটেই কঠিন কাজ নয়। আর এই কাজটুকুর জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল না থেকে সেচের ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত পরিমাণ সারের ব্যবস্থা করা, এবং কৃষকদের কৃষি বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা। সরকারী প্রচারকার্য মতে এর কোনটাই বাদ থাকেনি, সবই পুরোভাবে করা হয়েছে। উপরন্তু ভারত সরকার এক 'কেন্দ্রীয় ট্রাকটার অর্গানিজেশন' নামে সংস্থা স্থাপন করে নিজেদের উদ্যোগে প্রতি বৎসর বহু লক্ষ একর নূতন নূতন জমিতে শস্য চাষের ব্যবস্থাও করেছেন। তাই আশ্চর্য যে এত করার পরেও উৎপাদন বাড়ছেনা কেন? এই কেনর উত্তর একটাই দেওয়া যায়, যার মানে হচ্ছে শুধুই যে ভারত সরকার অন্যান্য সব কাজের মত এখানেও যা করছেন, তা ঐ লোক দেখাবার জন্য যতটা আসল কাজের জন্য ঠিক ততটা নয়।

এই সারের কথাটাই একটু উল্টে দেখা যাক না কেন, তাহলেই বুঝা যাবে আসল গলদ কোথায়। কলেজের অর্থনীতির ক্লাসে আমাদের মতই আজও ছেলেরা আলোচনা করে যে ভারত গরীব দেশ, এখানে সাধারণভাবে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ইউরোপ বা আমেরিকার মত দামী রাসায়নিক সারের কথা চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ সার ব্যবহার করা সম্ভব হলেও সাধারণভাবে ঐ সারের সাহায্যে ভারতের কৃষি উন্নতির আশা বর্তমানে একেবারেই নেই, অদূর ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে হয় না। তাই ভারতের জন্য অন্য প্রকার অল্প দামী, সহজলভ্য সারের কথাই চিন্তা করা উচিত। ভারতের কৃষি উন্নয়ন কার্যের প্রথম এবং প্রধান ব্যবস্থাই হওয়া চাই সার, আবার সেই সার হওয়া চাই অল্প দামী এবং সহজলভ্য। এই অল্প দামী এবং সহজলভ্য সারও ভারতে একটি আছে; প্রায় প্রচুর পরিমাণেই এবং প্রায় বিনা মূল্যেই আছে। সেটি হচ্ছে গোময় বা অন্যান্য গৃহপালিত পশুর বিষ্ঠা।

স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে, মানে অবিভক্ত ভারতে মোট গরু মোষের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে পনের কোটি—সমগ্র পৃথিবীর মোট সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী। ছাগল ভেড়া প্রভৃতি আরও কয়েক কোটি নিশ্চয়ই হবে। দেশ ভাগ হবার পর ভারত বা পাকিস্থানে ঠিক কত সংখ্যক গরু মোষ আছে তার সঠিক সংখ্যা আজ জানা না গেলেও, এটুকু খুব জোরের সাথেই বলা যায় যে ভারতের ভাগে অন্তত বার তের কোটি গরু মোষ পড়েছে। এখন যদি ধরে নেওয়া যায় যে গড়প্রতি একটা গরু বা মোষ বছরে মাত্র একটন গোময় দান করে, তাহলে কম করেও ভারতে প্রতি বৎসর বার তের কোটি টন গোময় সার পাওয়া যায়। এই অতি-প্রয়োজনীয় অল্প দামী বা বিনি পয়সার এবং সহজলভ্য সারটি বিশেষভাবে ব্যবহারের কোন ব্যবস্থাই ভারতের কৃষি পণ্ডিতেরা এপর্যন্ত করে উঠতে পারেন নি। এখনও ঐ মহামূল্য সম্পদটি জ্বালানি হিসাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে বা অবাধে নষ্ট করা হচ্ছে। এখনও যে শতকরা দশভাগ গোময় জমিতে সার দেবার কাজে ব্যবহার করা হয় না সে বিষয়ে সকলেই একমত হবেন।

স্বাধীনতার পর প্রথম প্রথম এই প্রশ্নটি নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করতেও শোনা গেছে; তবে জ্বালানির অভাব দূরীকরণের কোন সুব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়নি বলেই নাকি গোময়কে সাররূপে ব্যবহারের উপরও বিশেষ জোর দেওয়া সম্ভব হয়নি। বটেই ত, জ্বালানি না হলে রান্না হবে কিভাবে! কিন্তু দিনে দিনে কি রান্না হবে সেই প্রশ্নটাই যে বৃহত্তর আকার ধারণ করছে সে দিকে লক্ষ্য রাখবার প্রয়োজন কারুর নেই। কি দিয়ে রান্না হবে সেইটুকু ভাবলেই চলে যাচ্ছে! এসবও মোটেই ইয়াকি নয়, সব অতি সিরিয়াস পলিটিক্স। সহজলভ্য প্রাকৃতিক সার আরও অনেক রকমের সংগ্রহ করা সম্ভব, তার কিছুও সংগ্রহ করবার বিশেষ চেষ্টা হয়েছে বলে জানা যায়নি। সিন্ধ্রির কারখানা হয়েছে, সেটা দেখিয়ে দেশী বিদেশী অনেকের কাছ থেকেই সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছে, তবে আর চাই কি! সময় এবং সুযোগ মত আরও দু'একটা কারখানা বাড়াতে পারলেই, আরও অনেক সার্টিফিকেট আটকায় কে!

দেশের উন্নতিমূলক কাজ কারবারের প্রসঙ্গেই আবার ঐ ভারতীয় গরু, মোষের কথা উল্লেখ না করে উপায় নেই; কারণ ভারতের কৃষিই যে শুধু ভীষণভাবে এবং নানা কারণে ভারতীয় গরু মোষের উপর নির্ভরশীল,

তা মোটেই নয়। ভারতের বার তের কোটি গরু মোষ যে পরিমাণ দুধ দেয়, তাও নিতান্ত ফ্যালনা ব্যাপার নয়, কোন মতেই! কৃষিপ্রধান ভারতের জাতীয় আয়ে ঐ গরু মোষের দান কৃষি থেকে আয়ের পরেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। মোটকথা ১২।১৩ কোটি গরু মোষের গড়ে প্রতিটি যদি একশত টাকারও দুধ বৎসরে দিয়ে থাকে, তাহলে ভারতের ঐ বাবদ জাতীয় আয় বৎসরে ১২০০।১৩০০ কোটি টাকার কম নয়। কিন্তু ঐ বিরাট কামধেনুদের উন্নতিরই বা কি চেষ্টা হচ্ছে? সরকারী পর্যায়ে মাত্র কয়েকটি ডায়রী ফার্ম তৈরী করা ছাড়া ভারতের ঐ ১২।১৩ কোটি গরু মোষের উন্নতিবিধানের জন্য কি চেষ্টা হয়েছে তা আমার জানা নেই। অথচ দুধের দর ক্রমাগতই উর্ধ্বগামী হতে হতে প্রায় আকাশেই উঠে গেছে বলা চলে। আজ ভারতের দুধের বাজার বিদেশী পাউডার মিল্ক না থাকলে একেবারেই অচল। যে ভারতে এখনও পৃথিবীর অর্ধেক গরু মোষ বর্তমান রয়েছে, সেই ভারতের এই দুরবস্থাও কারুর কোনরকম লজ্জার উদ্রেক করে না, এটাই আশ্চর্য। অবশ্য লজ্জা বলে কোন জিনিস যে আজও ভারতে আছে সে কথাও বলা চলে না; তাই একান্ত নির্লজ্জভাবেই উন্নতির প্রচারকার্য চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আর সরকারের বাইরে যাঁরা গরু মোষ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, তাঁরাও যে ঐ সম্পদটির সত্যিকারের উন্নতির জন্যই বিশেষ ব্যগ্র, তাও মনে হয় না। গরু খাওয়া বন্ধ করে মুসলমানদের একটু জব্দ করতে পারলেই অনেকে খুব খুশী হন, তার বেশী কিছুই নয়। ভারতের মুসলমানেরা গরু খাওয়া বন্ধ করলেই ভারতীয় গরুর উন্নতি আপনা থেকেই চরমে পৌঁছে যাবে, ভাবটা অনেকটা এই ধরণের আর কি! তবে আসলে মোট ব্যাপারটা ঠিক গরুদের উন্নতির জন্য না হলেও গরুদের মতই যে হচ্ছে তাতেও কোন সন্দেহই নেই। একেও ইয়ার্কি বলা উচিত নয়; গরুরা আবার ইয়ার্কি করতে পারে নাকি!

পাকিস্থানে কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য লোক দেখাবার মতও কিছু করা হয়েছে বলে জানি না। দু' চারটে ছোটখাট খাল অবশ্যই এখানে ওখানে কাটা হচ্ছে, ক্ষেতে জল সরবরাহ করবার জন্যই; তবে ব্যাপারটা আসলে ঐ পর্যন্তই, একটুও বেশী নয়। জমির একর-প্রতি ফলনের বৃদ্ধির জন্য প্রায় কিছুই করা হয়নি, আর গরু মহিষের উন্নতির জন্য ত নয়ই। বরং আজকাল পাকিস্থানে যে হারে গরু খাওয়া শুরু হয়েছে, তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ঐ গরুর অভাবেই পাকিস্থানের কৃষিকাজের ভীষণ ক্ষতি হবে, এবং দুধের অভাবে

জাতীয় স্বাস্থ্য আরও ভেঙ্গে পড়বে। কৃষিকার্যের জন্য গরুর অভাব এখনই বেশ বোধ করা যাচ্ছে, আর বাজারে গরুর টাটকা দুধের চেয়ে বিদেশী পাউডার মিল্কই বেশী আমদানী হচ্ছে। অনেক মুসলমান বন্ধুকেও আজকাল হামেসাই বলতে শুনি যে, পাকিস্থান হয়ে আর কিছু না হোক গরু খাওয়ার স্বাধীনতা হয়েছে। গরু খাওয়া হচ্ছেও ঠিক স্বাধীনভাবেই। অবশ্য গরু খেলেই যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে এমন কথা আমার কোন দিনই মনে হয় নি। পৃথিবীর যে-সব দেশে গরুর উন্নতি আজ চরমে উঠেছে, তারা সবাই গরু খায়। পাকিস্থানের গরুর প্রশ্নটা তাই দাঁড়াচ্ছে এই রকম যে, গরুর উন্নতির কিছুমাত্র চেষ্টা না করে শুধু গরু খাবার চেষ্টা করলে যা হওয়া সম্ভব তাই। গরুর উন্নতির চেষ্টা না করে শুধুমাত্র খেতে থাক্‌লে যে শেষ পর্যন্ত গরুতেই পরিণত হতে হবে, সে চিন্তাটাও থাকা উচিৎ ছিল!

ব্যবসা ও বাণিজ্যের অবস্থা

ব্যবসা বাণিজ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অর্থকরী পেশাগুলির উন্নতি স্বাধীন ভারত বা পাকিস্থানে যা হয়েছে, তাও খুব গর্বের কথা নয়। ভারতে, দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য যে কিছুটা উন্নতি লাভ করেছে তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু ঐ উন্নতির মোট ফল যে অন্যান্য বিষয়ের উন্নতির খুব সহায়ক হয়েছে, এরকম মনে করবার কোন কারণও নেই। ব্যবসায়ী শ্রেণী বলে যারা পরিচিত ছিল, এখনও ব্যবসাগুলি প্রায় সবই তাদের হাতেই রয়েছে। নূতন লোকের এই লাইনে প্রবেশ লাভ করা ক্রমেই আরও দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ভারতে পুঁজিবাদী ব্যবসা চালু থাকলেও ব্যবসা বাণিজ্যের উপর দিন দিন ক্রমাগতই সরকারী তদারকি বেড়ে যাচ্ছে; কিন্তু তবুও ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের ধন বণ্টনের ফল যা হয়েছে তা খুব শোচনীয়ই বলা যেতে পারে। ধনীরা ক্রমেই মহাধনীতে পরিণত হয়েছে আর গরীবরা ক্রমেই ঘর ছেড়ে পথে নেমে আসতে বাধ্য হচ্ছে।

ব্যাঙ্কের ব্যবসা, তাদের আমানতের টাকার অঙ্ক বা সরকারী লভ্য ইনকাম-ট্যাক্সের পরিমাণ, যেগুলিকে সাধারণত দেশের ব্যবসা বাণিজ্য বা অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠি হিসাবে দেখা হয় সেই মাপকাঠিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে অবশ্য স্বীকার না করে উপায় নেই যে ভারতে এই দশ বৎসরে ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ কিছুই অগ্রগতি লাভ করেনি, বরং অধোমুখেই

এগিয়ে চলেছে। বহু ছোট খাট ব্যাঙ্ক ত লালবাতি জ্বেলে সহস্র সহস্র মধ্যবিত্ত পরিবারকে পথে বসিয়েই ছেড়েছে। তবুও যা দেখা যাচ্ছে তাতে মোটেই ভুল নেই যে ব্যবসা বাণিজ্য খানিকটা এগিয়েছে। তবে কিনা দেশে আজকাল প্রচুর ফাঁপা টাকার ছড়াছড়ি থাকায় যা হওয়া অতি স্বাভাবিক, সেই ফাঁপা ব্যবসাই প্রাধান্য লাভ করেছে। আর ইনকাম ট্যাক্স এবং ব্যাঙ্কের আমানতী টাকার অঙ্ক যে বিশেষ এগোচ্ছেনা, তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে, ব্যবসাটা প্রধানত চলছে ঐ কালোবাজারেই। কালোবাজারের লাভ ত আর ব্যাঙ্কে রাখা চলে না, ইনকাম ট্যাক্সের খাতায়ও দেখান চলেনা। স্বাধীন ভারতের ব্যবসাও তাই ভারতের স্বাধীনতার মতই চোরা পথেই এগোচ্ছে।

ভারতের ব্যবসার বাজারে একটি নূতন উপসর্গ দিন দিন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই উপসর্গটি হচ্ছে ব্যবসার বাজারে ভারত এবং প্রাদেশিক সরকারদের ক্রমাগত অনুপ্রবেশের চেষ্টা। সোজাসুজিভাবে কতকগুলো ব্যবসা ত সরকার দখল করে বসেছেনই এবং একচেটে ব্যবসা করবার সুযোগে স্বাধীনভাবে লোকসানের অঙ্ক ক্রমাগতই ফাঁপিয়ে তুলছেন। অন্যান্য কতক-গুলোতে সরকার পরোক্ষভাবে অনুপ্রবেশের চেষ্টায় আছেন; আর লাভটা যাতে ঠিক মত হয় সেই জন্য কালোবাজারী পন্থাসমূহ অবলম্বন করতেও সরকার কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করছেন না। সিমেণ্ট, চিনি, লৌহ-ইস্পাত প্রভৃতির ব্যবসাগুলোতে সরকারী কালোবাজারী অবদান প্রায় প্রকাশ্যই আর কি! প্রায় আর কি আইনের সাহায্যেই কালোবাজার চালান হচ্ছে, তাই সাধারণ ব্যবসায়ীদেরও আর বেশী দোষ দেবারও উপায় নেই;—তবে এ সবই হচ্ছে ঐ দেশের উন্নতির জন্যই! দেশটা ত আর মানুষের নয়, ঐ কালোবাজারীদেরই, উন্নতির চেষ্টাও হচ্ছে তাদেরই পন্থায়। তাই অন্ধকারের অগ্রগতির উপর দৃষ্টি স্থাপন করে বসে থাকা ছাড়া আর উপায়ই বা কি!

আর বহির্বাণিজ্যে বা অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে ভারতের অবস্থা শুধু হতাশাব্যঞ্জকই নয়, করুণা পাবারই যোগ্য। বিদেশে বিক্রয়যোগ্য ভারতীয় মাল আগেও যা ছিল এখনও প্রায় তাই রয়েছে। বিদেশ থেকে আমদানির ব্যাপারেও প্রায়ই পূর্ববৎ। স্বাধীন হবার আগেও ভারত প্রধানত চট, চা এবং অন্যান্য কাঁচামাল রপ্তানীকারী দেশ ছিল, আজও তাই রয়েছে। আর ভারতের আমদানি প্রধানত ছিল বিদেশে তৈরী শিল্প সামগ্রী। সামান্য কিছু যে অদল বদল হয়নি তা নয়, তবে যেটুকু হয়েছে তা এতই নগণ্য যে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

ভারত থেকে আজকাল কিছু কিছু মিলে তৈরী কাপড়, কড়াই, বালতি, ইলেক্‌ট্রিক বালব, ইলেট্রিক ফ্যান ইত্যাদি বাইরে চালান যাচ্ছে ঠিকই; তবুও ভারতকে একটা শিল্পোন্নত দেশ বলে অভিহিত করবার মত অবস্থা হতে আরও অনেক—অনেক যুগ দেরী আছে। তার উপর লড়াইতে জার্মানী এবং জাপানের শোচনীয় অবস্থার সুযোগ যা ভারত পেয়েছিল, সে সুযোগও আজ ক্রমেই কেটে যাচ্ছে। তাই ভারতের তৈরী শিল্প মালও বাইরের বাজারে চালু রাখা ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাইরের বাজারে ত আর সরকারী আইন সাহায্যে কালোবাজার চালাবার সুযোগ নেই! তাই ভারতীয় মালকে ক্রমেই কোনঠেসা হয়ে বেরিয়ে আসতে হচ্ছে। অথচ ভারতীয় শিল্পের তৈরী খরচা কমান বা তাদের উৎকর্ষতার মান বাড়াবার যে বিশেষ চেষ্টা হচ্ছে তাও মোটেই মনে হয় না। মোট কথা ভারত বাইরের বাজারে গত কয়েক বছর যে কিছু শিল্প-সামগ্রী রপ্তানী করেছিল তা ক্রমেই কমে আস্‌ছে এবং কমে আস্‌তে বাধ্য। অদূর ভবিষ্যতে ভারত যে এই বিষয়ে বিশেষ কিছু উন্নতি দেখাতে পারবে তার ভরসাও বিশেষ দেখা যায় না। ভারতকে আরও বহুদিন প্রধানত কাঁচা-মাল রপ্তানীকারী দেশ হিসাবেই তার অর্থনীতির কাঠামো সাজিয়ে নিতে হবে। কিন্তু কাঁচামালের উন্নতির চেষ্টাও যে বিশেষ হচ্ছে তাও বুঝবার মত নয়। শুধুমাত্র লৌহপ্রস্তর, মেঙ্গানীজ বা ঐ ধরণের আরও কয়েকটি খনিজ দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা হচ্ছে বলে কিছুটা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এই মহামূল্য খনিজ দ্রব্যগুলো আদতেই বেশী করে রপ্তানী করা উচিত কিনা সে বিষয়েই চিন্তা করবার প্রয়োজন রয়েছে খুবই বেশী।

আমদানি বাণিজ্যের তালিকাও ইংরেজ আমল থেকে খুব বেশী অদল বদল হয়েছে তাও নয়। মোটামুটি প্রায় তাই আছে,—তৈরী শিল্প-সামগ্রীই প্রধান। তবে ভারতে নূতন নূতন কলকারখানা গড়ে উঠছে, তাই সেই অনুপাতে যন্ত্রপাতির সংখ্যা বেশ কিছু বেড়েছে। খাদ্যশস্য আমদানি পুরো-মাত্রায়ই চলেছে। আর নূতনত্বের মধ্যে দেশ ভাগ হবার ফলে আজকাল প্রতিবৎসর বহু বহু কোটি টাকার কাঁচা পাটও পাকিস্থান থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। মাছ, তরি তরকারি এসব আগে কখনও বিদেশ থেকে আমদানি হ'ত না, আজকাল পাকিস্থান থেকে আস্‌ছে, এবং বহু টাকারই।

মোটকথা, ভারতের রপ্তানী বা আমদানি বাণিজ্যে এমন কিছু তারতম্য

হয়নি যা থেকে বলা যেতে পারে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গত দশ বৎসরে ভারত একটা ব্যবসায়ী দেশ হিসাবে অনেকটা এগিয়ে গেছে। আর মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের অঙ্কের কথাই যদি ধরা যায় তাহলে ত অবস্থা আরও কাহিল। গত দশ বছরে টাকার অঙ্কের দিক থেকে ভারতের বহির্বাণিজ্য কিছুমাত্র বাড়েনি উপরন্তু বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্য বরাবরই ভারতের বিপক্ষেই চলছে, মানে গণেশ উল্টোমুখী। মাত্র কয়েক দিন আগে (১৯৫৭ সালের প্রথম দিকে) ভারতের বহির্বাণিজ্য বিষয়ক যে সংখ্যাতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় গত বৎসরে রপ্তানী থেকে আমদানী বেশী হয়েছে প্রায় ১২২ কোটি টাকার। ফলে সব রকমেরই বিদেশী মালের আমদানি কড়াকড়ি করবার হুকুম জারী হয়েছে। বিগত আট বছরে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে এসেছে, তাই বুঝাবার জন্যও অল্প কয়েকদিন আগেই (১৯৫৭ সালে) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া থেকে এক সংখ্যাতত্ত্ব বের করা হয়েছে, যার শেষ কথাই হচ্ছে এই যে, গত আট বৎসরে ভারত বিদেশ থেকে মোট ৮০২ কোটি টাকার বেশী মাল কিনেছে, মানে মোট রপ্তানীর চেয়েও ৮০২ কোটি টাকার মাল বেশী কিনেছে এবং এই বাবদ ভারতকে তার বিদেশে গচ্ছিত তহবিল থেকে সাতশো কোটি টাকারও বেশী খরচা করতে হয়েছে। [বর্ত্তমানে (১৯৬১) ভারতের আর কারুর কাছে কিছুই পাওনা নেই, পৃথিবীর সবাই আজ ভারতের পাওনাদার।]

ভারতের বিদেশে গচ্ছিত টাকার মধ্যে ত ছিল এক ইংরেজের কাছে পাওনা পাউণ্ড স্টার্লিং। সে ত দেখা যাচ্ছে আট বছরেই শেষ হয়ে গেল, এরপর ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য কারবারটি চলবে কি উপায়ে? অথচ কয়েক বৎসর আগে যখন ইংরেজ তার পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের দর কমিয়ে দিয়েছিল, তখন ঐ পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের লেজুড়ে বাঁধা ভারতীয় টাকারও দর কমান হয়েছিল এই আশাতেই যে, তাহলে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য ফেঁপে উঠবে। বাণিজ্য যে কিরকম ফেঁপে উঠেছে সে ত অন্ধরা বাদে সবাই বেশ পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছে। এখন এই বেশি ফেঁপে উঠবার ফলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বহির্বাণিজ্য যখন ফেটে উঠবে, তখন কি অবস্থা হবে?

বাইরে থেকে আমদানি কমিয়ে দেয়া ভিন্ন আজ আর কোন উপায়ই নেই, করাও হয়েছে তাই। কিন্তু সব আমদানি কমিয়েই বা দেশের উন্নতি-মূলক কাজগুলি এগোবে কি ভাবে? আমদানি বন্ধের নোটিশে প্রথমেই ত

দেখতে পেলাম, সিমেণ্ট আর আস্‌বে না। বোধহয় সিমেণ্টের আর প্রয়োজন নেই, এখন বিনা সিমেণ্টেই অনেক কিছু গড়ে তোলা যাবে। আজকাল বাইরে থেকে যে সব জিনিস আমদানি করা হয় তার কোনটিই প্রায় অপ্রয়োজনীয় নয়। তাই আমদানি কমান মানেই উন্নতির কাজের অগ্রগতি বন্ধ। আজ আট বছরের বাণিজ্যের ফলেই দেশের এই অবস্থা এসে গেছে। বাইরে থেকে এখনও যে বিরাট পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করা হচ্ছে, দেশের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলে শুধু ঐ জিনিসটিরই আমদানি বন্ধ করে অন্য সব প্রয়োজনীয় জিনিস আনবার কাজে লাগান যায়; এবং চেষ্টা করলে হয়ত দেশে যথেষ্ট খাদ্যশস্য ফলান একেবারে অসম্ভবও নয়। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে ততদিন খাদ্যশস্য আমদানি সব চেয়ে প্রয়োজনীয় আমদানি হিসাবেই থাক্‌বে, এবং রয়েছেও তাই।

এইভাবেই ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আমদানি-রপ্তানি সব হু হু করে এগিয়ে যাচ্ছে, অন্ততপক্ষে প্রচারকার্যটি ঐ ধরণেরই হচ্ছে; তাই শুধু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয়, কোন্ দিকে এগোচ্ছে? ব্যাপারটা সবাই দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু দেখেও ঠিক বুঝতে পারছে না। ব্যাপার কি! এই না বুঝবার একটা কারণও আছে, যা হচ্ছে কিনা ঐ বেসরকারী বাজারে পাকিস্থানের টাকার মূল্যের চেয়ে ভারতীয় টাকার মূল্য অনেকটাই বেশি। ১৯৪৯ সালে পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের দরের সাথে ভারত তার টাকার দর কমালেও পাকিস্থান কমায়নি। ১৯৫৬ সালে আবার পাকিস্থানও তার টাকার দর কমিয়ে দিয়েছে। পাকিস্থানের টাকার চেয়ে ভারতের টাকার দর যখন বেশি, তখন আর কথা কি, নিশ্চয়ই সব ঠিক আছে। আর পাকিস্থানও যখন টাকার দর কমাতে বাধ্য হয়েছে, তাহলে ত প্রমাণ হয়েই গেছে যে আগেই টাকার দর কমিয়ে ভারত বুদ্ধিমানেরই কাজ করেছিল। পাকিস্থানের মানদণ্ডে নিজেদের উন্নতির যাচাই করে আত্মপ্রসাদ লাভ করার মনস্তাত্ত্বিক দৌর্বল্য থাকা ভারতীয়দের পক্ষে হয়ত অস্বাভাবিক নয়। নেপাল, ভূটান বা তিব্বতের সাথেও যদি ভারতের রেষারেষি থাকৃত, তাহলে হয়ত তারা নেপাল, ভুটান বা তিব্বতের চেয়ে বেশি অগ্রসর বলেও মনে মনে গর্ব অনুভব করত। কিন্তু সত্যই কি আজ পাকিস্থানই ভারতের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী নাকি?

জানি না পাকিস্থানই ভারতের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কি না। তবে ভারত এবং পাকিস্থান উভয়েই যে প্রধানত কাঁচামাল রপ্তানীকারী দেশ, সেটা কারুরই

অজানা নয়। তাই পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের দরের সাথে টাকার দর না কমালেও ভারতের কাঁচা মালগুলি পৃথিবীর বাজারে একেবারেই চাহিদাবিহীন হয়ে যেত না; উপরন্তু বাইরে থেকে আমদানি মালগুলোতে, ভারত তার টাকার দর কমাবার ফলে যে বেশি দর দিতে হোল সেটাও বেঁচে যেত। সামান্য কিছু তৈরী শিল্প-সামগ্রী যা ভারত বাইরে বিক্রী করে, টাকার দর না কমালে তার হয়ত কিছুটা অসুবিধা হ'ত ঠিকই। কিন্তু তৈরী করবার খরচা না কমিয়ে শুধুমাত্র টাকার দর কমিয়েই যে মাল বাইরে চালু করা যায় না বা বেশিদিন চালু রাখা সম্ভব নয়, সে বিষয়েও আজ সকলেই একমত। আবার মুদ্রামূল্য কমাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে এত ফালতু টাকা বাজারে ছাড়া হয়েছে যে মুদ্রামূল্য কমাবার সুবিধা ফালতু টাকার কল্যাণে ডবল অসুবিধাতেই পরিণত হয়েছে।

এই সব বিরাট বিরাট পলিসির পলিসিতেই ভারতের বহির্বাণিজ্যের গণেশ ক্রমাগতই উল্টোমুখে চলেছেন, সোজা হবার কোন সম্ভাবনাও নেই। উল্টো-মুখেই বা কতদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন তাও বলা কঠিন, হঠাৎ একদিন বসে না পড়েন! এর উপর ভারতের রাজনীতিও তার বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে কম অসুবিধার কারণ সৃষ্টি করেনি। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি যতদিন পর্যন্ত এই রকম উদ্দেশ্যবিহীন এবং স্ববিরোধী কাজ কারবারে ব্যস্ত থাকবে, ভারতের বাণিজ্যও ততদিন খুব এগোবার সুযোগ পাবে না। এসবই কিন্তু ভারতে করা হচ্ছে খুব সিরিয়াসলি, এবং চিন্তার কারণও তাই।

পাকিস্থানের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ভারতের থেকে আরও শোচনীয়। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও পাকিস্থানের অধোগতি খুবই পরিষ্কার। নূতন পরিবর্তনের মধ্যে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তা শুধুই হিন্দুদের হাত থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য মুসলমানদের হাতে যাওয়ার মধ্যেই। তবে পূর্ব বঙ্গের বৃহৎ পাটের ব্যবসা এখনও মাড়োয়ারীদের হাতেই রয়েছে। (তবে ইদানীং ঐ ব্যবসাটিরও অনেকটাই মাড়োয়ারীদের হাত থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা হয়েছে।) আর কালোবাজার এখানেও প্রায় ভারতেরই মত প্রকাশ্য। যদিও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এখানে সরকার এখনও অনুপ্রবেশের চেষ্টা বিশেষ করেন নি। পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে যাতায়াত ব্যাপারের কিছুই উন্নতি না হবার ফলে এই দুই অংশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন এতই কঠিন ব্যাপার যে বিশেষ কিছুই উন্নতি হওয়া সম্ভব হয়নি। অনেক সময়েই দেখা যায় যে কোন কোন জিনিষ পূর্ব-

বাংলায় খুবই সস্তা, অথচ পশ্চিম পাকিস্থানে অতি দুর্মূল্য, এবং কোন কোন জিনিষ পশ্চিম পাকিস্থানে বিক্রীর বাজার না থাকলেও পূর্ববঙ্গে অগ্নিমূল্যই চলছে। এমন কি সোনার দর পর্যন্ত দুই পাকিস্থানে দুই রকমের রয়েছে দেখা যায়!

বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারেও পাকিস্থানের অবস্থা মোটেই সুবিধার নয়। মোট বাণিজ্যের পরিমাণ গত দশ বছরে বিশেষ কিছুই এগোয়নি। আর বাণিজ্যের ভারসাম্যও প্রায়ই ভারতের মতই পাকিস্থানের প্রতিকূলেই থাকছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে অতি প্রয়োজনীয় জিনিষগুলোও কেনা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে পাকিস্থানী রাজনীতি, এক ভারতের সাথে বাদে বাণিজ্যের কিছু প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে বলে জানিনা। পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের দরের সঙ্গে টাকার দর না কমিয়ে পাকিস্থান যে বিশেষ লাভের কারবারই করেছিল, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। বর্তমানে পাকিস্থান আবার টাকার মূল্য কেন যে কমিয়েছে, বুঝা কঠিন। বোধ হয় পাকিস্থান বুঝতে পেরেছে যে শেষ পর্যন্ত ভারতের উপরই তার বাণিজ্য অনেকখানি নির্ভর করে, তাই। কিন্তু মুদ্রামূল্য কমালেও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির অনুকূল অন্যান্য অবস্থাগুলির সৃষ্টির কিছুই চেষ্টা করা হয়নি। সত্যিই পাকিস্থানকে আরও বহুদিন পর্যন্ত ভারতের উপরই বাণিজ্যের জন্য নির্ভর করতে হবে। এ কথাটা পাকিস্থান যত তাড়াতাড়ি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে ততই মঙ্গল। তবে পাকিস্থানী হিন্দুরা তাঁদের টাকা নিজেদের দেশে লগ্নী করবার মত আস্থা ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত পাকি-স্থানের আর্থিক বা বাণিজ্যিক উন্নতির আশা সুদূর পরাহতই থাকবে, সেটা আরও সত্যি কথা।

শিল্প স্থাপন

দেশ স্বাধীন হলে দেশকে শিল্পে উন্নত করতে হবে, জমির উপর চাপ কমাতে হবে, তা নাহলে ভারতের অর্থনীতির বুনিয়াদ কখনই ভালভাবে গড়ে উঠবে না। এসব কথা এত সাধারণ এবং এত বেশী বলা হয়েছে যে কারও কিছুমাত্র সন্দেহ থাকা সম্ভব নয় যে শিল্পোন্নতির কথাটা ভারত এবং পাকিস্থানেরও নূতন রাষ্ট্রনায়কেরা তাঁদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হিসাবেই গ্রহণ করেন নি। শিল্পোন্নতির চেষ্টা দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়েছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এবং গত দশ বৎসরে দেশে যে নূতন নূতন

শিল্প গড়ে ওঠেনি তাও নয় ;—ভারত এবং পাকিস্থানেও গত দশ বৎসরে অনেকগুলি নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তবুও একথাও নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে, যতটা আশা করা গিয়েছিল সে অনুপাতে শিল্পোন্নতি মোটেই সম্ভব হয়নি। বুনিয়াদী শিল্পগুলি, যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে অন্যান্য শিল্প, সেগুলির প্রসার ত হয়েছে আরও কম। এবং ঐ লক্ষ কোটি টাকার অতি শক্তিশালী প্রচারকার্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে অতি পরিষ্কারভাবেই বলা যায় যে, এই অবস্থার জন্যও দায়ী ঐ সরকারী নেতারাই। রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পেতেই যাদের মাথায় ঢুকেছে যে, সব কিছুই নিজেদের তাঁবে রাখতে হবে, তারাই হচ্ছে দায়ী।

ভারতের আজ যে কোন একটা সুস্থ শিল্প-পরিকল্পনা আছে তা ত মনেই হয় না। অতি সাধারণ গোঁজামিল হিসাবে এখানে ওখানে কতকগুলি কল কারখানা তৈরি করে সাধারণকে ভাঁওতা দেওয়াই যেন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কখন শোনা যাচ্ছে বৃহৎ বৃহৎ শিল্প গড়ে তুলবার কাজ আগে আরম্ভ করতে হবে, তা না হলে শিল্পের উন্নতি ঠিক পথে করা সম্ভব হবে না। আবার পর মুহূর্তেই হিসাব কষে দেখান হচ্ছে, বৃহৎ শিল্পের চেয়ে কুটিরশিল্পে নিয়োজিত মূলধনের টাকাপ্রতি বেশী শ্রমিক নিয়োগ করা সম্ভব, অতএব বৃহৎ শিল্পের চেয়ে কুটিরশিল্পই আজ ভারতে বেশী প্রয়োজনীয়। কখনও বিদেশী মূলধনকে ভারতের শিল্প উন্নয়নের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য ঘোষণা করে সাদর আমন্ত্রণ জানান হচ্ছে। তারপরই, এই আমন্ত্রণের মিষ্টি কথাগুলি বিদেশী পুঁজিপতিদের কাণে পৌছবার আগেই হয়ত আবার হুঙ্কার ছেড়ে বলা হচ্ছে যে, বিদেশী মূলধন এসে ভারতের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করবে তা ভারত কখনই বরদাস্ত করবে না। মোটকথা ভারতের শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রধান এবং অপরিহার্য প্রশ্নগুলির কথা চিন্তা করে কোন কাজই হচ্ছে না।

ভারতের শিল্প উন্নয়নের প্রথম এবং এক নম্বর প্রতিবন্ধকই হচ্ছে উপযুক্ত পরিমাণে মূলধনের অভাব। বাইরে থেকে পুঁজি না এলে ভারতের শিল্প উন্নয়নের গতি দ্রুত হওয়া একান্তই অসম্ভব। তাই ভারতের শিল্প পরিকল্পনার সাফল্যের মাপকাঠিও হওয়া উচিত ঐ বাইরে থেকে সংগৃহীত মূলধনের পরিমাণের উপরই। এ পর্যন্ত বিদেশী মূলধন যা ভারতে এসেছে, তা নেহাৎ নগণ্য ভিন্ন আর কিছুই নয়। কেন বিদেশী মূলধন উপযুক্ত পরিমাণে ভারতে আসছে না, এই প্রশ্নটি যদি আলোচনা করা যায়, তহলে প্রথমেই মনে হবে ভারতীয়

রাজনীতির অস্থিরচিত্ততার কথা। ভারতীয় রাজনীতির ফাঁপা প্রেস্টিজের ফাঁপা বুলির কথা। দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতীয় রাজনীতি আজ অনেক কিছুই করতে চায়, কিন্তু ঠিক কি যে চায় সেটা বোধ হয় আজও বুঝে উঠতে পারে নি।

ভারতীয় গঠনতন্ত্রে একটা ধারা ছিল যে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দিয়ে সরকার কারও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না। গঠনতন্ত্র পাশ হবার বছর দুয়েক যেতে না যেতেই ঐ ধারাটিকে বদলিয়ে করা হোল যে, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ মানেই হচ্ছে সরকারের ইচ্ছানুযায়ী ক্ষতিপূরণ। এর পরও যদি বিদেশী মূলধন ভারতে আসতে ভয় পায়, তাহলে বিদেশীদের দোষ দেওয়া চলে না কোন মতেই। সরকারী পরিচালনায় গঠিত শিল্পে মূলধন লগ্নী করা আমেরিকা পছন্দ করে না, অথচ ভারত সরকার অনেকগুলো মূল শিল্পকে তাঁদের একচেটে অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করে বসে রয়েছেন, প্রায় নির্বিকার ভাবেই আর কি! তারপর ভারতের রাজনীতি আজকাল যত উচ্চ মার্গ আশ্রয় করে বসে রয়েছে, তা দেখেও নিশ্চয়ই বিদেশী অনেকেরই চোখ প্রায় ছানাবড়া। বিদেশী পুঁজি এগোবে কোন্ সাহসে!

শুধু যে বিদেশী মূলধনের ভারতে আগমনের পথেই কাঁটা দিয়ে রাখা হয়েছে, তাও নয়। দেশের ভেতরও যে সামান্য কিছু মূলধন আছে, তাও ঠিকভাবে কাজে লাগাবার কোন চেষ্টাই হয়নি। ভারতীয় মূলধনের একটা বিরাট অংশ আজও ঐ কালোবাজারের অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে, তাকেও অন্ধকার থেকে আলোতে আনবার কোন চেষ্টাই হচ্ছে না। সামান্য যেটুকু পুঁজি আজও প্রকাশ্য বাজারে রয়েছে, সেটুকুকেও শিল্প বিস্তারের কাজে খুব যে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, তাও বলা চলে না। তাদেরও সরকারী কণ্ট্রোল, পারমিট আর প্ল্যানিংয়ের খবরদারীতে ক্রমেই কোনঠেসা করবার চেষ্টা হচ্ছে।

বহুকাল আগে, স্বাধীনতার প্রথম আমলে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী যখন শিল্প-বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন, আর শিল্প-বিভাগের কর্তা ছিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীজ্ঞান ঘোষ, তখনই ভারতে নূতন নূতন লৌহ-ইস্পাত তৈরীর কারখানা খুলবার প্ল্যান হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘসূত্রী সরকারী ব্যবস্থার, নানা রকম মিশন কমিশন, এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট পাঠ করতেই এতকাল কেটে গেছে; তাই আজও নূতন একটিও লৌহ-ইস্পাতের কারখানা চালু করা সম্ভব হয়নি। শেষপর্যন্ত অবশ্য, সর্ববিদ্যা শেষ হবার পর, সহজ সরল পন্থাটির সাহায্যই নেয়া

হয়েছে যার ফলে তিনটি বিদেশী লৌহ-ইস্পাত কোম্পানীর সহযোগিতায় তিনটি কারখানা তৈরীর কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয়েছে। আশা করা যায় একদিন কাজ শেষও হবে। (ঐ ইস্পাত কারখানাগুলোর কাজ শেষ না হলেও অনেকটাই এগিয়েছে। তিনটিতেই আংশিকভাবে কাজও আরম্ভ হয়েছে।) তবে ইতিমধ্যে বাইরে থেকে যে পরিমাণ লৌহ ইস্পাত কেনা প্রয়োজন হবে, সেটি সংগ্রহ করার উপরেই ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করছে। ভারতের লৌহ আকর সবচেয়ে ভাল এবং পাওয়াও যায় অতি প্রচুর পরিমাণেই, কয়লারও অভাব নেই, মেঙ্গানীজ প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় খনিজগুলিও এখানে অফুরন্ত ; যার ফলে ভারতে ইস্পাত তৈরীর খরচা পৃথিবার অন্য যে কোন দেশের চেয়ে অনেক কম। যদি স্বাধীনতার দশ বৎসরে দশটি ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব হ'ত, তাহলে আজ ভারত শুধুমাত্র ঐ ইস্পাতের উপর নির্ভর করেই তার অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারত এবং ইস্পাতের মত সুদৃঢ় ভাবেই। অথচ স্বাধীনতার দশ বৎসরে একটিও নূতন লৌহ-ইস্পাতের কারখানা চালু করা গেল না, এর চেয়ে অপদার্থতা আর যে কি হতে পারে, জানি না।

সিমেণ্টের মত অতি-প্রয়োজনীয় মূল শিল্পটির গত দশ বৎসরে যেটুকু উন্নতি হয়েছে তাতেও গর্ব করবার কিছুই নেই। পরিকল্পনার সব কাজ আরম্ভ করতেই সিমেণ্ট প্রয়োজন, অথচ চাহিদার তুলনায় সিমেণ্ট দেশে অর্ধেকও তৈরী হচ্ছে না। সিমেণ্ট প্রস্তুতের মূল উপাদান চুণা পাথর ভারতে প্রায় অফুরন্তই আছে, কয়লারও অভাব নেই, এবং সিমেণ্ট তৈরীর কাজটিও একটা ভীষণ কিছু কঠিন ব্যাপারও নয় ; তবুও প্রয়োজনমত সিমেণ্ট তৈরীর কিছুই করা হচ্ছে না। এসব বিষয়ে সরকারের খুব যে নজর আছে তাও মনে হয় না। একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কথা আমার জানা আছে, তারা নাকি আজ এক বছর চেষ্টা করবার পরও আসামের রাজধানী শিলং শহরের কাছে একটি সিমেণ্টের কারখানা খুলবার জন্য জমি সংগ্রহ করতে পারছেন না। নানারকম আইনের গণ্ডগোলই নাকি এই না পারার কারণ (শেষ পর্যন্ত তাঁরা ঐ কারখানা খুলবার চেষ্টা আর করছেন না, হয়রান হয়ে চেষ্টা শেষ করেছেন)। এর পরও যদি স্বীকার করতে হয় যে ভারতের কোন সুস্থ শিল্প পরিকল্পনা আছে, তবে অনেকেই আমাকে পাগল কিংবা ভাড়াটিয়া প্রচারকারী ভিন্ন আর কি বলতে পারেন তাও জানি না। পৃথিবীর অন্য সব দেশে লৌহ-কারখানার

ফালতু 'স্লাগ' বস্তুটি ব্যবহার করে অতি সস্তায় এক ধরণের সিমেণ্ট প্রস্তুত করা হয়; কিন্তু ভারতের দুটি (বর্তমানে পাঁচটি) বিরাট লৌহ কারখানার ঐ 'স্লাগ' বস্তুটি এখনও ফেলেই দেয়া হয়,—শুধু তাই নয় পয়সা খরচ করেই সরিয়ে ফেলতে হয়।

অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদের তৈরীর ব্যাপারটি সরকারী একচেটে অধিকারে রাখলেও এ পর্যন্ত ওগুলোরও তৈরীর ব্যবস্থা মোটেই বেশীদূর এগোয় নি। সাধারণের ব্যবহারযোগ্য বন্দুক, রাইফেল সরকারী কারখানা থেকে তৈরী হয়ে বাজারে বিক্রয় হবে, এরকম ঘোষণা অনেককাল আগেই করা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু এ পর্যন্ত বাজারে বন্দুক রাইফেল যা বিক্রী হচ্ছে, তা প্রায় সবই বিদেশী। আর গোলাবারুদের (explosive) জন্যও এ পর্যন্ত কোন কারখানা খোলা হয়েছে জানা যায় না। [ইদানীং শিল্পকার্য্যে ব্যবহার যোগ্য বিস্ফোরকের (industrial explosive) একটি কারখানা চালু হয়েছে।] এমন কি, ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগের ব্যবহারের জন্য বিস্ফোরক দ্রব্যগুলোও এখনও ভারতে তৈরী করবার কোন ব্যবস্থাই হয়নি। এইভাবেই ভারত শিল্পোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোও যে দেশে এখনও ঠিকমত তৈরী হচ্ছে না, তার কারণও ঐ সরকারী গাফিলতি বা অতিচালাকি ভিন্ন আর কিছুই নয়। বিদেশে বহু টাকার সামরিক মালপত্র অর্ডার দেওয়াই হচ্ছে, রাজনীতিক্ষেত্রে বিদেশী সমর্থন লাভের ভারতীয় সহজ পন্থা। ভারত নানা ব্যাপারে এত সব সহজিয়া লাইন আবিষ্কার করে বসে আছে যে, কোন দিক থেকেই আর তাকে সিরিয়াস বলে ভাবা চলে না।

দেশের আমদানি পলিসি সব সময়েই দেশের শিল্প প্রসারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সেদিক থেকেও ভারতের পলিসি যে খুব সহায়ক হয়েছে তাও বলা চলে না। মোটর গাড়ী, রেডিও ইত্যাদি কতকগুলো জিনিসের আমদানি আয়ত্তে রেখে সরকার অবশ্য কিছু কিছু অংশ জোড়া দেবার কারখানা চালু করতে সাহায্য করেছেন ঠিকই; কিন্তু পুরো জিনিসটি ভারতে তৈরী করবার ব্যবস্থা এখনও সম্ভব হয় নি। আবার ঔষধপত্র এবং রাসায়নিক প্রভৃতি কতকগুলো জিনিসের আমদানি আয়ত্তে রেখে দেশে শুধুমাত্র বোতল বোঝাই করবার ব্যবসা ফাঁপিয়ে তুলেছেন। আমদানির উপর কণ্ট্রোল রেখে ভারত সরকার শিল্প উন্নয়নের যেটুকু সাহায্য করেছেন, তা শুধু নগণ্যই নয়, একান্ত অব্যবস্থাও বটে। রপ্তানির তুলনায় আমদানি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে,—

সেইজন্যই আমদানি কণ্ট্রোল করা হচ্ছে, শিল্প উন্নয়নের সাহায্যের জন্য বোধ হয় মোটেই নয়। কারণ কোন বৎসর রপ্তানী যখনই একটু বেড়ে গেছে তখনই বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় যে কোন জিনিসই আমদানি করতে দেয়া হয়েছে। যে সব জিনিস দেশে যথেষ্ট পরিমাণে এবং উৎকৃষ্টও প্রস্তুত হচ্ছে, সেগুলোও বাইরে থেকে আমদানি করতে কোন বাধা দেওয়া হয়নি। এমন কি সাবান, তরল আলতা, স্নো, পাউডার, মাথার ক্লিপ, কাঁটা, ইত্যাদি অতি অপ্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্যগুলোও প্রচুর পরিমাণে আমদানি করা হয়েছে।

ভারত সরকারের শ্রমিক নীতি এবং ভারতের শ্রমিক আন্দোলন, দুইই ভারতের শিল্প উন্নয়নের পক্ষে বিশেষ পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত সরকার গত দশ বৎসরে শ্রমিকদের কাজের সময় কমিয়ে, ছুটি বাড়িয়ে এবং আর্থিক ও অন্যান্য লাভে সাহায্য করে যে সব নূতন নূতন আইন প্রণয়ন করেছেন, সেগুলোকে খারাপ বলা চলে না ঠিকই; কিন্তু এই অভাগা দেশে ঐ ভাল কাজগুলোরও ফল ভাল হয়নি, বরং উল্টোই হয়েছে। তবে হয়েছে এই জন্যই যে ভারতীয় নেতৃত্ব দায়সারাভাবে কতকগুলো ভাল কাজ করলেও সত্যিকারের পথে শ্রমিকদের পরিচালিত করবার কোন চেষ্টাই করেন নি। ভারতীয় শ্রমিকদের মানুষ হিসাবে তৈরী করবার কোন চেষ্টাই এ পর্যন্ত হয় নি। আর শ্রমিকদের ইউনিয়ন আন্দোলন বলে দেশে যে কাজটি চলছে সেটি আর যাই হোক না কেন, ভারতীয় শিল্পের উন্নতির সহায়ক যে নয়, তা খুব পরিষ্কারভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছে। কাজ করবার কোন প্রয়োজন নেই, ভাল করে ত নয়ই, শুধুমাত্র দল পাকিয়ে হল্লা করতে পারলেই বেশী হপ্তা আদায় করা যাবে—এই যে একটা ধারণা আজ ভারতীয় শ্রমিকদের মাথায় ঢুকেছে, এটি একেবারেই সর্বনাশকর। ভারতীয় শ্রমিক ইউনিয়নগুলোতে, বিশেষ করে কম্যুনিস্টদের পরিচালিত ইউনিয়নগুলিতে, কাজ ফাঁকি দেবার বিজ্ঞানসম্মত পন্থাগুলির কার্যকারিতা সম্বন্ধে যে রকম পরীক্ষা কার্য চলছে, তাতে ভারতীয় শিল্পের উন্নতির শেষ যে কোথায় সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তার কারণ হওয়াই উচিত। ভারত সরকার যে এ বিষয়ে কিছুই জানেন না, তাও নয়; তবে অত হাঙ্গামা করে কে! বিশ্ব-প্রেম আর বিশ্ব-শান্তির বড় বড় বক্তৃতা করলেই যখন সব সমস্যার সমাধান হয়, তখন সেই বক্তৃতার পন্থায়ই তাঁরা চলেছেন। এ সবের উপরও ইনকাম ট্যাক্সের উৎপাত যে ভারতের শিল্পের অগ্রগতিতে কি ভীষণ বাধা সৃষ্টি করেছে, তাও আর বলার নয়। তবে ইনকাম

ট্যাক্সের বিষয় বেশী বলারও উপায় নেই,—ভারত হচ্ছে কিনা একটা 'ওয়েলফয়ার স্টেট', তাই ঐ ট্যাক্স বাদ দিলে খাবে কি ?

গান্ধী আদর্শের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর একটা বড় কথাই হচ্ছে, অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ; এবং এই জন্যই মহাত্মা গান্ধী আগাগোড়াই বৃহৎ বৃহৎ শিল্পের চেয়ে গ্রামে গ্রামে কুটিরশিল্প গড়ে তোলার উপরই জোর দিয়েছিলেন অনেক বেশী। গান্ধীজীর পুত্ররা আজ ভারতে ক্ষমতায় আসীন, তাই কুটিরশিল্পের প্রসারের চেষ্টা ভারতে খুবই হচ্ছে আশা করা যায়। খুব না হলেও খানিকটা যে হচ্ছে তাতে কোন ভুল নেই। আর ভুল নেই এ বিষয়ে যে, সে কাজটিও করা হচ্ছে অতি দায়সারাভাবেই এবং আরম্ভও করা হয়েছে ঠিক ভুল পথেই। ভুল পথ বলা হচ্ছে এই জন্যই যে, যে কাজগুলি কুটিরশিল্প হিসাবে করলেই ভাল লাভের কাজ হয় সেগুলো কুটিরে রাখবার বা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা না করে, যে কাজগুলো বৃহৎ শিল্প হিসাবে করলেই বেশী লাভ হয় তারই কিছু কিছু কুটিরশিল্প হিসাবে চালাবার চেষ্টাই হচ্ছে বেশী। ধানভাঙ্গা, গমভাঙ্গা, তেল পেষাই, আখ মাড়াই প্রভৃতি কাজগুলো স্বাধীন ভারতে কুটিরের ঢেঁকি, জাতা, ঘানি ছেড়ে ক্রমেই শহরের মিলে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। আর কাপড়, যা কিনা বৃহৎভাবে বড় মিলে তৈরী হলেই বেশ ভাল এবং সস্তা হয়, তাকে গ্রামের তাঁতে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা হচ্ছে নানা উপায়েই। এমনকি মাঝে মাঝে মিলের উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েই। হাঁঃ, আপাতত কুটিরশিল্পের প্রসারের জন্য অনেক কোটি টাকা ত খরচ করা যাচ্ছে! পরে কি হবে সে পরের কথা। কপালে থাক্‌লে টিক্‌বে, না হয় উঠে যাবে!

শিল্পের ব্যাপারে উন্নয়ন কর্মটি খুব বেশী না হলেও পাকিস্থানেও খানিকটা হয়েছে। ভারতের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে হয়ত এ ব্যাপারেও পাকিস্থান পেছনে পড়ে রয়েছে। তাহলেও স্বীকার করলে ভুল হবে না যে অন্তত এই একটি ব্যাপারে পাকিস্থানও খানিকটা এগিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন এখানেও সেই একই, যতটা হওয়া উচিত ছিল তার কিছুই হয়নি। এই না-হওয়ার ব্যাপারে পাকিস্থানের কতকগুলি বিশেষ অজুহাত অবশ্যই আছে, তাহলেও পাকিস্থানের দুর্বল নেতৃত্বই এই না-হওয়ারও প্রধান কারণ তাতেও কোন ভুল নেই।

ভারতের মত পাকিস্থান সরকার অবশ্য কোন দিনই বিশেষ বিশেষ শ্রেণী-

ভুক্ত শিল্পগুলি তাঁদের খাসদখলে রাখবার চেষ্টা করেননি; কন্ট্রোল এবং প্ল্যানিংয়ের নাম করেও সব কিছুকেই তাঁদের তাঁবে রাখবার চেষ্টাও করেন নি। বরং সামান্য পুঁজি যা দেশে আছে, তাকে ঠিকভাবে শিল্প উন্নয়নের কাজে লাগাবার চেষ্টাই করছেন। সরকার থেকে নূতন নূতন শিল্প গড়ে তুলে সাধারণের কাছে বিক্রী করে দেবার যে পলিসি পাকিস্থানে নেওয়া হয়েছে তা পাকিস্থানের শিল্প উন্নয়নের পক্ষে বিশেষ সাহায্যই করেছে। এই উদ্দেশ্যে সুরকার 'পাকিস্থান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভালাপ্মেণ্ট করপোরেশন' নামে একটি সংস্থাও স্থাপন করেছেন। এই সব কারণেই অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও পাকিস্থানে শিল্প উন্নতি খানিকটা সম্ভব হয়েছে। পাকিস্থানের রাজনীতিও ঐ এক পূর্ববাংলার হিন্দুদের আস্থা ফিরিয়ে আনা বাদে অন্য কোন ব্যাপারে দেশের শিল্প প্রসারের প্রতিবন্ধকও সৃষ্টি করেনি। পাকিস্থানেও শিল্প প্রসারের আসল সমস্যা হচ্ছে প্রধানত মূলধনেরই সমস্যা। বাইরে থেকে পুঁজি পাকিস্থানেও বিশেষ আসেনি, সম্ভবত ভারতে যা এসেছে পাকিস্থানে তার চেয়েও অনেক কম এসেছে। তাহলেও এটুকুও ঠিক যে পাকিস্থান ইচ্ছে করে কোন প্রতিবন্ধকও সৃষ্টি করে রাখেনি। অন্তত পুঁজি লগ্নীর ব্যাপারে ইনকাম ট্যাক্সের উৎপাত পাকিস্থানে ভারতের চেয়ে অনেকটাই কম,—এদিক থেকেও পাকিস্থানের শিল্প উন্নতির অনেকটা সাহায্য হয়েছে।

বহু রকমের কাঁচা মালের স্বচ্ছলতা না থাকায় পাকিস্থানে বড় বড় অনেক শিল্প গড়ে ওঠাই হয়ত সম্ভব হবে না। তাই যে-সব শিল্পের কাঁচামালের অভাব নেই, অন্তত সেগুলি সব ঠিকমতনই গড়ে উঠছে বা যথেষ্ট পরিমাণে কাজ আরম্ভ হয়েছে দেখতে পেলেও অনেকটা সান্ত্বনা থাকত, কিন্তু আশানুরূপ কিছুই হয়নি। আর কুটিরশিল্পের উন্নতির অবস্থাও প্রায় ঐ ভারতেরই মত। কিছু কিছু নূতন কুটিরশিল্প গড়ে উঠেছে ঠিকই, আরও কিছু কিছু কাজ আরম্ভও হয়েছে দেখতে পাই। তবে এ চেষ্টাও ঐ ভারতেরই মত উল্টোদিক থেকেই আরম্ভ হয়েছে। একদিকে চালকল, আটা কল, তেল পেষণের জন্য কলের ঘানি হামেশাই বেড়ে যাচ্ছে, আর অন্যদিকে কাপড় এবং অন্যান্য কিছু কিছু জিনিস, যা বড় মিলে তৈরী হলে ভাল এবং সস্তায় হয়, সেগুলো গ্রামের তাঁতে তৈরী করবার চেষ্টা হচ্ছে। দেশে কাপড়ের যথেষ্ট অভাব থাকায় এখনও ভারতের মত সরকারীভাবে মিলে তৈরী কাপড়ের উৎপাদন কমাবার আদেশ জারী করবার দরকার হয় নি, তাই বাঁচোয়া।

অর্থনীতির অনর্থ

একটা দেশের শিল্প বাণিজ্য এবং অন্য সবরকমেরই উন্নতি অনেক—অনেকখানি নির্ভর করে, সেই দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপর। ভারত এবং পাকিস্থানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যে ভারত এবং পাকিস্থানকে কতদূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে সেটাও দেখা দরকার। তবে আগেই বলে রাখছি, অর্থনীতি ব্যাপারটা বড়ই ঘোরাল, ঠিকমত বুঝা যার তার কর্ম নয়, আমার মত গণ্ডমূর্খদের ত নয়ই। তাই এখানে যেটুকু আলোচনা হচ্ছে তা হবে ঐ গণ্ডমূর্খরাও যতটুকু বুঝে মাত্র ততটুকুই, একটুও বেশী নয়; এবং গণ্ডমূর্খ সাধারণের জন্যই।

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের অর্থনীতিক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। সবাই নাকি ভারতের অর্থনীতিকে এমন প্রবলভাবে ঠেলে দিয়েছেন যে, আর্থিক ক্ষেত্রেও ভারত নাকি একটা অতি বিশেষ স্থান ইতিমধ্যেই করে নিয়েছে। এ ধরণের প্রচারকার্য এত বেশী হয়েছে বা হচ্ছে যে, আজ যদি হঠাৎ ভারতীয় অর্থনীতির একটা খুঁত ধরা যায় তাহলে মার খাওয়াটাই স্বাভাবিক; একান্তই কেউ যদি মার দিতে এগিয়ে না আসে, তবে আমার পিতৃপুরুষের ভ্যাগ্যির জোর আছে বলতে হবে। স্বাধীন ভারতের প্রথম অর্থমন্ত্রী সম্মুখম্ চেট্টি থেকে আরম্ভ করে দেশমুখ এবং কৃষ্ণমাচারী এঁরা সবাই নাকি পৃথিবীর সেরা অর্থনীতিবিদ্দের অন্যতম। অবশ্য, ভারতে যে যখন যে দপ্তরের মালিক হন, প্রচারকার্য অনুসারে তখন তিনিই পৃথিবীর সেরা চীজ হন। কেউ কারও চেয়ে কম নয়। সম্মুখম্ চেট্টি, জন মাথাই, দেশমুখ, কৃষ্ণমাচারী এঁরা সবাই বিরাট বিরাট পুরুষ, এত বিরাট যে সাধারণ লোকে ধারণাই করতে পারে না যে তাঁরা কত বিরাট! বোধ হয় তাঁরা নিজেরাও নিজেদের বিরাটত্বের বিষয় ঠিক ঠাউরে উঠতে পারেন নি। ফলে যখন যা মনে হয়েছে তাই করে গেছেন, বা করছেন, কারও ধার না ধেরেই,—ভারত একটা স্বাধীন দেশ ত!

অর্থনীতির মত একটা জটিল ব্যাপারেও বাইরে থেকে সৎপরামর্শ গ্রহণ করা তাঁরা কেউই কখনও পছন্দ করেন নি। হিটলারের জার্মানীর সেই অর্থনৈতিক যাদুকর ডাঃ শাখাটের কথা বেশ মনে পড়ে। ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হবার পর অর্থনীতির ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্য ডাঃ শাখাটকে আমন্ত্রণ করে সে দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডাঃ শাখাট পরামর্শ দিয়েও

এসেছিলেন। তারপর ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতির অবস্থা যে কি হয়েছে সেটা অবশ্য আমার জানা নেই ; তবে এটুকু বুঝতে ভুল করিনি যে, ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক নেতাদের সর্ববিদ্যাবিশারদ হিসাবে দম্ভটা অনেকটাই কম। আরও যেটুকু জানি তা হচ্ছে এই যে, ডাঃ শাখাট ঐ ইন্দোনেশিয়া যাতায়াতের পথে বিনা নিমন্ত্রণেই ভারতে এসেছিলেন। কলকাতাতে ত ছিলেনই দিল্লীর বড় কর্তাদের সাথেও দেখা সাক্ষাৎ করে এসেছিলেন। আর তাঁর ভারত সফরকালে কথাবার্তায় তিনি যেটুকু প্রকাশ করেছিলেন, তার সোজা মানেই হচ্ছে এই যে, ভারত অর্থনীতির ব্যাপারে যেভাবে চলছে, সেটা খুব বুদ্ধিমানের মত নয় ; এবং ভারত যদি চায় তাহলে তিনি অতি আনন্দের সঙ্গেই ভারতকে কিছু সৎ পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু ভারতের নেতারা ত আর আমার মত গণ্ডমূর্খ নয় যে, কেউ মিষ্টি কথার ছলে কিছু পরামর্শ দিতে চাইলেই সেই পরামর্শ গলাধঃকরণ করে বসে থাক্‌বেন। তাঁরা ত কথায় কথায় কত শাখাট রোজই পয়দা করছেন ; তাঁরা শাখাটের পরামর্শের কি ধার ধারেন। তাই ডাঃ শাখাটকে সেদিন দিল্লী থেকে বিনা অভ্যর্থনাতেই ফিরে যেতে হয়েছিল ; বোধহয় ভারতের স্বাধীনতাকে সেলাম জানিয়েই।

ভারতের নেতারা সবাই সবজান্তা, তাঁরা একাই একশো, শাখাটের পরামর্শের তাঁরা থোড়াই ধার ধারেন। ভারতের অর্থনীতিও আজ তাই হু হু করে এগিয়ে চলেছে, কারও ধার না ধেরেই,—না দেশের শিল্প উন্নয়নের, না দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের। জিনিসপত্রের দর যে রেটে বেড়ে চলেছে তাতে ভারত শেষ পর্যন্ত চিয়াংকাইসেকের চায়নার মত উন্নতিলাভ করতেও আর বেশী দেরি করবে মনে হয় না। তবে এগিয়ে যে চলেছে তাতেও কোন ভুল নেই। কারণ,—খবরের কাগজওয়ালারা, যারা আরও বেশী সবজান্তা, তারাই যে সব সার্টিফিকেট ঝাড়ছেন। আর প্রমাণ ত রয়েছে হাতের কাছেই —পাকিস্থানের টাকার দর ভারতের টাকার দরের চেয়েও কম। তবে আর চাই কি,—মার দিস কেল্লা!

ভারতের অর্থনীতির সাফল্যের প্রচারকার্য এত মাত্রাবিহীনভাবে করা হয়েছে যে, যখনি যিনি অর্থমন্ত্রী হয়েছেন, তাঁর মাথাটি আর ঠিক রাখতে পারেন নি, যা ইচ্ছে তাই করে গেছেন। তাঁদের ক্ষমতা এবং দম্ভও যে অসীম সেটা বুঝতে আজ আর কারও বাকি নেই। গল্পে কথিত স্টেশন মাস্টারের "টু শো মাই পাওয়ার আই স্টপড্ দি ট্রেণ' এর মতই তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা

দেখাচ্ছেন, এবং অতি নির্ভীকভাবেই। কৃষ্ণমাচারী কাপড়ের উপর ট্যাক্স বসিয়ে পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে বড় গলায় হেঁকে বল্লেন যে, "কাপড়ের দর কমাবার জন্যই এই ট্যাক্স বসান হয়েছে।" মূর্খসাধারণকে কৃষ্ণমাচারীর এই দম্ভও হজম করতে হয়েছে। তারপর ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স, তার উপর ট্যাক্স, খেতে ট্যাক্স, বসতে ট্যাক্স, পরতে ট্যাক্স, হাঁটতে ট্যাক্স, চলতে ট্যাক্স, আরও হাজার রকমের ট্যাক্স আজ ভারতে এমন কঠিনভাবে সাধারণের মস্তকজাত হয়ে বসছে যে তাদের অবস্থা আরব্য উপন্যাসের সেই 'সিন্ধবাদের' চেয়েও করুণ আর কি! এই ট্যাক্স মহিমার ফলেই ভারতের পার্লামেণ্টের যে কোন সেসনই আজ বাজেট সেসন হয়ে দাঁড়িয়েছে; এবং বৎসরের যে কোন দিনই আজ পার্লামেণ্টে ট্যাক্স বসাবার আইন পাসের কাজে ব্যস্ত থাকা হচ্ছে; যেন ভারতীয় পার্লামেণ্টের ঐ ট্যাক্স আদায়ের আইন পাস করাই হচ্ছে সর্বপ্রধান কাজ! ভারতকে এখনও সর্ব বিষয়ে, সর্ব কর্ম এবং অকর্মের একচেটে ক্ষমতার অধিকারী কমুনিস্ট রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়নি ঠিকই; কিন্তু এই অতি ট্যাক্স বৃদ্ধির রাস্তায় সাধারণ পুঁজি যে কি ভাবে গড়ে উঠতে পারে, তারও কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। ঘোষণা না করেও অবশ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক কাজই এদিক ওদিক করা হয়; আর যেখানে অব্যবস্থা এবং অকর্মণ্যতা চরমে পৌঁছেছে সেখানে যে কি হয় আর কি না হয় তাও বলা কঠিন।

কিন্তু ট্যাক্স না দিয়েই বা উপায় কি? ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ হবে কিভাবে? এ ট্যাক্স ত আর ইংরেজ আমলের ট্যাক্স নয়, এ যে স্বাধীন আমলের ট্যাক্স! তবে এই ট্যাক্সেই যদি শেষ হ'ত, তাহলেও না হয় বুঝতাম। এর উপর রয়েছে আবার ঐ ফালতু টাকা বাজারে ছাড়বার বিরাট বাহাদুরী। এরকম বিরাট এবং অদ্ভুতভাবে নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়া হচ্ছে যে একটা মহাযুদ্ধটুদ্ধ ভিন্ন ঐ রকমের নোট ছাড়ার কথা ভাবাই কঠিন। নোট ছাপাবার ব্যবসাই হচ্ছে আজ ভারতের সবচেয়ে বড় এবং লাভজনক ব্যবসা। আসলে ঐ নোট ছাপাবার কারখানার প্রসার স্বাধীন ভারতে যতটা হয়েছে, তা আর অন্য কোন শিল্পে হয়নি;—স্বাধীন এবং সার্বভৌম সরকারের কার্য-কলাপের উপযুক্তই বটে! অত্যধিক ফালতু টাকার ফলে ফলও হয়েছে অতি ফালতু ধরণেরই,—মানে যা হওয়া উচিত ছিল তাই। সবরকম জিনিসের দর হু হু করে উপরের দিকে এগিয়ে চলেছে। এমন কি খাবার পরবার বা গরীব লোকদের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীগুলোও

মূল্য বৃদ্ধি থেকে বাদ পড়েনি। বাদ পরাবার বিশেষ যে চেষ্টা হয়েছে তাও বলা চলে না ; এবং এইখানেই হচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতির বাহাদুরী। বিনা তোয়াক্কায় ফাঁপা নোট ছাড়া হচ্ছে, অতি বৃহৎ ভাবেই।

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারে এবং দেশে শিল্প উন্নয়নের কাজে এই ফালতু টাকার ছড়াছড়ি যে কি ভীষণ অনর্থ সৃষ্টি করেছে, সে ত আগেই খানিকটা দেখা গেছে ; তাই বেশি না বলাই ভাল। তবুও প্রচারের কমতি নেই—'ভারতের অর্থনীতির বুনিয়াদ অতি পাকাভাবেই গড়া হয়েছে, ঠিকমতই চলছে, কোন ভয় নেই।'

ভারতের অর্থনীতিবিদেরা এবং অর্থমন্ত্রীরা ত বটেই, সবাই এক একজন পৃথিবীর সেরা ঝানু খেলোয়াড়। এই ঝানু খেলোয়াড় হিসাবে অর্থমন্ত্রী চিন্তামন দেশমুখের নাম খুবই প্রচারিত হয়েছে। তিনিই অবশ্য সবচেয়ে বেশীদিন ভারতের অর্থদপ্তর আগ্লিয়ে বসেছিলেন। দেশমুখের নামটি চিন্তামন হলেও তিনি যে মনে কোন চিন্তা না করেই সব কাজ করে গেছেন সে বিষয়েও আজ আর কোন চিন্তা নেই। কিছুদিন আগে যখন অন্য কোন অনর্থ কারণে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, তখন সারা দেশময় হৈ হৈ পড়ে গিয়েছিল তাঁর অভাবের দুঃখে। তাঁর বিরহে নাকি ভারতের লক্ষ্মীদেবী ভীষণ কাতর হয়ে পড়বেন, এই সম্ভাবনায়। এই বিরহ মিলনের ঢংয়া ঢংয়ির কথা আমার মগজে খুবই কম ঢোকে, তাই বলতে পারবনা যে সত্যি সত্যি দেশমুখ-বিহনে ভারতীয় অর্থনীতির অবস্থা আদতে কি হতে পারে। তবে যেটুকু বুঝি তা খুবই পরিষ্কার,—শ্রীজহরলাল যতক্ষণ ভারতের মাথা হয়ে বসে আছেন ততক্ষণ আর কোন ভয়ই নেই। যে কেউ, যে কোন ভাগ্যবান ব্যক্তিই ভারতের যে কোন দপ্তরকে অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রাকৃতিক উন্নতির পথে এগিয়ে দিতে পারেন। কৃষ্ণমাচারী কেন, কংগ্রেস সভাপতি ডেবর বা রেড্ডী, কন্যা ইন্দিরা, জহরলালের মোটর ড্রাইভার বা প্রাইভেট সেক্রেটারী—যে কেউই ভারতের অর্থমন্ত্রী হবার যোগ্য। মন্ত্রী হওয়াই যা একটু দেরী ; হলে পরেই ত প্রচারকার্য মারফৎ তাঁকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য তৈরী করতে আর মোটেই দেরী হয় না। মহাবীর ত্যাগীও ত বেশ কিছুদিন অর্থ বিভাগের 'মিনিস্টার অফ স্টেট' হিসাবে কার্য চালিয়েছেন।

অবশ্য দেশমুখের বিদ্যাবুদ্ধি, তার ব্যক্তিত্ব, তাঁর নিজ দপ্তর পরিচালনায় কার্য্যকরী ক্ষমতা, এসবকে হেয় প্রতিপন্ন করা আমার মোটেই উদ্দেশ্য নয়।

তিনি যে ভারতীয় মন্ত্রীসভার অনেক অনেক মন্ত্রীদের চেয়েই বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞানে এবং ব্যক্তিত্বে অনেকটাই এগিয়েছিলেন সে বিষয়েও আমার কোন সন্দেহ নেই। আর তিনি যে অধিকাংশ ভারতীয় মন্ত্রীদের মত, সেক্রেটারীরা ফাইল নিয়ে আসলেই "কাঁহা সহি খিচনে হোগা ওহি বাতাও," বলেই সহিকর্ম সম্পাদন করে কর্মসম্পাদন করতেন না, সে বিষয়েও মূর্খ সাধারণের ধারণা বেশ পরিষ্কার বলেই মনে হয়। তবুও প্রশ্ন হচ্ছে যে তিনি বাহাদুরীটা কি দেখালেন ? ট্যাক্সের বোঝা বৃদ্ধি, আর সেই সঙ্গে ফালতু টাকা ছড়িয়ে জিনিস-পত্রের মূল্যমানকে ফাঁপিয়ে তুলে প্রায় আর কি ফাট ফাট অবস্থায়ই যদি আন্‌তে হয়, তাহলে বাহাদুরীটা হোল কোন্ খানে ?

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করে 'স্টেটব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াতে' পরিণত করে তিনি যে কাজটি করেছেন তার ফল মোটামুটি ভালই হবে আশা করা যায়। আবার ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলো জাতীয়করণও হয়েছে তাঁরই আমলে ; তাই বুঝা কঠিন যে তিনি কি করতে চেয়েছিলেন। ইন্সিওরেন্স কোম্পানী জাতীয়করণ হলে ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতির কাজ যে কিভাবে সাহায্য লাভ করতে পারে, তা বুঝা খুবই কঠিন। তবে আপাতত বিদেশে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো যে ব্যবসা করছিল তা যে শেষ হল তাতে আর কোন ভুল নেই। ইন্সিওরেন্স প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণের প্রধান অজুহাত হচ্ছে এই যে, ইন্সিওরেন্সের মালিক পুঁজিপতিরা টাকাগুলো যাচ্ছেতাই ভাবে যেখানে সেখানে লগ্নী করতেন। ফলে টাকাগুলোর ঠিক সদ্ব্যবহার হ'ত না। ভারতের সরকারী নেতারা সাধারণ পুঁজিপতিদের চেয়ে টাকাগুলো বেশি ভালভাবে ব্যয় করবেন এরকম ধারণা দেশের লোকের এখনও হবার সুযোগ হয়নি। বরং পুঁজিপতিরা টাকা খাটালে লাভ হয় আর সরকার টাকা খাটালে লোকসান হয়, এটাই সাধারণ লোকে দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। (মাত্র কয়েকদিন আগে (১৯৫৮) ইন্সিওরেন্স করপোরেশন কর্তৃক মুন্দ্রাদের ফেলো কোম্পানীর শেয়ার বাজারের চেয়ে বেশী দামে কেন্‌বার যে কেলেঙ্কারীর কথা প্রকাশ পেয়েছে তাতেই বুঝা গেছে যে সরকারী নেতারা ইনসিওরেন্সের টাকাগুলো কিরকম সদ্ব্যবহার করছেন।) আর বেসরকারী পুঁজি খাটান ভারতে এখনও একেবারে বন্ধ করে দেওয়াও হয়নি। ভারতের যে পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে তাতেও বেসরকারী পুঁজি নিয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে। তাই ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলো সরকারী তাঁবে নেবার মানে সাধারণ লোকের বোধগম্যের

াইরেই থেকে যাচ্ছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পেয়ে যাঁরা সব ক্ষমতাই নিজেদের হাতে টানবার চেষ্টায় আছেন, ঐ টাকাগুলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার সুবিধা তাদের অবশ্যই হয়েছে। এখন কপালগুণে অন্যান্য সরকারী ব্যবসাগুলোর মতই ঐ ব্যবসায়টিও লোকসানের কারবারে পরিণত না হলেই বাঁচোয়া!

আর টাকা লগ্নী ঠিকমত হয় না বলেই ইন্সিওরেন্স ব্যবসাগুলো জাতীয়করণ করবারও খুব কিছু মানেও ছিল না। ইন্সিওরেন্সের আমানতী টাকার একটি অতি বৃহৎ অংশই ত আইন অনুযায়ী সরকারী ঋণে লগ্নী করতে হ'ত; তারপর খাইখরচা পুষিয়ে সামান্য যা হাতে থাকত সেইটুকুই শুধু কোম্পানীর মালিকরা এদিক ওদিক করবার সুযোগ পেতেন। সেই সামান্য অংশের উপরও যদি সরকারী তদারকি প্রয়োজন হ'ত, তাহলে আইন করেই সেটুকু করাও কিছুই অসুবিধার ছিল না। তবুও ইন্সিওরেন্স জাতীয়করণ করা হয়েছে, এবং নিশ্চয়ই দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরেই। শ্রীজহরলাল আর তাঁর পেটোয়া কয়েকজনকে নিয়েই ত দেশ কিনা! জনৈক বন্ধুর মতে ইন্সিওরেন্স ব্যবসা জাতীয়করণের কারণ হচ্ছে যে, ঐ ব্যবসাগুলোর উপরে ভারতের রাষ্ট্রভাষাভাষীদের দখল খুবই কম ছিল; এবং ঐ একই কারণে অদূর ভবিষ্যতে ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসাগুলোও জাতীয়করণ করা হবে, তাতেও সন্দেহ নেই। জানিনা, তবে ব্যাপার যা দেখছি, তাতে কিছু অসম্ভবও মনে হয় না।

ভারতের অর্থনীতির সমস্যাটি আসলে হচ্ছে ভারতের অর্থাভাবেরই সমস্যা। তাড়াতাড়ি উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে হলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়, সে পরিমাণ অর্থ ভারতে সংগ্রহ করা কঠিন। দেশের ভেতরে তাই ট্যাক্স এবং ফালতু নোট বৃদ্ধি না করে উপায়ও নেই। কিন্তু শুধুমাত্র ঐ সংক্রিয়া দুটির উপর নির্ভর করে এগোতে হলে শেষপর্যন্ত যে উল্টোমুখেই এগোতে হতে পারে, সে কথাটাও ভেবে দেখা দরকার। বিদেশ থেকে ধার দেনা করে বা চাঁদা সংগ্রহ করে দেশের অর্থনীতির অনেকটা সাহায্য করা অবশ্যই যায়; কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতিতে এই বিদেশী ধার বা সাহায্যের খুব বিশেষ স্থান নেই। (যদিও বর্তমানে শুধুই ধার এবং ভিক্ষার উপরই ভারত চলছে।) । রাস্তাটি ভারতের রাজনীতিই মেরে রেখে দিয়েছেন। তাই এই বৈদেশিক অনর্থের ব্যাপারে ভারতের অর্থনীতিবিদদের বিশেষ দোষও দেয়া যায় না— শ্রীদেশমুখকেও না। তবুও এটুকু বলে নিশ্চয়ই বেশি বলা হবে না যে অর্থমন্ত্রী

শ্রীদেশমুখ যদি একটা রাজনৈতিক অনর্থের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পদত্যাগ না করে কোন অর্থনৈতিক অনর্থের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পদত্যাগ করতেন, তাহলে আরও ভাল হ'ত। অন্ততপক্ষে ফাঁকা ভারতীয় রাজনীতি যে ভারতের অর্থনীতিকেও কি অদ্ভুত দুরবস্থায় এনে ফেলেছে, সেদিকে অনেকের দৃষ্টি পড়ত

বাইরে থেকে বিশেষ সাহায্য আসবার সম্ভবনা যখন আর বেশি নেই, দেশের ভেতরেই যা কিছু সংগ্রহ করতে হবে তখন ভারতীয় অর্থনীতির আজ পরিকল্পনাই হওয়া উচিত, দেশের মধ্যেকার যৎসামান্য পুঁজিকে সব চেয়ে ভাল-ভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করা। আর এ কাজটি ঠিকমত করতে হলে সর্বপ্রথম দরকার হচ্ছে, দেশের মধ্যে যে বিরাট কালোবাজারী পুঁজি রয়েছে তাকে প্রকাশ্য বাজারে উপস্থিত করা; কিন্তু ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে এপর্যন্ত এ কাজটির কিছুই করা সম্ভব হয়নি।

গত মহাযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত অনেক ভারতীয় অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ এরকম মত প্রকাশ করেছেন যে, ভারতের কালোবাজারে কমপক্ষে এক-হাজার কোটি টাকার পুঁজি খাটান হচ্ছে। কিন্তু সম্মুগম্ চেট্টি থেকে আরম্ভ করে কৃষ্ণমাচারী পর্যন্ত কোন ভারতীয় অর্থমন্ত্রীই ঐ কালোবাজারী পুঁজিটিকে প্রকাশ্য বাজারে আনবার বিশেষ কিছুই করতে পারেন নি। তাই বলছিলাম যে ভারতীয় অর্থনীতির বাহাদুরী হচ্ছে প্রচারে, কাজে নয়। কালোবাজারের এই বিরাট পুঁজিটি প্রকাশ্য বাজারে নিয়ে আসা যে ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে একটা অতি প্রধান এবং সর্ববৃহৎ কর্তব্য, তা অন্তত দেশমুখের মত বিজ্ঞ লোকেরা যে বুঝতে পারেননি, তাও নয়; অথচ কাজে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয়নি। যতদূর মনে পড়ে, দেশমুখের আমলেই 'ভলাণ্টারী ডিসক্লোজার নামে এক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বেশ-কিছু কম খরচায় কালোবাজারী পুঁজিকে প্রকাশ্য বাজারে আনবার একটা সুযোগও দেয়া হয়েছিল, কিন্তু ঐ পর্যন্তই ;—কাজ খুব বেশি এগোয়নি। খুব সামান্যই কিছুমাত্র ডিসক্লোজড হয়েছিল ভারতীয় পুঁজির বেশির ভাগই আজও কালোবাজারে খাটছে এবং বৃদ্ধিও পাচ্ছে ঐখানেই, যার ফলে ভারতের বাজার ক্রমে আরও কালোবাজারেই পরিণত হচ্ছে।

দরিদ্র দেশ ভারতের এই সহস্রাধিক কোটি টাকার পুঁজিকে যদি প্রকাশ্য বাজারে এনে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প উন্নয়নের কাজে লাগান সম্ভব হ'ত তাহলে আজ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার

কল্পনাকে আরও অনেক বাড়িয়ে দিয়ে আরও অনেক সহজে সফল করে তোলা মোটেই অসম্ভব হ'ত না। কিন্তু কিছুই সম্ভব হয়নি। কালোবাজারীরাই আজ ভারতের মালিক হয়ে বসে রয়েছে।

কালোবাজারে অর্থ যে কি পরিমাণ আছে, এবং কতখানি অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে বিষয়ে অনেকেরই খুব ধারণা নেই; তাই আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে একটু বলছি। কলকাতার কোন একটি চার্টার্ড একাউন্টেণ্ট ফার্ম, যারা ইনকামট্যাক্স উপদেষ্টা হিসাবে বিশেষ সুনামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, এবং যারা এককভাবে সমগ্র ভারতে সবচেয়ে বেশী ভলাণ্টারী ডিসক্লোজারের কাজ করেছে,—এই রকম একটি ফার্মের সাথে আমার কিছু সম্পর্ক থাকায়, আমার ঐ কালোবাজারী পুঁজির বিষয় বেশ একটু পরিষ্কার ধারণাই হয়েছে। যার ফলে আমি আজ অতি সহজেই বিশ্বাস করি যে অনেক ভারতীয় অর্থ-বিদেরা যে অনুমান করেছেন তা মোটেই ভুল নয়। যদি তাঁদের অনুমানে কিছু ভুল হয়ে থাকে তাহলে সে ভুল কম বলার জন্যই হয়েছে, বেশী বলা হয়নি মোটেই। আমার ধারণা, এক কলকাতার বাজারেই বহুশত কোটি টাকার কালোবাজারী পুঁজি খাটছে। সমগ্র ভারতের কালোবাজারে হাজার কোটি টাকা খাটছে বল্লে বোধ হয় বেশ কিছু কমই বলা হয়। ভারতের ইনকাম ট্যাক্সের বড়কর্তা দু'এক জনের সাথেও আলাপ করে আমি আমার ধারণারই সমর্থন পেয়েছি। তাই ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের বিষয় লম্বাই লম্বাই গল্প শুনলে আজ আর আমার মস্তক বিগড়ে যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

বাড়ী ঘর, জায়গা-জমির এবং সোনারূপোর দর যে এত বেড়ে গেছে তার কারণও হচ্ছে ঐ কালোবাজারী পুঁজি। অতটাকা লুকিয়ে খাটান ত আর সোজা কথা নয়! তাই বাড়ীঘর, জায়গা জমির উপর ফটকা খেলা হচ্ছে, আর সোনা রূপা কিনে ঘর বোঝাই করা হচ্ছে। জমি কিনলে নাকি ইনক্যাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া খুবই সহজ। আর দশলাখ টাকায় বাড়ী তৈরী করে, দু'লাখ টাকায় করা হয়েছে বলে ইনকামট্যাক্সের খাতায় দেখানও বেশী কঠিন কাজ নয়। হচ্ছেও তাই। একজন বিশিষ্ট পুঁজিপতিকে বলতে শুনেছি যে, আজকাল লড়াইয়ের পর থেকে ভারতে এরোপ্লেন যাতায়াত যে এত বেড়ে গেছে, তার প্রধান কারণই হচ্ছে নাকি ঐ কালোবাজারী টাকা। কালোবাজারের টাকায় ফুর্তি করতে হলে এরোপ্লেন অবশ্যই চাই, কিন্তু সেটাই সব নয়,—কালোবাজারের টাকা ব্যাঙ্কে ড্রাফট্ কেটে চালান করার সুবিধা না থাকায়, সুটকেশ বোঝাই

করেই এরোপ্লেন চড়ে চালান করতে হয়। এরোপ্লেনের সীটের চাহিদাও তাই এত বেশী। বেশী দামী নোটগুলি আবার চালু হওয়ায় কাজটা অবশ্য অনেক হাল্কা হয়ে এসেছে ঠিকই।

পুঁজি সব কালোবাজারে আটকা পড়ায় শিল্প প্রসারের পক্ষে যে কত অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সে বিষয়েও অন্তত একটা নিজস্ব অভিজ্ঞতা আমার আছে। কলকাতার এক স্বনামধন্য ব্যবসায়ী মহাযুদ্ধের বাজারে প্রাণভরে ব্যবসা করেন এবং ততোধিক প্রাণভরে টাকা রোজগার করেন। হাতে প্রচুর টাকা জমে যায়, ফলে যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই তিনি ব্যবসায়ী থেকে শিল্পপতিতে উন্নতি লাভ করবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত যে জিনিষটি তার ব্যবসায়ের মূল পণ্য ছিল, সেটিকে তিনি দেশেই তৈরী করবার ব্যবস্থা করতে থাকেন। এক বিরাট কারখানা তৈরী করবার কাজও আরম্ভ করে দেন, এবং আংশিকভাবে কারখানার কাজ আরম্ভও হয়ে যায়। বিরাট কারখানাকে পুরোভাবে সাজিয়ে তোলবার জন্য মোট প্রায় দেড় কোটি টাকার যন্ত্রপাতি, কলকব্জার অর্ডার বিলেতে দেওয়া হয়। কিছু যন্ত্রপাতি যখন এসেও পড়েছে এমন সময় কোন কারণে ঐ ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটির খেয়াল হয় যে, যে বিরাটসংখ্যক টাকা তিনি শিল্প স্থাপন করবার জন্য ব্যয় করতে চাচ্ছেন, তার অতি নগণ্য অংশমাত্রই ইনকাম ট্যাক্সের খাতায় প্রকাশিত আছে। ফলে যতদূর সম্ভব বিলাতী যন্ত্রপাতির অর্ডারগুলি তৎক্ষণাৎ সব নাকচ করে দিয়ে তিনি ইনকামট্যাক্সের খাতা সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যতদূর জানি আজও তিনি ঐ খাতা নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত আছেন, তার কারখানা আর বড় করা হয়নি। তাই মনে হয় এই কালোবাজারের টাকাটাকে প্রকাশ্যে আনতে না পারার ফলেই আজ ভারতের অর্থনীতিতে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। যদি ঐ ভদ্রলোক টাকাটা খাটাবার সুযোগ পেতেন, তাহলে তাঁর কারখানায় আজ অন্ততপক্ষে প্রায় দশ হাজার লোক প্রত্যক্ষভাবে কাজ করবার সুযোগ পেত।

কালোবাজারের এই টাকাটা প্রকাশ্যে আনা খুব কঠিন কাজ সন্দেহ নেই কিন্তু একেবারে অসম্ভব বলারও খুব মানে হবে না। আসলে ওটাকে প্রকাশ্যে আন্‌বার যা চেষ্টা হয়েছে তাকে প্রাণহীন চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। কালোবাজারী পুঁজি ধরা পড়লে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে যদি একটা তারিখ ঠিক করে দিয়ে, বিনা বা নামমাত্র ট্যাক্সে ওটাকে প্রকাশ করবার সুযোগ দেয়া হ'ত তাহলে অন্তত বেশীরভাগ পুঁজিই যে প্রকাশ্য বাজারে বের

হয়ে আসত তাতে কিছুই সন্দেহ নেই। কিন্তু আসলে সিরিয়াসনেসেরই যেখানে অভাব, যেখানে সব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হচ্ছে শুধুই বক্তৃতা মারফৎ, সেখানে এর চেয়ে বেশী কি-ই বা আশা করা যায়। এইভাবে কালোবাজারী পুঁজিকে প্রকাশ্যে আনবার সুযোগ দিলে দু'এক বৎসর যে ইনকাম ট্যাক্সের খাতা পরীক্ষার কাজে কিছু অসুবিধা হতে পারে, তা খুবই সত্যিকথা। তবে আরও সত্যিকথা হচ্ছে এই যে, ঐ কাজটি করা হলে পরে যে সুবিধা হবে তার তুলনায় অসুবিধাটুকু কিছুই নয়। যদি হাজার কোটি টাকাই মাত্র কালোবাজার থেকে প্রকাশ্য বাজারে বেরিয়ে আসে এবং দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পে খাটতে থাকে তাহলে ঐ বাড়তি ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্প থেকে শতকরা দশটাকা হিসাবে লাভ হলেও বছরে শুধু প্রত্যক্ষভাবেই একশ কোটি টাকা আয় হতে পারে। একশ কোটি টাকা আয় হলে তার উপর ইনকামট্যাক্সও কম পক্ষে চল্লিশ পঞ্চাশ কোটি টাকার কম আদায় হবে না। অপ্রত্যক্ষভাবে যে আয়টা হবে তার কথা না হয় নাই ধরা হল। কিন্তু কিছুই করা সম্ভব হয়নি; হচ্ছে কেবল প্ল্যান আর প্রচারকার্য; আর শুধুই ইয়ার্কি। অনেক ভাল কাজ করবার ব্যাপারে ভারতীয় নেতাদের টাকার অভাবের কথা বলতে শোনা যায়; কিন্তু কিছু না করা হলে টাকা আসবে কোথা থেকে? টাকা ত আর আকাশ থেকে পড়ে না! ভারতের অর্থনীতি যে কি অদ্ভুত দুরবস্থায় এসে পড়েছে তাও ইতিমধ্যেই (মানে আবোল তাবোলের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হবার কয়েক দিন মধ্যেই) প্রকাশ্য এবং সরকারীভাবেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তাই ও বিষয়ে আর বেশী না বলাই ভাল,—ভিক্ষাই আজ ভারতের একমাত্র সম্বল।

আর আর্থিক ব্যাপারে ভারত এখনও ঐ ইংরেজের পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের লেজুড় ধরে বসে রয়েছে; স্বাধীনভাবে কিছুই করবার ক্ষমতা তার নেই। এই লেজুড় ধরে বসে থাকবারই যে কি মানে তাও বুঝা কঠিন। বর্তমান অবস্থায় আর্থিক ব্যাপারে উন্নত ইংরেজের সঙ্গে থাকলে যে বেশ খানিকটা সুবিধা থাকা সম্ভব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের লেজ ধরে বসে থাকতে হলে যে লেজের এক জায়গাই ধরে থাকতে হবে সেরকম দিব্যিও ইংরেজ কিছু দিয়ে রাখেনি। বিশেষ করে, ইংরেজের পাউণ্ড স্টার্লিং নিজেই যখন উপরে নীচে উঠা নামা করছে, তখন ভারতও কিছুটা উপরে বা নীচে চেপে ধরে থাকতে পারত,—মানে নূতন রেটে ইংরেজের পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের

সাথে টাকার দর বেঁধে নিতে পারত। অন্ততপক্ষে ইংরেজকে এই নূতন রেটে রাজী হবার জন্য অনুরোধ জানাতে কোন বাধাই ছিল না। কিন্তু এসব কিছুই হয়নি।

আর শুধু মাত্র পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের লেজুড় হয়ে বসে থাকলেই আপসে সব সুবিধা এসে যাবে এমন সোজা বুঝবারও কোন মানে নেই। পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের সঙ্গে সম্বন্ধের সুযোগ নিতে হলে শুধু অর্থনৈতিক ব্যাপারে ইংরেজের লেজুড় হয়ে থাকলেই হয় না, রাজনৈতিক ব্যাপারেও অন্তত খানিকটা ইংরেজের লেজুড় হওয়া দরকার। রাজনৈতিক ব্যাপারে আমরা সব যখন সমান, কমরেড কমরেড, তখন অর্থনৈতিক সুবিধার আশা করা কঠিন।

অথচ এই লেজুড় ধরে থাকার জন্যই ১৯৪৯ সালে ইংরেজ যখন তার পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের দর কমাল, তখন ভারতও তার টাকার দর কমিয়ে দিয়ে এক মহা বাহাদুরি দেখালে। ভারতের যে অর্থমন্ত্রী এ কর্মটি করেছিলেন, তিনিও নিশ্চয়ই একজন ভীষণ বড় বিশেষজ্ঞ, অন্তত প্রচারকার্য এই ধরণেই হয়েছে নিশ্চয়ই। এবং অর্থনীতির গোড়ার কথা বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহও কেউই প্রকাশ করেন নি। তাঁর ঐ কর্মটির ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য যে কিরকম ফেঁপে উঠেছে তা ত আমরা আগেই দেখেছি, আর অন্যান্য বিষয়েও যে কি সুবিধা হয়েছে তাও বেশী না বলাই ভাল।

আসলে মুদ্রামূল্য কমিয়ে দিয়ে বিদেশে বেশী মাল বিক্রী করতে পারলেই, যে লাভের কর্ম হয়, সে কথাটা অন্ধভাবে বিশ্বাস করবার মত অর্থনীতিবিদ আজ আর নেই বললেই চলে। তার উপর ভারত প্রধানত একটি কাঁচামাল রপ্তানীকারী দেশ; তাই মূল্য কিছু না কমালেও বিদেশে তার মালের চাহিদা বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা কম। আর বর্তমানে ভারত রপ্তানীর চেয়ে আমদানিই বেশী করছে; তাই তার মুদ্রামূল্য কমিয়ে দিলে বাইরে থেকে অল্প জিনিষ বেশী দামেই কিনতে হবে। এ সব কথা জেনেও যে, কোন অর্থমন্ত্রীর পক্ষে টাকার মূল্য কমিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল তা বাস্তবে না দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন হ'ত। তবে হ্যাঁ, বোম্বাইয়ের কাপড়ের কল-মালিকরা, যাঁরা আজ ভারতের অনেক কিছু, তাঁদের কিছু কাপড় বাইরে বিক্রী করবার সুবিধা অবশ্যই হয়েছিল—তাই লাভটুকু তাঁরাই পেয়েছেন।

আর পাকিস্থানের টাকার দর বর্তমানে ভারতের টাকার দরের চেয়ে অনেকটাই কম, সেটাও ভারতের অর্থনীতির এক মহা বাহাদুরী বলেই

প্রচারিত হচ্ছে, এবং এই ব্যাপারটি দেখেই আজ বহু ভারতীয়ের মনে আর কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় অর্থনীতি খুব ভালভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। আসলে ব্যাপারটি মোটেই সেরকম নয়। পাকিস্থানের টাকার দর কমে যাবার আর যাই কারণ থাকুক না কেন, ভারতের কাছ থেকে তারা বেশী জিনিস কিনে কম জিনিস বিক্রী করছে, তা মোটেই নয়। বরং তারাই অনেক বেশি টাকার মাল ভারতকে বিক্রী করছে। তবুও পাকিস্থানের টাকার দর ভারতের চেয়ে অনেকটাই কম এই জন্যই যে, হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে পাকিস্থানী হিন্দু তাদের বাড়ীঘর ছেড়ে বা জমি-জমা বিক্রী করে দলে দলে এসে ভারতের রাস্তায় আশ্রয় নিচ্ছে। যারা এখনও পাকিস্থানে আছে, তাদেরও নিজেদের টাকা পাকিস্থানে লগ্নী করবার মত আস্থা নেই; টাকা হাতে পেলেই ভারতে পাঠাচ্ছে। এই হিন্দুদের হুণ্ডির টাকার জন্যই পাকিস্থানের টাকার আজ এই দুরবস্থা। পাকিস্থানের হিন্দুরা আজ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে এক বিরাট মূলধন হিসাবেই দেখা দিয়েছে। এর জন্য বাহাদুরী যদি কারও প্রাপ্য হয়, তাহলে সে বাহাদুরী পাকিস্থানের নেতাদেরই প্রাপ্য, কিংবা হয়ত যাঁরা দেশকে ভাগ করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা আহরণ করেছেন তাঁদেরও এ বাহাদুরী দেয়া যেতে পারে; ভারতীয় অর্থবিদ্‌দের কখনই নয়। [বর্তমানে (১৯৬১) এই হুণ্ডির টাকা আসা যে খুবই কমে গেছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই।]

তবে ভারতের অর্থনীতির এই দুরবস্থা দেখে কেউ যেন মনে করে না বসেন যে ভারতের অর্থনীতি যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁরা সবাই প্রলাপবক্তা 'আবোল তাবোল' লেখকের চেয়েও নিরেট। তাঁরা অর্থনীতির কিছুই বুঝেন না। ব্যাপারটা সেরকম মোটেই নয়, কারণ জায়গা বিশেষে অন্যান্য অনেক নীতির মতই অর্থনীতিটুকুও তাঁদের মাথায় খুব পরিষ্কারভাবেই প্রবেশ করে এবং প্রয়োজন বিশেষে তাঁরা সেই অতি-পরিষ্কার বুঝা অর্থনীতিকে প্রয়োগ করতেও কিছুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ করেন না। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারদের মধ্যে বণ্টনযোগ্য রাজস্ব বণ্টন ব্যাপারে তাঁরা যেরকম তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তারও কোন তুলনা হয় না। প্রথমত তাঁরা ঐ বণ্টনযোগ্য রাজস্ব বণ্টন ব্যাপারে প্রদেশগুলির শিল্প-উৎপাদন ক্ষমতা বা করপ্রদান ক্ষমতার সঙ্গে বণ্টন নীতির কোন সংযোগ রাখা প্রয়োজন বোধ করেন নি। বণ্টন করেছেন জনসংখ্যার অনুপাতে। যার ফলে উত্তর প্রদেশ এবং বিহার তাদের দেয় কর অপেক্ষা বহুগুণ বেশি ভাগ

সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন। আর পশ্চিমবঙ্গ দেয় করের এক নগণ্য ভগ্নাংশ ফকিরের ভিক্ষালাভ করেছেন। পরে আবার যখন রেলের বণ্টনযোগ্য রাজস্ব ভাগের নীতি নির্ধারিত করতে হয়েছে তখন আর প্রদেশগুলির মধ্যে যাত্রী-সংখ্যা বা মাল বুকিংয়ের সংখ্যার নীতিতে ঐ বণ্টন করা সম্ভব হয় নি; তখন ঐ টাকা বণ্টন হয়েছে কোন প্রদেশে কত মাইল রেল লাইন আছে সেই ভিত্তিতে। ফলে আবারও ঐ উত্তর প্রদেশ দেয় অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশী প্রাপ্তিযোগে লাভবান হয়েছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ আবারও কলা খেয়েছেন। এর পরেও যদি কেউ বলে যে ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারেরা অর্থনীতি বুঝেন না, তাহলে সে যে একটি অতি বড় গবেট তা আর প্রমাণ করবার প্রয়োজন হয় না। অতি পরিপক্ক অর্থবিদ্‌দের নেতৃত্বেই ভারতের অর্থ এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে উত্তর প্রদেশের পথেই। এবং এই অর্থনীতির নীতিটি হচ্ছে "Head I win tail you lose."

তবে ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের বিষয় বেশি ভাববারও কিছু নেই; অর্থনৈতিক সব সমস্যার সমাধান প্রায় এসে গেছে। গত ১লা এপ্রিল ১৯৫৭ থেকেই নয়া পয়সা চালু হয়েছে, এক টাকায় এখন ৬৪ পয়সার বদলে ১০০ পইসা পাওয়া যাচ্ছে, ভারতের পইসা যে অনেক সস্তা তারই প্রমাণ দেবার জন্যই। আর সস্তা পয়সায় যে সব কাজ অতি সহজেই করা যায়, তাও আরম্ভ হতেও বেশি দেরী হয়নি। দুঃখ শুধুই যে, ঐ নয়া পয়সার উপরও বাদশাহ জহরলালের ছবি ছাপা হয়নি। দিল্লীর অন্য আর একজন বাদশাহ মহম্মদ তোগলুক সস্তা টাকার প্রচলন করতে গিয়ে যে তামার নোটের আবিষ্কার করেছিলেন, তার উপরও ঐ বাদশাহের ছবি ছাপা হ'ত কিনা, তাও আমার জানা নেই। তবে বাদশাহ জহরলালের এই সব নূতনত্বের পরিণাম যে মহম্মদ তেগলকের নূতনত্বের মতই হবে তাতে বোধ হয় সন্দেহ নেই।

পাকিস্থানের রাজনীতির মতই অর্থনীতিও বেশ একটু ঘোরাল ব্যাপার, সোজা করে বুঝা খুবই কঠিন। পাকিস্থানে যে কোন আদর্শগত অর্থনীতি আছে, তাও নয়। তবে পাকিস্থানে ট্যাক্সের বোঝা এখনও ভারতের মত এত মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি; যদিও দ্রব্য-মূল্যমান ভারতের মতই ঊর্ধ্বমুখী। পাকিস্থান বাইরে থেকে পুঁজি আমদানি বা সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে খুবই আগ্রহশীল—নানা ধরণের কিছু কিছু সাহায্য যে পাচ্ছে না তাও নয়। তবুও অর্থনৈতিক

অবস্থা যে দিন দিনই খারাপের দিকেই যাচ্ছে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। আর সন্দেহ নেই এই ব্যাপারে যে, পাকিস্থানেরও অর্থনৈতিক দুরবস্থার আসল কারণও হচ্ছে ঐ রাজনৈতিক। ভারতের মত অতি বাগাড়ম্বরের ফলে পাকিস্থান অবশ্য দুনিয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু ভারত থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তা খুবই পরিষ্কার। অথচ পাকিস্থানের অর্থনীতি ভারতের সাথে এত গভীরভাবে সংযুক্ত যে, অদূর ভবিষ্যতেও ভারতকে বাদ দিয়ে স্বাধীন পাকিস্থানী অর্থনীতি গড়ে তোলা খুবই কঠিন ব্যাপার। আরও একটা কথা খুবই পরিষ্কার যে, পাকিস্থানী রাজনীতি তার লোকসংখ্যার একটা বৃহৎ অংশ থেকেও ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে, যার ফলে পাকিস্থানের অর্থনীতিতে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের আস্থা ফিরিয়ে আনবার বিশেষ কিছুই চেষ্টা আজও হচ্ছে না, অন্তত পাকিস্থানী অর্থনীতির খাতিরেও এ চেষ্টা কাজটি হওয়া একান্তই প্রয়োজন ছিল। পাকিস্থানী নেতারা যে ব্যাপারটি বুঝতে পারেননি তাও নয়, তবে সোজা পথে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা তাদের পক্ষে এখনও সম্ভব হয়নি। তারা চেষ্টা করছেন যাতে ভারত-পাকিস্থানী সীমানার চোরাই ব্যবসা বন্ধ করা যায়। বোধ হয় তারা ধারণা করেছেন যে এইটি বন্ধ করতে পারলেই হিন্দুদের হুণ্ডির টাকা ভারতে গেলেও কোন অসুবিধা হবে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে থাকলেই আপনা থেকেই লোকে বেশী বিজ্ঞ হয়ে পড়ে এটাও তারই একটা প্রমাণ। তবুও সত্যিকথা হচ্ছে এই যে, যতদিন না পাকিস্থানী রাজনীতি পূর্ববাংলার হিন্দুদের আস্থা ফিরিয়ে এনে হিন্দুদের টাকা পাকিস্থানেই লগ্নী করবার মত অবস্থার সৃষ্টি করতে পারছেন ততদিন পর্যন্ত পাকিস্থানের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসবার সম্ভাবনা খুবই কম।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিকল্পিত ইয়ার্কি

প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা, যার পাঁচবছরী হিসাব ধরে নাম দেয়া হয়েছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সে এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার। আসলে যে ব্যাপারটি কি, কি তার উদ্দেশ্য, কি কাজে লাগে, ওটি খায় না মাথায় দেয়, তা খুব কম লোকেরই জানা আছে। তবুও প্ল্যানিংয়ের মাহাত্ম্য প্রচার আজ এমন এক অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছে যে, অনেকেরই কান ঝালাপালা হতে হতে মাথা বিগড়াবার উপক্রম আর কি! প্ল্যানিং প্ল্যানিং প্ল্যানিং, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী

প্ল্যানিং, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানিং, আরও কত কি! জানি না, বোধ হয় প্ল্যানিং জিনিষটিও ঐ সর্বরোগহর দাওয়াইয়ের মতই কোন চীজ হবে হয়ত। তবে প্ল্যানিং প্ল্যানিং করে প্যাওওয়েতে ইয়ার্কি জমাবার ব্যবস্থাটি ভারতেরই একচেটে ব্যাপার, পাকিস্থানে এই হুজুগের ছোঁয়াচ খুব কমই লেগেছে।

আসলে ঐ প্ল্যানিং বস্তুটি যে কী তা আমি নিজেও জানি না, অন্ততপক্ষে বুঝি না, কিংবা যদিই বা বুঝি, তা আমার মতে খুবই রসের বস্তু—উচ্চাঙ্গের রসিকতা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। কমুনিস্ট রাশিয়ার আবির্ভাবের পূর্বে এ কথাটির কথা পৃথিবীর লোকে খুব কমই শুনেছে, আর অন্য কোথাও যে প্ল্যানিং মারফৎ দেশের উন্নতির চেষ্টা হয়নি সেটাও ঐতিহাসিক সত্য। বর্তমান যুগে কমুনিস্ট রাশিয়ার যদি কোন অবদান থেকে থাকে, তাহলে ঐ প্ল্যানিং এবং প্রপাগাণ্ডাই হচ্ছে তাদের দান। রাশিয়ার কমুনিস্ট সরকার রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করবার পর পুরোনো সব কিছু ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ নূতনভাবে তাদের দেশকে গড়ে তুলবার আদর্শ গ্রহণ করেছিল। কোন কিছু করা বা না করার একচেটে ক্ষমতাও সেখানে সরকারী হাতেই ছিল। ফলে তারা কি কি করবে বা না করবে, সে বিষয়ে হিসেব নিকেশ করে কতকগুলো পরিকল্পনা তৈরী করে নিয়ে কাজে লেগেছিল, এবং এই পরিকল্পনা করে কাজ আরম্ভ করবার নামই দিয়েছিল প্ল্যানিং। পাঁচবছরের মেয়াদে এক একটা পরিকল্পনা খাড়া করা হয়েছিল বলে নামও হয়েছিল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

পৃথিবীতে উন্নত দেশ আরও আছে, রাশিয়ার চেয়ে অনেক বেশী উন্নত দেশও রয়েছে কিন্তু আর কোথাও প্ল্যানিংয়ের প্রয়োজন হয়নি। শুধু যে প্ল্যানিং অন্য কোথাও হয়নি তাও নয়, অন্য কোথাও প্ল্যানিং করা সম্ভবও ছিল না; কারণ ঐ প্ল্যানিং করতে হলে পারিপার্শ্বিক যে রকম অবস্থার সৃষ্টি হওয়া দরকার সেরকম অবস্থা অন্য কোন দেশেও মোটেই ছিল না। সব কিছু ভাল মন্দ করবার বা না করবার একচেটে অধিকারও অন্য কোন দেশের সরকারের হাতে ছিল না, প্ল্যানিংও তাই হয় নি। তবুও অন্য অনেক দেশের পক্ষেও উন্নতির চরমে উঠা মোটেই অসম্ভব হয়নি। রাশিয়ার পর কমুনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর বাইরে সর্বপ্রথম প্ল্যানিং আরম্ভ হয়েছে ভারতে। কিন্তু প্ল্যানিংয়ের সফলতা অর্জন করতে হলে পারিপার্শ্বিক যে অবস্থার সৃষ্টি হওয়া দরকার সে অবস্থা ভারতেও নেই। ভারত সব কিছু ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে নূতন করে গড়ে তুলবার বা সাজিয়ে নেবারও চেষ্টা করছে না। আর ভারতীয় সরকারকেও

কেউই সব কিছু ভাল মন্দ করা বা না করার একচেটে অধিকারও দেয় নি। এই অবস্থায় ভারতে যদি প্ল্যানিং প্ল্যানিং বলে সোরগোল তুলে কানের মাথা খাবার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেটাকে আর যাই বলা হোক না কেন, কোন সৎউদ্দেশ্যমূলক কাজ বলা চলে না।

প্ল্যানিংয়ের বাহাদুরী প্রচারের জন্য একটি কথা সব সময়েই বলা হয় সেটি হচ্ছে যে তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে হলে প্ল্যানিংই একমাত্র উপায়। সম্ভবত রাশিয়ার দিকে তাকিয়েই এবং রাশিয়ান প্রপাগাণ্ডা গলাধকরণ করেই কথাটি বলা হয়। কিন্তু রাশিয়াই একমাত্র তাড়াতাড়ি উন্নতি করেছে তাও মোটেই নয়। গত দশ বৎসর জার্মানী আর জাপান তাদের দেশ দুটোকে যেভাবে পুনর্গঠিত করে তুলেছে। সে কাজ রাশিয়ার উন্নতির ধাপের তুলনায় কিছু কম হয়নি, বরং বোধ হয় অনেকগুণ বেশীই হবে—প্রায় আর কি ম্যাজিক খেলাই দেখিয়েছেন তাঁরা। অথচ তাঁরা যে প্ল্যানিং এবং প্রপাগাণ্ডা সাহায্যেই ঐ সফলতা লাভ করেছেন তারও কোন প্রমাণ নেই। আসলে কোন কাজ করতে হলে কাজ জিনিষটিরই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, কথার বা প্ল্যানিংয়ের নয়—প্রয়োজন শুধুই সততার সঙ্গে কাজ করার। তাই প্ল্যানিংয়ের মাহাত্ম্য কিছুটা কম প্রচার হলেও বিশেষ অসুবিধা হ'ত না।

অবশ্য ভারতের প্ল্যানিং না বুঝলেও সাধারণত প্ল্যানিং কথাটির যা মানে মূর্খদের পক্ষেও বুঝা কঠিন নয়, সেটুকু আমার মস্তিষ্কেও যে প্রবেশ লাভ করে না তা নয়। ওটুকু আমিও বুঝি। বুঝি এইটুকু যে, দেশের আয়-ব্যয়, ধন-দৌলত, মালপত্র ইত্যাদির হিসেব নিকেশ করে দেশের উন্নতির প্রয়োজনে কি কি করা দরকার এবং কোনটি আগে করা দরকার বা কোন্ কাজটি কিভাবে করলে সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে ভাল ফল দেবে, কিংবা কোন্ জিনিসটিকে কিভাবে বাঁচিয়ে কোথায় কাজে লাগালে কাজের অগ্রগতি ঠিকমত রাখা যাবে, এই সবেরও একটি হিসেব করে, দেশের পূর্ণ সম্পদকে পূর্ণ ক্ষমতায় কাজে লাগিয়ে কাজের একটা পরিকল্পনা করাই হচ্ছে প্ল্যানিং। আর এইটুকু বুঝি বলেই ভারতের প্ল্যানিং বুঝিনা। এই ধরণের কাজ করতে হলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে রকম সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন তা যে ভারতে নেই সে ত অতি সত্যি কথা। যতখানি ভালমন্দ করবার ক্ষমতা সরকারী হাতে থাকা দরকার ভারতে তাও নেই; তাই ভারতের প্ল্যানিংকেও বুঝি না। তবে প্ল্যানিং মারফৎ এবং প্ল্যানিংয়ের নামে সব ক্ষমতা যে সরকারী হাতে নেবার চেষ্টা করা হচ্ছে, তা

বুঝতে ভুল হয় না। মনে হয় ভারতের প্ল্যানিংয়ের উদ্দেশ্য বোধ হয় ঐ পর্যন্তই। আসল প্ল্যানিং যে ভারতে হচ্ছে না, শুধু প্ল্যানিংয়ের ভাঁওতা মেরে অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা হচ্ছে, তা এতই পরিষ্কার যে, বুঝিয়ে বলবারও বোধ হয় কোন দরকার হয় না, বেশী বলবার ত নয়ই।

ভারতের প্ল্যানিংয়ে যত সিমেণ্ট আর স্টিল প্রয়োজন তার অর্ধেকও দেশে তৈরী হয় না, প্রয়োজন অনুযায়ী বাইরে থেকেও আনা সম্ভব নয়; তবুও ভারতে প্ল্যানিং হচ্ছে বোধ হয় শুধুই প্ল্যানিংয়ের উদ্দেশ্যেই। সিমেণ্ট এবং স্টিল যখন যথেষ্ট নেই, তখন ও দুটি জিনিসের ব্যবহার যাতে সব চেয়ে ভালভাবে করা হয় প্ল্যানিংয়ে অবশ্যই সে রকম প্ল্যান থাকা উচিত ছিল। কিন্তু আসলে ও দুটি জিনিষ কিভাবে খরচ করা হচ্ছে তা আর কারও জানতে বাকি নেই। যে কোন আজে বাজে বাড়ীঘরও আজ সিমেণ্ট দিয়েই গেঁথে তোলা হচ্ছে, রাস্তায় পিচের বদলে অনেক জায়গায় কংক্রীট ঢালাই করেই রাস্তা তৈরী করা হচ্ছে, রেলের প্ল্যাটফর্ম ভেঙ্গে ফেলে নূতন করে বা সম্পূর্ণ নূতন নূতন প্ল্যাটফরমও তৈরী হচ্ছে ঐ সিমেণ্ট দিয়েই। বড় বড় এক একটা কাজের উপরে অনেক অস্থায়ী বসতবাড়ী, অফিস বাড়ী বা কুলি কোয়ার্টার, কাজটি শেষ হয়ে গেলেই বা হয়ত ভেঙ্গে ফেলতে হবে, তাও আজ গেঁথে তোলা হচ্ছে ঐ সিমেণ্ট দিয়েই, অন্য কিছু দিয়ে নয়। সিমেণ্টের বদলে চুন-সুরকির গাঁথ্নি যে বাড়ীঘরের পক্ষে কিছু খারাপ জিনিস নয়, বরং হাজার বা দেড় হাজার বছরের পুরোনো বাড়ী ঘর দেশে যা আছে তার সবই ঐ চুন সুরকিরই গাঁথ্নি, তা জেনেও ভারতে প্ল্যানিং মারফৎ সিমেণ্ট বাঁচিয়ে ঐ চুন সুরকি বেশী করে ব্যবহারের কোন চেষ্টাই নেই। রাস্তায় কংক্রীট ঢালাই করা বা রেলের প্ল্যাটফরম তৈরী করাই যে আজ সব চেয়ে বড় প্রয়োজন নয়, একথা ভাববার প্রয়োজনও ভারতের প্ল্যানিংয়ের নেই। স্টিলের ব্যাপারেও ঠিক তাই, হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ টন স্টিল ঐ ভাবেই অপ্রয়োজনীয় কাজেই বেশী ব্যয়িত হচ্ছে;—রেলের প্ল্যাট-ফরমের উপর শেড তৈরী করবার কাজেই ব্যয় করা হচ্ছে ঠিক যখন ঐ স্টিলের অভাবেই রেলের ওয়াগন বা বগী তৈরী বন্ধ হয়ে আছে। এই ধরণের আরও বহু অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ যা ভারতে যথেষ্ট পাওয়া যায় না, তাও ঐ একই ধরণের প্ল্যানিং মারফৎই খরচ করে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। অথচ সিমেণ্ট বা স্টিলের উৎপাদন বৃদ্ধি করাই যে ভারতের প্ল্যানিংয়ের সর্বপ্রথম কর্তব্য তা এখনও, আজ দশ বৎসর পরেও, প্ল্যানিং কর্তারা ঠিকমত বুঝতে

পেরেছেন মনেও হয় না। গত দশ বৎসরে সিমেণ্টের উৎপাদন যা বৃদ্ধি করা হয়েছে তা একান্তই নগণ্য ; আর স্টিলের ত প্রায় কিছুই হয়নি, অথচ ওদুটি জিনিস তৈরীর কাঁচামালের ভারতে কোন অভাবই নেই, বরং অতি প্রচুর পরিমাণেই রয়েছে। আশাকরি তাই ভারতের প্ল্যানিং যাঁরা বুঝতে পারেন না, কেউ আর তাঁদের হিংসুটে বলে পাশ কাটাবার চেষ্টা করবেন না।

প্ল্যানিং ভারতে ঠিকই হচ্ছে এবং পুরোদমেই যে হচ্ছে তাতেও কোন সন্দেহ করবার কিছুই নেই। যতসব সেরিমনি, কনফারেন্স, কমিটি বা বিশেষজ্ঞ আমদানি দেখে ব্যাপারটি খুবই পরিষ্কার বুঝা যায়। আরও বেশী বুঝা যায় যে, অত সব কমিটি, কনফারেন্স আর বিশেষজ্ঞদের মতের ফাইল চাপা পড়বার ফলেই, অনেক বিশেষ বিশেষ কাজও ঐ সিমেণ্ট আর স্টিলের উৎপাদনের মতই বিশেষ এগোতে পারছে না। বর্তমান ভারতে জনসংখ্যার চাপ যে রকম বেশী, আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ যে অতি বেশী, সে বিষয়ে অজ্ঞ বোধ হয় কেউই নেই। যে কোন অধমেরই, যার কিছু মাত্র মাত্রাজ্ঞান আছে, তারই বুঝতে অসুবিধা নেই যে এই জনসংখ্যার চাপ না হোক, জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ কমাতে না পারলে অর্থনৈতিক উন্নতির কোন আশাই ভারতের নেই। যত ভাল প্ল্যানিংই হোক না কেন আর যত ভালভাবেই তাকে সফল করে তোলা যাক না কেন, ভোগযোগ্য দ্রব্যের বৃদ্ধির চেয়ে ভোগীদের সংখ্যাই যদি বেশী বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিংবা সমান সমানই থেকে যায় তাহলে সাধারণভাবে সাধারণ লোকের উন্নতির কোন আশাই আর থাকে না। সরকারীভাবেও ভারতে প্রতি দশ বৎসরে প্ল্যানিং মারফৎ যতখানি ধনবৃদ্ধির হিসাব কষা হচ্ছে, প্রতি দশ বৎসরে শতকরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও তার চেয়ে বিশেষ কম নয়। ফলে সহস্র প্ল্যানিংয়ের পরও ভারতের গড়পড়তা উন্নতির যে কোন আশাই নেই, সে ত অতি সাধারণ অঙ্কশাস্ত্রের ব্যাপার। তাই আজ ভারতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ কমাবার চেষ্টাই হওয়া উচিত যে-কোন ধরণের উন্নতিমূলক প্ল্যানিংয়ের সর্বপ্রথম কর্তব্য। এই মহান কর্তব্য কাজটি যে কর্তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ করেনি, তাও নয়। তবে কিনা সহজিয়া কোন পন্থা নেই বলেই বোধ হয়, কাজটি বেশী এগোচ্ছে না। সোজাসুজি শিরশ্ছেদ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ কমাবার ব্যবস্থাটা যদি পৃথিবীতে কোথাও চালু থাকত, তাহলে আর দেখতে হ'ত না। অতি সহজ এবং সরল পন্থায় ও কাজটি সাধিত হ'ত এবং ভারত নিশ্চয়ই এতদিনে কবন্ধ-কাটার দেশ বলে পৃথিবীতে সম্মান না হোক ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।

বুঝতে ভুল হয় না। মনে হয় ভারতের প্ল্যানিংয়ের উদ্দেশ্য বোধ হয় ঐ পর্যন্তই আসল প্ল্যানিং যে ভারতে হচ্ছে না, শুধু প্ল্যানিংয়ের ভাঁওতা মেরে অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা হচ্ছে, তা এতই পরিষ্কার যে, বুঝিয়ে বলবারও বোধ হয় কোন দরকার হয় না, বেশী বলবার ত নয়ই।

ভারতের প্ল্যানিংয়ে যত সিমেণ্ট আর স্টিল প্রয়োজন তার অর্ধেকও দেশে তৈরী হয় না, প্রয়োজন অনুযায়ী বাইরে থেকেও আনা সম্ভব নয়; তবুও ভারতে প্ল্যানিং হচ্ছে বোধ হয় শুধুই প্ল্যানিংয়ের উদ্দেশ্যেই। সিমেণ্ট এবং স্টিল যখন যথেষ্ট নেই, তখন ও দুটি জিনিসের ব্যবহার যাতে সব চেয়ে ভালভাবে করা হয় প্ল্যানিংয়ে অবশ্যই সে রকম প্ল্যান থাকা উচিত ছিল। কিন্তু আসলে ও দুটি জিনিষ কিভাবে খরচ করা হচ্ছে তা আর কারও জানতে বাকি নেই। যে কোন আজে বাজে বাড়ীঘরও আজ সিমেণ্ট দিয়েই গেঁথে তোলা হচ্ছে, রাস্তায় পিচের বদলে অনেক জায়গায় কংক্রীট ঢালাই করেই রাস্তা তৈরী করা হচ্ছে, রেলের প্ল্যাটফর্ম ভেঙ্গে ফেলে নূতন করে বা সম্পূর্ণ নূতন নূতন প্ল্যাটফরমও তৈরী হচ্ছে ঐ সিমেণ্ট দিয়েই। বড় বড় এক একটা কাজের উপরে অনেক অস্থায়ী বসতবাড়ী, অফিস বাড়ী বা কুলি কোয়ার্টার, কাজটি শেষ হয়ে গেলেই যা হয়ত ভেঙ্গে ফেলতে হবে, তাও আজ গেঁথে তোলা হচ্ছে ঐ সিমেণ্ট দিয়েই, অন্য কিছু দিয়ে নয়। সিমেণ্টের বদলে চুন-সুরকির গাঁথ্‌নি যে বাড়ীঘরের পক্ষে কিছু খারাপ জিনিস নয়, বরং হাজার বা দেড় হাজার বছরের পুরোনো বাড়ী ঘর দেশে যা আছে তার সবই ঐ চুন সুরকিরই গাঁথ্‌নি, তা জেনেও ভারতে প্ল্যানিং মারফৎ সিমেণ্ট বাঁচিয়ে ঐ চুন সুরকি বেশী করে ব্যবহারের কোন চেষ্টাই নেই। রাস্তায় কংক্রীট ঢালাই করা বা রেলের প্ল্যাটফরম তৈরী করাই যে আজ সব চেয়ে বড় প্রয়োজন নয়, একথা ভাববার প্রয়োজনও ভারতের প্ল্যানিংয়ের নেই। স্টিলের ব্যাপারেও ঠিক তাই, হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ টন স্টিল ঐ ভাবেই অপ্রয়োজনীয় কাজেই বেশী ব্যয়িত হচ্ছে;—রেলের প্ল্যাটফরমের উপর শেড তৈরী করবার কাজেই ব্যয় করা হচ্ছে ঠিক যখন ঐ স্টিলের অভাবেই রেলের ওয়াগন বা বগী তৈরী বন্ধ হয়ে আছে। এই ধরণের আরও বহু অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ যা ভারতে যথেষ্ট পাওয়া যায় না, তাও ঐ একই ধরণের প্ল্যানিং মারফৎই খরচ করে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। অথচ সিমেণ্ট বা স্টিলের উৎপাদন বৃদ্ধি করাই যে ভারতের প্ল্যানিংয়ের সর্বপ্রথম কর্তব্য তা এখনও, আজ দশ বৎসর পরেও, প্ল্যানিং কর্তারা ঠিকমত বুঝতে

পেরেছেন মনেও হয় না। গত দশ বৎসরে সিমেণ্টের উৎপাদন যা বৃদ্ধি করা হয়েছে তা একান্তই নগণ্য; আর স্টিলের ত প্রায় কিছুই হয়নি, অথচ ওদুটি জিনিস তৈরীর কাঁচামালের ভারতে কোন অভাবই নেই, বরং অতি প্রচুর পরিমাণেই রয়েছে। আশাকরি তাই ভারতের প্ল্যানিং যাঁরা বুঝতে পারেন না, কেউ আর তাঁদের হিংসুটে বলে পাশ কাটাবার চেষ্টা করবেন না।

প্ল্যানিং ভারতে ঠিকই হচ্ছে এবং পুরোদমেই যে হচ্ছে তাতেও কোন সন্দেহ করবার কিছুই নেই। যতসব সেরিমনি, কনফারেন্স, কমিটি বা বিশেষজ্ঞ আমদানি দেখে ব্যাপারটি খুবই পরিষ্কার বুঝা যায়। আরও বেশী বুঝা যায় যে, অত সব কমিটি, কনফারেন্স আর বিশেষজ্ঞদের মতের ফাইল চাপা পড়বার ফলেই, অনেক বিশেষ বিশেষ কাজও ঐ সিমেণ্ট আর স্টিলের উৎপাদনের মতই বিশেষ এগোতে পারছে না। বর্তমান ভারতে জনসংখ্যার চাপ যে রকম বেশী, আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ যে অতি বেশী, সে বিষয়ে অজ্ঞ বোধ হয় কেউই নেই। যে কোন অধমেরই, যার কিছু মাত্র মাত্রাজ্ঞান আছে, তারই বুঝতে অসুবিধা নেই যে এই জনসংখ্যার চাপ না হোক, জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ কমাতে না পারলে অর্থনৈতিক উন্নতির কোন আশাই ভারতের নেই। যত ভাল প্ল্যানিংই হোক না কেন আর যত ভালভাবেই তাকে সফল করে তোলা যাক না কেন, ভোগযোগ্য দ্রব্যের বৃদ্ধির চেয়ে ভোগীদের সংখ্যাই যদি বেশী বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিংবা সমান সমানই থেকে যায় তাহলে সাধারণভাবে সাধারণ লোকের উন্নতির কোন আশাই আর থাকে না। সরকারীভাবেও ভারতে প্রতি দশ বৎসরে প্ল্যানিং মারফৎ যতখানি ধনবৃদ্ধির হিসাব কষা হচ্ছে, প্রতি দশ বৎসরে শতকরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও তার চেয়ে বিশেষ কম নয়। ফলে সহস্র প্ল্যানিংয়ের পরও ভারতের গড়পড়তা উন্নতির যে কোন আশাই নেই, সে ত অতি সাধারণ অঙ্কশাস্ত্রের ব্যাপার। তাই আজ ভারতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ কমাবার চেষ্টাই হওয়া উচিত যে-কোন ধরণের উন্নতিমূলক প্ল্যানিংয়ের সর্বপ্রথম কর্তব্য। এই মহান কর্তব্য কাজটি যে কর্তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ করেনি, তাও নয়। তবে কিনা সহজিয়া কোন পন্থা নেই বলেই বোধ হয়, কাজটি বেশী এগোচ্ছে না। সোজাসুজি শিরশ্ছেদ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ কমাবার ব্যবস্থাটা যদি পৃথিবীতে কোথাও চালু থাকত, তাহলে আর দেখতে হ'ত না। অতি সহজ এবং সরল পন্থায় ও কাজটি সাধিত হ'ত এবং ভারত নিশ্চয়ই এতদিনে কবন্ধ-কাটার দেশ বলে পৃথিবীতে সম্মান না হোক ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।

দেশের দারিদ্র্যই জন্মহার বৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ, সে বিষয়েও প্রায় দ্বিমত নেই। দারিদ্র্যের কারণে মানুষ যখন অন্য সব রস থেকে বঞ্চিত হয় তখন সে ঐ সহজলভ্য আদিরসের সাহায্যেই কোন রকমে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করে, জন্মহার বৃদ্ধিও হয় সেই কারণেই। ব্যাপারটা গণ্ডগোলেরও সেই জন্যই। দারিদ্র্য কমানোই প্ল্যানিংয়ের আসল উদ্দেশ্য, অথচ দারিদ্র্য আগে কমাতে না পারলে জন্মহারও কমবে না, প্ল্যানিংয়েরও কোন মানে হবে না। ইংরেজিতে যাকে বলে vicious circle (পাপচক্র), তাই আর কি! কোন্‌খান থেকে আরম্ভ করা যায়, কোন্‌টা আগে করা দরকার সেটাই সমস্যা। তবে চেষ্টাও যে হচ্ছে না তাও বলি না, আর কাজটি যে খুবই দুঃসাধ্য তাও ত বুঝাই যাচ্ছে। তবুও কোন কাজ করতে হলে এক জায়গায় অবশ্যই আরম্ভ করতেই হবে। আরম্ভ হয়েওছে, এবং সনাতন সর্বরোগহর বক্তৃতা মারফৎই। ভারতের মহিলা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অধীনে ভারতের স্বাস্থ্যবিভাগই ঐ কাজটি চালাচ্ছে;—যেন মেয়েদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই ঐ কাজটির একমাত্র প্রয়োজন। ভারতের মহিলা স্বাস্থ্যমন্ত্রী বৎসরে অর্ধেক সময়ের বেশী বিদেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ান। শোনা যায়, তিনি নাকি বিভিন্ন দেশে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিগুলো আয়ত্ত করে বেড়াচ্ছেন। তারপর যখন দেশে ফিরে আসেন তখন দেশের বিভিন্ন মহিলা সমিতিতে বক্তৃতা করে তিনি তাঁর লব্ধজ্ঞান বিতরণ করেন। কিন্তু তিনি না জানলেও দেশের অন্যদের জানতে বাকি নেই যে, যে-সমস্ত মহিলার সাথে তিনি মেশেন বা যে সমস্ত মহিলা তাঁর বক্তৃতা শোনাবার সৌভাগ্য রাখেন, তাঁরা কেউই ওবিষয়ে অজ্ঞ নন, বরং বিশেষজ্ঞই। আর সাধারণ বা অসাধারণ প্রচারকার্যের দ্বারা সবচেয়ে বেশী যেটুকু আশা করা যায়, তা হচ্ছে ঐ মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের মধ্যেই জন্ম-নিয়ন্ত্রণ জ্ঞানের প্রসার। অথচ সেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে ঐ বিদ্যা কিছু কম থাকলেও যে আসল সমস্যার কোন ইতর বিশেষ হয় না, তাও বোধহয় তিনি বুঝেন না। কোটিতে কোটিতে যারা ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে তারা শিক্ষিতও নন, মধ্যবিত্তও নন—মধ্যবিত্তরা ভারতের জনসংখ্যার এক নগণ্য অংশমাত্র।

তাই যত অসুবিধাই হোক না কেন, যদি সত্যিসত্যি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে হয়, তাহলে সেটা ঐ আইনের সাহায্যেই করতে হবে। ছেলে মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স বাড়িয়ে দিতে হবে আরও অনেক, বিবাহ করবার পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে সার্টিফিকেট নিতে হবে। একটির বেশী

দুটি বিয়ে কাউকে করতে দেয়া হবে না। প্রয়োজন হলে সন্তান উৎপাদনের সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়ে বেশীর উপর ট্যাক্স বসাতে হবে। দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তদের আইন বলেই সন্তানজন্ম দেবার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া যেতে পারে। এ সবই খুব কঠিন ব্যাপার, ইলেকসনে ভোট নষ্ট হবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট, তাই ওপথে কেউই আর এগোতে চাচ্ছেন না, শেষপর্যন্ত বক্তৃতাই একমাত্র ভরসা। অবশ্য মুসলমানদের বাদে অন্য সকলের জন্য এক সঙ্গে একটার বেশী বিয়ে না করবার একটা আইন ভারতে পাশ হয়েছে, অন্য উদ্দেশ্য ঠিকই; কিন্তু তা নিয়ে দেশে খুব অসন্তোষও যে হয়েছে তাও নয়। তাই সত্যিকারের সদিচ্ছা থাকলে যে আরও এগোন যেত, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। আসলে ঐ সিরিয়াসনেসেরই যখন অভাব তখন বেশী কিই বা হওয়া সম্ভব! বড় বড় ড্যাম, ব্যারেজ, দালান কোঠা, আর কারখানা ইত্যাদি যে সকল জিনিস তৈরী করলে কাজও হবে, দেখে লোকের চক্ষুও চড়কগাছ হবে, আর বিদেশীরাও সার্টিফিকেট দেবে প্রচুর, তারই কিছু কিছু তৈরীর কাজই আজ ভারতে প্ল্যানিং মারফৎ এবং প্রপাগাণ্ডা সহকারে আরম্ভ হয়েছে সবচেয়ে বেশী। ভারতের প্ল্যানের সফলতাও তাই একেবারে গ্যারান্টিড, কোন ভয় নেই!

তবুও ভারতে যে প্ল্যানিংয়ের কাজ হচ্ছে না সে কথা বলা উচিত নয়। কাজ অবশ্যই হচ্ছে এবং আগামীতেও হবে। তাই এহেন প্ল্যানের কাজগুলি যে কিহেন প্ল্যানে হচ্ছে সেটা অবশ্যই বুঝবার চেষ্টা করতেই হবে। আর প্ল্যানিং মারফৎ যেসব কাজ হচ্ছে, তা দেখতে না পেলেও, শুনে শুনে অন্তত অনেকেরই মাথা খারাপ হবার উপক্রম; তাই কাজগুলি একটু তলিয়ে বুঝাও দরকার। প্ল্যানিং মারফৎ কাজ যে হচ্ছে তার প্রমাণ ত রয়েইছে ঐ শত শত কোটি টাকা খরচ হবার মধ্যে; কিন্তু আসলে সে কাজগুলি যে কি সেটাই জানা দরকার।

শোনা যায় প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানিংয়ের কাজ নাকি শেষ হয়েছে, এবার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হবে। দুটো পুরো পরিকল্পনার কাজ যখন শেষ হয়েছে, তখন অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে অনেক কাজ হয়েছে। কিন্তু যদি প্রশ্ন তোলা যায় যে, ভারতের বৃহত্তম নগরী কলকাতার উন্নতির জন্য বা নাগরিক জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আনবার জন্য কলকাতা করপোরেশন কি বৃহৎ বৃহৎ কাজগুলি করেছে কেউ দেখেছেন কি? কে কি উত্তর দেবেন জানি না। ভারতের বৃহত্তম নগরীর করপোরেশন এলাকাটি নিশ্চয়ই প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার বাইরে ছিল না! কলকাতা করপোরেশন

এলাকা কেন, যারা অজ পাড়াগাঁয়ে বাস করেন, তারাও নিশ্চয়ই পরিকল্পনার কাজ কলকাতার নাগরিকদের চেয়ে বেশী দেখেন নি। তবুও প্ল্যানিং হচ্ছে এবং হতে থাকবেও। আর তার মাহাত্ম্য শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা অবশ্যই হবে।

তবে প্ল্যানিংয়ের প্রয়োজন নেই একথা অবশ্যই বলা চলে না, প্রয়োজন অতি অবশ্যই আছে। সাধারণের জন্য না হোক, অসাধারণ যাঁরা পরিকল্পনা করেছেন তাঁদের জন্য আছেই। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পরই সদম্ভে ঘোষণা করা হয়েছিল, আগামী তিন বৎসরের মধ্যে,—মানে ১৯৫০ সালের মধ্যে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে। তারপর ১৯৫০ সালে যখন কাজটি মোটেই করা সম্ভব হলনা তখন ঐ তারিখটি আরও দুবছর পেছিয়ে দিয়ে করা হল ১৯৫২ সাল। মানে, ১৯৫২ সালে ভারত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবেই, তাতে আর কোন ভুল নেই। একেবারে 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' দেশ হয়ে যাবে। ১৯৫২ সাল যখন পার হয়ে গেছে তখন ভারত যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েই গেছে, তাতে সন্দেহ করবার মত মূর্খ দেশে থাকতেই পারে না। সরকারীভাবে সেই সফলতার দাবিটি আর জোর গলায় করা হয়না সত্যিই, কিন্তু আরও সত্যিকথা হচ্ছে যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার তারিখটি আর পেছিয়েও দেয়া হয়নি। কিন্তু ১৯৫৬ সালের শেষে যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ প্রায় শেষ হয়েছে তখন বাইরে থেকে খাদ্য আমদানির যে চুক্তি ভারত করেছে, যার মাল ডেলিভারী আসবে ১৯৫৭ সালেও, তার মোট পরিমাণ ১৯৪৭ সালের চেয়ে কিছু কম নয়। আর ইতিমধ্যে কোন বছরই খাদ্য আমদানির পরিমাণ কিছু কমতিও হয়নি। তাই খট্‌কা লাগে। তবে খট্‌কাও কিছু নয়, প্ল্যানিংওয়ালারা যখন বলছে, আর আমদানির হিসাবও পাচ্ছি, তখন খাদ্যে ভারত যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েই গেছে, তাতে আর ভুল কিছুই নেই। এখন এই স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার বেশী খাবারটা ভারতের হজমের গোলমাল সৃষ্টি না করলেই বাঁচি! (১৯৫৭ সালের পর থেকে খাদ্য আমদানী আরও অনেক বেড়ে গেছে এবং ক্রমশই বাড়ছে।)

খাদ্য এখনও যথাপূর্বং আমদানি করতে হচ্ছে বলেই প্ল্যানিং ফেল হয়েছে কিছুই কাজ হয়নি, তাও মোটেই সত্যিকথা নয়। প্ল্যানিং ঠিকমতই হচ্ছে এবং যথেষ্ট সুফলও দিচ্ছে,—খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলেও দেশে আর তা নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্যও হচ্ছে না, সবাই প্ল্যানিংয়ের মাহাত্ম্য শুনেই ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। আর যাঁরা প্ল্যানিং আঁটছেন তাঁদের ত কথাই নেই, তাঁরা ত আছ

স্বীকারই করেন না যে দেশ এখনও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি! বাইরে থেকে খাদ্য আমদানি করবার অজুহাত হিসাবে তাঁরা আজ বলছেন, 'ফুড রিজার্ভ বিল্ড আপ' করবার জন্যই আমদানি। খুব প্ল্যানমাফিক কথাবার্তা বলা হচ্ছে না কি? প্ল্যানিংয়ের প্রয়োজন ভারতে বোধ হয় ঐ কারণেই। আজকাল অধিক খাদ্য ফলাও এর কথা বলবার সময় প্ল্যানিংওয়ালারা যে কথাটি বলেন তাও শোনবার মত। "শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেই সব হলনা, বিদেশে চালান দেবার মত খাদ্যশস্য আমাদের উৎপাদন করতে হবে", যেন ভারত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েই গেছে, এখন আরও বাড়াবার কথাটা বলা হচ্ছে শুধুই বিদেশের সাহায্যের জন্য। সবই খুব প্ল্যান করে কথাবার্তা বলা, তাই প্ল্যানিং দরকার। খাদ্যশস্যের দর উর্ধ্বমুখী হতে হতে দিন দিন যেরকম আকাশে উঠছে, তা দেখিয়েও আর কেউই বলতে সাহস রাখে না যে ভারত খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি মোটেই। দেশে যথেষ্ট খাদ্যশস্য থাকলে ফালতু ফাঁপা টাকার কল্যাণেও যে তার দর খুব বেশী উপরে ওঠান সম্ভব নয়, অর্থনীতির কিছুমাত্র জ্ঞান যাদের আছে, তারাই সেটা বুঝতে পারে। টাকা বেশী থাক্‌লেই চাল, ডাল, আটা, লোকে বেশী খায় না।

ভারতের প্ল্যানিং যে সাফল্যের চরমে পৌঁছে গেছে তার আর একটি প্রমাণ হচ্ছে বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধিতে। গত চৌদ্দ বৎসরে এবং দুটি প্ল্যানিংয়ের সাহায্যেই দেশে বেকারের সংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি করা গেছে, সে ত এক অতি শুভ লক্ষণ! শুভ লক্ষণ বলছি এই জন্যই যে এই রেটে বেকারী বাড়তে থাক্‌লে আর বেশী প্ল্যানিংয়ের প্রয়োজন হবে না; দেশের বেকাররাই তখন প্ল্যান করে একটা কিছু করে বসবে, প্ল্যানিং করার এত হাঙ্গামা চুকিয়ে দেবে। কিন্তু তবুও বলব যে প্ল্যানিংয়ের প্রয়োজন আছে বা ছিল। ওটি না থাক্‌লে, ঐ অশ্বডিম্বটি দেখাতে না পারলে কি ভারতের মূর্খ সাধারণ শান্ত থাকত, না শ্রীজহরলালের বাদশাহীতেই শান্তি থাকৃত! দেশের লোক শান্ত আছে বলেই না শ্রীজহরলাল অতি শান্তিতেই দুনিয়া চষে বেড়াতে পারছেন! দুনিয়াকে লম্বাই চৌড়াই শোনাতে পারছেন, দুনিয়াতে একজন কেউ-কেটা হয়ে গেছেন! প্ল্যানিংয়ের প্রয়োজন এই জন্যই, অন্য কিছু নয়।

তবে প্ল্যানিংয়ের কাজ যে কিছুই হচ্ছেনা তাও নয়, প্ল্যানমাফিক করাও হচ্ছে অনেক কিছু। ডি, ভি, সি; ভাকরা নাঙ্গাল থেকে আরম্ভ করে কম্যুনিটি প্রজেক্ট বা ভিলেজ একস্‌টেনসান ব্লক পর্যন্ত অনেক কিছু ব্যাপারেই প্ল্যানমাফিক

কাজ হচ্ছে। তবে কমুনিটি প্রজেক্ট বা ভিলেজ এক্সটেনসান ব্লক ব্যাপারগুলো যে কি, কি তাদের উদ্দেশ্য তা অনেকেরই মত আমিও যেমন বুঝিনি, এক বন্ধু যিনি ঐ সব করে বেড়াচ্ছেন তাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি যে, তিনিও আমারই মত বুঝেছেন। বল্লেন, উদ্দেশ্য একটি অবশ্যই আছে, তবে ঠিক যে কি তা আমিও বুঝিনি,—ইলেকশনও হতে পারে, দেশের উন্নতিও অসম্ভব নয়। তবে আপাততঃ যা দেখছি তাতে মনে হয় কিছু ধন বণ্টনই হচ্ছে প্রধান উদ্দেশ্য ;—অনেকে টাকা পেয়ে হাতের লোক হয়ে থাকছে। সমাজতন্ত্রী ভারতে ধন বণ্টন ব্যাপারটির উপর যে বিশেষ জোর দেয়া হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! তাই কিছু কিছু ঐ ধরনের কাজ হচ্ছে।

তবে কাজের চেয়েও বেশী যেটা হচ্ছে, প্ল্যানিংয়ের সেটাই আসল এবং বিশেষত্ব। যে কাজগুলো হচ্ছে সেগুলো প্ল্যানিং না থাকলেও হতে বাধা ছিল না, বরং বেশীই হ'ত; কিন্তু কাজের চেয়েও বেশী যেগুলো হচ্ছে তা ঐ একমাত্র প্ল্যানিংয়ের কল্যাণেই সম্ভব। প্ল্যানিং না থাকলে কখনই হ'ত না। রেলের উন্নতির জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে; টাকা খরচের অজুহাতে ভাড়াও বাড়ান হচ্ছে মুহুর্মুহু, কারও কিছু বলবার নেই। আর কাজ হচ্ছে ইণ্টার ক্লাসকে সেকেণ্ডে পরিণত করা, সেকেণ্ডকে ফার্স্টে এবং ফার্স্টকে এয়ারকণ্ডিসনে পরিণত করা। এয়ারকণ্ডিসণ্ড্ থার্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাসের স্লিপিং কোচ, সিনেমা দেখান গাড়ী আরও অনেক রকমের নূতন কায়দা। তবে কিনা প্যাসেঞ্জারদের অবস্থা এখনও সেই বহু পুরাতন কায়দামাফিকই চলছে—হাণ্ডেল ধরে নয়ত ছাদে চড়ে চলার মধ্যে! কাজের চেয়ে বেশী এই ধরণের অনেক কাজ প্ল্যানিংয়ের কল্যাণে আজ সম্ভব হচ্ছে, ভারতের প্ল্যানিংয়ের উদ্দেশ্যও হচ্ছে ঐ কাজের চেয়ে বেশী কাজ করা। দেশে যথেষ্ট অর্থ নেই, তাই শিল্পের উন্নতি আশানুরূপ এগোচ্ছেনা, কিন্তু তাই বলে শিল্প উন্নয়নের চেয়েও বেশী দরকারী কাজটি প্ল্যানিং মারফৎ না করে ছাড়া যায় না! অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের নামে তাই প্ল্যানিং-কর্তারা শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের কাজ সবচেয়ে বেশী জোরের সাথে আরম্ভ করেছেন। কোন শিল্পটি কোথায় স্থাপন করতে হবে সেইটেই হচ্ছে প্ল্যানিংয়ের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। ফলে যে শিল্পটি যে জায়গায় স্থাপন করলে সবচেয়ে সস্তায় এবং ভাল কাজ দিত, সেকথা ভাববার আজ আর কোন প্রয়োজন নেই। যত বেশী খরচাই হোকনা কেন, বিশেষ বিশেষ জায়গায় বিশেষ বিশেষ শিল্প স্থাপন করতেই হবে, এই হচ্ছে আজ ভারতের প্ল্যানিংয়ের

প্রকাশ্য নির্দেশ। কাজ করাও হচ্ছে সেই অনুযায়ীই এবং কাজ এগোচ্ছেও সেই অনুপাতেই। অবশ্য প্ল্যানিংয়ের এই ধরণের প্রকাশ্য নির্দেশের পেছনে বিশেষ কোন গোপন প্ল্যানিং রয়েছে কিনা সেটা এখনও প্রকাশ পায়নি। তবে ভাব দেখে যেন কেমন কেমন মনে হয়, বড় বড় অনেক কিছুই যে আজ রাষ্ট্র-ভাষাভাষী এলাকায় নিয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছে কিনা, তাই।

রাস্তাঘাট, রেললাইন, নদীরপুল, ড্যাম, ব্যারেজ, ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন—এসব কোথায় হবে বা কোন্‌টি আগে হবে, তা সবই ঠিক করে দিচ্ছেন ঐ প্ল্যানিংওয়ালারা—প্রকাশ্যভাবেই এবং ঐ একই পদ্ধতিতেই। গঙ্গার উপর একটা পুল তৈরী হবে, গঙ্গার উত্তর এবং দক্ষিণের রেলপথের সংযোগ করবার জন্যই। ফরাক্কায়, মোকামায় এবং আরও অনেক স্থানে ঐ পুলটি স্থাপন করবার দাবি উঠল নানা অজুহাতে। কোথায় করা হবে সে বিষয়ে অনেক আলোচনা হল, হৈ হল্লা করা হল ; এবং শেষ পর্যন্ত ঠিক হল বিহারের মোকামা ঘাটে পুলটি তৈরী হবে। পুল তৈরী করবার সুবিধা মোকামাতে কতখানি আছে তা অবশ্য বিশেষজ্ঞরাই চিন্তা করবেন ; কিন্তু মূর্খেরাও যেটুকু বুঝে তা হচ্ছে এই যে, গঙ্গার উপর পুলের প্রয়োজনটি শুধুমাত্র উত্তর বিহারের কুলিদের কলকাতা আসবার সুবিধার জন্যেই নয় ; ভারতের প্রায় বিচ্ছিন্ন অংশ আসাম এবং উত্তর বাংলার সাধারণের সুবিধার জন্যও। এবং উত্তর বাংলা ও আসামের পাট এবং চায়ের কলকাতা বন্দরে আসবার সুবিধার জন্য ত বটেই। প্ল্যানিং মারফৎ যা করা হয় তা সব সময়েই ভারতের বৃহত্তর স্বার্থেই করা হয় নিশ্চয়ই ; আর প্ল্যানিংয়ের সুবিধাও হচ্ছে যে এত চক্ষুলজ্জারও দায় থাকে না। তাই আজ মোকামাতেই গঙ্গার উপর পুল তৈরী হয়েছে ;—উত্তর বিহারের কুলিদের কলকাতা আসতে কষ্ট করে স্টিমারে গঙ্গা পার হতে হয়, সেই জন্যেই! উত্তর বঙ্গ আর আসামের অ-রাষ্ট্রভাষী হতভাগাদের সুখের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, তাদের কথা বেশী ভাববার প্রয়োজনই বা কি! কিন্তু ঐ উত্তর বাংলা আর আসামের স্বর্ণসূত্র পাট আর সুগন্ধি চা দ্রব্যটি কলকাতা আসতে ফরাক্কা ছেড়ে মোকামা মারফৎ আরও আড়াইশত মাইল ঘুরে আসতে হলে যে, ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ বৃহত্তর না হয়ে অনেক সংকীর্ণই হতে পারে, সেকথাটাও ভেবে দেখবার আজ আর কেউই নেই। সব প্ল্যানিং দেখে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছে। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে গণেশ ত অনেক দিন থেকেই উল্টো হয়েই বসে আছেন, তার উপর বিদেশে বিক্রয়-

যোগ্য এই প্রধান জিনিস দুটির রেলভাড়া বৃদ্ধি মারফৎ দর আরও চড়ে গেলে গণেশের অবস্থা যে, সেই স, সে, মি, রা-ই হয়ে দাঁড়াবে, সে কথাও ভাব্বার আজ আর প্রয়োজন নেই।

আসামের তেলের জন্যে রিফাইনারী স্থাপনের ব্যাপারে আজ যে ইয়ার্কি আরম্ভ হয়েছে, তাও ঐ একই কারণে। আসামে রিফাইনারী বসান হবেনা, রিফাইনারী বসাতে হবে কলকাতায় নয় ত বিহারে। বিহারেই আসল ইচ্ছা; (শুধু ইচ্ছা নয় বিহারেই রিফাইনারী বসান সুরু হয়েছে।) তবে চক্ষু লজ্জায় যদি বাধে তাহলে কলকাতায়ও বসতে পারে,—আসামও জব্দ হবে, আসামী বাঙ্গালী স্বার্থের খোঁচাখুঁচিও চাঙ্গা থাক্‌বে। সব দিকেই লাভ। বিশেষজ্ঞরা পেট্রলের বাজার এবং by product এর কথা বিবেচনা করে কলকাতাতেই রিফাইনারী বসাবার মত দিয়েছিলেন; কিন্তু তাও হবার নয়। রিফাইনারী বসাতে হবে বিহারের বারৌনীতে। যদি পেট্রলের বাজার এবং by product-এর কথাই চিন্তা না করা হয় তাহলে আসামে রিফাইনারী বসিয়ে ভারতের অন্য সব স্থানের প্রয়োজন মত বেশী দামী অল্প পরিমাণের পেট্রল না এনে, অন্যস্থানে রিফাইনারী বসিয়ে কম দামী বেশী পরিমাণের ক্রুড অয়েল আনবার কি যে সুবিধা হতে পারে তা মূর্খসাধারণের বুদ্ধিতে বুঝা কঠিন।

প্ল্যানিং মারফৎ এই ধরণের কাজের চেয়েও বেশী কাজ অতি অবশ্যই হচ্ছে। আর অনেক কাজ যে বেশী প্ল্যানিংয়ের জন্যই হচ্ছে না তাও খুবই পরিষ্কার। ভারতের স্বর্ণডিম্ব প্রসবকারী হংস কলকাতা বন্দর গঙ্গার উপর অবস্থিত। কলকাতার গঙ্গার সঙ্গে উপরের আসল গঙ্গার সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে অনেক দিন আগেই; ফলে ক্রমেই কলকাতা বন্দরের অবস্থা দিন দিনই অবনতির পথে। বড় বড় জাহাজ আসা একেবারেই বন্ধ বা খুবই কঠিন। ইংরেজ আমলেও কলকাতার এই দুরবস্থা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা দেখা গিয়েছিল; যার ফলে কিনা, ডায়মণ্ড-হারবার ক্যানেল নামে ডায়মণ্ড-হারবারের পাশ কাটিয়ে এক বিরাট ক্যানেলের পরিকল্পনা করা হ'য়েছিল। স্বাধীন ভারতে ঐ সব ইংরেজী প্ল্যানের কথা আর কেউ ভাবছেন না, নূতন নূতন বড় বড় প্ল্যান নিয়েই সবাই ব্যস্ত। অথচ কলকাতার গঙ্গায় জল সরবরাহকারী উপনদীগুলোর উপরই যতসব বাঁধ তৈরীর কাজও হচ্ছে। ময়ূরাক্ষী, দামোদরের কাজ ত প্রায় শেষেরই কাছে, কংসাবতীতেও কাজ আরম্ভ হচ্ছে খুব তাড়াতাড়িই। উপরের জলের অভাবে গঙ্গা যে আরও মজে যাবে এবং যাচ্ছেও, সে বিষয়েও

চিন্তা করার কোন বিশেষ তাগাদা প্ল্যানিং কমিশনের আছে, মোটেই মনে হয় না। ফরাক্কাতে বড় গঙ্গার উপর বাঁধ তৈরী করে কলকাতার গঙ্গায় স্রোত বহাবার চেষ্টাকেও তাই নানা বাজে অজুহাতে ঠেকিয়ে রাখা হচ্ছে। ভারতের প্ল্যানিং এইভাবেই হচ্ছে। শুধু স্বর্ণডিম্ব প্রসবকারী হংসের পেট চিরে সব ডিমগুলো বের করে নিতেই যা দেরী! (সামনে ইলেকশন (১৯৬২) সম্ভবত তাই কিছুদিন থেকে ফরাক্কা বাঁধের কাজ শীগ্‌গীরই সুরু হবে এ ধরণের প্রপাগাণ্ডা আরম্ভ হয়েছে।)

প্ল্যানিং মারফৎ যে সব কাজ করা হয়, তার কোন্‌টি আগে করা প্রয়োজন, এবং কোন্‌টি পরে করলেও চলতে পারে, তা নিশ্চয়ই গভীর চিন্তা সহকারেই ঠিক করা হয়,—অনেক মাপজোঁক, হিসাব নিকাশ, বিশেষজ্ঞদের মতামত ত নিশ্চয়ই নেওয়া হয়। কিন্তু এত করবার পরও এই কাজের 'প্রায়রিটির' ব্যাপারটা যে কি রকম খামখেয়ালীভাবে করা হয় তারই একটা খুব বড় দৃষ্টান্ত হাতের কাছেই আছে। ভারতীয় রেলের কোন কোন লাইনকে ইলেকট্রিফিকেশন করে ইলেকট্রিক ট্রেন চালু করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই ব্যবস্থাটি চালু হলে নাকি সেই সব লাইনে রেলের যাত্রী বহন ক্ষমতা আরও অনেক বেড়ে যাবে। হাওড়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত ইলেকট্রিফিকেশনের কাজ এই বাবদই আরম্ভ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, হাওড়া থেকে বর্ধমান লাইনের প্রয়োজনটিই কি সবচেয়ে বেশি নাকি? খবর ত যা জানি, তাতে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ সেকসান এবং শিয়ালদহ স্টেশন, শুধু হাওড়া থেকে কেন ভারতের যে কোন স্টেশন থেকে অনেকগুণ বেশি যাত্রী বহন করে। দৈনিক হাওড়া স্টেশনে যেখানে খুব বেশি হলেও পঞ্চাশ ষাট হাজারের বেশি যাত্রী যাতায়াত করে না, সেখানে শিয়ালদহ স্টেশনে প্রায় তুলাখ যাত্রী যাতায়াত করে (৭ই জুলাই ১৯৬১তে প্রকাশিত এক সংখ্যাতত্ত্ব মতে শিয়ালদহ দিয়ে দৈনিক তিন লক্ষ তিরিশ হাজার লোক যাতায়াত করে)। শিয়ালদহ শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর মধ্যে একটি সবচেয়ে বেশি যাত্রীবহুল স্টেশন। অথচ ইলেকট্রিক ট্রেনের ব্যবস্থা প্রথমে করা হচ্ছে হাওড়া স্টেশন থেকে। ব্যাপার কি? শিয়ালদহ থেকে দার্জিলিং এবং শিলংয়ের সোজা লাইন বন্ধ হয়ে যাবার ফলে আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের আর শিয়লদহে বিশেষ আসতে হয় না, ঠিকই। বর্তমানে হাওড়া-দিল্লী পথেই ঐ যাত্রীদের যাতায়াত বেশি, তাও খুবই সত্যি কথা। কিন্তু সত্যিই

কি শুধু ঐ সব লোকদের দেখাবার জন্যই ইলেকট্রিফিকেশনের কাজ আগে হাওড়ায় আরম্ভ করা হয়েছে? এর উত্তর কে দেবে জানিনা। ভারতীয় রেলের উচ্চ পদস্থ একজনের সঙ্গে একদিন আলাপ হয়েছিল, ব্যাপারটি তাঁকে জিজ্ঞেস করায়, তিনি যা বলেছিলেন তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ও সব প্ল্যান ট্ল্যান কিছু না, এক একটা ডিপার্টমেণ্টের উপরওয়ালাদের খেয়ালখুসী মতই সব কিছু কাজ হয় বা হয় না। এরকম অনেক কাজও নাকি হয়, অনেক বড় বড় কাজও, যার হয়ত কোন প্রয়োজনই নেই। তবু সে কাজগুলি হয়, কারণ, বড় দুজন অফিসারের মধ্যে রেষারেষি রয়েছে; তাঁরা নিজ নিজ অধিকারে বড় বড় কাজ দেখাতে চান, শুধু এই কারণেই। বেশির ভাগ বিভাগের কাজেই মন্ত্রী পর্যায়ের তদারকি প্রায় নেই বল্লেই চলে। যদি কখনও তদারকির চেষ্টা হয় তাহলেও তারা বিশেষ পাত্তা পান না; কথার প্যাঁচ খেয়েই সরে পড়তে বাধ্য হন। এইভাবেই ভারতের প্ল্যানিং চলছে;—গঙ্গার পুলের ব্যাপারেও যেমন, রেলের ইলেকট্রিফিকেশনের ব্যাপারেও ঠিক তেমনি; কোথায় আগে দরকার তার সাথে কোন সম্পর্ক না রেখেই। (হাওড়া-বর্ধমান লাইনে ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হয়ে গেছে। তারপর আসানসোল-ধানবাদ লাইনটুকুও ইলেকট্রিফিকেশন করা হয়ে গেছে। মাঝখানে বাদ রয়েছে বর্ধমান-আসানসোল লাইনটুকু। শুধু তাই নয় হাওড়া বর্ধমান লাইনটুকুতে D. C. Current ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়েছে, এবং আসানসোল থেকে ব্যবস্থা হয়েছে A. C. Current-এর; এবং এইভাবেই প্ল্যানিংয়ের কাজ শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলেছে। লটারীতে টাকা পেয়েও যে কেউ কোথাও এধরণের অপব্যয় করেছে তা এখনও জানা যায়নি।)

তবুও বলব প্ল্যানিংয়ের কাজ যে হচ্ছে না, তা মোটেই নয়। কাজ হচ্ছে! অনেকগুলো কাজ আমি নিজেই দেখেছি। গত দশ বছরে ভারতের রাস্তায় অনেক ঘুরেছি, আসলে ঐ কাজগুলো দেখবার জন্যই। যতদূর হিসাব মনে পড়ে, তাতে মনে হয়, রেলগাড়ীতে ঘুরেছি কমপক্ষে পৌনে দুলাখ মাইলের উপর, আর মোটরেও সত্তর আশি হাজার মাইলের কম হবে না। প্রায় 'কাশ্মীর হতে কন্যাকুমারী এবং ইম্ফল হতে সিন্ধুর' মতই। বড় বড় অনেক কাজ বহুবারও দেখেছি, দেখতে ভাল লাগে সেই জন্যই। দেশ স্বাধীন হলে দেশে এধরণের বড় বড় কাজ অনেক অনেক হবে, তাই ত ছিল স্বাধীনতার ধারণা। তাই ভালভাবেই দেখবার চেষ্টা করেছি। কাজ হয়নি বা হচ্ছে না একথা কখনই বলব না; কাজ হচ্ছে। তবে কাজের চেয়েও বেশি কাজ যেগুলো

সেগুলোই হচ্ছে বেশি। আর অকাজ এবং কুকাজের ত অন্তই নেই। এ সবই ঐ প্ল্যানিং মারফৎই হচ্ছে, তাই কাজগুলো দেখেও আমার যা ধারণা হয়েছে সে খুব আশাপ্রদ মোটেই নয়। সব সময়েই মনে হয়েছে যে ঐ প্ল্যানিং আর প্রপাগাণ্ডার উপর জোর কিছু কম দিলে আসল কাজ আরও অনেক অনেক বেশি হতে পারত। প্রপাগাণ্ডা আর প্ল্যানিংয়ের ফলে ওল্টোই হয়েছে অনেক বেশি, আর আসল কাজ অনেক কম

ভারতের প্ল্যানিংয়ের একটি বড় বিশেষত্ব হচ্ছে যে, প্ল্যানিংয়ের কোন কাজে কত টাকা খরচা করা হবে সেই টাকার হিসেবটারই প্রচারকার্য হয় সবচেয়ে বেশি। টাকাগুলোর সদ্‌গতি হলেই সব ঠিকমত হয়ে যাবে ধরে নিতে হবে। কোন্ কাজে কত বিরাট টাকা খরচ করা হল সেটাই শোনান হচ্ছে অহরহ্। আসলে যেকাজটির পেছনে এই শ্রাদ্ধ কাজটি হল, তিনি কতদূর এগোলেন তার হিসাব খুব কমই জানান হয়। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার কাজেও বহু বহু কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে নিশ্চয়ই। ঐ টাকাগুলো দিয়ে সোনা কিনে পাহাড় তৈরী করলে সে পাহাড় যে প্রায় হিমালয়ের কাছাকাছিই যেত, তাও হয়ত সরকারী প্রপাগাণ্ডা ছবিতে এঁকে দেখান হয়েছে। আসলে কিন্তু খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ কাজটি কতখানি সফল হয়েছে, সেটা আর পরিষ্কারভাবে বলা হয় না। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করা হয় শুধুই ঐ 'রিজার্ভ বিল্ড আপ' করবার জন্যই। তাই বলছিলাম ভারতের প্ল্যানিংয়ের সফলতা ঐ টাকা খরচ করবার মধ্যে যতখানি আসল কাজ করবার মধ্যে ততখানি নয়। টাকার শ্রাদ্ধ ঠিকই হচ্ছে।

অনেক কাজ আমি নিজেই দেখেছি এবং আগেই বলেছি যে ভাল লাগে বলেই দেখেছি। কিন্তু কি হয়েছে বলতে পারব না। আজ কয়েক বৎসর থেকে যখনই কোন নূতন কাজ দেখতে যাই, আমার চোখে কাজের চেয়ে অকাজগুলোই বেশি ধরা পড়ে। কোথায় কি খুঁত হয়েছে, চুরি জুচ্চুরি হয়ে কিভাবে টাকা লুট হচ্ছে, অকর্মণ্যতা এবং অপদার্থতার ফলে কি অনিষ্ট হচ্ছে, বেহিসাবী এবং বেপরোয়া প্ল্যানিংয়ের ফলে কিভাবে টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ হচ্ছে, এই সবই সবচেয়ে প্রথমে চোখে পড়ে। চোখ যে ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই! তবুও এতসব প্ল্যানিং দেখেও যে একেবারে অন্ধ হয়ে যাইনি, সেটাও ঠিক। বুঝতে পারিনা যে কিছুমাত্র বিশেষ জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও ঐ সব দোষগুলো আমার চোখে এত সহজে ধরা পড়ে

কিভাবে? আমি কি ভারতের ঐ প্ল্যানিংওয়ালাদের চেয়েও বেশি চালাক হয়ে গেলাম নাকি? না তা মোটেই নয়; আমি মোটেই বেশি চালাক হয়ে যাইনি। আসলে দোষগুলো এত বেশি হচ্ছে এবং এত নগ্নভাবেই হচ্ছে যে আমার চেয়ে বড় মূর্খও যদি কেউ থেকে থাকে তবে তার চোখেও ধরা না পড়ে পারে না। ওগুলি নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়, কারণ তাহলে আলোচনার শেষ আর কখনই হবে না। তবুও একটু ইঙ্গিত দেবার জন্যই কিছু বলা দরকার।

অল্প কিছুদিন আগে উড়িষ্যার গভর্ণর কুমার স্বামী রাজা দামোদর ভ্যালীর কাজ দেখতে এসে বিপুলভাবে টাকার শ্রাদ্ধ কিভাবে হচ্ছে সে বিষয়ে একটু মন্তব্য করেছিলেন। ফল অবশ্য কিছুই হয়নি, বরং মূর্খদের উপদেশ দিতে গেলে যা হওয়া স্বাভাবিক, তাই হয়েছে। 'তিনি সংকীর্ণমনা দক্ষিণ ভারতীয়, উত্তর-ভারতের বড় বড় কাজগুলো পছন্দ করেন না;' এই সবই তাঁকে শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। কথায় কথা বাড়ে, এই ভেবেই তিনি হয়ত আর বেশি কথা বলেন নি। কিন্তু সত্যিই কি তিনি মিথ্যা বলেছিলেন? তিনি শুধুই টাকা অপব্যয়ের কথা বলেছিলেন; আমিও তাই শুধু ঐ ব্যাপারেই দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

দামোদর ভ্যালীর কাজের অংশ হিসাবেই বোখারোর থারমাল পাওয়ার স্টেশনটি তৈরী হয়েছে। ঐ স্টেশনটির কাজ চালাবার জন্য যারা বোখারোতে থাকবেন, তাদের বাসের জন্য অনেকগুলো ঘর বাড়ী তৈরী করে বোখারোতে একটি বেশ সুন্দর শহরও গড়ে তোলা হয়েছে। শহরটি যে কেউই দেখেছে, তারই ভাল লেগেছে, তাও জানি; কিন্তু আরও ভালভাবে জানি যে, দর্শকদের অনেকেরই জানা নেই যে বোখারো শহরের বাড়ীগুলো তৈরী করতে কি পরিমাণ টাকার শ্রাদ্ধ হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর কোয়ার্টারগুলোর তৈরী খরচা হয়েছে প্রত্যেকটি বাবদ ষাট হাজার টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্যেকটির জন্য চল্লিশ হাজার টাকা, আর তৃতীয়শ্রেণী গুলোর জন্য পঁচিশ হাজার টাকা। এগুলো বাদেও সাধারণ শ্রমিকদের জন্য অনেকগুলো ব্যারাক ধরণের বাড়ীও করা হয়েছে। নীচে সমতলে যথেষ্ট জায়গা থাকা সত্ত্বেও বহু টাকা ব্যয়ে পাহাড়ের গা কেটে কয়েকখানা বাড়ী তৈরী করা হয়েছে, শুধু মাত্র সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যই,—রসজ্ঞানের পরিচয় দিতেই। ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার আর কেরাণীদের প্রত্যেকের জন্য ষাট হাজার, চল্লিশ হাজার আর পঁচিশ হাজার

টাকার বাড়ী তৈরী করে অবশ্য আদর্শই স্থাপন করা হয়েছে। তাই অপব্যয়ের কথা না তোলাই ভাল। এখন ভালোয় ভালোয় দামোদর ভ্যালীর কাজটা শেষ হলে তবেই বাঁচোয়া—টাকার অভাবে আসল ড্যামগুলোর কাজ নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে যাবে না, আশাকরি। তবে দ্বিতীয় ধাপে যে ড্যামগুলি তৈরী হবার কথা ছিল সেগুলি তৈরীর কথা আর বিশেষ শুন্‌তেও পাওয়া যাচ্ছে না, তাও খুবই সত্যি।

আর কুকাজ যে কি ধরণের হচ্ছে তাও একটু বল্লেই বুঝা যাবে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ভারতে পরপর দুটো অদ্ভুত ধরণের রেল দুর্ঘটনা হয়ে গেল। দুটোই গাড়ীসুদ্ধ নদীগর্ভে পতনের ব্যাপার। দুটোতেই নাকি পুলের তলা ধুয়ে গিয়েছিল; আর অন্ততপক্ষে একটি পুলের তৈরীতেও নাকি গলদ ছিল। অনেককেই আজ প্রশ্ন করতে শুনি, এরকম হল কিভাবে? দেখবার কি কেউ ছিলনা নাকি? জানি না; তবে আমি যে ও গাড়ীদুটোর একটাতেও ছিলাম না, সেত বুঝাই যাচ্ছে। তবুও কিছু যে না জানি তাও নয়। তাই বলছি: ১৯৫৩ সালে উত্তর বঙ্গের কুচবিহারে হঠাৎ এক ভীষণ বন্যা হয়েছিল। ঐ বন্যায় কুচবিহার জেলার পুব দিকটাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক বাড়ী ঘর নষ্ট হয়েছিল, রাস্তাঘাটের অবস্থা হয়েছিল শোচনীয়। এই বন্যার কয়েকদিন পরে কুচবিহার থেকে ধুবড়ী যাচ্ছিলাম বাসে করে ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে। কয়েক জায়গায় রাস্তা এবং পুল ভেঙ্গে গেছে দেখেছি। এক জায়গায় নীচু মাঠের উপর একটা বড় কালভার্ট ছিল, নূতন কংক্রীটের তৈরী। দেখলাম কালভার্টটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পড়ে আছে। জলের স্রোত আটকা পড়ে কালভার্টের উত্তর দিকে বেশ বড় একটা গর্ত হয়েছে। বাসটিকে নৌকায় করে পার করতে হবে, তাই দেরী হচ্ছিল। কালভার্টটি ছোট নয়, বেশ বড় এবং নূতন কংক্রীটের তৈরী। তাই আমার মত মূর্খদের মনে যা সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, তাই হয়েওছিল। সন্দেহ হয়েছিল যে কংক্রীট ঢালাইতে উপযুক্ত পরিমাণ সিমেন্ট দেয়া হয়নি। আবারও তাই মূর্খজনদের মতই সিমেন্টের পরিমাণ আঁচ করবার চেষ্টা করছিলাম, ভাঙ্গা এক খণ্ড কংক্রীটের টুকরোকে আর একখণ্ড কংক্রীটের টুকরোর উপর আঘাত করে। আমি যখন এই পরীক্ষাকার্যে ব্যস্ত, সেই সময় জনৈক বিজ্ঞ সহযাত্রী আমার স্থূলবুদ্ধি বুঝতে ভুল না করে কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, "ও কি করছেন? কি পরিমাণ সিমেন্ট দেয়া হয়েছে তারই পরীক্ষা করছেন বুঝি? তবে ত বুঝতেই পেরেছেন যে ওতে

সিমেণ্ট বিশেষ নেই। একটা টুক্‌রো আর একটা টুকরোর উপর মারতেই যেভাবে শত টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে, তা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে সিমেণ্টের কারবার বিশেষ হয়নি। কিন্তু আসল জিনিসটি আপনার চোখে এখনও পড়েনি, ঐ কংক্রীট ব্লকগুলোর ভেতর কোথাও লোহার রডও নেই,—বিনা লোহার রডেই ওগুলো ঢালাই করা হয়েছিল”। সহযাত্রী ভদ্রলোক যে বিশেষ বিনয়ী ভদ্রলোক সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। তা না হলে তিনি আমাকে সোজাসুজি ‘ইডিয়ট’ বলেই সম্বোধন করতে পারতেন। এত অল্প এবং মোটা বুদ্ধি নিয়ে এত বিদ্যা ফলাতে যাওয়া কারুর উচিত নয় সেট আমিও বুঝি। তবুও স্বভাবদোষ, কি করা যাবে! তবে আসল প্রশ্নটির উত্তর আমার এখনও জানা হয়নি, বিনা লোহার রডে রিএনফোর্স্‌ড কংক্রীট ঢালাই করা যায় কিনা? ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানে সেরকম কোন ব্যবস্থা আছে কি না, তা আমার জানা হয়নি। অন্য কোথাও না থাক্‌লেও ভারতে যে আছে তা ত দেখেইছি। সেদিন মনে মনে ভেবেছিলাম ভাগ্যিস বন্যা হয়েছিল, তাই কংক্রীটপুলের মৃত্যু ফাঁদটি ধরা পড়ে গেছে। তা নাহলে ওপথে যখন যাতায়াত আছে, কোনদিন হয়ত বাসসুদ্ধ আমিই ঐ কংক্রীট পুলের শিকার হয়ে খবরের কাগজে নাম ছাপাতাম। এখন আমি একটু বিজ্ঞ হয়েছি, তাই গাড়ীসুদ্ধ শত শত লোককে অতলে তলিয়ে যেতে দেখলেও আর বিশেষ অশ্চর্য হই না।

ভারতে আজ এসব দেখবার কেউই নেই, স্বাধীন দেশ ত! প্ল্যানিংওয়ালারা টাকা খরচ করেই খালাস, টাকার পরিবর্তে কি তৈরী হচ্ছে সেটুকু দেখে নেবার প্রয়োজন আছে তাঁরা মনেই করেন না। কিংবা হয়ত স্বাধীনতার দশ বৎসরেই ভারত এত এগিয়েছে, এত চালাক হয়ে গেছে যে, ও দেখে নিতে গেলেও বিশেষ লাভ হয় না, চালাকে চালাকে ধূলপরিমাণ হয়ে যায়। ঐ বিনা লোহার রডে এবং বিনা সিমেণ্টে রিএনফোর্স্‌ড্ কংক্রীটের পুল তৈরী হবার অভিজ্ঞতাটি আমি কোন দিনই ভুলতে পারি নি। তাই পরে যখন কলকাতা এসেছিলাম তখন আমার কলকাতার ঠিকানা থেকে ভারত সরকারের রাস্তাঘাট সংক্রান্ত দপ্তরে একটি চিঠি দিয়ে ব্যাপারটা তাঁদের গোচরে আনবার চেষ্টা করেছিলাম। দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কতটা পেরেছিলাম তা আজও জানি না, কারণ আমার চিঠির উত্তর ত দূরের কথা একখানা প্রাপ্তি-স্বীকার পত্রও আজ পর্যন্ত পাইনি। কতসব বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারে ভারতীয় মন্ত্রীরা সর্বদাই ব্যস্ত থাকেন, এত ক্ষুদ্র ব্যাপারে নজর দেবার সময় তাঁদের থাক্‌তেই

পারে না। তার উপর ভারতীয় পার্লামেন্টের উদারচেতা মহান সদস্যরা ত রয়েইছেন। কোন মন্ত্রী যদি ঐরকম পুলের তলা না থাকার কারণে রেলগাড়ী-সুদ্ধ অতলে তলিয়ে যাওয়ায় পদত্যাগ করে পালাতে চান, তাহলে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করে এত সব স্তুতি বন্দনা করেন যে দেখে লজ্জা পেতে হয়।

ভারতের প্ল্যানিং কর্ম এইভাবেই চলছে, যার ফলে ভারতে কনট্রাকটারী ইঞ্জিনিয়ারিং নামে এক নূতন বিজ্ঞানের আবিষ্কার হয়েছে। এ বিজ্ঞানের বিশেষত্বই হচ্ছে, বিনা লোহার রডে বা বিনা সিমেন্টে রিএনফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীটের কাজ করা, এবং আরও অনেক কাজই বিনা জিনিসে করা। দেশে স্টিল এবং সিমেন্টের যেরকম অভাব চলছে তাতে এ ধরণের ইঞ্জিনিয়ারিং আবিষ্কার না হলেই বা পরিকল্পনার কাজ এগোবে কিভাবে? দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যত সিমেন্ট আর স্টিল প্রয়োজন হবে তার অর্ধেকও দেশে ঐ সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করা সম্ভব হবে না বা বিদেশ থেকেও আনা সম্ভব হবে না, একথাটি মোটামুটি প্রায় স্বীকার করে নিয়েই দ্বিতীয় পরিকল্পনার কল্পনা তৈরী করা হয়েছে। তাই এই নূতন আবিষ্কার কনট্রাকটারী ইঞ্জিনিয়ারিং ইচ্ছে করলেই বন্ধ করে দেওয়াও খুব সহজ কাজ হবে না।

এই ধরণের ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের আর একটি অভিজ্ঞতা বলছি। আসাম লিঙ্ক লাইন নামে নূতন যে লাইনটি তৈরী করা হয়েছে, তার খবর এবং কাজের সফলতার বাহাদুরীর সংবাদ অনেকেই বহু বহুবার শুনেছেন। এই রেল লাইনটি নাকি ভারতের সঙ্গে আসামের যোগাযোগ সাধনে খুবই প্রয়োজন ছিল, তাতেও সন্দেহ নেই। বোধ হয় ঐ অতি-প্রয়োজনের অজুহাতেই এই লাইনের মাত্র সত্তর মাইল নূতন রেলপথ তৈরী করতেই প্রায় দশ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। লাইনটি অতি সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তৈরী করা হয়েছে। এই লাইনের দুধারের দৃশ্যাবলী এতই সুন্দর যে ভারতের আর কোথাও আছে বলে জানিনা, অন্তত আমার চক্ষে পড়েনি। তাই মাঝে মাঝে, কারণে এবং অকারণেও আমি ঐ লাইনটি বা পাশের মোটর রাস্তাটি ধরে যাতায়াত করি। কিন্তু কি কারণে জানিনা, তৈরী হবার পর থেকেই ঐ লাইনটি প্রায় প্রতিবৎসরই বর্ষার সময় ভেঙ্গে চুরে অকেজো হয়ে যায়। গত '৫৪' সালে ঐ লাইনটি দুবার ভেঙ্গে চুরমার হয়েছিল। দ্বিতীয় বারের ক্ষতিটাই হয়েছিল ভীষণ, প্রায় একটিও পুল আর আস্ত ছিল না।

লাইনটির ঐ দুরবস্থা দেখবার জন্য আমিও একবার ওদিকে গিয়েছিলাম,— একটু অদ্ভুত খেয়াল আমার আছে, তাই। শিলিগুড়ি থেকে রওনা হয়ে কিছু মোটরে, কিছু হেঁটে, কোথাও পিলারবিহীন রেল পুলের ঝোলা লাইনের উপর দিয়ে, কোথাও হেঁটে বা নৌকায় নদী পার হয়ে, এবং হাতীতে চড়ে একটি নদী পার হয়ে পুরো তিন দিনে আলিপুর-দুয়ার গিয়ে পৌঁছেছিলাম। মোটকথা লাইনটির দুরবস্থা ভালভাবেই দেখেছিলাম।

আমি ইঞ্জিনিয়ার বা কোন বিশেষজ্ঞ নই, তবুও ঐ লাইনের দুর্বলতার যে কারণটি সেদিন আমার মাথায় ঢুকেছিল; তাই বলছি: ও জায়গার মাটি খারাপ কোন সন্দেহ নেই; আর অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড়ী নদীর উপর দিয়েই তৈরী করতে হয়েছে ঐ লাইনটিকে। এই পাহাড়ী নদীর বেশির-ভাগগুলোতেই বছরে বেশির ভাগ সময়ই জল থাকে না, আর পাহাড়ে বৃষ্টি হলেই অতি অদ্ভুত তোড়ে জল নেমে আসে। আমি ঐ রাস্তাটি বা রেল লাইনের যতগুলি পুলকে ভাঙ্গা দেখেছিলাম, তার আশেপাশে অনেক বড় বড় গাছ পড়েছিল দেখেছি। অনেকগুলোকে পুলের নীচে আট্‌কে থাকতেও দেখেছি। মনে হয়েছে ঐ গাছগুলো জলের স্রোতে ভেসে এসে পুলে বাধা পেতে জলের বেগ বেড়ে গিয়ে পুলসুদ্ধ ধ্বসিয়ে দিয়েছে। মোটকথা জলের প্রবাহের তুলনায় ঐ পুলগুলি অনেক ছোট ছিল, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই ছিল না। আমার মনে হয়েছিল লাইনটি ঠিকমত রাখতে হলে পুলগুলিকে উপরে এবং পাশে (Overhead & Side Clearance) আরও অনেক বাড়াতে হবে; এবং জল আরও অনেক জায়গা দিয়ে বের করে দেবার জন্য অন্য কালভার্টের সংখ্যা আরও বাড়ান দরকার। অনেক টাকা খরচ করে এবং বহুদিনের চেষ্টায় লাইনটি আবার চালু হয়েছে। আমি আবারও ওদিকে যাতায়াত করেছি, এবং দেখে সুখী হয়েছি যে ভারতের ইঞ্জিনিয়াররা সবাই আমার চেয়ে অনেক বিজ্ঞ এবং চালাক ব্যক্তি। তাই আমার মোটাবুদ্ধির ধারণা মতে, তাঁরা কোন কাজই করেন নি, তাঁদের সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যেই কাজ গুছিয়েছেন। মানে, ঠিক আগের প্ল্যান মতই সব পুলগুলি তৈরী করে রেখেছেন; এবং বোধ হয় একটি কালভার্টও বাড়ান নি। তাঁদের বুদ্ধির তারিফ করতেই হবে, একেবারে প্ল্যানিংয়ের বুদ্ধি। মাঝে মাঝে যদি ওগুলো নাই ভাঙ্গে, তাহলে আবার কাজ হবে কিভাবে? সাম্যের দেশ ভারত, তাই কাজ হলেই না ধন বণ্টন হয়ে অনেকের পকেটে যাবার

সুযোগ পায়! প্ল্যানিং করা ইঞ্জিনিয়ার, তাঁদের ত আর এই বণ্টনের কথাটি বাদ দিয়ে কাজ করা চলে না!

সরকারী পর্যায়ে প্ল্যানিং মারফৎ আরও এক ধরণের কাজ হচ্ছে, কর্মচারীদের বাসের জন্য বাড়ী তৈরী করা। অন্য সব লোক কোথায় কোন গাছতলায় থাক্‌ল সেদিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন নেই; সরকারী কর্মচারীরা ঠিকমত থাক্‌ল কিনা সেটাই আগে দেখা দরকার। দেশটা ত সরকারের খাস তালুক কি না! এইসব ভাড়া দেবার ফ্লাট-বাড়ী তৈরীর কাজেও কখনও সিমেণ্ট বাঁচিয়ে চুন সুরকির গাঁথনির চেষ্টা হচ্ছেনা। দেশে যেটুকু সিমেণ্ট বা স্টিল আছে তা ঐ সরকারী প্ল্যানেই প্ল্যানমাফিক কাবার করবার চেষ্টা হচ্ছে। অন্য সবাইকে তাই হাপিত্যেশে অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কি! আরও মজা হচ্ছে এই যে কলকাতা শহরের মধ্যেই দেখতে পাই, সরকারের তৈরী এই সব ভাড়া দেবার বাড়ী, শ'য়ে শ'য়ে খালি পড়ে রয়েছে, ভাড়া দেবার বিশেষ তাগাদাও নেই। এক বছর দু'বছর খালি পড়ে থাকে এরকম বাড়ী ত প্রায় সবই। আর কতকগুলো এমন প্ল্যানে তৈরী হয়েছে যে, তাতে কোনদিনই ভাড়াটে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কাগজেও এসব ব্যাপার নিয়ে লেখালেখি হতে দেখেছি কিন্তু অবস্থার উন্নতি হতে দেখিনি। তবে ভাড়াটে আসুক আর নাই আসুক বাড়ীগুলো তৈরী হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, এবং ঐ অতি-প্রয়োজনীয় সিমেণ্ট অপব্যয় করেই। (বর্তমানে অবশ্য বাড়ীগুলো আর খালি নেই।)

শুধুমাত্র সিমেণ্ট এবং স্টিলের সরবরাহ বাড়াতে পারলেই যে সরকারী প্ল্যানের চেয়ে বহুশত বা সহস্রগুণ বেশি বাড়ীঘর দেশময় তৈরী হতে পারে সে কথাটা ভেবে দেখবার কোন প্রয়োজন যে প্ল্যানিংওয়ালাদের আছে, তা মনেই হয় না। বরং দেশে যৎসামান্য স্টিল বা সিমেণ্ট যা আছে, ক্রমেই তার দর বাড়িয়ে সাধারণের নাগালের বাইরে নিয়ে নিজেদের প্ল্যান আঁটাই হচ্ছে ভারতীয় প্ল্যানের বাহাদুরী। ঠিক এইভাবেই বেসরকারী পুঁজিকে কোণ-ঠেসা করে সরকারী প্ল্যানের তাঁবে আনার চেষ্টাও হচ্ছে ঐ প্ল্যানিংয়েরই একটা অঙ্গ। একটা গণতন্ত্রী দেশ, যেখানে বেসরকারী পুঁজি খাটাবার কোন বাধা নেই, সেখানে প্ল্যানিং হওয়া কখনও সম্ভব নয়। তাই ভারতে আজ প্ল্যানিং করতে গিয়েই ঐ বেসরকারী পুঁজি ঠিকমত কাজে লাগাবার ব্যাপারে যত হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়েছে এবং ক্রমেই আরও হবে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

আর প্ল্যানিং মারফৎ সরকারীভাবে যেসব শিল্প বা অন্য সব জিনিস গড়ে তোলা হচ্ছে তাতে খরচ স্বভাবতই অনেক অনেকগুণ বেশি হচ্ছে এবং ওগুলো চালাবার খরচ হচ্ছে আরও বেশি। ফলে প্ল্যানিংয়ের মাল প্ল্যান সাহায্যেই লোককে গছাতে হচ্ছে, অনেকগুণ বেশি দামেই। তবুও সরকারী প্ল্যানের কারবারে লোকসানের অন্ত নেই। তবে সরকারের লোকসান মানেই অন্য কারুর লাভ, সেটা বুঝা শক্ত নয়। তাই ও নিয়ে মাথা ঘামাবার লোকও বেশি নেই।

সরকারী পর্যায়ে প্ল্যানিংয়ের কাজ এইভাবেই হচ্ছে। বেসরকারী ভাবে যেসব কাজ হচ্ছে তাও নেহাৎ কম নয়। তবুও সেগুলো নিয়ে আলোচনার বিশেষ কিছু নেই, কারণ সেগুলো যে শুধুই টাকা খরচের হিসাবের মধ্যেই শেষ হচ্ছে না, সেত নিশ্চয়ই,—বেসরকারী পুঁজি ত আর গৌরীসেনের টাকা নয়! কালোবাজারে রোজগার করতে হলেও অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তাই ট্যাক্সের টাকার চেয়ে কালোবাজারের টাকার উপর বেশি মমতা থাকাই স্বাভাবিক। বেসরকারী কাজের বিষয় আরও কিছু জানি যা হচ্ছে কিনা ঐ বেশি প্ল্যানিংয়ের ফলে অনেক কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। যেকোন কাজ আরম্ভ করতে হলেই প্ল্যানিংয়ের অনুমতি চাই, এমন কি চালু কারখানাকে বাড়াতে হলেও ঐ অনুমতি ভিন্ন করা সম্ভব নয়। আর মাপজোখ হিসাব নিকেশ শেষ করে অনুমতি দান করতে করতেই অনেকেরই নিকেশ হবার উপক্রম আর কি! তা ছাড়া যত সব পারমিট আর কণ্ট্রোল ভেদ করে আজ একটা নূতন কিছু গড়ে তোলা যে কি দুষ্কর হয়েছে সে বিষয়েও বেশি না বলাই ভাল। সিমেণ্ট আর স্টিলের পারমিট পেতেই অনেকের কর্ম শেষ।

ভারতে প্ল্যানিংয়ের গতি এবং প্রকৃতির বিষয় কিছু জ্ঞান যাঁদের আছে, তাঁরাই জানেন যে, প্ল্যানিং মারফৎ ভারতের অগ্রগতিতে একটা সাম্যের ভাব আনবার চেষ্টা হচ্ছে। যার মোটা মানেই হচ্ছে কিনা প্রগতিশীল, কর্মক্ষম এবং শক্তিশালী প্রদেশ কটিকে আটকিয়ে রেখে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি প্রদেশকে এগিয়ে দেওয়া। সব প্রদেশ যদি নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী এগিয়ে যেতে পারে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের সিংহাসন নিয়ে মারামারি হবার সম্ভাবনা, তা বুঝা কঠিন নয়। তবুও ট্যাক্স্ আদায়ের ব্যাপারে অতি-প্রয়োজনীয়, এমন কি বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের ব্যাপারেও যারা বলতে গেলে

একমাত্র ভরসা, প্ল্যানিং মারফৎ উন্নয়নের বিশেষ কোন ব্যবস্থা তাদের জন্যও নেই। বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের ব্যাপারে ভারতের মধ্যে পশ্চিম বাংলার স্থান শুধু বড় নয়, অনেক উর্ধে। আর তারপরই হচ্ছে কিনা আসাম। কিন্তু প্ল্যানিং মারফৎ উন্নতির জন্য সাহায্য যা বাংলা এবং আসামকে দেওয়া হয়, তা ঐ ফকিরের ভিক্ষার চাইতে বেশি কিছুই নয়। বাংলা যদিবা কিছু আদায় করে, আসামকে শুধুমাত্র কদলীই প্রদর্শন করা হয়। এ সবই করা হয় ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরেই, তাই প্ল্যানিং প্রয়োজন।

তবুও ভারতে প্ল্যানিং হচ্ছে প্ল্যানিং কমিশন তৈরী হয়েছে, এবং তাই দেখিয়েই দেশের মূর্খসাধারণকে ভেড়া তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এর পরও প্ল্যানিংয়ের কোন বাহাদুরী নেই একথা বলা আর মোটেই সম্ভব নয়। ভারতের প্ল্যানিং কমিশন সেরা চীজ, এবং সেরা প্ল্যানার শ্রীজহরলাল তার চেয়ারম্যান। সদস্যেরা চেয়ারম্যানের বাছাই করা সব মহাপুরুষ ব্যক্তি। ঐ সর্ববিদ্যাবিশারদ কমিশনের সদস্য হবার জন্য কোন বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন নেই—জায়গা বিশেষে দহরম মহরম থাকলেই যে কোন ভাগ্যবান ওখানের আসর জাঁকিয়ে বসতে পারেন। তাই স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক, ভবঘুরে রাজনৈতিক, বটতলাসিদ্ধ উকিল, আর কালোবাজারী মহাজন, সবাই ঐ কমিশনের সদস্য পদ লাভ করে সমান ইয়ার বনে গেছেন। আর কাজও করেছেন ঐ ইয়ারে ইয়ারে ইয়ার্কি করবার তালেই।

তবে প্ল্যানিং প্ল্যানিং বলে সোরগোল তোলা মানেই যে সাধারণের সাথে একটু রসিকতা করা এটা ভারতের প্ল্যানাররা জানলেও, জনসাধারণ মোটেই জানেন না কিংবা জানলেও বুঝেন না, এবং এইটেই হচ্ছে ভারতের প্ল্যানিংয়ের সব চেয়ে বড় বাহাদুরী। এই বাহাদুরীটুকু সম্ভব হচ্ছে এই জন্যই যে, বাবা প্ল্যানিং কখনও একলা আসেন না, সঙ্গে তার বাবাত ভাই প্রপাগাণ্ডা অবশ্যই থাকেন। ঐ প্রপাগাণ্ডা ভাইটিও সাম্যবাদী রাশিয়ার সভ্যতার আর এক বিরাট অবদান। দু'ভাইয়ের মধ্যে কে যে বড় আর কে যে ছোট, বলা কঠিন। প্ল্যানিংই বড় না প্রপাগাণ্ডাই বড়, তা আমি আজও বুঝাতে পারিনি। তবে এটুকু বুঝতে মোটেই ভুল করিনি যে, প্ল্যানিংয়ের আসল যা বাহাদুরী তা ঐ প্রপাগাণ্ডা ভাইয়েরই দৌলতে। প্রপাগাণ্ডা না থাকলে, বা একটু কম থাকলে, প্ল্যানিং ভায়া অনেক আগেই লাথি খেতেন। ভারতে প্ল্যানিং আর প্রপাগাণ্ডা সমান তালে চলেছেন। প্ল্যানিং ভাঁওতা মেরে বসে আছেন, আর প্রপাগাণ্ডা

তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নটবর বলে চালিয়ে দিচ্ছে। তাই ভারতের প্ল্যানিং যে কি চীজ, ওটি খায় না মাথায় দেয় তা আজও বুঝতে পারিনি।

এইভাবেই ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রপাগাণ্ডা মারফৎ শেষ করে দ্বিতীয়টায় হাত দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টির কল্পনা তৈরী করা হয়েছে আরও অনেক বৃহত্তর আকারে এবং প্রপাগাণ্ডাও আরম্ভ করা হয়েছে বহুগুণ বৃহত্তরভাবেই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কল্পনায় প্রথম স্থির হয়েছিল যে সরকারীভাবে মোট ৪৮০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে। এই বিরাট পরিকল্পনাটিকে কার্যে পরিণত করতে হলে যে বিরাট পরিমাণ সিমেণ্ট আর স্টিলের প্রয়োজন হবে, তার অর্ধেকও যে ঐ সময়ের মধ্যে দেশে তৈরী করা সম্ভব হবে না বা বাইরে থেকেও আনা সম্ভব হবে না, সে কথাটি এক রকম স্বীকার করে নিয়েই কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল ; তাই সিমেণ্ট আর স্টিলের কথা আর না তোলাই ভাল। কিন্তু ঐ বিরাট টাকাটি যে কোথা থেকে আসবে আর তার যা হিসাব কষা হয়েছে তাও মোটেই কম মজার কথা হয়নি। হিসাব মোটামুটি এই রকম : পরিকল্পনার পাঁচ বছরে উদ্বৃত্ত সরকারী আয়ের তহবিল থেকে সংগ্রহ করা হবে ১৪০০ শত কোটি টাকা, প্রতি বৎসর ১০০ কোটি টাকার নূতন ট্যাক্স এবং ১০০ কোটি টাকার নূতন ঋণ সংগ্রহ করে পাওয়া যাবে আরও ১০০০ কোটি টাকা। এই দুই মিলে মোট হবে ২৪০০ কোটি টাকা। আর বাকি ২৪০০ কোটি টাকার যা হিসাব দেওয়া হয়েছে সেটা একেবারেই প্ল্যানিংয়ের হিসাব। তাই সকলের বুঝবার জন্য নয়। যাই হোক বাকি হিসাবটা হচ্ছে এই রকম : ১২০০ কোটি টাকার ফালতু নোট ছাপান হবে (১২০০ কোটি টাকার ফালতু নোট ছাপিয়ে ১২০০ কোটি টাকার কাজ করা যায় এ বিশ্বাস একমাত্র ভারতের অতি-বিদ্বান প্ল্যানিংওয়ালাদের পক্ষেই থাকা সম্ভব আর কারুর নয়), ৮০০ কোটি টাকার সাহায্য বাইরে থেকে পাওয়া যাবে আশা করা হচ্ছে ইত্যাদি, এবং তারপরও বাকি ৪০০ কোটি টাকার কোন হিসাব দেওয়া সম্ভব হয়নি। অথচ সরকারী পর্যায়ে প্ল্যানিংয়ের খরচ পরে আরও প্রায় ৬০০ কোটি টাকা মত বাড়িয়ে মোট করা হয়েছে প্রায় ৫৪০০ কোটি টাকা —বাকি ৬০০ কোটি টাকার হিসাব দেবারও কোন প্রয়োজন নেই। মোটকথা পরিকল্পনা যখন কল্পনাতেই শেষ করবার জন্য এবং সাধারণকে বোকা বানাবার জন্যই তৈরী করা হচ্ছে তখন কল্পনাকে খাটো করলে চলবে কেন ? প্রপাগাণ্ডা চালান হবে ঐ কল্পনারই, তাই কল্পনার প্রসারতার অভাব নেই,—স্বপ্নে

যখন রসগোল্লা খাওয়া হবে তখন পেট পুরে খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিছুই এসব ইয়াকি নয়, শুধু ইলেক্‌শনে এবার ভোটটা পেলেই হয়, পাঁচ বছর আর মারে কে! এইভাবেই ভারতের প্ল্যানিং এগিয়ে যাচ্ছে এবং যেতে থাকবেও যত দিন না মূর্খ সাধারণ এসব প্ল্যান বুঝে ফেলে নিজেদের প্ল্যান নিয়ে কাজে এগিয়ে আসে। ইলেক্‌শন শেষ হয়ে গেছে, প্ল্যানিং করা নেতারা আবারও গদিতে আসীন হয়েছেন; তাই ক্রমেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানের কাজ পুরোটা হওয়া কখনই সম্ভব নয়। এখন নাকি ওর শাসটুকুকেই রূপ দেবার চেষ্টা হচ্ছে। আরও অনেক কিছুই শুনতে পাওয়া যাবে, তাতেও সন্দেহ নেই। [বর্তমানে (১৯৬১) দ্বিতীয়টিকে শেষ করে তৃতীয়তে হাত দেবার তোড়জোর হচ্ছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কল্পনাও ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। তাতে নাকি ১০০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।]

এসব প্ল্যানিংয়ের ধোঁকা পাকিস্থানে খুব বেশী হুজুগ তুলতে পারেনি, আর দেশের মধ্যে পাকিস্থানী প্রপাগাণ্ডা ভায়াও বেশ একটু দুর্বলই আছেন। তাই পাকিস্থানে মোটেই বুঝতে ভুল হয় না যে পাকিস্থান সম্মুখের চেয়ে পেছনের দিকেই এগোচ্ছে বেশী, উঁচু থেকে নীচুতেই পাকিস্থানের গতি। তবে এহেন সর্বরোগহর দাওয়াইয়ের সার্থকতা যে পাকিস্থানী বড়কর্তারাও একেবারে বুঝেন না, তাও নয়। তাই মাঝে মাঝে তাঁদেরও ঐ প্ল্যানিংয়ের অঙ্ক কষে কথা বলতেও শোনা যায়। একদিন খবরের কাগজে দেখেছিলাম, পূর্ববঙ্গে এ বৎসর কত লক্ষ, কত হাজার, কত শত, কত পাউণ্ড কলার ফসল বেশী উৎপন্ন হয়েছে, তারই একটা হিসাব দেওয়া হয়েছে। ফসলটা নেহাৎ কলার ফসল, তাই হয়ত মূর্খসাধারণ বিশেষ খেয়াল করেনি। কলার ফসলকে 'কলার' রসিকতা বলেই বুঝে নিয়েছে। অন্য কোন ফসলের ব্যাপার হলে মূর্খদেরও অন্তত দু-একজন মুখ খারাপ না করে থাকতে পারত না,—হয়ত খারাপ কথা বলেই জিজ্ঞেস করে বসত, ঐ কলার হিসাবটি পেলে কোথায় হে? তবে ভারতের প্ল্যানিংয়ের সাফল্য যে ভারতের বড় কর্তাদের কি রকম বাঁচিয়ে চলেছে, সেটা নিশ্চয়ই পাকিস্থানী বড়কর্তাদের চোখ এড়িয়ে যায়নি। তাই হঠাৎ যদি একদিন শুনতে পাই যে পাকিস্থানও প্ল্যানিং এঁটে বসে আছেন, আর প্রপাগাণ্ডা ভায়াকে ক্রিয়াও দিয়ে দিয়েছেন, তাহলে খুব আশ্চর্য হবারও কিছু থাকবে না। পাকিস্থানও তখন ভারতেরই মত হু-হু করে এগিয়ে যেতে

থাকবে আর আমার মত হতভাগারা দূর থেকে শুধু লক্ষ্য করবে, সে অগ্রগতি কোন্ দিকে এবং কি গতিতে। (বর্তমানে পাকিস্থানেও প্ল্যানিং হয়েছে, তবে প্রপাগাণ্ডাটা কিছু কম থাকায় ব্যাপারটাকে কিছুটা অহিংস বলেই মনে হয়— মানে এখনও কারও চোখ বা মাথা খেতে পারেনি।)

বিশ্বাসঘাতকদের উদ্বাস্তু রসিকতা

ভারতের স্বাধীনতা—সে এক অতি আশ্চর্যের ব্যাপার, অদ্ভুত ত বটেই তামাম দুনিয়ার ইতিহাসে এহেন উপায়ে স্বাধীনতা প্রাপ্তির অন্ত কোন ঘটনা আছে কিনা, জানিনা। অদ্ভুত এবং অত্যাশ্চর্য এ জিনিসটি সব দিক থেকেই। স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন যা ভারতে হয়েছিল, সেও যেমন অত্যাশ্চর্য, মানে ইংরেজের সাথে শত্রুতার চেয়ে প্রেমের মাধ্যমেই যা হচ্ছিল। সুবোধ বালকের মত ইংরেজের এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়াও ঠিক সেই রকমই আশ্চর্যের ব্যাপার। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হয়ত ছিল ঐ নির্ঝঞ্ঝাটে ক্ষমতাটুকু নিজেদের হাতে পাবার আশায় দেশোদ্ধারী দুটো দলের দেশটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়া। যার ফলে এক ভারত স্বাধীনতা পেয়ে দুটো হয়েছে, তাদের দলপতিদের স্বাধীনতা দেবার জন্যই। পৃথিবীর ইতিহাসে নিজেদের মাতৃভূমিকে স্বেচ্ছায় এভাবে ভাগ করে নেবার আর কোন নজির আছে বলে আমার জানা নেই। ভারতে সবই সম্ভব, ভারতের ইতিহাসটাই হচ্ছে একটা অদ্ভুত জিনিস, ভাল আর মন্দের জগাখিচুরী। সুদূর অতীতে ভারত জ্ঞানে বিজ্ঞানে, দর্শনে, কলায়, সংস্কৃতিতে এবং মনুষ্যত্বের ঐশ্বর্যে যেমন চরমে পৌঁছেছিল, বহুশত বৎসরের পরাধীনতার ফলে ঠিক ততখানিই, বোধহয় আরও বেশী নীচে নেমে এসেছিল। তাই ঐ অদ্ভুত স্বাধীনতা, ঐ আরও অদ্ভুত উপায়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতা, একমাত্র ভারতেই সম্ভব।

যুদ্ধে মার খেয়ে ইংরেজ যে অবস্থায় এসে পড়েছিল, যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর শক্তিদ্বন্দ্বে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে বিচক্ষণ ইংরেজ তার বৃহৎ স্বার্থের খাতিরেই ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। আর ভারতীয় নেতারা ইংরেজের সেই বৃহৎ স্বার্থ রক্ষার সহায়ক হিসাবেই নিজেদের মাতৃভূমিকে খণ্ডিত করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা আহরণ করেছেন। কিন্তু তাই বলে ক্ষমতা হাতে পেলে যে কাজটি সবচেয়ে বেশী করবার সুযোগ হয়, সেই বক্তৃতার সুযোগ, না ভারত না পাকিস্থান কোন পক্ষের নেতারাই কখনই ছাড়েন নি। অতি

নির্লজ্জভাবেই বক্তৃতা করে চলেছেন। বক্তৃতা করেই প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে তাঁদের স্বাধীনতা এক অতি অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য এবং আদর্শ চীজ। এতে কোন রক্তক্ষয় নেই, হিংসাদ্বেষ নেই। অনেক কিছুই যে নেই সে অতি সত্যিকথা, অত্যাশ্চর্য এবং অতি অদ্ভুত ব্যাপারও যে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। আর আদর্শস্থানীয় যে, সে ত অতি নিশ্চয় কথা—বহুশত বৎসরের পরাধীনতার ফলে ভারতে মনুষ্যত্বের ঐশ্বর্য যে পর্যায়ে নেমে এসেছিল সে পর্যায়ে স্বাধীনতার আদর্শ এর চেয়ে বেশী কিছু হওয়া কখনই সম্ভব নয়। মোট কথা, ভারতীয়েরা তাদের উপযুক্ত স্বাধীনতাই পেয়েছে, এবং সেই স্বাধীনতা পেয়ে নিজেদের খুবই গর্বিত অনুভব করছে। মাতৃভূমিকে খণ্ডিত করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা পাবার চেষ্টা করা ভারতীয় মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে আজ আর কোন নিন্দাজনক ব্যাপার নয়, বরং খুব গর্বেরই বস্তু। একটা দেশ বাহাদুরীর ফলে দুটো হয়েছে, সে যদি গর্বের না হয়, তাহলে আর কি বলা যায়! যদি দুটো না হয়ে দশটা হ'ত বা হয়, তাহলে গর্বও নিশ্চয়ই সেই অনুপাতেই বেড়ে যেত বা যাবে। অন্তত গর্ব করবার লোকের সংখ্যা যে অঙ্কের অনুপাতেই বেড়ে যাবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তাই বলছিলাম ভারতের স্বাধীনতা সত্যিই অতি অদ্ভুত, এবং আরও বেশী অদ্ভুত ঐ স্বাধীনতাওয়ালাদের আচরণ।

দেশটাকে ভাগ করা হয়েছে সাম্প্রদায়িক কারণে, হিন্দু মুসলমানদের সংখ্যানুপাতের ভিত্তিতে। যেরকম সহজ সরল এবং অহিংস পন্থায় দেশ ভাগ হয়ে স্বাধীনতা এসেছে, যার গর্বে ভারত এবং পাকিস্থানেরও ক্ষমতাশালী নেতারা প্রায় শূন্যমার্গে পৌঁছে গেছেন, আশা করা উচিত ছিল যে সেই আদর্শ স্বাধীনতার ফলে অন্যান্য অনেক সমস্যার না হোক, অন্তত সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু অবস্থা কি সত্যিই সেই রকম নাকি? সাম্প্রদায়িকতা শেষ হয়ে জাতীয়তাবাদের বন্যায় দেশ ভেসে যাচ্ছে কি? সাম্প্রদায়িকতার সব হাঙ্গাম মিটে গেছে কি? ভারতে অবশ্য যে গঠনতন্ত্র তৈরী হয়েছে তাতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টানদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করবার চেষ্টা হয়নি। সবাইকে সমানভাবে একটি মাত্র ভোটের অধিকারী করা হয়েছে। সম্প্রদায়গত কারণে কারুর কোন অধিকারেও বাধা জন্মাবার চেষ্টা হয়নি। কিন্তু আইনগত এই সমতাই কি সমস্যার সমাধান নাকি? পাকিস্থানে আবার এই সমতাটুকুও করা হয়নি, আইনের দিক থেকে পাকিস্থানের অ-মুসলমানদের একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবেই তৈরী করা হয়েছে। তবে ভারত বা

পাকিস্থানে এই আইনের প্রশ্নও আসল নয়। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, যার অজুহাতে দেশটাকে ভাগ করা হল, সে সমস্যা মিটেছে কি? ভারতের মুসলমান আর পাকিস্থানের হিন্দুরা, ভারত বা পাকিস্থানকে তাঁদের নিজস্ব বলে মেনে নিয়েছে কিনা, বা তাঁদের রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা ফিরে পেয়েছে কিনা, সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

অহিংস পন্থায় যে সমস্যার সমাধানে দেশকে ভাগ করে নেয়া হল, দেশ ভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অতি হিংস্র পন্থায়, আবারও সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হল। ১৯৫০ সালে আবার যে চেষ্টা হল তাও মোটেই অহিংস পন্থায় নয় আর এখনও যে সে চেষ্টা হচ্ছে না, তাও নয়। মাথা গুনতিতে কত বেশী বা কম লোক নিহত হল, এই যদি ধরা যায় হিংসা আর অহিংসার মাপকাঠি, তাহলেও ভারতের এই অহিংস সমাধানকে খুব বেশী সম্মান দেওয়ার উপায় নেই, কারণ নিহতদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। দুটো মহাযুদ্ধ বাদে, সত্যি সত্যি অন্য কোন যুদ্ধ বা হাঙ্গামায় ইদানীংকালে এত লোক নিহত হয়েছে কিনা সন্দেহ। (বৃটিশ পার্লামেণ্টে চার্চিলের বক্তৃতা অনুযায়ী, এক পাঞ্জাবের হাঙ্গামাতেই পাঁচলক্ষের বেশী লোক নিহত হয়েছে।) আর ঐ অহিংস সমাধানের ফলে যত লক্ষ কোটি লোককে আজ পর্যন্ত রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়েছে তার ত সীমা সংখ্যাই নেই। এই সহজিয়া স্বাধীনতা আনতে গিয়ে, হিংসা বা অহিংসা পন্থায়, মানে মারামারিতে বা উদ্বাস্তু হয়ে রাস্তা ঘাটে, বনে জঙ্গলে পড়ে যত লক্ষ লক্ষ লোক আজ পর্যন্ত মারা গেল ঠিক তত লোক একটা গোটা মহাযুদ্ধেও মারা গেছে কিনা সন্দেহ করবার অবকাশ আছে। তবে সুবিধা হচ্ছে এই যে তাঁদের হিসাব রাখবারও কেউই নেই। আর যত লোক ভিটেমাটি ছেড়ে গাছতলায় আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষুকে পরিণত হল, যত মেয়েকে তাঁদের দেহ বিক্রয় করে উদর পূর্তি করতে হল, তা গত দুটো মহাযুদ্ধ মিলেও সম্ভব হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তবুও অহিংসা যে বড় আসলী চীজ, বড় মোক্ষম ব্যাপার সেটা অস্বীকার করবার কোন উপায়ও নেই; কারণ ঐ বুলিটি ঝেড়েই দেশের বাকি লোকদের মাথা ঠাণ্ডা রাখা গেছে, তা না হলে গোটা দেশটাই হয়ত পাগল হয়ে যেত। অবশ্য মনুষ্যত্বের যে নীচু পর্যায়ে আজ ভারত বা পাকিস্থানের অধিবাসীরা নেমে এসেছে, তাতেই হয়ত আসল সুবিধাটুকু হয়েছে তা না হলে বোধহয় ওবুলিতেও কুলোত না। যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে যে ঐ সমস্যার সমাধান দেশ ভাগ করেও হয়নি, আজ

দশ (চৌদ্দ) বৎসর পরেও নয়। ভারত আর পাকিস্থানের সম্মুখে রয়েছে আজও সেই বহু পুরাতন সমস্যাটি, হিন্দু মুসলমানের সমস্যা—হয়ত কিছুটা নূতনভাবে, এই যা তফাৎ।

পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের পর লোক-বিনিময় হয়ে ওদিকটার সমস্যাটি খানিকটা মিটেছে ঠিকই, কিন্তু সবটা মেটান সম্ভব হয়নি মোটেই। সেই স্বাধীনতার গরমে গরমে যদি পূবদিকটাও আগুন লাগত, তাহলে কি হ'ত বলা যায় না; তবে আজ আর কোন মতেই ঐ পাঞ্জাবী পন্থায় সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তার উপর দেশকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করে নেবার পর ভারতীয় রাজনীতি হঠাৎ যেরকম ধর্মনিরপেক্ষ সতী সেজে বসেছে, সে কারণেও আজ আর পাঞ্জাবী দাওয়াই চালু করা সম্ভব নয়। লোক-বিনিময় দ্বারাই সব সমস্যার সমাধান হবে সে বিশ্বাস করাও কঠিন। অনেক ভারতীয় মুসলমান, এবং অন্তত কিছু কিছু পাকিস্থানী হিন্দুও যে নিজ নিজ দেশ ছেড়ে যেতে চাইবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে। তাই ঐ লোক-বিনিময় দ্বারাও নূতন সমস্যার সৃষ্টি করা ভিন্ন অন্য কোন লাভ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তবুও যে সব হিন্দু এখনও পাকিস্থান ছেড়ে চলে আসছে বা মুসলমানেরাও যদি ভারত ছেড়ে যায়, তাহলে ভারত এবং পাকিস্থানের অতি অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, সেই আগতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা; কারণ, ভারত খণ্ডিত হবার কারণই হচ্ছে তাঁদের ভিটেমাটি ছাড়ার কারণ। এই অতি বড় দায়িত্বটি, ভারত বা পাকিস্থান কিভাবে পালন করেছে বা করবার চেষ্টা করছে, সেটাও জানা দরকার।

পশ্চিম পাকিস্থান আর পশ্চিম ভারতে দাঙ্গার ফলে লোক-বিনিময়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। তাই ওদিকের হিন্দু-মুসলমান উদ্বাস্তুর সমস্যাটি আজ দশ (চৌদ্দ) বৎসর পরে আর খুব বেশী নেই। ওদিকের সমাধানটাও খুব কঠিন কাজ হয়নি। যত মুসলমান ভারত ছেড়ে পাকিস্থানে গেছে, প্রায় ততসংখ্যক হিন্দুও পাকিস্থান ছেড়ে ভারতে এসেছে, তাই সম্পত্তি অদল-বদল করে এক রকম মিটে গেছে। এখনও অল্প যেটুকু হাঙ্গাম রয়েছে, তা হচ্ছে ঐ ভারতে বা পাকিস্থানে ফেলে আসা সম্পত্তির পরিমাণ এবং মূল্য নির্ধারণ নিয়ে। পাকিস্থানের দাবি মুসলমানেরা অনেক বেশী টাকার সম্পত্তি ভারতে ফেলে এসেছে; আর ভারতের দাবি হিন্দুরা বহুগুণ বেশী মূল্যের সম্পত্তি পাকিস্থানে ফেলে এসেছে। কার দাবি যে বেশী সত্যি তা আজ বলা কঠিন। হিন্দুদের আর্থিক অবস্থা যে সাধারণত মুসলমানদের চেয়ে অনেকটাই ভাল ছিল, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই;

তাই মনে হয় হিন্দুরাই পাকিস্থানে বহু বেশী টাকার সম্পত্তি ফেলে এসেছে। তবে এ ব্যাপার নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার আজ আর কিছু নেই ; কারণ ও সমস্যার সমাধান আর কখনই হবে না। অন্ততপক্ষে ভারত আর পাকিস্থানের মধ্যে একটা যুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ও ব্যাপারের কোন সমাধানই আর সম্ভব নয়। আর যুদ্ধ বাধানও খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যুদ্ধ বাধলে শেষপর্যন্ত যে ভারত আর পাকিস্থান এক হয়ে যাবে না তার গ্যারান্টি দেওয়া কঠিন। ভারত এবং পাকিস্থানের বাদশাহরা এদিকটা যে চিন্তা করেন না, তাও নয় ; বরং একটু বেশীই করেন বলেই যুদ্ধের কথাটাই বেশী বলেন, কাজের দিকে আর এগোন না। নিজেদের গদি বজায় রাখতে হবে ত !

বর্তমানে উদ্বাস্তু সমস্যা যেটুকু সে হচ্ছে পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলারই সমস্যা ; এবং ঠিকমত বলতে গেলে ওটা আজ শুধুই পশ্চিম বাংলার সমস্যা। কারণ, পূর্ব বাংলা ছেড়ে হিন্দুরা যে হারে যাচ্ছে সে তুলনায় পশ্চিম বাংলা ছেড়ে মুসলমানেরা মোটেই আসছে না। ভারতের অন্য সব প্রদেশ থেকেও পাকিস্থানে আজ যে কয়জন মুসলমান যাচ্ছে, তাদের সংখ্যাও প্রায় নগণ্য। দেশ ভাগ হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার হিন্দুরা ক্রমাগতই চলে আসছে, এবং আগামীতেও যে আসতে থাকবে, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। তাই, উদ্বাস্তুদের সাহায্য এবং পুনর্বাসনের কি ব্যবস্থা ভারত বা পশ্চিম বাংলা সরকার করেছেন, তাই হচ্ছে আজ প্রথম এবং প্রধান বিবেচ্য। আগেই বলেছি, পশ্চিমে লোক বিনিময়ের মাধ্যমে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের যে সুবিধাটুকু হয়েছিল, পূর্বে সেটুকু কখনই হয়নি। আর এদিকের উদ্বাস্তু প্রবাহও প্রায় একমুখী, তাই সমস্যাটিও হয়েও উঠেছে অতি জটিল। লোক-বিনিময় না হয়েও যদি সমান হারে মুসলমানেরাও ভারত ছেড়ে চলে যেত, তাহলেও আগতদের পুনর্বাসনের জন্য জায়গাজমির বা বাড়ী ঘরের অভাব হ'ত না ; তাও হচ্ছে না। ফলে সমাধানও হচ্ছে না।

তবে সমস্যাটি যে শুধু এই কারণেই সমাধান হচ্ছে না তাও নয়, আসলে সমাধানের বিশেষ কোন চেষ্টাও হচ্ছেনা, তাই। চেষ্টা যেটুকু হচ্ছে তা ঐ সমস্যাকে পাশ কাটাবারই চেষ্টা, সমাধানের নয়। আজ পর্যন্ত কম পক্ষে ৪৫।৫০ লক্ষ হিন্দু পূর্ব বাংলা ছেড়ে ভারতে এসেছে, প্রায় আর কি পশ্চিম পাকিস্থান ছেড়ে যত হিন্দু এসেছিল, ততই ; কিংবা কিছু বেশীও হতে পারে। তাঁদের পুনর্বাসনের জন্যে মুসলমানদের ছেড়ে যাওয়া বাড়ীঘর ত নেই-ই, উপযুক্ত পরিমাণ

জায়গা জমিও নেই। অথচ, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুদের জন্য ভারত সরকার যত টাকা খরচ করেছেন পূর্ব বাংলার হিন্দুদের জন্য তত টাকাও খরচ করতে তাঁরা রাজী নন। পশ্চিম বাংলায় জায়গা ত নেই, পার্শ্ববর্তী বিহার বা আসামও জায়গা দিতে রাজী নয়। এমন কি বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলিও তাঁরা বাংলাকে ফেরৎ দেয়া দরকার মনে করেন না। অবস্থা ঠিক এই ধরণের : ভারত সরকার নিরপেক্ষ, বিহার, আসাম এবং অন্যান্য প্রদেশগুলো অনিচ্ছুক, আর পশ্চিম বাংলায় ক্ষমতার বাইরে। তাই আজ পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের অবস্থা ত্রিশঙ্কুপ্রায়, শুধুই শ্রীভগবান ভরসা। শ্রীভগবান অবশ্য ভারতীয় নেতাদের মত বিশ্বাসঘাতক বা অপদার্থ নন, তাই সাধ্য মত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে চলেছেন। তাঁর ভরসায় থাকলে অতি অবশ্যই একদিন সব সমস্যার সমাধান হবে নিঃসন্দেহে।

আজ পর্যন্ত ভারত সরকারের দৌলতে ঠিক কত সংখ্যক পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে, তা আমার সঠিক জানা নেই। শতকরা পনের বা ষোল জনের বেশী যে নয়, সে ত ভারত সরকারের ঐ কাজের সফলতার দাবি থেকেই জানা গেছে। তবে শ্রীভগবান ভারতের রাস্তাঘাট, বনজঙ্গল, শিয়ালদহ স্টেশন এবং ইভাকুয়ী ক্যাম্পগুলি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যতসংখক উদ্বাস্তুর গতি করেছেন, তার একটা মোটামুটি হিসাব আমরা কিছুদিন আগে (১৯৫৫) সংগ্রহ করেছি ; সেটা হচ্ছে কিনা সাড়ে ছয় লক্ষেরও কিছু উপরে। [বর্তমানে (১৯৬১) সংখ্যাটি যে কতদূর এগিয়েছে তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও সংখ্যাটি তিনগুণে পৌঁছে গেছে তা ধরে নিলে খুব ভুল করা হবে, মোটেই মনে হয় না।] ভারত সরকার আর শ্রীভগবান পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যাপারে প্রায় সমান সমানই যাচ্ছেন। তবুও শ্রীভগবানের ক্রেডিটই এখানে অনেক বেশি স্বীকার করতেই হবে, এই জন্যেই যে, তিনি সেটা করছেন নিষ্কামভাবেই, কারও কোন ইলেকশন ফাণ্ডের ফাণ্ড না বাড়িয়েই এবং উদ্বাস্তুদের জন্য তাঁর নৈতিক কোন দায়িত্বও কিছু ছিলনা বা নেই। তবে তাঁর দোষও যে নেই তাও বলা চলেনা। তিনি যখন সর্বশক্তিমান তখন আর একটু হাত চালিয়ে কাজটা শেষ করে দিলেই ত পারতেন। ভারত সরকার কি করেন বা না করেন সেদিকে তাকিয়ে থাকবার তাঁর কোন প্রয়োজন ছিলনা। ভারত সরকার ত আর ছোটখাট ব্যাপার নয় যে ঐ উদ্বাস্তুদের নিয়ে বসে থাকলেই চলে! তাঁদের যে পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে, হতভাগা পৃথিবীকে একটা আদর্শ দিতে হবে ; আরও

কত রকমের কাজ করতে হবে! তাঁর উপর দৈনিক কত সেরিমনি ত লেগেই আছে, সেগুলিও উদ্‌যাপন করতে হবে।

যাই হোক, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, একদিন ঐ শ্রীভগবানকেই এ সমস্যার সমাধান করে দিতে হবে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু কেন, এত নীচু ধরণের ইতরামিরই বা মানে কি? পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের সমস্যা কি ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরেই তাড়াতাড়ি সমাধান হওয়া প্রয়োজন নয়? নিশ্চয়ই প্রয়োজন। 'তবে কিনা ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ আজকাল বোধহয় কিছুটা ক্ষুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়ে কোন বিশেষ ভাষা-ভাষীদের স্বার্থেই পরিণত হয়েছে, তাই! এ ভিন্ন অন্য কোন মানে এর ভেতর খুঁজে বের করা সম্ভব তা মোটেই মনে হয় না। এত উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের জন্য যথেষ্ট টাকা ভারত সরকারের না থাকাই সম্ভব, কিন্তু যে কাজটি করলে অতি সহজেই এবং অনেক সস্তায়ও উদ্বাস্তুদের একটা হিল্লে হতে পারত, সেটিও না করবার মানে কি? বিহার এবং আসাম থেকে কয়েক হাজার বর্গমাইল জায়গা পশ্চিম বাংলায় দিয়ে দিলে কাজটা অনেক সোজা হ'ত না কি? সেটুকুও দেয়া হল না কেন? অন্ততপক্ষে বিহার এবং আসামের বাংলা ভাষাভাষী জায়গাগুলো যদি বাংলাকে ফিরিয়ে দেয়া হ'ত, তাহলেও কিছুটা কাজ হতে পারত; কিন্তু তাও হয়নি। সুদূর আন্দামানে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা যেতে শুরু করতেই, জানিয়ে দেয়া হল যে, আন্দামানের ভাষা হবে হিন্দী, কারণ আন্দামান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আর কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হচ্ছে হিন্দী। কেন্দ্রের অধীনে বলে মণিপুর বা আগরতলায় ত এখনও হিন্দি চালু করা হয় নি; তবে আন্দামানের ব্যাপারে অত অধীর হবার কারণ কি ছিল? এসবই ইঙ্গিতপূর্ণ এবং সব ইঙ্গিতগুলিই ঐ একদিকেই দেখাচ্ছে। যে বাঙ্গালী কেবল বাংলা ভাষার গর্বেই মত্ত, তাদের পুনর্বাসনের জন্য এর চেয়ে বেশী কিছুই করা সম্ভব নয়, কোন মতেই।

তবে ভারত সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য যে কিছুই করছেন না, তাও নয়। করছেন অনেক কিছুই, টাকা ত খরচ করছেন প্রচুর পরিমাণেই। কিন্তু তবুও শতকরা পনের বা ষোল ভাগের বেশী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন, এ দাবি তাঁরা করেন না; বোধহয় বিনয়বশতই। আর যখন দেখতে পাই সাত আট বছর ধরে অনেক উদ্বাস্তু পরিবার বিভিন্ন ক্যাম্পে পচে মরছে, তখনই সরকারী প্রচেষ্টার স্বরূপটি বুঝতে ভুল হয় না। ক্যাম্পে বসে সাত আট বছর ধরে ডোল খাবার পর, ঐ লোকেরা যে কি কাজে লাগতে

পারে, তা সাধারণ লোকের বুঝা কঠিন। তবে ক্যাম্পে বসে ডোল না খেলেই বা চলবে কেন! যদি তাদের পুনর্বাসন হয়ে যায়, যদি তারা আর ডোল না খায়, তাহলে তাদের আজ যাঁরা দয়া করে ডোল খাওয়াচ্ছেন তাঁরা খাবেন কি? উদ্বাস্তুরা ক্যাম্পে পচে মরে ডোল খাচ্ছে বলেই না কর্মকর্তাদের অনেকের পুনর্বাসনের জন্য বড় বড় দালান-কোটা তৈরী হতে পারছে। তাই উদ্বাস্তুদের আজ অধৈর্য হলে চলবে না। ধৈর্য ধরে শ্রীভগবানের নাম করতে হবে। এক মনে প্রার্থনা জানাতে হবে 'পার কর হে দয়াল শ্রীহরি।' তবেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অহিংস ভারতে অধৈর্য হওয়া চলবে না, অধৈর্য হয়েছ কি তোমাকে সোজা রাস্তায়, সর্ট-কাট পথে শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ করা হবে। যদি পালিয়ে এসে প্রাণ বাঁচাতে চাও তাহলে কলকাতার খোলা ফুটপাতে ১০৮।১১০ ডিগ্রি গরমে কৈমাছ ভাজা হয়ে, কিংবা হাওড়া ময়দানে বুলেট ভক্ষণ করে শ্রীভগবান লাভ করতে হবে। কোন ভারতবাসী কিংবা কোন বঙ্গ-সন্তানও তোমার জন্য এককোঁটা চোখের জল ত দূরের কথা একটা দীর্ঘনিশ্বাসও পরিত্যাগ করবে না। ভারতে আজ সবাই অহিংস হয়ে গেছে। অনেক উর্দ্ধমার্গে বিচরণ করছে আজ ভারতবাসী।

উদ্বাস্তুদের জন্য টাকা যখন খরচ হচ্ছে তখন আর কথা কি! উদ্বাস্তুরা পাক আর নাই পাক, কেউ না কেউ পাচ্ছে নিশ্চয়ই। অনেকগুলি প্রাদেশিক সরকার ত উদ্বাস্তুখাতে খরচ করবার জন্য অনেক অনেক টাকা নিয়ে খরচও করেছেন; তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই দলে দলে অকৃতজ্ঞ উদ্বাস্তুরা যখন ফিরে এসে কলকাতায় রাস্তায় ভিড় পাকায়, তখনই শুধু বুঝতে পারা যায় যে টাকাগুলির কি রকম সদ্ব্যয় হয়েছে।

ভারত সরকারের যে উদ্বাস্তুদের জন্য কোন দরদ নেই সে কথাও বলা উচিত নয়, সরকারী নেতারা ত বক্তৃতা করে হামেশাই উদ্বাস্তুদের জন্য কতই না অশ্রু বিসর্জন করছেন! বক্তৃতায় অশ্রু বিসর্জন আর টাকা খরচ দুই-ই যখন হচ্ছে তখন আর চাই কি, কাজ নিশ্চয়ই হচ্ছে। আসলে বক্তৃতা করা আর টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ করাই হচ্ছে ভারতীয় নেতাদের একমাত্র কাজ; অন্য সব ব্যাপারেও যেমন, উদ্বাস্তুদের ব্যাপারেও ঠিক তেমনি। আসল কাজ যে কি পরিমাণ হচ্ছে সেটা দেখে নেবার তাদের কোন দায়িত্ব নেই—তাদের সময়ই বা কোথায়!

উদ্বাস্তুদের জন্য দরদ সরকারের অতি অবশ্যই আছে, তবে যখন একটু

সীমা ছাড়িয়ে দরদী কথা তারা বলে বসেন, তখনই মাত্র মূর্খসাধারণ বুঝতে পারে যে সে দরদ কি ধরণের। কিছু দিন আগে শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন যখন ভারতের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন, তখন একদিন পার্লামেণ্টে উদ্বাস্তুদের বিষয় বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে 'উদ্বাস্তুরা অতি সুখেই আছে এবং তারা সাদি করে বাচ্চা পয়দাও করছে' (Marrying and begeting children)। কথাটি খুবই উচ্চাঙ্গের কথা নয় কি? উচ্চ সংস্কৃতিবান লোকেরাই ত আজকাল ভারতের মন্ত্রী হন কিনা, তাই! আধুনিক ভারতের সংস্কৃতি চূড়ামণি শ্রীজহরলালও পাশেই বসেছিলেন, বোধ হয় ঐ উচ্চাঙ্গের রসিকতাটুকু উপভোগও করেছেন। তবে কিনা বিদেশী অর্থনীতি-বিদেরা যখন ভারতের আর্থিক দুরবস্থার বিষয় বলতে গেলে বলে বসেন যে, 'ভারতে এমন কি ভিক্ষুকেরাও সাদি করে এবং বাচ্চা পয়দা করে,' তখন কথাটি অনেকেরই কাছে রসিকজনের কথা বলে মনে হয় না। আর সে দিনের স্পীকার শ্রীঅনন্তশায়নম্ আয়েঙ্গার মশাইও একটু রসভঙ্গ করেছিলেন মন্ত্রী মশাইকে ধমক দিয়ে, ঐ ইতর রসিকতাটুকু করবার জন্যই।

পোড়া ভারতে, খণ্ডিত ভারতে, অর্দ্ধনগ্ন এবং অর্ধভুক্ত ভারতে যে রসের অভাব আছে, তা ভারতের সবচেয়ে বড় শত্রুও বলতে সাহস রাখেনা। দৈনিক সেরিমনির উপর সেরিমনি যেভাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে, তাতে দেশটা যে আসলে সেরিমোনিয়াল ব্যাপারেই পরিণত হয়েছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তাই অভাগা উদ্বাস্তুদের নিয়েও রসসঞ্চারের চেষ্টা হামেশাই হচ্ছে। কিছুদিন আগে অভিভাবকবিহীন ছুকরী বাঙ্গালী উদ্বাস্তু মেয়েদের সৌরাষ্ট্রের ক্যাম্পে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়ে যে একটা বিশেষ রস আস্বাদনের চেষ্টা হয়েছিল, সে খবর খবরের কাগজ মারফৎ অনেকেই জানেন। ছুঁড়িগুলো বোধ হয় বেরসিক ছিল, তাই ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে এসে সব রসভঙ্গ করে বসল। আর কটা দিন টিকে থাকতে পারলেই পাড়ায় পাড়ায় তাদের পুনর্বাসন হয়ে যেত খুব ভালভাবেই।

সরকার যে উদ্বাস্তুদের নিয়ে শুধু আদিরসের সৃষ্টির চেষ্টাই করছেন তাও নয়, বিশেষ করুণ রসেরও সৃষ্টি হচ্ছে। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় পাঠান হচ্ছে, কিন্তু সে অদ্ভুত জায়গাগুলি যে কত অদ্ভুত সে ধারণা অনেকেরই নেই। বিন্ধ্য প্রদেশের এক বিরাট জঙ্গলের মধ্যে চাষ আবাদ বৃদ্ধির জন্য অনেকটা জায়গা কেন্দ্রীয় ট্রাক্টার অর্গানিজেশন কর্তৃক

পরিষ্কৃত হয়। বেশ মোটা টাকা খরচ হয়ে যাবার পর আবিষ্কার করা হয় যে ঐ জায়গায় জলের এতই অভাব যে চাষ-আবাদ হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। ও জায়গায় জল পেতে হলে খাল কেটে প্রায় একশো মাইল দূর থেকে জল আন্‌তে হবে, তাতে যে টাকার প্রয়োজন হবে সে টাকা আপাতত বিন্ধ্য প্রদেশের পক্ষে সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভব নয়। তাই কাজটি গভর্ণরের আদেশ অনুযায়ী বন্ধ করে দেয়া হয়; এবং এই ভাবেই অনেক দিন পড়ে থাকে। অল্প কিছুদিন আগে কয়েক হাজার পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুকে ঐ জায়গায় পুনর্বাসনের জন্য নিয়ে ফেলা হয়েছে। পুনর্বাসন যে তাদের হয়েই গেছে তা ত ধরে নেওয়াই চলে, আর যদি এখনও না হয়ে থাকে তবে জলের অভাবে আর শ্রীভগবানের আশীর্বাদে কাজটা হয়ে যেতে বেশী দেরিও হবে না। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা এইভাবেই হচ্ছে এবং আশা করা যায় আগামীতেও এইভাবেই হবে।

আগামীতেও যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ কারবার এইভাবেই হবে, তারও ইঙ্গিত অতি পরিষ্কারভাবেই ইতিমধ্যেই প্রকাশ করা হয়েছে। পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে দণ্ডকারণ্যে জঙ্গল পরিষ্কার করে উদ্বাস্তুদের বসান হবে। বিহারের বাংলাভাষী এলাকাগুলোতে লক্ষ লক্ষ একর অনাবাদী জমি পড়ে রয়েছে, সেখানে নয়। বাংলার মধ্যেই রয়েছে বিরাট সুন্দরবন, যা শুধু নামেই বন, বন সম্পদ কখনই নয়—সে জায়গাও উন্নত করে উদ্বাস্তুদের বসান চলতে পারে না। বাংলার ধারে কাছে অন্য কোথাও নয়—কিংবা আন্দামানেও নয়। তাদের বসাতে হবে ১০০ কোটি টাকা খরচ করে, বনসম্পদ নষ্ট করে বাংলা থেকে অনেক দূরে উড়িষ্যার ওমাথায় দণ্ডকারণ্যে। ঠিক বিন্ধ্য প্রদেশের জঙ্গলে নিয়ে পুনর্বাসন করবার মতভাবেই এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে আর কি! এ ধরণের পুনর্বাসন কাজের সুবিধা অনেক দিক থেকেই—এতে বাঙ্গালীর সংখ্যাবৃদ্ধি পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। বেশী লোকের পুনর্বাসনে এ ব্যবস্থায় বেশী জায়গারও প্রয়োজন হয় না—মাঝে মাঝে এক এক দলকে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আস্‌লেই হল। ফলে বনসম্পদ নষ্ট হবার সম্ভাবনাও প্রায় নগণ্য; টাকা বেশী খরচ হবার সম্ভবনাও ঐ একই কারণে খুব বেশী কখনই নয়। উপরন্তু দেশের জানোয়ার সম্পদ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। কিছুদিন আগে কাগজে একটা খবর দেখেছিলাম যে, গুজরাটের গির জঙ্গলে ভারতীয় সিংহদের বংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যাভাব

দেখা দিয়েছে এবং ঐ কারণেই ঐ স্থানের সিংহদের স্বাস্থ্যও ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাই সরকারের দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা প্রকাশিত হবার পর শুধু মনে হচ্ছে যে, সরকার স্থান নির্বাচনে একটু ভুল করছেন। স্থানটি দণ্ডকারণ্য না হয়ে গির অরণ্য হলে আর কথা ছিল না, লাভ আরও বেড়ে যেত—মানে পূর্ববঙ্গ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ত হ'তই, উপরন্তু ভারতের সিংহ-সম্পদও অকাতরে বৃদ্ধি পেত এবং তাদের স্বাস্থ্যও আবার ভাল হ'ত। (দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা যে একটি অতি বৃহৎ ভাঁওতাবাজী ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না, তাও ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে।)

তবুও পূর্ববাংলা থেকে উদ্বাস্তু আগমন যে বন্ধ হচ্ছেনা সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আশ্চর্য। যেন মরবার জন্যই তারা বদ্ধপরিকর। যে কোন উপায়েই হোক, বা যে কোন দুরবস্থার মধ্যেই হোক, তারা মরতে পেলেই খুসী। কেবল নিজেদের ভিটেতে মরতে না হলেই হল, তাদের হিন্দুত্বের অঙ্গহানি না হলেই হল। অন্য সব হানিকে তারা আর গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছে না,—পাগলের অবস্থা আর কি!

আর একটা কথা হচ্ছে যে ভারতীয় নেতারা নাকি বুঝতেই পারেন না ঠিক কি কারণে পূর্ববাংলার হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে আসছে। তাঁরা কখনও মনে করেন অর্থনৈতিক কারণে হিন্দুরা চলে আসছে; কখনও বা হেঁকে বসেন পূর্ববাংলার মুসলমানদের অত্যাচারেই হিন্দুরা চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে; আবার কখনও এরকম ইঙ্গিতও করেন যে, ভারতে এসে যে অঢেল সাহায্য তারা পাচ্ছে সেই লোভেই পূর্ববাংলার হিন্দুরা ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতের গাছতলার অভিমুখে ধাওয়া করেছে। এই অজুহাতে মাঝে মাঝে উদ্বাস্তুদের সাহায্য দেবার ব্যবস্থাও যে তারা কমাবার চেষ্টা করেন নি তাও নয়। এই উদ্বাস্তু আসার কারণ খুঁজে যে তাঁরা আসল কারণটিকে চাপা দিতে চাচ্ছেন, সেটা বোধ হয় অনেকেরই বোধগম্য নয়। মোটকথা তাঁরা এখনও ঠিকমত বুঝতেই পারেননি যে, কেন ওরকম হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ ভাগ করেই যে তাঁরা পাকিস্থানের হিন্দুদের রাস্তায় বসিয়েছেন, শুধু সেই কথাটাই তাঁরা বুঝতে ভুল করেন। জায়গা বিশেষে ভারতীয় নেতারা যে অবোধ বালকের ভূমিকায় পার্ট ভালই করেন, সে আজ আর কারও বিশেষ অজানা নেই; তাই তাঁদের ঐ অজ্ঞানতার জন্য খুব বেশি আশ্চর্যও আর কেউ বিশেষ হন না। তবে এটুকু আজ আমারও স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে এখনও কেন পূর্ব-

বাংলার হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে আসছে, তা আমিও ভাল বুঝতে পারিনা। পাকিস্থান সরকারের মতিগতি ফিরেছে বা মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু প্রীতি বেড়েছে, একথাও আমি বলিনা। শুধু ভারতে পূর্ববাংলার হিন্দুদের আদর অভ্যর্থনার যে ব্যবস্থা হয়েছে, তাদের নিয়ে যে উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে, তাদের লক্ষ লক্ষ যে ভারতের রাস্তাঘাটে, গাছতলায়, জঙ্গলে, শিয়ালদহ স্টেশনে বা উদ্বাস্তু ক্যাম্পে কি দুরবস্থায় মারা গেল, কত সহস্র সহস্র উদ্বাস্তু ভদ্র মেয়েকে যে আজ ভারতে এসে দেহ বিক্রয়ের মাধ্যমেই জীবন ধারণ করতে হচ্ছে, এসব খবর মোটামুটি জেনেও যে পূর্ববাংলার হিন্দুরা এখনও কেন ভারতে আসছে, সেইটুকুই বুঝতে পারি না। ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্থানে হিন্দুদের থাকা যে অসম্ভব তা বুঝতে আমার ভুল নেই; বুঝবার ভুল শুধুই ঐ হিন্দু হিসাবে বাঁচবার জন্য মরবার কি মানে, তারই মধ্যে।

তবে সুখের কিংবা দুঃখের কথা জানি না, মহান অহিংস অবতার মহাত্মা গান্ধীর যে সব সন্তান আজ বাপের দোহাই দিয়েই ভারতের সিংহাসনে আসীন হয়েছেন, তাঁদের মনে এবার সত্যিই আঘাত লেগেছে! এ নৃশংস হত্যা দৃশ্য তাঁরা আর সহ্য করতে পারছেন না! তাই আবারও এক সহজিয়া উপায় আবিষ্কার করে, নানা অজুহাতে পাকিস্থান থেকে উদ্বাস্তুদের আর আসতে দিচ্ছেন না। পাকিস্থানের একটা ভুল চালের সুযোগ নিয়ে, ভারত-পাকিস্থান পাসপোর্ট প্রথা ত আগেই চালু করা হয়েছিল। ঐ পাসপোর্ট প্রবর্তনের পর থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসতে হলে যে মাইগ্রেসন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে আসতে হ'ত, সে সার্টিফিকেট দেওয়াও বন্ধ হয়েছে। এখন আর পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা ইচ্ছা করলেই ভারতের রাস্তাঘাটে এসে মরতে পারে না। মাইগ্রেসন সার্টিফিকেট দেয়া বন্ধ হয়েছে বল্লেও ঠিক হবেনা; কারণ, মাইগ্রেসন সার্টিফিকেট এখনও দেওয়া হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, দেওয়া হচ্ছে শুধুই দেওয়া হচ্ছেনা কথাটাকে মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্যই। এই ভাবেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের স্বাধীনভাবে মরবার শেষ আশাটুকুও শেষ করে দেয়া হয়েছে। পাকিস্থানে হিন্দুদের হুণ্ডির টাকার কথা আগেই বলেছি, ওটা না হলে যে ভারতের আজ আর উপায় নেই, সেজন্যও পাকিস্থানে হিন্দুদের মরবার জন্যও থাকা চাই।

পৃথিবীতে সত্য, অহিংসা আর শান্তিবাণী প্রচার করবার অধিকার নিয়েই যাঁরা জন্মেছেন, তাঁরা অবশ্যই সব কিছুই পৃথিবীর বৃহত্তর স্বার্থেই করে থাকেন;

তাই বলবারও কিছু নেই। আমাদের দেশে অনেক জাতবোষ্টমের গল্প শুনেছি, তাঁরা নাকি দুধ চুরি করে খাওয়া বেড়ালকেও কখনও হত্যা করতেন না। কৃষ্ণের জীবকে হত্যা করা নিশ্চয়ই মহাপাপ। তাই তাঁরা বেড়ালদের ছালায় পুরে মুখ বেঁধে নদীর জলে ফেলে দিতেন। আর মাইগ্রেসন সার্টিফিকেট দেয়া বন্ধ করবার সময়টাও বেছে নেওয়া হয়েছে খুবই ব্রাহ্মমুহূর্তে, সেদিক থেকে বুদ্ধির তারিফ ভারতীয় নেতারা অবশ্যই দাবি করতে পারেন। ঠিক যে সময়ে পাকিস্থানে গঠনতন্ত্র আইন পাশ হয়ে হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মর্যাদা দান করে পাকিস্থানকে ইসলামিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হল; আর পূর্ববঙ্গের সরকার জমিদারী দখল করে নিয়ে প্রায় লাখখানেক হিন্দু পরিবারকে বেকারত্ব দান করল, ঠিক সেই সময়েই, সেই ব্রাহ্মমুহূর্তেই মাইগ্রেসন দেয়া বন্ধ করা হল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর কাকে বলে! অত বুদ্ধি আছে বলেই না ভারতের নেতারা আজ পৃথিবীর নেতা হবার আশায় আছেন! আশা করা যায় এবার ভারতের উদ্বাস্তু সমস্যা ক্রমেই সমাধান হয়ে আসবে,—শ্রীভগবানের ভলাণ্টিয়ার সার্ভিস, আর মাইগ্রেসন সার্টিফিকেটের গ্যারাকল, এই দুয়ে মিলে ভারতে আবার অখণ্ড শান্তি ফিরিয়ে আনবে। তবে ভালয় ভালয় শান্তিটা শ্মশানের শান্তি না হলেই হয়।

ভারতীয়েরা অশান্তিতে থাকুক এরকম অবশ্যই কেউই চায় না, তবে তাদের শান্তি যে আজ লক্ষ কোটি পূর্ববঙ্গ হিন্দুর অশান্তির কারণ হয়েছে, সেটাই হচ্ছে কথা। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সাথে ভারতীয় নেতাদের এই বিশ্বাসঘাতকতার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটিও নেই বা হওয়া সম্ভবও নয়; কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় ভণ্ডামিও আর দ্বিতীয়টি সৃষ্টি হয়নি। তবে এটি সম্ভব হচ্ছে এই জন্যই যে, ভারতীয় জনসাধারণও আজ জীবজগতের যে পর্যায়ে নেমে এসেছে, সেটা আর যাই হোক মানুষের পর্যায় যে নয়, তাতেও কোনই ভুল নেই। আজ সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ পূর্ববাংলার হিন্দু যখন ভারতের রাস্তা-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে শেয়াল-কুকুরেরও অধম অবস্থায় মারা পড়ছে, চোখের উপরে তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে জীবন্ত মানুষগুলি, তখনও ভারতীয়েরা বেশ শান্তিতেই আছে, একজনও পাগল হয়ে যায়নি। শুধু তাই নয়, তারা মিশর, আলজিরিয়া বা মরক্কোর শান্তিতেও যাতে কোন বিঘ্ন ঘটতে না পারে তারই জন্য আন্দোলন করে বেড়াচ্ছে। এটম বোমা বা হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্যের বিরুদ্ধেও তাদের প্রতিবাদের অন্ত নেই।

নিশ্চয়ই ত! এটম বোমা বা হাইড্রোজেন বোমা ফাটলে যে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে! শুধু তারা ভাবতে পারছে না যে, পৃথিবী যদি ধ্বংসই না হয় তাহলে তাদের এ বোঝা থেকে মাতা ধরিত্রীর মুক্তি হবে কিসে?

উদ্বাস্তু সমস্যা কখনই পাকিস্থানের সম্মুখে ভারতের মত অত ভীষণভাবে দেখা দেয় নি। যেটুকু দেখা দিয়েছিল, তা পাকিস্থান মহাজনের, মানে ভারতের পন্থায়ই পাশ কাটিয়েছে। অত হাঙ্গামা করে কি আর বাদশাগিরি পোষায়! আগেই বলেছি পশ্চিম ভারত আর পশ্চিম পাকিস্থানে লোক বিনিময় হয়েছিল, তাই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের হাঙ্গাম বিশেষ জটিল হয়নি। ভারতের পূর্ব প্রান্তের প্রদেশগুলো থেকে অল্প বিস্তর যে উদ্বাস্তু পূর্ববাংলায় এসেছিল তারাও প্রায়ই নিজেরাই নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে, কিংবা আবার ভারতে ফিরে গেছে; সরকারের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। তবে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় আসাম থেকে বেশ কয়েক লক্ষ বাঙ্গালী মুসলমানকে, বাঙ্গালী বলেই বিতাড়িত করে পূর্ববাংলায় পাঠান হয়েছিল; এবং হাঙ্গামাও বেধেছিল তাদের নিয়েই। তবে আসামের বাঙ্গালী মুসলমানেরাও বেশি তকলিফ না দিয়েই মানে মানে সরে পড়েছে—মানে পূর্ববাংলায় উদ্বাস্তুদের আদর-অভ্যর্থনার নমুনা দেখেই দিন থাকতে আবার আসামে ফিরে গেছে। অবশ্য ফিরে গেছে তারা আর বাঙ্গালী মুসলমান হিসাবে নয়, আসামী মুসলমান হিসাবেই এবং আসামী ভাষাকে মাতৃভাষা কবুল করেই। যারা ফিরে যায়নি এবং এখনও বেঁচে আছে, তারা যা হয় কিছু করছে, সরকারী সাহায্যের আশা না রেখেই। তবে উদ্বাস্তুদের জন্য টাকা খরচ পাকিস্থানেও হয়েছে; বোধ হয় টাকা খরচ করতে ভাল লাগে, তাই টাকা খরচ হয়েছে, এবং ভারতেরই মত কারও না কারও পকেটে গেছে। ভারতের সঙ্গে তফাতের মধ্যে শুধু এইটুকুই যে, পাকিস্থানে উদ্বাস্তুদের নিয়ে রসের খেলার চেষ্টা হয়নি; আর পাকিস্থান ভারতীয় মুসলমানদের হুণ্ডির টাকার আশাও রাখে না।

ফরেণ পলিসির বিজাতীয় কার্যকলাপ

ভারতের ফরেণ পলিসি আর ফরেণ ডিপার্টমেণ্টই হচ্ছে ভারত সরকারের সব কিছু, অন্য সব বিভাগগুলো উপরি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।• এই ফরেণ পলিসির বাহাদুরীই আজ ভারতের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত এই

ফরেণ পলিসিই যে ভারতকে কোথায় নিয়ে যাবে, কোন্ অতলে তলিয়ে দেবে, সেকথা আজ ভবিষ্যৎ-বাণী করে বলা কঠিন হলেও একেবারে অসম্ভবও নয়। এর ভেতরই যেটুকু বুঝা যাচ্ছে তা মোটেই শুভ ইঙ্গিত করে না। তাই স্বাধীন ভারতের রাজনীতিকে বুঝতে হলে ভারতের ফরেণ পলিসি বা তার বৈদেশিক বিভাগের কার্যকলাপ বিষয়ে আলোচনা একান্তই দরকার। বাইরে থেকে বৈদেশিক বিভাগের অতি গোপন খবরগুলো অবশ্যই জানা সম্ভব নয়, তবুও বাইরের কথাবার্তা শুনে বা ঐ বিভাগের মালিক স্বয়ং শ্রীজহরলালের চালচলন দেখেই যেটুকু বুঝা যায়, তাই এখানে আলোচিত হবে।

আসলে, একটা দেশের বৈদেশিক বিভাগ বলতে সেই বিভাগকেই বুঝা যায়, যে বিভাগ ঐ দেশের সঙ্গে অন্য সব দেশের কাযকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন যাতায়াত বা নানা রকমের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা অন্য ধরণের চুক্তি সম্পাদন করা, এসবই হচ্ছে মোটামুটিভাবে বৈদেশিক বিভাগের কাজ। এই কাজের জন্য প্রত্যেক দেশেই একজন বৈদেশিক মন্ত্রী থাকেন আর তার অধীনে দেশে দেশে থাকেন রাজ-দূতেরা। বিভিন্ন দেশ থেকে রাজদূতেরা তাদের নিজেদের দেশের স্বার্থের প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠান, আর তার উপর ভিত্তি করে দেশের বৈদেশিক মন্ত্রী বা মন্ত্রিসভা ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগের পলিসি তৈরী করেন। মোটামুটি বলতে গেলে এই বলতে হয় যে, দেশের বৈদেশিক স্বার্থরক্ষা করাই হচ্ছে বৈদেশিক বিভাগের কাজ এবং ঐ স্বার্থরক্ষার উপায় হচ্ছে সেদেশের বৈদেশিক নীতি বা ফরেণ পলিসি।

ভারতের এই বৈদেশিক নীতি নাকি এক বিরাট, বিপুল, সুমহান ব্যাপার, একেবারে বিশ্ববিনিন্দিত এবং সফলতায় এতই ভরপুর যে মাত্র দশ বৎসরেই ভারতকে ঠেলতে ঠেলতে উপরে তুলে একেবারে আকাশের নীলে মিশিয়ে দেবার উপক্রম করেছে। হয়ত বা তাই; যেদিন সত্যি সত্যিই ভারতকে শূন্যে মিলিয়ে যেতে দেখব, সেদিন আর অবিশ্বাস করবারও কিছু থাক্‌বে না। তবে যাদের বুদ্ধি আমারই মত মোটা আর বিদ্যাও একই রকম নিরেট, তাঁরাও যেমন বুঝেন না আমিও ঠিক তেমনি; ওসব সুমহানত্বের কিছুই বুঝি না। কেবল মনে হয় শেষের দিন বুঝি আর খুব বেশী দূরে নয়। ফরেণ পলিসি নাকি ভারতের প্রেষ্টিজ বিদেশে এমন ফাঁপিয়ে তুলেছে যে আর কহতব্য নয়। ইতি-মধ্যেই নাকি 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' হয়ে গেছে। এসবের

কিছুই আমার গো-ঘিলুতে প্রবেশ করে না, এবং প্রবেশ না করলে যা হয় ঠিক তাই। শুধু প্রশ্ন জাগে, দেশবছরেই যদি সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে বাকি বয়েসটা বসে বসে ভারত করবে কি? বাতের থেকে আত্মরক্ষা করবে কি উপায়ে? আরও অনেক কথা মনে হয়, মনে হয় যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আসনটি যদি এতই সস্তা চীজ, দুটো বোলচাল ঝেড়ে দিতেই আপনা থেকে সুর সুর করে এসে পশ্চাৎদেশের নীচে আশ্রয় নেয়, তাহলে সে চীজটির জন্য গান লেখাও কি সম্ভব? যাকগে, যা বুঝি না তা নিয়ে মাথা ঘামাতেও চাই না, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী করেও লাভ নেই।

তবে যেটুকু বুঝেছি, স্বাধীনতার আগে এবং পরেও বুঝেছি, এবং এখনও বুঝছি তা খুবই পরিষ্কার কথা। সুদূর অতীতের কথা বাদ দিলে, বর্তমান ভারত এক অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত, অসহায়, দুর্বল এবং খণ্ডিত দেশ। ভারতীয়েরা শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক ব্যাপারে অতি নীচু পর্য্যায়ে নেমে এসেছে। তাদের পেটে খাবার নেই, পরিধানে বস্ত্র নেই, আরও অনেক কিছুই নেই তাদের। তবে, যত অসৎভাবেই হোক না কেন, ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে গেছে, তাই ভারতীয়েরা তাদের শাসনক্ষমতা ফিরে পেয়েছে। এখন যদি সেই ক্ষমতাটুকুর সদ্ব্যবহার করে বহু ত্যাগ এবং পরিশ্রমের পথে এগিয়ে যেতে পারে তবেই হয়ত দেশটা আবার গড়ে উঠতে পারে। গড়ে উঠতে পারে দেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য এবং আরও অনেক কিছু। যার ফলে ভারত হয়ত একদিন তার নষ্ট-সম্মানও ফিরে পেতে পারে। তবে একাজ অতি দুরূহ, উঠতেও হবে অতি নীচু থেকে আর বাধাও প্রচুর। তাই আশা বেশী না করে, বেশী করে কাজ আরম্ভ করাই কর্তব্য।

আরও বুঝি যে এই মহান কর্তব্য কর্মটি করতে হলে বিদেশের দিকে তাকিয়ে থাকবার খুব বিশেষ প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধুই দেশের দিকে দৃষ্টি রেখে অক্লান্ত পরিশ্রমে কাজ করে যাওয়া। তাই আবারও খট্‌কা লাগে, এহেন ভারতে বৈদেশিক বিভাগ আর তার ফরেণ পলিসির এত চটক হয় কি করে? বিদেশের সাথে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে ভারত একাই সব-কিছু করে নিতে পারবে, এরকম কথা অবশ্যই কেউ বলে না। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পকলা—এসব ত আজ বিদেশ থেকেই আন্‌তে হবে, বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্যের প্রয়োজনও প্রচুর। ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারেও হয়ত বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন থাকতে পারে। তাই ভারতের বৈদেশিক বিভাগের প্রয়োজনও

অবশ্যই আছে। প্রয়োজন আছে বলেই ঐ বিভাগই প্রধান বা এক নম্বরের একথারও কোন মানে হয় না ; দেশের গঠনমূলক অন্যান্য বিভাগগুলিও মোটেই ফালতু নয়। কিন্তু কপালগুণে ভারতে হয়েছে ঠিক উল্টো। ভারতের বৈদেশিক বিভাগের চটকের কাছে অন্য সবাই ফালতু হয়ে গেছে। আরও মজা হচ্ছে এই যে ভারতের বৈদেশিক স্বার্থরক্ষার সঙ্গে বৈদেশিক বিভাগের সম্পর্কও খুবই কম,—নেই বল্লেও চলে। ভারতের বৈদেশিক বিভাগের প্রায় একমাত্র কর্ম হচ্ছে পৃথিবীতে প্রেম আর শান্তি প্রচার এবং প্রচার মারফৎ ভারতের প্রেস্টিজ বৃদ্ধি করা। খোল, কত্তাল আর বৈষ্ণবী নিয়ে কীর্তন করে বেড়ালেই প্রেস্টিজ। দাঁতের মাজন বিক্রী করবার মতই আর কি! গুণের উৎকর্ষতার প্রয়োজন নেই সং সেজে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে লোক জমাতে পারলেই বিক্রী হয়ে যাবে।

ভারতে আন্তর্জাতিক প্রেস্টিজের বিষয় এই যে একটা ধারণা জন্মান হয়েছে এটাই হয়েছে ভারতের কাল। আরে বাবা, প্রেস্টিজ অত সস্তা চীজ নয়! তুমি কতখানি উন্নতি করেছ, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পকলায়, মনুষ্যত্বের, ঐশ্বর্য্যে, এমন কি সামরিক বা অর্থনৈতিক শক্তিতে, তারই উপর নির্ভর করেছে তোমার প্রেস্টিজ। আসলে ঐ সব ব্যাপারের মোট ফল যেখানে প্রায় শূন্য, সেখানে অত প্রেস্টিজের বুলি ঝেড়ে বেড়ালেই অনেক কিছু হয় না। ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে গেছে বলেই তুমি ইংরেজের সমান ব'নে গেছ, একেবারে কমরেড ব'নে গেছ, তাদের উপদেশ দেবার অধিকার অর্জন করেছ, এসব ইয়ার্কি না করে যা করলে তুমিও একদিন ইংরেজের সমান হতে পারবে, তারই চেষ্টা কর। কিন্তু তাও হবার নয়। শুধুই ঐ প্রচারকার্যের কীর্তন গেয়েই প্রেস্টিজ ফাঁপিয়ে তুলব, শুধু তারই তাল।

আসলে ভারতের ফরেণ পলিসি যে কি বস্তু তা আমিও যেমন জানি না, আরও অনেকেরই সেই অবস্থা। অন্ততপক্ষে যা হওয়া উচিৎ ছিল তা যে নয়, সেটুকু বুঝতে বেগ পেতে হয় না। অধঃপতিত দেশকে উন্নত করে শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই যখন ভারতের একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিৎ, তখন ভারতের ফরেণ পলিসিও হওয়া উচিত ঐ কাজেরই সহায়তার পরিকল্পনা। যে সব দেশের সাথে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য বেশী চলে বা আরও বেশী হবার সম্ভাবনা আছে তাদের সাথে ভাব রাখা, এবং বাইরের জ্ঞান, বিজ্ঞান, এবং শক্তিতে উন্নত দেশগুলি থেকে কতটা সাহায্য সংগ্রহ করা যায় তারই চেষ্টা করা। কিন্তু

তাও হবার নয়। ইংরেজ দেশ ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে নিয়েছে। এখন শুধুই চেষ্টা হচ্ছে, ইয়ার-দোস্তদেরও সেখানে কিছুটা ঠাঁই করে দেওয়া যায় কিনা; তবেই ইয়াকি মসকরাটা জমিয়ে নরক বেশ গুলজার করে তোলা যাবে। ভারত তাই দেশোদ্ধার শেষ করেই পৃথিবী উদ্ধারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে; আর কিছু তার প্রয়োজন নেই।

মূর্খদের মস্তিষ্কেও যতটুকু প্রবেশলাভ করা সম্ভব তাতে মনে হয়, ভারতের ফরেণ পলিসি একটা বিরাট চালবাজী ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। কিংবা হয়ত সহজিয়া-পন্থী ভারতীয় নেতাদের মস্তিষ্কে ঢুকেছে যে, মহাযুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ফলেই যখন ইংরেজ ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, তখন ভারত যদি তার কার্যকলাপের দ্বারা আবারও ঐ ভারসাম্যে কিঞ্চিৎ এদিক ওদিক করতে পারে, তবে আর চাই কি; আপসে সব ঠিক হয়ে যাবে! আর পৃথিবীটা যখন দুটো শক্তি গোষ্ঠিতে ভাগ হয়েই আছে তখন আর মারে কে,—ঠিক বানরের পিঠে ভাগের মত, একবার এদিকে ওজন চাপিয়ে আর একবার ওদিকে ওজন চাপিয়ে সব পিঠেটাই খেয়ে নেওয়া যাবে। ভারতের অতি-চালাক নেতাদের তুলনায় অন্যান্য সবাই ত ছেলে মানুষ কিনা! ভারত তাই দুপক্ষের মধ্যে নিরপেক্ষ হয়ে বসে আছে। আর প্রচার-কার্য চালান হচ্ছে, ভারতের এই নিরপেক্ষ নীতির আর তুলনা নেই,—এর সফলতারও অন্ত নেই। সফলতার প্রমাণেরও অভাব নেই,—কোরিয়াতে ভারতীয় ফরমূলা অনুযায়ীই শান্তি স্থাপিত হয়েছে, ইন্দোচায়নাতেও অনেকটা তাই। দুপক্ষের মধ্যে সব রকমের অশান্তির সম্ভাবনাতেই ভারতের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এছাড়াও আমেরিকা ভারতকে বাৎসরিক যে সাহায্য দিচ্ছিল, সেটা ত বন্ধ করে দেয়নি; অথচ রাশিয়াও কিছু কিছু দেওয়া শুরু করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, অদূর ভবিষ্যতে যদি ঐ দুপক্ষের মধ্যে শক্তিপরীক্ষাটা হয়ে যায়, তখন ভারতের অবস্থাটা কি হবে? অনন্তকাল ধরে দুপক্ষ শুধু পাঁয়তারাই কষবে, একথা নিশ্চয়ই পাগল বা অতি-চালাকেরা ভিন্ন অন্য কেউই বিশ্বাস করে না। আর সম্মুখ সমরে দুপক্ষ যখন অবতীর্ণ হবেন, তখনও কি ভারতের পক্ষে নিরপেক্ষ হয়ে বসে থাকা সম্ভব হবে নাকি? সস্তায় পিঠে খাবার রাজনীতির তখন কি অবস্থা হবে? আর সাহায্য যা ভারত রাশিয়া বা আমেরিকার কাছ থেকে পাচ্ছে, সেটাও যে অদ্ভুত রকমের কিছু তাও মোটেই

নয়। মনে হয় প্রতি বছর ভারত তার আন্তর্জাতিক প্রেস্টিজ বাড়াবার জন্ম দেশে সেরিমনি, আর বিদেশে মিশন কমিশনের ফুর্তি-ফার্তার জন্ম যত টাকা খরচ করে, সে টাকাটাও বিদেশ থেকে সাহায্য হিসাবে আসে না। তবু কিছু যে আসে সে ঠিকই। রাশিয়া থেকে এ পর্যন্ত যা এসেছে তার পরিমাণ নগণ্য ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। তবে রাশিয়া যে হাত খুলেছে সেটাও ঠিক; কিন্তু কেন যে খুলেছে সেটাই বলা কঠিন। ভারতকে হাতে রাখা দরকার মনে করেই, না ভারত তার হাতে এসে গেছে মনে করেই, সেটাই বুঝা কঠিন। আমেরিকা অবশ্য প্রথম থেকেই ভারতকে কিছু কিছু সাহায্য দিয়ে আসছিল, এবং ভারতের প্রেস্টিজ এত ভীষণ বেড়ে যাওয়ার পরেও বন্ধ করে দেয়নি। আমেরিকা যে ভারতকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দেয়নি, ভারতের এত লম্বাই চৌড়াই শুনেও সাহায্য দিচ্ছে, এটাই হচ্ছে ভারতীয় রাজনীতিকদের মতে তাদের ফরেণ পলিসির সফলতার সব চেয়ে বড় প্রমাণ। কিন্তু আমেরিকা সত্যি সত্যি ভারতকে কি সাহায্য দিচ্ছে এবং সেটা আদৌ সাহায্য, না ফকিরের ভিক্ষে হিসাবেই দিচ্ছে, সে কথাটা কেউই তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন না!

যারা আমার মত গণ্ডমূর্খ তাদের কতকগুলি দোষ থাকে। নিজেদের কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিত তারা অন্যের কাজকে বুঝতে চেষ্টা করে। কেন জানিনা, আমার মাথায় একদিন ঢুকেছিল যে ঐ ফুটো পয়সা আবিষ্কার করেই ইংরেজ তার ভারতীয় সাম্রাজ্য হারাল; তাই এখনও ঐ ফুটো পয়সাগুলি আমার কাছে অশুভের চিহ্ন বলেই রয়ে গেছে। ফুটো পয়সা আমার হাতে এলেই আমি তাড়াতাড়ি ও-গুলিকে বিদেয় করতে ব্যস্ত হই। খরচ করে ফেলি, নয়ত ভিখারীদের দিয়ে দেই; সময়েতে ভিখারীদের ডেকেও দেই। অথচ সাধারণত আমি একজন দাতাও নই বা দান করবার মত পয়সাও আমার যথেষ্ট নেই। অনেক সময় আমার মনে হয় কি যে, আমেরিকা ভারতকে যে টাকা সাহায্য হিসাবে দান করে, তা আমার ঐ ফুটো পয়সা দানের মতই,—অবাঞ্ছিত অর্থ বিদেয় করবার জন্ম না হলেও, অবাঞ্ছিত প্রার্থীকে তাড়াতাড়ি পাশ কাটাবার জন্মই। শুধু আমার মনের ঐ দুর্বলতাটুকুর জন্মই যে আমার ঐ কথাটি মনে হয়, তাও নয়,—কারণ আমেরিকাকে এই ধরণের দান আরও অনেক জায়গায়ই করতে দেখা যায়। ভারতের চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র এবং দুর্বল দেশকেও আমেরিকা এই ধরণের দান করে, এবং ভারতের চেয়ে অনেক বেশিও করে,

তাই। আর আমেরিকা যে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সত্যিকারের সাহায্য দিয়ে উন্নতির জন্য সাহায্য করে তাও ত কিছু কিছু অজানা নয়। গত মহাযুদ্ধে হেরে জার্মানী আর জাপান প্রায় একেবারেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাদের কলকারখানা, বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট সবই প্রায় চুরমার হয়ে গিয়েছিল। আমেরিকার সাহায্যেই জার্মানী আর জাপান আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। জাপানের উৎপাদন ক্ষমতা ইতিমধ্যেই যুদ্ধের সময়ের সবচেয়ে বেশী উৎপাদনকে পেছনে রেখে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। আর জার্মানীর উৎপাদন ক্ষমতা নাকি লড়াইয়ের সবচেয়ে বেশীর দ্বিগুণের চেয়েও বেশী হয়েছে। এই অদ্ভুত গঠন কর্মটি সম্ভব হয়েছে শুধু মাত্র আমেরিকার সাহায্যেই। আমেরিকা জাপানকে বাৎসরিক ঠিক কত ডলার সাহায্য দিয়েছে, রাউণ্ড ফিগারে সেটা আমার জানা নেই তবে জাপানকে দেওয়া সাহায্য যে ভারতের বাৎসরিক লভ্য চল্লিশ বিয়াল্লিশ কোটি টাকার অনেক অনেক অনেকগুণ বেশী সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। আর জার্মানীকে প্রথম পাঁচ বছরে আমেরিকা যে সাহায্য দিয়েছে সেটি আমার অজানা নয়। সেটি হচ্ছে, সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি ডলার—মানে প্রায় তিরিশ হাজার কোটি টাকা। উপযুক্ত ক্ষেত্রে আমেরিকা সত্যিকারের সাহায্যও দেয়, এবং এইভাবেই দেয়।

তবে জার্মানী বা জাপানের কথা তুলেও লাভ নেই, তাঁরা ত লড়াইতে হারুয়ার দল, স্বাধীনতার বুঝেই বা কি, আর প্রেস্টিজই বা কি আছে! তাঁরা ত কেবল নিজেদের দেশটাকে শক্ত করে গড়ে তুলে, পেট পুরে খেয়ে, তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের বাহাদুরী আর রাইফেল হাতে দুনিয়াকে তাদের দাপট দেখাতে পারলেই বাঁচে! প্রেম, অহিংসা, শান্তি এসব আধ্যাত্ম্য বুঝা তাদের কর্ম নয়। এমন কি তাঁরা ত তাদের দেশ রক্ষার জন্য আমেরিকান সৈন্যদেরও তাদের দেশে থাকতে দেয়। শুধু তাই নয়, কত আমেরিকান সৈন্য থাকলে কত কোটি ডলার মুদ্রা ফালতু উপায় করা যাবে, হিসাব কষে সেটা বুঝে নিয়ে মনে মনে খুনী হতেও লজ্জা পায় না তারা। তাই ভারতের সাথে জার্মানী জাপান কোন্ নস্যাৎ, অন্য কারুরই কোন তুলনা হয় না। ভারত অতি উচ্চমার্গে বিচরণ করে, তার নেতারাও তাই; আর তার ফরেণ পলিসির ত কথাই নেই। ভারতের ফরেণ পলিসিতে দেশকে গড়ে তুলবার জন্য বাইরে থেকে সাহায্য সংগ্রহের কোন পলিসি নেই। অবশ্য দেশকে গড়ে তুলবার পলিসিই যে আছে তাও শোনা কথা, দেখলে অন্য রকমই মনে হয়। ভারতের প্রেস্টিজ তাই

শনৈঃ শনৈঃ উচ্চ থেকে সুউচ্চে ধাবমান। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার পর্যন্ত শ্রীজহরলালকে ডেকে নিয়ে চেয়ার টেনে বসতে দেন।

কিন্তু ভারত দরিদ্র হলেই বা কি, আর বাইরে থেকে সাহায্য না পেলেই বা কি, তার দিল কখনও ছোট না; বরং ফরেণ প্রেস্টিজ বাড়াবার ব্যাপারে ভারত অতিমাত্রায় দিল-দরিয়া। U. N. O. তে বিশেষ বিশেষ ভোটাভুটির ব্যাপারে দেখা যায়, ভারত আর ব্রহ্মদেশ এক সাথে থাকে। অল্প কিছুদিন থেকে অবশ্য তাও ঠিক দেখা যাচ্ছে না। ভারত প্রায় একাই থাকে, নয়ত রাশিয়ার পক্ষে জুটে যায়। ব্রহ্মদেশের ঐ একটি মাত্র ভোটকে ভারতের পেছনে রাখবার জন্য ভারত কত কোটি টাকা খরচ করেছে, সেটা অবশ্যই অনেকে জেনেও জানেন না, তাই বলছি—সত্তর কোটি টাকারও বেশী। সাহায্য, ঋণ মকুব, নূতন ঋণদান এবং বেশী দামে ধান কিনে ভারত এপর্যন্ত ব্রহ্মদেশকে সত্তর কোটি টাকারও বেশী দিয়েছে। তবু ঐ একটি মাত্র ভোটও আজ আর ভারতের পেছনে নেই, সেও খুবই সত্যি কথা। আর কোথায় ভোটের পেছনে টাকার শ্রাদ্ধ হয়েছে তা আমার জানা নেই; তবে আর কাউকে কোন বিশেষ দিনে ভারতের পেছনে থাকতে দেখিনি। ভারতের ফরেণ পলিসি এইভাবেই এগিয়ে চলেছে, প্রেস্টিজও বেড়ে যাচ্ছে সেই অনুপাতেই, বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় এসে গেছে যে, এখন ভারত একাই একশো,—মানে, তার দলে আর কেউই নেই।

ভারত নিরপেক্ষ, নিউট্রাল, কোন দলেই না—সারা পৃথিবীতে এই কথাগুলি সহস্র সহস্র বার উচ্চারণ করে বেড়ালে কি লাভ হতে পারে, কিভাবে প্রেস্টিজ বাড়তে পারে, বা ওকথাগুলির মানেই যে কি তাও আমার বোধগম্য নয়। এই জন্যেই নয় যে, নিরপেক্ষ, নিউট্রাল কথাগুলি যে পরিস্থিতিতে বলার সুযোগ হয়, বর্তমানে পৃথিবীতে ঠিক সে পরিস্থিতি নেই। যুদ্ধ বাধলে তবেই না নিউট্রাল থাকার কথা ওঠে; যুদ্ধ যখন নেই তখন ওকথাগুলি বারে বারে বলে বেড়াবার উদ্দেশ্য কি? যুদ্ধ বাধুক, তখন যে যে দলে যেতে চাও কেউই আপত্তি করবে না, আর নিউট্রাল থাকতেও কারুর বাধা নেই। তবুও বিনা যুদ্ধেই দুনিয়ার মাঝপথে এক কাল্পনিক বংশদণ্ডের সিংহাসন খাড়া করে তার উপর চেপে বসে "আমি নিউট্রাল," "আমি নিরপেক্ষ," "আমি কোন দলেই না" এই অবান্তর কথাগুলো বলে বাহাদুরী করাই ভারতের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য লড়াই না থাকলেও ঠাণ্ডা লড়াইয়ের নামে এক কাল্পনিক লড়াইয়ের

উদ্দেশ্য করেই ওকথাগুলি বলা হয়। কিন্তু সেই ঠাণ্ডা লড়াইতে ভারত যে খুব নিরপেক্ষ তা আর বোধ হয় বলাও চলে না। রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের কিছুই বলার নেই—তার যত গালাগালি আমেরিকা, ইংরেজ বা ফ্রান্সের বিরুদ্ধেই। তাই ভারতের এই শান্তি, অহিংসা আর নিরপেক্ষতার বুলি অতি-সাধারণ ব্লাকমেলের চেষ্টার চেয়ে বেশী সম্মানও আজ আর পাচ্ছে না। সুয়েজ ক্যানেলের ব্যাপারে ভারতের শান্তি ফর্মুলা যে সম্মান পেয়েছে, তা মোটেই অন্যায্য হয়েছে বলা চলে না। আর হাঙ্গেরীর ব্যাপারে ভারতের মুখোস একেবারেই খুলে পড়েছে, বিদেশে এবং দেশেও।

এইভাবেই ভারতের বৈদেশিক নীতির সফলতা আর ভারতের প্রেস্টিজ এগিয়ে চলেছে, তাই প্রচারকার্যও চলছে আরও বেশিগুণ জোরে। তবে সফলতাও যে একেবারেই হয়নি তাও নয়। ভারতের অন্যান্য সকল কর্মেরই মত তার বৈদেশিক নীতির সফলতাও ভারতবাসীদের একেবারে থ বানিয়ে ছেড়েছে; কারও আর কিছু বলবার নেই। ব্যাপার-স্যাপার দেখে যেরকম মনে হয়, তাতে ভারতীয় জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের অপদার্থতা ঢেকে রাখাই ভারতীয় নেতাদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই কাজে তারা যে পরিমাণ অর্থব্যয় করছেন তারও কোন সীমা সংখ্যা নেই। ভারতের ফরেণ ডিপার্টমেন্টের চালিয়াতী দেখলে কখনই মনে হয় না যে ভারত একটা অতি দরিদ্র দেশ, জনসাধারণ অনশনক্লিষ্ট।

ভারতের বৈদেশিক বিভাগের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হচ্ছে পৃথিবীতে অহিংসা, শান্তি আর প্রেম বিতরণ করা। এগুলো ত ভারত অতি সফলতার সঙ্গেই করছে, তাতে আর সন্দেহ কি! এগুলো বাদেও ভারতের প্রত্যক্ষ কতকগুলি বৈদেশিক স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে ভারত সরকার যে অদ্ভুত সফলতা দেখিয়েছেন, তা শুধু অদ্ভুত বলেই হয়ত কেউই আর আলোচনা করে সময় নষ্ট করতে চায় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় স্বার্থ যেভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং ভারতের বিরাট বিশ্বপ্রেস্টিজ সে ব্যাপারে যতটুকু করেছে তা সত্যিই আলোচনার অযোগ্য। সিংহলে ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারেও তাই। গোয়ার ব্যাপার নিয়ে ভারত ত আজ লেজে-গোবরেই হয়ে গেছে, ভারতের ফরেণ পলিসি গোয়াকে একেবারেই ফরেণ তৈরী করে তবে ছেড়েছে। আর পাকিস্থানের সাথে কাশ্মীর এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দু উদ্বাস্তুদের নিয়ে ভারতের অবস্থা যা হয়েছে, তা শুধুই করুণার উদ্রেক করে। কাশ্মীরের ব্যাপার নিয়ে

U. N. O. তে মামলা বাধিয়ে ভারত ত আজ নিজেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে, এবং দাঁড়িয়েছেও নিজের অতি-চালাকির ফলেই। আর আগেই ত বলেছি যে কমুনিস্ট চীনের সাথে প্রেম-পিরীতি জমাবার আশায় ভারত তিব্বতে তার নিজস্ব সম্পত্তিগুলি সমেত গোটা তিব্বতটাই চীনের হাতে উপঢৌকন হিসাবেই তুলে দিয়েছে। যার ফলে চীনের বিরুদ্ধে ভারতের আজ আর কোন রক্ষা ব্যবস্থা কোন মতেই সম্ভব নয়। (সম্ভব হয়ওনি, চীন ভারত আক্রমণ করে বসেছে এবং ভারত পদলেহন প্রক্রিয়ার পথই বেছে নিয়েছে।) চীনের পদলেহন করেই তাই আজ ভারতকে তার স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে। আর একাজ করে ভারত শুধু তার নিজেরই ক্ষতি করেনি পাকিস্থান, নেপাল এবং ব্রহ্মদেশেরও সমূহ ক্ষতি করেছে। (বর্ত্তমানে, মানে ১৯৬০ সালে নেপালের মহারাজা নিজ হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করার পর থেকে, ভারতীয় ফরেণ পলিসি নেপালকেও শত্রু হিসাবেই তৈরী করে তুলেছে। সম্ভবত নেপালের মহারাজার কার্যকলাপ শ্রীনেহেরুর প্রেস্টিজে আঘাত করেছে,—ইদানিং নেপাল সরকারই ত শ্রীনেহেরুর একমাত্র সমর্থক ছিলেন কিনা, তাই।)

কিন্তু এগুলোও সব নয়, ভারতের বৈদেশিক নীতির সফলতার ফিরিস্তি আরও অনেক আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে এসিয়া এবং আফ্রিকার জাতিসমূহের যে সম্মেলন হয় সেটা হয়েছিল ভারতেরই নেতৃত্বে, অন্ততপক্ষে ভারতীয় টাকার আদ্যশ্রাদ্ধের সাহায্যেই। সেই বান্দুং সম্মেলনে পয়দা করা এক দশধারা নীতি লাভ করে বিশ্ববাসী ধন্য হয়েছে। ভারতেরও বোধ হয় খুবই জয়-জয়কার হয়েছে—প্রচারকার্য অন্তত সেই রকমই করা হয়েছিল। তবে ঐ বান্দুং সম্মেলনে এশিয়া-আফ্রিকার অন্য সবাই নিমন্ত্রিত হলেও 'ইসরাইল' নামক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি নিমন্ত্রিত হয় নাই। বোধহয় ক্ষুদ্র বলেই তাকে অবজ্ঞা করা হয়েছিল; কিংবা হয়ত বিশাল এবং পরাক্রমশালী আরব রাষ্ট্রদের খুসী করবার জন্যই তার নিমন্ত্রণ হয়নি। কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র হলেও 'ইসরাইল' যে শক্তিসামর্থ্যে খুব ক্ষুদ্র নয় তা ইদানীং ভালভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। সুয়েজ ক্যানেলের হাঙ্গামার সময় তাই ইসরাইল যখন মিশরকে সায়েস্তা করে দিলে তখন ঐ বান্দুংয়ের নীতির দশ ধারার কোন ধারারই প্যাঁচে ফেলে তাকে দুটো গালমন্দ করারও সুযোগ পাওয়া গেল না। অবশ্য তাই বলেই যে বান্দুং নীতি হেঁকে বেড়ান বন্ধ হয়েছে তাও মোটেই নয়; আরও জোর গলায়ই হাঁকা হচ্ছে। হাঁকাহাঁকি করবার জন্যই ত ওগুলি পয়দা করা হয়

কিনা! ঠিক এইভাবেই ভারত এবং চীনের প্রধান মন্ত্রীদের আবিষ্কৃত পাঁচধারা নীতি, যা আজকাল পঞ্চশীল নামে বিশেষ পরিচিত হয়েছে, তারও পঞ্চত্ব পেতে দেরি হয়নি হাঙ্গেরীতে রাশিয়ার বলাৎকারী অভিযানে। অথচ ঐ পঞ্চশীলের গুণকীর্তন না করার জন্যেই পৃথিবীর অনেক বড় বড় রাষ্ট্র ক্রমেই ভারত থেকে অনেক দূরে সরে গেছে; আর রাশিয়া ভারতের পরম-আত্মীয় সেজে বসেছে ঐ পঞ্চশীল কীর্তন করেই। (চীনের ভারত আক্রমণের পর পঞ্চশীলের অবশিষ্ট আর কি আছে, তা একমাত্র জহরলাল নেহেরুই বলতে পারেন; এবং পারেন বলেই তিনি এখনও ঐ শীলেই মাথা ঠুকে পড়ে আছেন। তাকে আরও অনেক শীলেই মাথা ঠুকতে হবে।)

একটা জিনিস অবশ্য ভারত সত্যিই নূতন সৃষ্টি করেছে, এবং এটিকে বিশ্বে বৈদেশিক রাজনীতির ব্যাপারে ভারতের এক বিরাট অবদান বল্লেও খুব অন্যায় হবে না। বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এবং আদান প্রদান আরও ঘনিষ্ঠতর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপ্রধানদের ঘন ঘন বিদেশে ভ্রমণের ব্যবস্থা। ভারতের প্রধান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীজহরলালই যে এই নূতনত্বের আবিষ্কর্তা তাতে কোনই ভুল নেই। আর প্রধান মন্ত্রী হিসাবে বিদেশে ভ্রমণ করে তিনি ত পৃথিবীতে অনেক কিছুরই নূতন নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করে বসে আছেন। ছাত্রজীবনে পৃথিবী ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা যে তাঁর খুবই প্রবল ছিল, সেকথা ত তাঁর লেখাগুলোর মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই ছাত্রজীবনে যে আকাঙ্ক্ষাটি তিনি চরিতার্থ করবার সময় করে উঠতে পারেন নি, প্রধান মন্ত্রী হয়ে সেটা প্রায় শেষ করে এনেছেন, অল্পমাত্র কয়েকটা দেশই বাকি। কতকগুলো থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ রয়েইছে, আর অন্যগুলো থেকেও নিমন্ত্রণ করিয়ে নিতে খুব অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। শ্রীজহরলালের উর্বর মস্তিষ্কের এই অবদানটি সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। রাষ্ট্র পরিচালনার কঠোর কর্মে দিনরাত লেগে থাকতে হলে মন মেজাজ সব সময় ঠিক থাকে না, ফলও নিশ্চয়ই হয় খারাপ। আর বিদেশে ভ্রমণে ঘনিষ্ঠতাও বৃদ্ধি পায় আর মেজাজও সরিফ হয়; একেবারে ডবল লাভ।

ভারতীয় রাজনীতির এই বিশেষ অবদানটি যে বেশ খানিকটা চালু হয়েছে সে ত ভারতে রাজ-রাজড়া অতিথি-অভ্যাগতদের ঘন ঘন আসার ব্যাপার দেখেই বুঝতে পারা যায়। তবে চালু হয়েছে প্রাচ্যের দেশগুলোতেই, যাদের শাসনকর্তাদের রক্তে বাদশাহী ভাবটা এখনও কাটেনি; এবং যাদের

দেশের জনসাধারণ আরও দুর্দশাগ্রস্ত। রাজা রাজড়াদের এই সব সেরিমনিয়াল ভ্রমণকার্যে যে পরিমাণ টাকার শ্রাদ্ধ করা হয় তা শুধুই অনগ্রসর দেশের শাসন-কর্তাদের পক্ষেই সম্ভব। যেসব দেশে টাকা খরচ করে জনসাধারণের কাছে হিসাব দিতে হয়, তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। আর এই ভ্রমণ সুখ উপভোগের নূতন রাজনীতিটি সফল করে তুলবার জন্য ভারতের বৈদেশিক বিভাগও অনেক নূতন নূতন কথা বলার প্যাঁচ আবিষ্কার করে ফেলেছেন; সেগুলোকেও এ আমলের নূতন 'ডিপ্লোমেসি' বলা চলে। রাষ্ট্র-প্রধানদের বিদেশে ভ্রমণ করা সম্ভব হয় তখনই যখন কোন বিদেশী সরকার তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানায়। তাই বিভিন্ন দেশ থেকে আমন্ত্রণ সংগ্রহ করাই হচ্ছে এই ডিপ্লোমেসির একমাত্র কাজ।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল ইউরোপের বহু দেশ বহুবার ঘুরে এসেছেন। নিমন্ত্রণ পেয়ে তিনি রাশিয়াতেও গেলেন। ফেরবার পথে আর এক নিমন্ত্রণ পেয়ে অস্ট্রিয়াতে ঘুরে এলেন। কিন্তু জার্মানীতে গিয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশামৃত ছড়াবার সুযোগ আর পান না। জার্মানী কিছুতেই তাঁকে নিমন্ত্রণ করে না। রাশিয়া থেকে ফিরে এসে জার্মানীর এই দুর্ব্যবহারেই কিনা বলা যায় না, দিল্লীর এক জনসভায় বক্তৃতা করতে উঠে সম্পূর্ণ অকারণে এবং অপ্রাসঙ্গিকভাবে জার্মানীকে গালাগালি করলেন,—জার্মানীই নাকি বিগত দুটো মহাযুদ্ধের জন্য দায়ী; তাই তাদের বিশ্বাস করে অস্ত্রসজ্জিত করা যায় না, ইত্যাদি,—ভাবটা এমন যে জার্মানীকে অস্ত্রসজ্জিত করবার মালিক তিনি নিজেই। এই বক্তৃতার পর জার্মান সরকারের মনোভাব ভারতের প্রতি কতখানি প্রেমে উথলে উঠেছিল জানা যায় নি; কিন্তু তবুও জার্মানী শ্রীজহরলালকে তাদের দেশে নিমন্ত্রণ করে অযথা শ্রীজহরলালের দর বাড়াবার সুযোগ দিতে রাজী হয় না। তাই শেষ পর্যন্ত শ্রীজহরলালকেই একটু নেমে আসতে হয়। তিনি মেজাজ দেখিয়ে নিমন্ত্রণ আদায় করবার পথ ছেড়ে দিয়ে নিমন্ত্রণের সোজা পথটি বেছে নিতে বাধ্য হন। শ্রীজহরলাল জার্মানীর প্রধান মন্ত্রীকে ভারতে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠান। কিন্তু জার্মানীর প্রধান মন্ত্রী ত আর ভারতের প্রধান মন্ত্রী নন যে দেশে দেশে নিমন্ত্রণ খেয়ে সেরিমনি করে বেড়ালেই বিরাট, বিপুল, সুমহান হতে পারবেন। তাই তিনি অপারগ হয়ে ভদ্রতার খাতিরে তাঁর ডেপুটিকে ভারত ভ্রমণে পাঠালেন। জার্মানীর ভাইস-চ্যান্সেলার ভারত ভ্রমণ করে অনেক প্রশংসাপত্র ত দিয়ে গেলেনই, উপরন্তু

যেটা খুবই স্বাভাবিক শ্রীজহরলালকেও নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন, তাঁদের দেশে পদধূলি দেবার জন্য। তিনি শ্রীজহরলালকে পদধূলি দেবার আমন্ত্রণ জানাবার পর, দিল্লীতে এক প্রেস কনফারেন্সে যে কথাটি বলেছিলেন, সেইটেই হচ্ছে আসল কথা, একেবারে চিচিংফাঁকের কথা। তিনি বলেছিলেন যে শ্রীজহরলাল স্বেচ্ছায় জার্মানীতে যাবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন (Jaharlal has willigly accepted)। জহরলাল যে খুব ভীষণ ডিপ্লোমাট তাতে আর সন্দেহ কি! জার্মানী তাঁকে তাঁদের দেশে পদধূলি দেবার নিমন্ত্রণ করে, একি কম কথা! জহরলালের দর কত তা জার্মানরাও জানে। এই ভাবেই জহরলালের দর আর পদধূলি তত্ত্ব বুঝতে বুঝতেই অনেকের হয়ত চোখেই ঠেকল না যে জার্মানীর ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী সাহেবও একটা দামী কথা (willingly accepted) বলে ভারতের এই নূতন ডিপ্লোমেসির সবটুকুই ফাঁস করে দিয়ে গেছেন।

এই ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিকল্পে রাষ্ট্রনেতাদের বিদেশ ভ্রমণের ব্যাপারটির কিছু উপকারিতাও হয়ত থাকতে পারে। রাষ্ট্রনেতাদের শরীর এবং মনের সরসতা ত অবশ্যই বৃদ্ধি করে। তবে এই নূতন ব্যবস্থাটির ফলে যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে এক অতি জটিল মিথ্যাচারিতার সুযোগ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রপ্রধানেরা দেখা সাক্ষাতের সুযোগে এক গ্লাসের টেবিলে বসে "মাইরি বলছি, মুখে যাই বলিনা কেন আমি তোমারই পক্ষে", কথাটি বলবার যে সুযোগ পান এম্বেসাডর মারফৎ চিঠিপত্র লিখে সে সুযোগ কখনই সম্ভব নয়। মুখের কথাতেই যখন রাজনীতি শেষ করা যায়, তখন একই সঙ্গে পৃথিবীর পরস্পরবিরোধী সব দেশকেই একই আশ্বাস দেওয়াও খুবই সহজ হয়ে গেছে। এমনিতেই ত পররাষ্ট্র রাজনীতিতে 'ডিপ্লোমেসি' কথাটি মিথ্যা কথা বলার-রাজনীতি বলেই সাধারণের কাছে পরিচিত। তার উপর চিঠিপত্র লেখালেখির বা কালি-কলমের ধার যদি না ধারতে হয় তাহলে আর কথা কি! রাশিয়া একই সঙ্গে ভারত, পাকিস্থান এবং আরও অনেককে একই আশ্বাস দিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারে; হচ্ছেও তাই। তবে এই নূতনত্বের আবিষ্কর্তা শ্রীজহরলালের যে দেশ ভ্রমণ করে স্বাস্থ্য ফিরেছে, সে ত দেখাই যায়। আপাততঃ সেটাই লাভ।

দুনিয়ার সব দেশের বৈদেশিক নীতির মূল কথাই হচ্ছে, বিদেশে নিজ দেশের স্বার্থরক্ষা বা বৃদ্ধি করা। ভারত ওসব স্বার্থটার্থ কিছু বুঝে না, তাই এক-

বারেই নিঃস্বার্থ। একান্ত নিঃস্বার্থভাবেই তামাম দুনিয়াতে অযাচিত উপদেশামৃত ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে (অযাচিত উপদেশামৃত দানের ফলে ভারতের না হলেও, ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলালের যে কি ভীষণ নাম হয়েছে তা অনেকেই জানেন না। আমেরিকান প্রেস আজকাল জহরলালের উল্লেখ করতে গেলেই যে বিশেষণ ক'টি ব্যবহার করে তা হচ্ছে,—"globe trotting, sermonising, permanent Prime minister of India")। ভারতের নেতাদের মতে যা কিছু খারাপ তার কোনটারই বিরুদ্ধে উচ্চ প্রতিবাদ জানাতে ভারত একটুও দ্বিধা করে না, দেরী ত নয়ই। এটম বোমা বা হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্যের বিরুদ্ধেও ভারতের প্রতিবাদের অন্ত নেই। কোথাও একটা ঐ বোমা ফাটিয়ে পরীক্ষা করতে গেলেই শ্রীজহরলাল চেঁচিয়েই গলা ফাটান। আর এই আণবিক পরীক্ষা-কার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ব্যাপারেও শ্রীজহরলালের প্রতিবাদ শুধুই আমেরিকা বা ইংরেজ-ফরাসীর বিরুদ্ধে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে কখনই নয় ;—অবশ্য আণবিক বোমা নিয়ে পরীক্ষাকার্য চালাবার মত বৈজ্ঞানিক উন্নতি রাশিয়ার হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে অনেক ভাল গোপন খবর তিনি হয়ত রাখেন !

মোটকথা, কথা বলবার একটা সুযোগ তিনি কখনই ছাড়েন না, উপরন্তু যেখানে একটা কথা বল্লেই চলে, সেখানেও সহস্র সহস্র কথা বলেন। আর এই বেশি কথা বলেই যে তিনি অনেক দেশকেই বেশ চটিয়ে তুলেছেন, তা বুঝতেও আজকাল আর ভুল হয় না। তবুও তাঁর বাহাদুরীর অন্ত নেই। থাকবেই বা কি করে, এখনও যে আইসেনহাওয়ার তাঁকে ডেকে চেয়ার টেনে বসতে দেন। এন্থনি ইডেনের সাথে দেখা করতে গেলেও প্রত্যাখ্যান করেন না। এমন কি জার্মানির উভয়খণ্ডকে একত্রীকরণ সাহায্যের উদ্দেশ্যে শ্রীজহরলাল কোন ফর্মুলা এগিয়ে দিতে গেলেও কাউকে আর হেসে ফেটে পড়তেও দেখা যায় না—গা-টেপাটিপি করে মুচকি হাসি কেউ হাসেন কিনা সেটা অবশ্য এখনও জানা যায়নি। তবে আইসেনহাওয়ার ডেকে চেয়ার দিয়ে তাঁকে যে কি সম্মান দেখান, তা U. N. O.তে কাশ্মীরের বর্তমান প্রস্তাব পাশ হতেই আর কারও বুঝতে বাকি নেই। এবার ('৫৬ সালের শেষে) জহরলাল যখন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন আইসেনহাওয়ার তাঁকে তাঁর খামার-বাড়ীতে নিয়ে যান, এবং খবরের কাগজেই দেখেছি যে ঐ খামার-বাড়ীতে আইসেনহাওয়ার, চাষ-আবাদ সম্বন্ধে আধ ঘণ্টা

বক্তৃতা করে শ্রীজহরলালকে শুনিয়েছিলেন। খবরটির তাৎপর্য তখন ঠিক বুঝতে না পারলেও বর্তমান কাশ্মীর প্রস্তাব U. N. O.তে পাশ হবার পর আর কারু বুঝতে বাকি নেই যে, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার শ্রীজহলালকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে বেশি কথা না বলে চাষ-আবাদে মন দেবার কথাই বলেছিলেন।

যাই হোক, এরকম নিঃস্বার্থভাবে পৃথিবীসুদ্ধ সবাইকে খোঁচা দেবার প্রবৃত্তির ইতিহাস আর কোথাও আছে বলে জানিনা। ছোট বড় সবাইকে খোঁচা দিতে পারলেই, সবাইকে ডোণ্ট কেয়ার ভাব দেখাতে পারলেই নিজে মস্তবড় সেটা প্রমাণ হয়ে যায়, ভাবটা অনেকটা এই ধরণের আর কি! একান্ত নিঃস্বার্থভাবে উপদেশের বা গালাগালির খোঁচা দিয়ে ভারত যে বিশ্বসভায় কতখানি প্রেস্টিজ বড়িয়েছে, তা সাধারণের বোধগম্য নয় নিশ্চয়ই; কারণ সাধারণেরা যে সব জিনিস দেখে ঐ জিনিসটিকে আন্দাজ করবার চেষ্টা করে সেগুলো ভারতের আজ আর নেই। ভারতের পুনর্গঠন-কাজে বাইরে থেকে যে সাহায্য আসছে, তা ঐ ফকিরের ভিক্ষের চাইতে বেশী কিছুই নয়। আজ বিশ্বসভায় ভারতের দলে আর কেউই নেই,—ভারত অবশ্য অন্যদের দলে জুটে বক্তৃতাবাজী করতে ছাড়েনা, ঠিকই। পাকিস্থান, সিংহল, পর্তুগাল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের স্বার্থের যে প্রত্যক্ষ সংঘাত চলছে সে ব্যাপারেও ভারতের জন্য কারও বিশেষ সহানুভূতি আছে বলে মনে হয় না। ভারতের বিশ্ব-প্রেস্টিজ বেড়ে যাচ্ছে এই বক্তৃতাটাই আছে, আর কিছুই নেই। নিজের দেশের স্বার্থের কথা যারা ভাবে না, যারা নিজের দেশকে উন্নত করবার চেষ্টা না করে পরকে উপদেশ দিতেই ব্যস্ত; কাজ নয় কথাই যাদের সব, তাদের প্রেস্টিজ বাড়া কখনই সম্ভব নয়।

তবে ভারতের প্রেস্টিজ যে কখনও ছিলনা বা এখনও নেই সেটাও মোটেই সত্যি নয়। ভারতের প্রেস্টিজ অবশ্যই আছে, তবে সেটা বর্তমান ভারতীয় নেতাদের বাগাড়ম্বরের জন্য নয়। ভারতের প্রেস্টিজ রয়েছে তার বিশালত্বে, তার ইতিহাসে, তার ভৌগোলিক সংস্থানে, তার দর্শনে, তার কলায়, তার সাহিত্যে, তার সংস্কৃতিতে, এমন কি তার অর্থনৈতিক সম্ভাবনায়; এমনি ধারা আরও অনেক কিছুতে। ভারতীয় নেতাদের চালবাজীতে নয়, বা তাদের বিশ্বপ্রেমের বক্তৃতায়ও নয়; বরং মনে হয় এই সহজিয়া পন্থায় প্রেস্টিজ আহরণ করতে গিয়েই ভারত তার প্রেস্টিজ অনেকটা খুইয়েছে। ভারতকে যে অনেক ব্যাপারে ডাকা হয়, অনেক ব্যাপারে তার মতামতের গুরুত্ব দেওয়া হয়, সে তার ঐ আদি এবং অকৃত্রিম প্রেস্টিজের খাতিরেই, অন্য কোন কারণে নয়।

এমন কি ভারত যে দুপক্ষের মধ্যে নিরপেক্ষ হয়ে বসে রয়েছে সে জন্যও নয়। ব্রহ্মদেশও এপর্যন্ত নিরপেক্ষভাবেই চলছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক কোন ব্যাপারে আজ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশকে বিশেষ গুরুত্ব কেউই দেয়নি, ঐ একই কারণে বা ঐ কারণের অভাবেই।

শক্তিই হচ্ছে সব প্রেস্টিজের মূল। সেই শক্তিই যখন নেই, আর সে শক্তিকে গড়ে তোলবার চেষ্টাও যেখানে উদ্যমহীন, সেখানে প্রেস্টিজের কথা উঠতেই পারে না। জার্মানী জাপান লড়াইতে হেরে গেছে ঠিকই, চুরমার হয়ে গেছে তাদের অনেক কিছুই; কিন্তু তারা শক্তিমান জাতি, শক্তির মর্যাদা বুঝে, তাই প্রাণপণে আবার চেষ্টা করছে নিজেদের গড়ে তোলবার; গড়ে তুলেওছে। সাহায্যও পেয়েছে প্রচুর, সাহায্য হিসাবেই; ফকিরের ভিক্ষার মত নয়। লড়াইতে হেরে গিয়েও তাদের সম্মান বিশ্ব-সভায় কিছু কমে যায়নি, বরং বেড়েছে। ভারতের না খেয়ে বেঁচে থাকবার শক্তি অবশ্যই আছে; পরাধীন অবস্থায় বহুশত বৎসর থেকেও যে একেবারে শেষ হয়ে যায়নি, সেও ভারতের একটা শক্তিরই লক্ষণ; কিন্তু ভারতের এই নেতিবাচক শক্তি কোন প্রেস্টিজ বহন করে না। তাই আজ ভারতের নেতিবাচক আন্তর্জাতিক রাজনীতিরও কোন প্রেস্টিজ নেই। অথচ এই নেতিবাচক, কিছু না করার রাজনীতি—এটা করনা বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে, ওটা করনা আগুন লেগে যাবে, এই ন্যাকামি করবার জন্যই ভারত তার দরিদ্র জনসাধারণের অর্থের যে অপব্যয় করছে তারও আর কোন তুলনা হয় না। ভারতের ফরেণ ডিপার্টমেণ্টের বাৎসরিক খরচ নাকি প্রায় তিরিশ কোটি টাকা। প্রায় বলছি এই কারণেই যে ভারতের ফরেণ ডিপার্টমেণ্টের অনেক বাজে খরচের টাকা অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টকেও যোগাতে হয়, এমন কি প্রাদেশিক সরকারদেরও। যাই হোক ঐ তিরিশ কোটি টাকাই যদি মাত্র খরচ হয়, তাহলেও বলতে হবে, এ এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার! শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যেখানে যথেষ্ট টাকা নেই অজুহাত দেখান হয়, সেখানে বাৎসরিক তিরিশ কোটি টাকা খরচ করে ঐ ফরেণ ডিপার্টমেণ্ট। তারও বেশীর ভাগ টাকাটা নিশ্চয়ই খরচ হয় বিদেশে। এটাকে লুট ভিন্ন আর কি যে বলা যায় জানি না! ভারতের অনেকগুলো প্রদেশেরই বাৎসরিক আয় দশ থেকে পনের কোটি টাকার বেশী নয়; অথচ কোটি কোটি সাধারণ মানুষের সব কিছু শুভাশুভ নির্ভর করছে ঐ প্রাদেশিক সরকারদের আয়ের উপরই। বিহার

একটা প্রদেশ যার লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে চার কোটি, তার আয় মাত্র চৌত্রিশ কোটি টাকা; দেখবার মত নয় কি? (বর্তমানে অবশ্য ফাঁপা টাকার কল্যাণে বিহারের প্রাদেশিক আয়ও অনেকটাই বেশী দেখান হচ্ছে। তবে সে বেশী যে শুধুই ফাঁপা বলেই বেশী তাতে সন্দেহ করবার কেউই নেই)।

কিন্তু আসলে ফরেণ ডিপার্টমেন্টের এই টাকাটা খরচ হয় কিসে? কয়েকজন এম্বেসাডর পুষতেই কি অত টাকা লেগে যায় নাকি? না তাও নয়। অজস্র মিশন কমিশন আরও কত কি, প্রতিদিনই সারা পৃথিবীময় টহল মারতে বের হচ্ছে। কালচারাল মিশন, কমার্শিয়াল মিশন, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিশন, পিস মিশন আরও কত কি কেবল পৃথিবীময় চষে বেড়াচ্ছে। মিশনে যারা যায় তারা বেশ চালাক হয়ে দেশে ফিরে, আর সরকারী সকল কর্মের গুণ গায়। এটা বুঝি এবং এর কারণও না বুঝবার মত নয়। কিন্তু আসলে তাদের কি উদ্দেশ্যে পাঠান হয়, আর তারা কি কাজ করে তা মোটেই বোধগম্য নয়। ভারতীয় মিশনের মিশনারী হতে হলেও যে কি কি গুণাবলীর দরকার হয় তাও কারও জানা নেই। সিনেমাওয়ালী ছুকরী মেয়েদের থেকে আরম্ভ করে হিন্দী সাহিত্যিক পর্যন্ত অনেকেই নির্বিচারে মিশনে স্থান পান। অনেক সময় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং অন্যদেরও পাঠান হয় ঠিকই; তবে একেবারে নিরপেক্ষভাবে যে নয়, সে ত ফেরবার পর তাঁদের কথাবার্তা শুনেই আঁচ করা যায়,—সবাই ভারতের এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষ শ্রীজহরলালের গুণ মাহিমা কীর্তনেই পঞ্চমুখ। মনে হয় শ্রীজহরলালের গুণ কীর্তন করবার মত গুণ থাকলেই মিশনারী হতে আর বাধা নেই।

আর ভারতের অতি-দরিদ্র সাধারণের টাকায় যে ডজন কয়েক এম্বেসির শ্বেত-হস্তী পোষা হচ্ছে তাদেরই বা খবর কি? তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বসে আড্ডাটি ত বেশ জমিয়েছেন শুনতে পাই; কিন্তু কাজ কি করছেন? এবিষয়ে ডিটেল কিছুই জানি না, জানা সম্ভবও নয়;—এসবই হচ্ছে কিনা স্টেট সিক্রেট। তবে বাইরে থেকে মূর্খ সাধারণের পক্ষেও যেটুকু জানা অসম্ভব নয় সেটুকু যে মোটেই আশাব্যঞ্জক নয় তা অনেকেই বিদেশে ভারতীয় এম্বেসিদের সমালোচনা করে বলে থাকেন। টাকা পয়সাও তাঁরা বেশ বেহিসাবী হিসাবমতই খরচ করতে সিদ্ধহস্ত,—অডিটার জেনারেলের রিপোর্টেই সে খবর অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে। তবে শুধু এম্বেসাডরদের দোষ দিয়ে কোন লাভ হয় না। ভারতের বৈদেশিক বিভাগ থেকেই যদি বিদেশে অবস্থানকারী এম্বেসি অফিসার এবং

স্টাফদের জন্য মদ্য সরবরাহ করবার ব্যবস্থা ঠিক রাখা হয়, তাহলে ঐ সুধারস পান করে অফিসাররা একটু বেহিসাবী হওয়াই স্বাভাবিক। ভারত দেশে মদ্য-পান নিষেধ করে আইন পাশ করে আর বিদেশে তার কর্মচারীদের সুবিধার জন্য মদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা রাখে, একথাটি হয়ত বুঝতে অনেকেই ভুল করবেন; তাই আবারও বলছি যে কথাটি সত্যি। পূর্ববাংলার ঢাকায়—মানে আমার দেশে ভারতের যে হাই-কমিশন অফিস আছে, সেখানের ব্যবস্থাটি জেনেই কথাটি বলা হচ্ছে, আন্দাজে নয়।

ভারতের বৈদেশিক বিভাগে এম্বেসেডার নিয়োগ করা হয় কি প্রথায়, আর ঐ কাজের জন্য তাঁদের কি কি গুণাবলীরই বা প্রয়োজন, সে খবরও আজ পর্যন্ত কারুর জানা নেই। শ্রীনেহেরুই সর্বময় কর্তা, তাই তাঁর ইচ্ছাই যে শেষ কথা তাতে আর সন্দেহ কি! ফলে তাঁর চেনাজানা বন্ধু-বান্ধব বা হাতের লোক হলেই যে কোন ভাগ্যবানের এম্বেসাডর হতে কোন বাধা নেই। ঐ চাকুরীতে ডাঃ রাধাকৃষ্ণানকে কেন নেওয়া হয়েছিল সেটা কেউই জানে না। তবে অন্য সকলে যে নেহেরুজীর ইয়ার-দোস্ত তাও সকলেরই ভালভাবেই জানা কথা। এই নিয়োগের ব্যাপারে কত অদ্ভুত খামখেয়ালী এবং মনোবৃত্তির পরিচয় যে পাওয়া যায় তারও আর অন্ত নেই। অনেকদিন আগে ঢাকায় যখন ডেপুটি-হাই কমিশনার হচ্ছেন শ্রীসন্তোষ বোস, তখন পাকিস্থানে ভারতীয় হাই কমিশনার পদ খালি হতে সেখানে পাঠান হল এক ডাঃ সীতারামকে। ডাঃ সীতারামের পরিচয়ে জানা গেল তিনি এলাহাবাদের লোক, এলাহাবাদ এবং বেনারস বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য, এবং ১৯২০ সালের পূর্বে তিনি কংগ্রেসের রাজনীতির সমর্থক ছিলেন। সবই খুব পরিষ্কার, তিনি এলাহাবাদের লোক এবং হয়ত শ্রীজহর-লালের ছোটবেলার বন্ধুও বটেন; কিন্তু শ্রীসন্তোষ বোস যে ভারতের রাজনীতির উপরতলাতেই একদিন বিচরণ করতেন, তিনি কলকাতার একজন মেয়রও ছিলেন, এসব কথা ভেবে দেখবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না।

এইভাবেই ভারতের এম্বেসাডররা চাকুরী পেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন, তাই তাঁদের কার্যকলাপও হচ্ছে ঐ বিখ্যাত রকমেরই, মানে গল্প লেখবার মতই। চীনে ভারতীয় এম্বেসাডর পানিক্কর সাহেব, চীনের তিব্বত আক্রমণের মতলবের কোন খবরই দেশে পাঠাতে পারেননি বরং অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে খবরটি শুনে জ্ঞানলাভ করেছিলেন, সে কথা ত আগেই বলেছি। তাই বলে তাঁর উন্নতিতে কোন বাধা পড়েনি। পরে তিনি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সদস্য হয়েছিলেন;

আর আরও পরে, কিছুদিন আগে তিনি প্রাইজ-পোস্ট প্যারীর এম্বেসিডে ছিলেন। শ্রীজহরলালের ভগ্নী মাদাম বিজয় একজন ঝানু এম্বেসাডর। তিনি ঐ চাকুরী নিয়ে কত দেশই না চষে বেড়ালেন, U.N.O.তে সভাপতিও হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি লণ্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনারের অফিস জাঁকিয়ে বসে আছেন। সুয়েজ ক্যানেলের গণ্ডগোলের সময় তিনি লণ্ডন থেকে যে সমস্ত সংবাদ দেশে পাঠিয়েছিলেন, তারই উপর ভিত্তি করেই নিশ্চয়ই ভারত সরকারের ধারণা হয়েছিল যে, ইংরেজ শেষ পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগ করবে না। আর তিনিও এতই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে ঐ হাঙ্গামা চলা কালেই ছুটি নিয়ে অবসর বিনোদনের জন্য দেশে এসে বসে থাকলেন। ইংরেজ মিশরের কর্ম শেষ করে দিতেও তাড়াতাড়ি লণ্ডনে ফেরবার কোন তাগাদা দেখালেন না। স্বয়ং জহরলাল ভগ্নী তিনি, তাঁর তাগাদাই বা কিসে! মিশরে ভারতের এম্বেসাডর জঙ্গবাহাদুর সাহেবও ঐ একই সময়ে অবসর বিনোদনের জন্য দেশে এসে বসেছিলেন।

যাকগে, কথায় কথা বাড়ে, বেশী কথা বলে লাভও নেই। এইভাবেই ভারতের এম্বেসাডররা তাদের কাজ করে যাচ্ছেন, ভারতের ফরেণ প্রেস্টিজ বাড়াবার জন্যই। তবে ভারতের এম্বেসি প্রায় সব দেশেই আছে, যার সাথে আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা অন্য কোন রকমের সম্পর্কও নেই, সে রকম বহু দেশেও ভারতের এম্বেসি আছে,—ভারত যে একটা ভীষণ কিছু তাই দেখাবার জন্যই। ভারত সেটা ভালভাবেই দেখাচ্ছে, দেখাবেও; দেখাতেই থাকবে, যতদিন না দেখাতে দেখাতেই হয়ে যায়।

পাকিস্থানের ফরেণ পলিসি অন্যান্য সব দেশের মতই, বিশেষ কিছু নূতনত্বের ব্যাপার নেই। সাধারণত একটা দেশের ফরেণ পলিসি যা হওয়া উচিত—মানে বিদেশে নিজেদের স্বার্থরক্ষা বা স্বার্থবৃদ্ধির চেষ্টা করা। পাকিস্থানের ফরেণ পলিসিও প্রায় সেই রকমই। ভারতের মত পৃথিবীর নেতা হবার দুরাকাঙ্ক্ষা পাকিস্থান রাখেনা, এবং রাখেনা বলেই উপদেশামৃত বিলিয়ে কাউকে বিশেষ উত্যক্তও করে না। পাকিস্থান তার অবস্থা বিষয়ে অজ্ঞ যে নয়, তাও তার ফরেণ পলিসিতে প্রমাণ পাওয়া যায়। বাইরের কতকগুলি দেশের সাথে মিলিটারী প্যাক্ট করে পাকিস্থান তার দেশরক্ষার ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে এবং ঐ প্যাক্টগুলির ফলেই সে বাইরে থেকে নানারকম সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যও পাচ্ছে। তবে পাকিস্থানের ফরেণ পলিসির আসল

দুর্বলতা হচ্ছে তার হোম পলিসি, যেটা এখনও বলা কঠিন যে, কি। এই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যই পাকিস্থান বিদেশে কিছুই সুবিধা করে উঠতে পারছে না। বিদেশ থেকে যে সাহায্যটুকু পাচ্ছে তাও যে খুব ভালভাবে কাজে লাগাতে পারছে, তাও নয়।

তাছাড়া পাকিস্থানের ফরেণ পলিসি ভারতকে এতই করেণ করে তুলেছে যে সেটাও তার দুর্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। পাকিস্থানের পক্ষে ভারতকে শত্রু হিসাবে তৈরী করে রেখে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। আর তার এই দুর্বলতাটুকুও যে তার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতারই আর একটা বহিঃপ্রকাশ সেবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। তবে অনেক বিষয়ে যে, আজ আর কারুরই ভারতের সাথে এক সঙ্গে চলা সম্ভব নয়, সেটাও কম সত্যি কথা নয়। কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্থানের অবস্থা ভারতের চেয়ে অনেকটাই ভাল। কাশ্মীরের উপর পাকিস্থানের আইনত কোন দাবি না থাকলেও পাকিস্থান আজও কাশ্মীরের অনেকটা অংশ নিজের দখলে রাখতে পেরেছে, এবং আশা করা যায় যে শেষ পর্যন্ত সেটুকু আইনগতভাবেই সে পেয়েও যাবে। কাশ্মীরের ব্যাপার নিয়ে U.N.O.-তে যে মামলা চলছে, তাতেও পাকিস্থানের অবস্থা অনেকটাই ভাল। তবে শেষপর্যন্ত যে U. N. O. এগিয়ে এসে বাকি কাশ্মীরটাও পাকিস্থানের হাতে তুলে দেবে না, সে কথাটি পাকিস্থানের রাজনীতিকরা যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারেন ততই মঙ্গল। তবে কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্থানের সুবিধাটুকু যে পাকিস্থান নেতৃত্বের বুদ্ধি বলেই এসেছে, তাও নয়, ভারতের বেশী চালাকির ফলেই ঐ সুবিধাটুকু পাকিস্থানের পক্ষে এসে গেছে। গোয়ার ব্যাপার নিয়ে পাকিস্থান ইদানিং বেশ কিছু মাথা ঘামাচ্ছে বলেই মনে হয়, যদি কিছু করতে পারে, তবে বাহাদুরী দিতেই হবে। মোটকথা ভারতের রাজনীতির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পাকিস্থান যদি কিছু কাজ হাসিল করতে পারে, তবে পাকিস্থানের রাজনীতির পক্ষে সেটা কোন নিন্দার বস্তু কখনই নয়। ভয় যেটুকু তা হচ্ছে যে ভারতের থেকে পাকিস্থান তাহলে আরও বেশী দূরে সরে যাবে, যা পাকিস্থানের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে কখনই উচিত বিবেচিত হওয়া উচিত নয়।

তবে পাকিস্থানের বৈদেশিক রাজনীতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে তার অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্রগুলির সাথে বন্ধুভাব সৃষ্টি করতে না পারাটা। পাকিস্থান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র বলে নিজেকে দাবি করলেও, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর

নেতৃত্ব অর্জন করবার জন্য কিছুই করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, অনেক ব্যাপারে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থের পরিপন্থী কাজও করেছে। পাকিস্থানের সুয়েজ ক্যানেলের রাজনীতি সাধারণভাবে খুব অন্যায় কিছু না হলেও, আরব রাষ্ট্রগুলোতে তার সম্মান অনেকটাই নষ্ট করেছে। এই একটা ব্যাপারে মনে হয় পাকিস্থান একটু বেশী বাহাদুরী দেখাতে গিয়েই তার অবস্থা খারাপ করে ফেলেছে। পাকিস্থান যদি ঐ গণ্ডগোলের সময় অত হাঁক ডাক করে একটা বিরুদ্ধ দল পাকাবার চেষ্টা না করত তা হলেই অনেক বুদ্ধিমানের কাজ হ'ত। আর ইদানীং পাকিস্থানের পররাষ্ট্র বিভাগ এবং সরকারও পররাষ্ট্র ব্যাপার নিয়ে বেশ একটু বেশী কথাবার্তা বলা শুরু করেছেন। মনে হয় তাদের কোন বিশেষ দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্যই। এটাও বিশেষ ভাল লক্ষণ নয়।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল আবিষ্কৃত রাষ্ট্রনেতাদের সেরিমোরিয়াল দেশভ্রমণ নীতিটি অন্য সব দুর্বল এবং অনগ্রসর দেশগুলোর মতই পাকিস্থানও গ্রহণ করেছে এবং ঐ বাবদে বেশ কিছু টাকার শ্রাদ্ধকার্যও হচ্ছে। ভাবটা দেখে মনে হয় উপরতলার রাষ্ট্রনেতাদের ভোগাকাঙ্ক্ষাটা ভারত বা পাকিস্থানে বিশেষ অভিন্ন নয়; ভয়টাও সেইখানেই।

তবে শেষপর্যন্ত পাকিস্থানের অন্যান্য অনেক সফলতার মতই পররাষ্ট্র-নীতির সফলতাও নির্ভর করে ভারতের সাথে খানিকটা বন্ধুত্ব ফিরিয়ে আনবার মধ্যেই। ভারত হয়ত বা পাকিস্থানকে খানিকটা অবজ্ঞা দেখিয়েও চলতে পারে; কিন্তু পাকিস্থানের পক্ষে সেটুকুও কঠিন। ভারতের সাথে খোঁচাখুঁচি বন্ধ না হলে পাকিস্থানের সামরিক ব্যয় কমান কোন দিনই সম্ভব হবে না; আর সেই সঙ্গে হবে না পাকিস্থানের সত্যিকারের কোন উন্নতিও। পাকিস্থানের পররাষ্ট্রনীতির আসল সমস্যাও এইখানেই।

জহরলাল দি মহামানব

ভারত আর পাকিস্থানের নেতৃত্ব, যা ইংরেজ ভারত ছেড়ে যাবার সুযোগ নিয়ে অতি সহজ, সরল এবং নির্ঝঞ্ঝাট পন্থায় দেশটাকে ভাগ করে নিয়ে দুটি গদীতে আসীন হয়ে বসেছে, তাদেরও কিছুটা বুঝতে হবে। ভারত এবং পাকিস্থানের নেতৃত্ব দেশ ভাগ করার ব্যাপারে যে আপোষী মনোভাব দেখিয়েছিল, সেটা যে পৃথিবীতে অভূতপূর্ব হয়েছিল তাতেও কোন সন্দেহ নাই। শান্তি আর

উন্নতিই ত রাজনীতির একটা অতি-প্রধান উদ্দেশ্য; তাই শান্তিতে একটা কাজ করতে পারা সব সময়েই বাহাদুরীর কাজ। ইংরেজকে শান্তিতে ভারত ছেড়ে যেতে দেওয়ার বাহাদুরীও সেইখানেই। তবে কিনা মনে ইচ্ছা থাকলেই ত আর সব কিছুই কাজে করা সম্ভব নয়! তাই ইংরেজ বাহাদুরী নিয়ে শান্তিতে চলে গেলেও ভারত বা পাকিস্থানে ঠিক অখণ্ড শান্তি বিরাজ করান কখনই সম্ভব হয়নি। ভারত আর পাকিস্থানের মধ্যে নানা অশান্তি ত লেগেই আছে; তার উপর দেশ দুটির সাধারণ লোকদের ভেতরও শান্তি নেই। যে বিরাট সমস্যা সমাধানের জন্য দেশটাকে ভাগ করে দুটো করা হয়েছিল। সে সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। শুধু যে সমাধান হয়নি তাও নয়, সমাধানের নানা চেষ্টা করতে গিয়ে আরও নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্ভবত এই নূতন সমস্যাগুলোর সমাধানের চেষ্টায় আরও অনেক নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হবে; এবং সমস্যাগুলোর চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি কোন দিনই বন্ধ হবে না। অন্য সব সমস্যার সংখ্যাও বাড়ছে এবং ক্রমেই বেড়ে বেড়ে ইতিমধ্যেই অসংখ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, আর সেই সঙ্গে সমাধানের আশাও ক্রমেই কমে আসছে; চেষ্টাও আর বিশেষ নেই। চেষ্টা যা হচ্ছে তা শুধুই সমস্যাকে পাশ কাটাবার, আর নিজেদের গদি বাঁচাবার চেষ্টা। এই গদি বাঁচাবার চেষ্টাকেই আজ ভারত এবং পাকিস্থানেও রাজনীতির মুখোস পরিয়ে রাজনীতি বলে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে; চেষ্টা হচ্ছে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে অপদার্থ নেতৃত্বের দিক থেকে তাদের চোখকে সরিয়ে দেওয়ার। তাই ঐ নেতৃত্বকে আরও ভাল করে বুঝবার প্রয়োজন আরও বেশী।

ভারতের সংবাদপত্র খুললেই যখন শ্রীজহরলালের খান কয়েক ছবি আর বেশ কয়েকটা বক্তৃতা ছাপা দেখতে পাই, আর ভারতের রেডিও আকাশ-বাণীর খবর শুনতে গেলেই যখন মুহুর্মুহু 'শ্রীনেহেরুকে বলিয়াছেন' কথাটি শুনতে পাই, তখনই আর বুঝতে ভুল হয় না যে ভারতের রাজনীতি ঠিকভাবেই চলছে, এবং নিজপথ অনুযায়ীই চলছে। পাকিস্থানেও প্রায় তাই; তবে ব্যক্তি-বিশেষের উপর পাকিস্থানে খুব বেশী আস্থা না থাকায় কোন বিশেষ সমস্যাকে সব সময়ই দেশের সম্মুখে ধরে রাখবার চেষ্টাই হচ্ছে প্রধান। কাশ্মীরের সমস্যা আর তাই নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে জিগির তোলাই হচ্ছে পাকিস্থানের রাজনীতির প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। যেন কাশ্মীর সমস্যাটা পাকিস্থানের অঙ্কুরে

সমাধান হলেই আর কিছু ভাবনা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। পাকিস্থান ধনধান্যে ভরে উঠবে—পাকিস্থানী জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হয়ে গিয়ে আমেরিকার সমান ত হবেই, হয়ত বা আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে যাবে! খাস পাকিস্থানের দাবি যখন তোলা হয়েছিল, তখনও প্রচারকার্য অনেকটা এই ধরণেরই হয়েছিল। তারপর পাকিস্থান যখন পাওয়া গেল, তখন কল্পনা আর বাস্তবের তফাৎটা যে সেই অসমান-জমীনেরই ফারাক রয়ে গেছে, সেদিকে কারও দৃষ্টি যেন না পড়ে।

গুণে হিসাব কষে দেখেছি, চালু ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোকে দৈনিক গড়পড়তা শ্রীজহরলালের একটা ছবি আর তিনটে বক্তৃতা ছাপা হয়। আর ভারতের রেডিওতে খবর বলবার সময় 'শ্রীনেহেরু বলিয়াছেন,' কথাটি উচ্চারণ করা হয় দৈনিক কুড়ি থেকে পঞ্চাশ বার। অতএব রাজনীতি যে ঠিক পথেই চলছে তাতে আর সন্দেহ কি! ক্রমাগত দশ বৎসর ধরে যদি একটা লোক এই ধরণের প্রচার পায়, তাহলে সে যে একটা কেষ্ট, বিষ্টু, আল্লা বা গড হয়ে যাবে তাতেও কিছু সন্দেহ থাকতে পারে না। তার উপর সিনেমা ছবি, এটা-ওটা ত আছেই। সরকারী প্রচার বিভাগের ফিল্ম ডিভিসন ত নানা পরিস্থিতিতে, নানা পোজে শ্রীজহরলালের ছবি তুলবার জন্যই সংস্থাপিত হয়েছে। যত ফাউণ্ডেশন স্টোন লেয়িং সেরিমনি, ওপিনিং সেরিমনি, কন্‌ফারেন্স, কংগ্রেস, ফেয়ারওয়েল, রিসেপসন সব জায়গায়ই তিনিই প্রধান এবং সর্বপ্রথম। ভারতের প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান, কংগ্রেসের ডিক্টেটার—সব-কিছুই ঐ এক শ্রীজহরলাল। বিজ্ঞান কংগ্রেস, সাহিত্য কংগ্রেস, অর্থনীতি কি বাণিজ্য কংগ্রেস, কলা কংগ্রেস—সব কিছুরই তাঁর সভাপতি হতে বাধা নেই। আর বক্তৃতা, তার ত কোনই কথাই নেই—আণবিক বিজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে সুস্থ সমাজজীবনে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কি হওয়া উচিৎ, সব বিষয়েই তিনি কিছু না কিছু বলতে সিদ্ধহস্ত,—অনর্গল বলে যেতে পারেন। পৃথিবীতে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র সব দেশগুলোরই রাজনীতি তাঁর নখদর্পণে,—যে কোন বিষয়েই তাঁর মতামত জানাতে একটুও দ্বিধা নেই, দেরিও হয়না।

এহেন শ্রীজহরলাল যখন দয়া করে ভারতে সিংহাসনজাত হয়ে বসে রয়েছেন, তখন আর ভয় কি, সমস্যাই বা কোথায়! দেশ অবশ্যই এগিয়ে চলেছে হু-হু শব্দেই। তাই ভয়ও নেই কিছু, আর ভাবনাও নেই। তবে আসলে কাজ কি হচ্ছে, রাজনীতি কোন্ পথে এগোচ্ছে, সে বিষয়ে আলোচনা ত অনেকটাই

করা হয়েছে, ক্ষমতানুযায়ী যার যার মত বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না। ভারতের রাজনীতিকে বুঝবার জন্য আরও বেশী আলোচনার প্রয়োজন আছে মনে হয় না ; তবে এই বিরাট, বিপুল, সুমহান, প্রায় আর কি সুপারম্যান ভারতীয় ভাগ্য-বিধাতাটির পরিচয় জানাবার জন্য কিছুটা আলোচনা অবশ্যই দরকার।

আগেই বলেছি ভারত একটা অতি-অদ্ভুত দেশ। ধর্ম, অধ্যাত্ম আর অতি মানবের দেশ। মনুষ্যত্বের ঐশ্বর্য তার যত নীচু স্তরেই নেমে যাক না কেন ঐ বৃহৎ ধারণাগুলি মস্তিষ্ক থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি কখনও। তাই মহা-মানবদের জন্ম আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যিখানেও একমাত্র ভারতেই সম্ভব, আর কোথাও নয়। সেই কারণেই আজও ভারতের অনেকে বিশ্বাস করেন যে মহামানব মহাত্মা গান্ধী তাঁর অতি বিশেষ ক্ষমতা বলেই অতি অদ্ভুত পন্থায় অহিংসার মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা এনেছেন। আর তাঁর মানসপুত্র এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী শ্রীজহরলাল তাঁর অতি-মানবিক ক্ষমতা বলেই, ভারতকে মাত্র দশ বছরেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করে ছেড়েছেন। প্রচারকার্য অন্তত এই ধরণেরই হচ্ছে, এবং অনেকে যে সেগুলো গলাধঃকরণ করে বসেও আছেন, সেবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। খারাপ যা কিছু তা ঐ জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতার জন্যই, আর ভাল সব-কিছুই শ্রীজহরলালের অনুগ্রহে। সব নীচুতার উর্ধ্বে থাকেন তিনি, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দিসাম্রাজ্য-বাদিতা এসব কিছুই তাঁকে স্পর্শ করা সম্ভব নয়, দেশে এসব নেইও ; আর যদিই বা কিছু থেকে থাকে তাহলে তার জন্য দায়ী সংকীর্ণমনা অন্যান্য রাজনীতিকরা, তিনি কখনই নন। তিনি ছেলেদের ভালবেসে চাচা হয়েছেন, মেয়েদের সাথে নেচে তাদের সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন, উপজাতি এলাকায় ভ্রমণকালে উপজাতি নেতাদের আসরে ভড্‌কা পান করেছেন, লম্ফ দিয়ে বাতির খুটিতে চড়ে বক্তৃতা করেছেন, তবে আর চাই কি ! তার অতিমানবত্ব প্রমাণ হয়েই গেছে। বিদেশে তাঁর যা নাম ডাক আর সম্মান, তাঁর পিস্‌ফর্মুলার যা কদর, তা দেখেও কি আর অন্য কিছু ভাবা সম্ভব ! একেবারে তাক লাগিয়ে ছেড়েছেন তিনি। আসলে তাঁর কার্যকলাপে, তাঁর বক্তৃতায়, তাঁর নাটকীয় চালচলনে বেশ কিছু লোকের ধারণা হয়ে গেছে যে তিনি সাধারণের উর্ধ্বে, তাঁর তুলনা নেই। এসব তুলনাহীন মানুষের আবির্ভাব একমাত্র তুলনাহীন ভারতেই সম্ভব, আর কোথাও নয়। এমন কি বোধহয় পাকিস্থানেও নয়, অন্তত পাকিস্থানে এই অতিমানবত্বের দাবিদার হয়ে কেউই এখনও দেখা দেননি।

ক্ষমতা যত দিন হাতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত ভারতে শ্রীজহরলাল যে অতি-মানবের পার্ট বেশ জমিয়েই বসে থাকবেন তাতেও সন্দেহ নেই; কারণ বহুশত বৎসরের পরাধীনতার ফলে ভারত আজ যে পর্যায়ে নেমে এসেছে, সে পর্যায়ে ক্ষমতাশীলেরাই একমাত্র মনুষ্যপদবাচ্য বলে বিবেচিত হয়; যাঁর হাতে সব ক্ষমতা, সে ত নিশ্চয়ই অতিমানব। এইভাবেই ভারতের অতিমানবতা এগিয়ে চলেছে, উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলেছে, চুরমার করে দিয়ে যত সব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে। বাধা দেবার কেউ নেই; সব বাধা শেষ হয়ে গেছে।

অধঃপতনের শেষ সীমায় মানুষ তখনই নেমে আসে যখন সে তার মনুষ্যত্বের উপর আস্থা হারায়, যখন অন্য কারও অতি-মনুষ্যত্বের উপর নির্ভর করে সে তার নিজের দায়িত্বকে পাশ কাটাবার তালে থাকে। ভারতের আজ সেই অবস্থাই হয়েছে। কারও আজ আর নিজের উপর আস্থা নেই, আস্থা নেই তাদের নিজ জ্ঞান এবং কর্মের উপর। তাই নিজেদের খালি চোখে তাঁরা আজ যা দেখতে পাচ্ছে, সেটা তাদের দেখাই নয়; তাদের চোখে রঙিন চশমা এঁটে দিয়ে যা দেখান হচ্ছে, সেটাই তাদের মনকে নাড়া দিচ্ছে বেশী। তাদের বিচার শক্তি একেবারেই লোপ পেয়েছে। কোন লোককে বুঝতে হলে, জানতে হলে আজ আর ভারতবাসী তার কাজ দেখে বুঝবার চেষ্টা করে না, তাকে বুঝে ফেলে তার বক্তৃতা শুনেই। ভারতের নেতৃত্ব আজ এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়েই তাদের বাদশাহী কায়েম রাখবার চেষ্টায় আছে; চেষ্টায় আছে তাদের দুর্বল, অকর্মণ্য এবং নপুংসক প্রবৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করবার আশায়। ভারতের এক এবং অদ্বিতীয় নেতা শ্রীজহরলাল নেহেরু সত্যিই ভাগ্যবান বাদশাহী করবার যে মোকা তিনি পেয়েছেন, তা পাঁচশত বৎসর আগে মধ্যযুগেও সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না।

প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে শ্রীজহরলাল নেহেরুর কর্মক্ষেত্র কোথায় ছিল বা কি বিরাট কাজ তিনি করেছেন, সে বিষয়ে নূতন করে কিছু জানবার চেষ্টা করা আজ বৃথা। আজ তিনি নিজেই হচ্ছেন তাঁর পরিচয় ভারতের এক এবং অদ্বিতীয় নেতা হিসাবেই। তবে তার সঙ্গে যে তাঁর দেশের বা দেশের জনগণের কোন সংস্রব ছিল না সেটা বোধ হয় অনেকেরই অজানা নয়। ছাত্রজীবনে বিদেশে বাস করে বহু বিদেশী বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, সেটাও অনেকেই জানেন। আর তাঁর

শিক্ষা বা সংস্কৃতির সঙ্গে যে দেশের নাড়ীর সম্পর্ক ছিল খুব কমই তাও ত তিনি নিজেই বড় গলায় গর্বভরেই ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর স্বীকারোক্তি, "আমি জন্মসূত্রে হিন্দু, শিক্ষায় ইংরেজ এবং সংস্কৃতিতে মুসলমান," I am by birth a Hindu, by education a Britisher and by culture a Muslim)—এই হচ্ছে তাঁর শিক্ষাদীক্ষার সত্যিকারের পরিচয়। সে পরিচয়ে তিনি আর যাই হোন না কেন, ভারতীয় যে নন তা খুবই পরিষ্কার।

বিরাট নেতা মতিলাল নেহেরুর পুত্র হিসাবে তিনি নেতা হয়েই জন্মেছিলেন, তাই বিদেশে বিদ্যার্জন শেষ করে দেশে ফিরে আসতেই নেতৃত্বের আসনের একটি কোণ দখল করতে বেশী অসুবিধা তাঁর কোন দিনই হয়নি। প্রথম থেকেই কংগ্রেসী মিটিংগুলির ডায়াসের উপরই তাঁর স্থান সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। পরে আরও বড় নেতা মহাত্মা গান্ধীর মানসপুত্র হবার সৌভাগ্যও হয়েছিল তাঁরই; তাই নেতৃত্বের সিঁড়ি বেয়ে শেষ ধাপে পৌঁছতে কোন হাঙ্গামাই পোয়াতে হয়নি। পিতৃগৌরবেই সব দুরূহ কাজ অতি সোজা হয়ে গেছে। ভারতের সমস্যাও তাই তাঁকে নিয়েই। দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, অথচ পিতৃগৌরবের সুযোগে নেতা হয়ে বসলে যেসব অতি দুরূহ কাজ অতি সহজেই করা যায়, তিনি আজ করছেনও তাই। তাঁর কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার, তাঁর নীতিজ্ঞান সবই আজ তাঁর ঐ বিদেশী মনোভাব আর পিতৃগৌরবের বার্তা বহন করে। এ অবস্থায় যা হওয়া একান্তই স্বাভাবিক, ভারতের এক এবং অদ্বিতীয় নেতা জহরলালের অবস্থাও হয়েছে অনেকটা তাই। যদি তিনি দেশের কোন সম্পর্কে থাকতেন, দেশীয় জনসাধারণের বা সংস্কৃতির জন্য যদি তাঁর কিছুমাত্র দরদ থাকত, যদি তাঁর কর্মের মাধ্যমে এবং নিজের চেষ্টায় ভারতের নেতৃত্ব লাভ করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই অন্যরকম হ'ত। তবেই হতেন তিনি সত্যিকারের নেতা।

প্রচারকার্যের দ্বারা ভারতকে ঢেকে রাখা সম্ভব হলেও ভারতের বাইরে আজ আর কারও জানতে বাকি নেই যে, শ্রীজহরলাল একজন অতি বদমেজাজী, দাম্ভিক এবং ডিক্টেটারী মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক। ভারতীয় পার্লামেন্টে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার যে কেউ লক্ষ্য করেছেন তিনিই জানেন যে ভারতের বাইরে তাঁর বিষয়ে যে ধারণাটি চালু হয়েছে, সেটা খুব অন্যায্য কিছু নয়। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পরেও তিনি বহুবার বহু ব্যাপারে ঐ পার্লামেন্টে

দাঁড়িয়েই তাঁর বদমেজাজের পরিচয় দিয়েছেন। কংগ্রেসের সভাগুলিতে তিনি অনেক সময় যেরকম মেজাজ দেখান, সেগুলোকে শুধুই বদমেজাজ বলে ঠিক বলা হবে মনে হয় না, সেগুলিকে ইতরামির পর্যায়েই ফেলা উচিত। কিছুদিন আগে পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন শ্রীজহরলালের সমর্থিত প্রার্থী আচার্য কৃপালনীকে হারিয়ে দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হবার পর শ্রীজহরলাল যে সব কথাবার্তা বলেছিলেন বা যে ব্যবহার করেছিলেন, তা যে-কোন স্কুলের নীচু ক্লাসের ছেলেদের কাছ থেকেও আশা করা উচিৎ নয়। এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় যখন হাজার তিনেক লোক প্রধানত শ্রীজহরলাল এণ্ড কোম্পানীর দায়িত্বজ্ঞানের অভাবেই পায়ের তলে চেপ্টে গিয়ে পঞ্চত্ব পেল, তখনও পর্যন্ত সেই মৃতদেহগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, সৎকার করা ত নয়ই। আর সেই সময়ে, মানে সেই অসময়ে এলাহাবাদের লাট ভবনে ঐ জহরলাল এণ্ড কোম্পানীর নৃত্যগীতসহ আমোদ প্রমোদে মত্ত হওয়াটা যে কোন্ পর্য্যায়ের মনুষ্যত্ব-জ্ঞানবোধের পরিচায়ক তা বুঝা কঠিন। তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি মতে, তাঁর ঐ দিনের ব্যবহার যদি মুসলমান সংস্কৃতির পরিচায়ক বলা হয় তাহলে মুসলমানেরা তাঁকে ক্ষমা করবে এ বিশ্বাস আমার নেই। তবুও শ্রীজহরলাল ভারতে শ্রীজহরলালই রয়ে গেছেন; শুধু তাই নয়—তিনি বিরাট, বিপুল, সুমহান, অতিমানব হিসাবেই চষে বেড়াচ্ছেন।

শ্রীজহরলালের অমানুষত্ব যে কোন পর্য্যায়ের তার হদিস আজও পাওয়া যায়নি। সম্ভবত তাঁর নীচুতার পরিমাপ করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। দেশে অনশন, অর্দ্ধাশন, নগ্ন, অর্দ্ধনগ্নদের ভীড়ের মধ্যে তিনি যেভাবে তাঁর কার্পেট, ক্যাডিলাক আর রত্নখচিত সিংহাসনের প্যারেড দেখিয়ে চলেছেন; যেভাবে তাঁর সেরিমনির অনন্ত উৎসব রাত্রি জাগিয়ে চলেছেন, তা একান্তই অভাবনীয়, কল্পনার একেবারেইবাইরে—ইতিহাসে অতুলনীয়। যাঁরা কুম্ভমেলায় শ্রীজহরলালের বিশ্বরূপ দেখেও তাকে ঠিক চিনতে পারেন নি। মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেছেন এই বলে যে ব্যাপারটা হঠাৎ যেন কেমন একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা ভুলই বুঝেছেন। শুধু তাই নয়, নিজেদের মনকেও ভুল বুঝাবার চেষ্টা করেছেন, কারণ হঠাৎ একটা ভুলের জন্যই ব্যাপারটা হয়েছিল, তা মোটেই নয়—শ্রীজহরলাল ঠিক ঐ জিনিষ। এবং ঐ জিনিষ বলেই তিনি ক্রমাগতই ঐ বিশ্বরূপ দেখিয়েই চলেছেন। কিছুদিন আগে (ডিসেম্বর ১৯৫৭) হাওড়া থেকে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন চালু করবার সেরিমনি

উৎসবের ব্যবস্থা হোল—লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়েই হোল। শ্রীজহরলাল এলেন, উদ্বোধনী বক্তৃতা শেষ করে ট্রেনে চেপে বসলেন আসল উৎসব উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে। ট্রেন চলতে সুরু হবার আগেই তাতে উঠে পড়ল শত সহস্র রবাহুতের দল—যারা চিড়িয়াখানার পয়সা বাঁচাতে শ্রীজহরলালের পাশে ভীড় জমান, তারাই। উঠে পড়লেন তারা গাড়ীর পাদানিতে, হ্যাণ্ডেলে এবং সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সকল জায়গায়। তাদের নামিয়ে দেবার কোন ব্যবস্থা হোলনা, উৎসব যাত্রাও বন্ধ হোলনা,—জগন্নাথের রথের মতই এগিয়ে চল্লে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন হু হু শব্দেই। তারপর? ছিট্‌কে পড়তে থাকলেন সেই রবাহুতেরা পরবর্তী ষ্টেশনগুলোর প্লাটফর্মে প্লাটফর্মে ধাক্কা খেতে খেতে। আর্ত চীৎকার তারা নিশ্চয়ই অনেক করেছিলেন, কিন্তু উৎসব যাত্রা স্থগিদ রাখা ত দূরের কথা; তাদের গাড়ীর ভেতর ঢুকিয়ে নেবার বা নামিয়ে দেবার কোন ব্যবস্থাই সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি আর্ত-মনুষ্যত্বকে বিন্দুমাত্র সম্মান প্রদর্শন করা। একে একে আঠাশজন মানুষ পড়ে গিয়ে হতাহত হয়েছেন (২৫ জন আহত এবং ৩ জন মানুষ নিহত) কিন্তু কারও আনন্দ উৎসবে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। ইতিহাসে অনেক রক্তলোলুপ নর-পাষণ্ডের কথা আছে; যাদের কাজই ছিল শুধু ধ্বংস। যাঁরা রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছেন দেশের পরে দেশকে। সেই রক্তলোলুপ চেঙ্গিজ, আটিলা, তৈমুরলঙ বা নাদিরশাও যে মানুষের মনুষ্যত্বকে অতখানি অপমান করে উৎসব উদ্‌যাপন করেছেন, তা এখনও জানা যায়নি। ভারতে আজ নূতন ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে,—শ্রীজহরলাল হচ্ছেন সেই ইতিহাসের নূতনতম আজব সৃষ্টি।

তাঁর নীতিজ্ঞান, তাঁর আদর্শনিষ্ঠা যে কত গভীর আর উচ্চস্তরের তাও আর কহতব্য নয়। ভারতকে স্বাধীন করতে গিয়ে ক্ষমতা হাতড়াবার লোভে তিনি যে ভারতকে বিভক্ত করে নিয়েছেন, সেটা না হয় নাই তোলা হোল, কিন্তু তারপরেও এবং প্রতিদিনই তাঁর কথাবার্তায়, তাঁর আচার ব্যবহারে তিনি যা দেখাচ্ছেন তারও কোন তুলনা হয় না। স্বাধীনতা পাবার আগে তিনি মাঝে মাঝেই চীৎকার করে গলা ফাটাতেন, কালোবাজারীদের আলোর খুঁটিতে ঝুলিয়ে ফাঁসি লটকাবেন। আর ক্ষমতা পেয়ে গদিসীন হয়ে কালোবাজারীদের আলোর খুঁটিতে ঝোলান ত দূরের কথা, তিনি নিজেই ঐ দলে ভিড়ে গেলেন,—কালোবাজারীরাই আজ তাঁর সব চেয়ে বড় সমর্থক। দেশ ভাগ করে ক্ষমতা হস্তগত করবার সময় তিনি বহুবার অতি গর্বের সঙ্গে,

ঘোষণা করেছিলেন যে দেশ-বিভাগের ফলে যদি কেউ উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হয় তাহলে তিনি তাঁদের ফেলে দেবেন না ;—শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েই তাদের পুনর্বাসনের চেষ্টা অবশ্যই করবেন। আর আজ যখন লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু রাস্তা-ঘাটে পড়ে মরছে, তখন তিনি মিশর, আলজিরিয়া, মরক্কো, কিউবা বা ঐ ধরণের অন্য সব সমস্যায় বড়ই ব্যস্ত হয়ে এদিকে তাকাবার আর সময় পাচ্ছেন না। উপরন্তু মাইগ্রেসন সার্টিফিকেট দেওয়া বন্ধ করে উদ্বাস্তুদের ভারতে আসা বন্ধ করবারই চেষ্টায় আছেন। উদ্বাস্তুদের সাথে তাঁর এই বিশ্বাসঘাতকতার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটিও নেই যা হওয়া সম্ভবও নয়। (তাঁর বিশ্বাস-ঘাতকতার তুলনা পৃথিবীতে না থাকলেও ভারতে আরও অনেক তৈরী হচ্ছে। লাদাকের চৌদ্দ হাজার বর্গমাইল ভূমি এবং অন্যান্য আরও বহু ভারতীয় ঘাঁটি তিনি যেভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে চীনকে ছেড়ে দিয়েছেন, তারও তুলনা অন্য কোথাও নেই)। তবুও তিনি মহামানব হিসাবেই চলাফেরা করছেন, তাঁর দর্শন লাভের জন্য পথের দুধারে লোকও জমায়েৎ হচ্ছে ; এ শুধু ভারতেই সম্ভব, অন্য কোথাও নয়।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, যার নেতা হিসাবেই শ্রীজহরলাল আজ ভারতের স্কন্ধে আরোহণ করে বসে আছেন, তার বহু কালের বহু বিঘোষিত নীতি ছিল দেশ স্বাধীন হলে প্রদেশগুলোকে ভাষাভিত্তিক করে গঠন করা হবে। কংগ্রেস এবং শ্রীজহরলাল এখনও ক্ষমতাতেই আছেন, কিন্তু ওকাজটি করা সম্ভব হয় নি। উপরন্তু রাজ্য পুনর্গঠনের সময় কোন বিশেষ ভাষাগোষ্ঠীকে সুবিধা করে দিতে গিয়ে অন্য কতকগুলি ভাষাগোষ্ঠীকে তিনি যেভাবে; যে নীচ উপায়ে ঠকাবার চেষ্টা করেছেন তা শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব, অন্য কারুর নয়। এসব উদাহরণের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই, যাঁরা দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যহই সংবাদপত্রে শ্রীজহরলালের এই ধরণের মিথ্যাচারিতা এবং বিশ্বাস-ঘাতকতার খবর পান। তবুও শ্রীজহরলাল অতি সুমহান ; ভারতে সুমহান কথাটি বড়ই সস্তা হয়ে গেছে, তাই।

শ্রীজহরলালের দাম্ভিকতা, তাঁর কথায় কথায় 'গুলি চালিয়ে শেষ করব' ভাবও আজ আর কারও বুঝতে বাকি নেই। পাটনায় ছেলেরা একটা তিনরঙা জাতীয় পতাকা পুড়িয়েছিল বলে তিনি সদম্ভে ঘোষণা করে গেলেন, "প্রয়োজন হলে দশ লক্ষ লোককে গুলি করে হত্যা করব, তবুও এসব কখনই বরদাস্ত করব না"। তিনি যে প্রেম আর অহিংসার পূজারী, পৃথিবীতে ঐ বস্তু ছুটিয়েই

কেরী করেই বেড়াচ্ছেন, তাই বুঝাবার জন্তই নিশ্চয়ই এ কথাগুলো বলবার প্রয়োজন হয়েছিল! তাঁর স্বাধীন ভারতীয় সরকার ত প্রয়োজনে অপ্রয়োজনেও যত্র তত্র এবং যে কোন অজুহাতেই গুলি চালাচ্ছে, তাই বোধহয় ভারতীয় জনসাধারণকে তাঁর এসব দম্ভ হজম করেই বেঁচে থাকতে হয়। কিন্তু এগুলোও সব নয়, ভারতের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে তিনি একদিন ঘোষণা করে জানালেন—"I am more than a Prime Minister"—আমি প্রধান মন্ত্রীর চেয়েও বড়—মানে, আমি দিল্লীর বাদশাহ। এ ধরণের দম্ভোক্তি তাঁর পক্ষেই সম্ভব, একমাত্র তাঁরই পক্ষে—অন্য কারুর নয়।

তার কাপুরুষতারও অন্ত নাই। পর্তুগীজ-অধিকৃত গোয়াকে অধীনতা মুক্ত করে স্বাধীন করবার জন্য তিনি কিছুই করতে রাজী হননি। অথচ কিছুদিন আগে যখন গোয়ার অভ্যন্তরে স্বাধীনতা আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে উঠল এবং ভারতেও তার ঢেউ না এসে ছাড়লনা, ভারত থেকে হাজারে হাজারে স্বেচ্ছাসেবক সত্যাগ্রহ করবার জন্য গোয়াতে প্রবেশ করতে প্রস্তুত হল। তখন কংগ্রেস পক্ষের ভোটের সুবিধা হবে মনে করেই বোধ হয়, তিনিও সেই আন্দোলনের ব্যাপারে উস্কানী দিতে কসুর করলেন না। তারপর সত্যাগ্রহীরা গোয়াতে প্রবেশ করা মাত্রই যখন পর্তুগীজ দস্যুদের হাতে নিহত হতে থাকল এবং সারা ভারতে আগুন জ্বলে উঠল তখন তিনি ঐ ব্যাপারে কোন সাহায্য ত করলেনই না, বরং ঐ ব্যাপারের সমস্ত দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ন্যাকা সেজে বসে থাকলেন। শুধু তাই নয়, ভারতীয় পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে তিনি বলে বসলেন, "যারা মনে করেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তাঁদের রক্ষা করবার জন্য গোয়াতে এগিয়ে যাবে এবং সেই ভরসাতেই সত্যাগ্রহী হয়ে সত্যাগ্রহ করতে যান, তাঁরা সত্যিকারের সত্যাগ্রহী নন, তাঁদের জন্য আমার কোন সহানুভূতি নেই'। তাঁর যে অনেক কিছুতেই সহানুভূতি নেই, তা আজ আর বিশেষ অজানা নয়। মনের অবস্থা যে রকম থাকলে ঐ সহানুভূতি জিনিসটি থাকা সম্ভব হয় সে মন তাঁর অনেক দিনই শেষ হয়ে গেছে। আর তাঁর অধীনস্থ থাকাকালে ভারতের সৈন্যবাহিনীও যে ভারতের কোন অংশকে স্বাধীন করবার জন্য ত দূরের কথা, ভারতের কোন অংশকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যও এগিয়ে যাবে না, সে কথাও যাঁদের বুঝবার ক্ষমতা আছে তাঁরাই বুঝে নিয়েছেন। (চীনের ভারত আক্রমণ যেভাবে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা হচ্ছে, তারপরে ভারতে সৈন্যবাহিনী থাকবার

যে কি প্রয়োজন তা বুঝা কঠিন।) কিন্তু আসলে, ঐ ধরণের খোঁচামারা কথাগুলো বলবার তাঁর উদ্দেশ্য কি? তিনি কি সত্যিই মানুষ, না স্রেফ প্রপাগাণ্ডা? ভারতের সৈন্যবাহিনী ত তার পার্শোনাল বডিগার্ড কিনা, তাই! তিনি এইভাবেই চলেছেন, চলেছেন বুকের বোতামে একটি গোলাপফুল গুঁজে বেশ নটবর সেজে, আর নটবরী চালে। তাঁকে কারুর কিছু বলবার নেই, অধিকারও নেই, ভোটের মেজরিটি যে তাঁরই পক্ষে।

তাঁর নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ ব্যাপারটি যে কতবড় জবরদস্ত চীজ তা কংগ্রেসী উঁচু মহলেও অনেকেই বেশ ভালভাবেই জানেন, মানে হাড়ে-হাড়েই বুঝেছেন। শ্রীকেষ্ট মেনন হচ্ছেন শ্রীজহরলালের ইয়ার-দোস্ত, সেই খাতিরে লণ্ডনে ভারতীয় হাই-কমিশনারের চাকরি পেয়েছিলেন। চাকরি পাবার পর রোল্‌স্‌রয় হাঁকিয়ে যে সব সুনামের কাণ্ডকারখানা তিনি সেখানে করেছিলেন, তাও অনেকেরই অজানা নয়। পরে আবার তাঁকেই ভারতীয় মন্ত্রীসভায় এনে বসাবার চেষ্টা করা হয়। এই চেষ্টার বিরুদ্ধে কংগ্রেসী বড় মহলেও আপত্তি ওঠে, ঐ নানা কেলেঙ্কারীর জন্যই। কিন্তু জহরলাল ওসব আপত্তিকে থোড়াই কেয়ার করেন, তাই একদিন শুভ মুহূর্তে কেষ্ট ভায়াকে তিনি ভারতের গদিতে বসিয়ে তবে ছাড়েন। এরকম না হলে পরে রাজনীতি নিয়ে ইয়ার্কি মস্‌করাটা জমবে কিভাবে?

আর শ্রীজহরলালের বাকসংযম—সে ত এক ঐতিহাসিক ব্যাপার—কথায় কথায়ই তাঁর দুনিয়া মাৎ। এক বন্ধু বলেছিলেন যে তিনি হিসাব কষে গুণে দেখেছেন যে, শ্রীজহরলাল মাসে এক মিলিয়ান শব্দের বক্তৃতা করেন। জানিনা, তবে অবিশ্বাস করবার মতও কিছুই নেই;—এরোপ্লেন্‌-বাজী আর কথা বলায় তাঁর তুলনা কোথাও নেই। মনে হয় পৃথিবীর অন্য সব দেশের রাষ্ট্র-প্রধানেরা সবে মিলে যত বক্তৃতা করেন বা এরোপ্লেন চড়েন, তার মোট সংখ্যাও একমাত্র জহরলালের সংখ্যার কাছে কিছুই নয়। শ্রীজহরলাল একেবারে বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। বাক্‌সিদ্ধ কথাটাতে একটা কথা মনে পড়ে গেল,—অনেক দিন আগের কথা। ১৯৪২ সালের অন্দোলনের পর এব্‌স্কণ্ড করে বেড়াচ্ছি। হিমালয়ের এক নিভৃত আস্তানায় কয়েকদিন আস্তানা করে আছি। ইতিমধ্যে সাধু সন্ন্যাসীও বহু দেখেছি, কিন্তু ভক্তি জিনিসটির অভাব হেতু কারও দিকে ফিরে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করিনি। এই নিভৃতে কিন্তু এক সাধু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ

করল ;—আমাকে ডেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাল তাও নয়। সাধুটি কথাবার্তা বলেন না বলেই তাঁর দিকে নজর পড়ল। একজন লোক কথা নাবলে থাকেন কি করে ভাবা কঠিন, তাই। কয়েকদিন চেষ্টা করে আমি অবশ্য তাঁকে কথা বলালাম,—অল্প কয়েকটি কথাই। ঐ কথা কয়টি তিনি যা বলেছিলেন, তার মোটামুটি মানে হচ্ছে এই যে, 'বাক্‌সংযমই হচ্ছে আধ্যাত্ম-পথের প্রথম সোপান, ওটি না হলে কোন কাজই হয় না। আর, যে লোক বেশী কথা বলে, সে নিশ্চয়ই অসংযমী এবং দুশ্চরিত্র।' আগে খেয়াল ছিল না, তাই জিজ্ঞেস করা হয়নি যে, যে লোক পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কথা বলে, সে কি চীজ! অবশ্য বেশী কথা বলার আর পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কথা বলার ফল যে একই ধরণের হবে তারও কোন মানে নেই। হয়ত বা উল্টো ধরণেরও হতে পারে! আর তা না হলেই বা শ্রীজহরলালের অত কথা লোকে সহ্য করছে কিভাবে?

তবে কিনা বেশী কথা বল্লেই যে বেশীর ভাগই বাজে কথা বলতে হয়, তা শ্রীজহরলালের কথাবার্তা যে শুনেছে সেই জানে। আর তাঁর এই কথাগুলো যে সময়ে সময়ে কত অদ্ভুত ধরণের ফাজিল এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত কথা হয়, তাও আর বলে শেষ করা যায় না! বছর কয়েক আগে একদিন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে তিনি বলে বসলেন যে ডাঃ মেঘনাদ সাহাকে নাকি একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে আর গণ্য করা যায় না। অথচ তার মাত্র মাস খানেক আগেই রাশিয়াতে এক আন্তর্জাতিক আণবিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য শ্রীজহরলালই অনেক খোসামোদ করে ডাঃ সাহাকে রাশিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। সেদিন ডাঃ সাহা অবশ্য উত্তর দিয়েছিলেন এবং ভালভাবেই দিয়েছিলেন। ডাঃ সাহা সেদিন শ্রীজহরলালের ঐ অসঙ্গত এবং ছ্যাবলামি কথাবার্তার প্রতিবাদে বলেছিলেন যে, ডাঃ সাহা বৈজ্ঞানিক কি বৈজ্ঞানিক নয়, তা বৈজ্ঞানিকেরাই বুঝবেন, জহরলাল নয়। ক্ষমতা হাতে থাক্‌লেই যাঁরা সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়ে বসেন ডাঃ সাহাকে বুঝা তাঁদের কর্ম নয়। আর তার সঙ্গে আরও একটু বলেছিলেন যে, ডাঃ মেঘনাদ সাহা পৃথিবীকে যে জ্ঞান দিয়ে গেলেন তা পৃথিবীর লোকে হাজার বছর পরেও অতি সম্মানের সঙ্গেই স্মরণ করতে থাক্‌বে; কিন্তু জহরলালের মত রাজ-নীতিকদের কথা লোকে ভুলে যাবে, যে মুহূর্তে তাঁদের ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে। ডাঃ সাহা ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিষই মেরেছিলেন, কিন্তু লাভ কিছুই

হয়নি ; শ্রীজহরলাল ওসবের উর্ধ্বে। ওসবের উর্ধ্বে না হলেই কি আর রাজনীতি করা যায়!

রাজ্যপুনর্গঠন ব্যাপার নিয়ে মহাগুজরাট আন্দোলন আরম্ভ হয়। ঐ আন্দোলনকে থামাতে গিয়ে আমেদাবাদে গুলি চলল, রক্তগঙ্গা বহে গেল, যার ফলে গুজরাটের ছাত্ররা ক্ষেপে উঠল, তাদের আর কিছুতেই বাগে আনা যায় না। তখন জহরলাল আমেদাবাদে গিয়ে এক বক্তৃতা ঝাড়লেন, যার মোট মানেই হচ্ছে কিনা যে, আমেদাবাদের এই মহাগুজরাট অন্দোলনের গোড়াতে রয়েছে কতকগুলো বিশেষ লোকের স্বার্থ। আমেদাবাদের আশে পাশের জমির মালিকরা গুজরাট প্রদেশ ভিন্ন হয়ে আমেদাবাদ রাজধানী হলে জমির দর বেশী পাবে এই আশায় যত হাঙ্গামা বাধিয়েছে। এসব কথা শ্রীজহরলাল সব সময়েই বলেন, এবং যত্র-তত্রই বলেন, মুখে একটুও বাধে না। ক্ষমতা হাতে থাক্‌বার শেষ দিন পর্যন্ত যে তিনি এধরণের বাৎচিৎ করেই চলবেন তাতেও আর কোন সন্দেহ নেই, কারণ তিনি হচ্ছেনই ঐ জিনিস।

বক্তৃতাবাজীর মতই সেরিমনি করে আনন্দ উৎসব করাও শ্রীজহরলালের রাজনীতির আর একটি অঙ্গ। তিনি একজন বিরাট কালচার্ড্ লোক, কোন বিষয়েই তাঁর রসজ্ঞানের অভাব নেই। তাই যে কোন ব্যাপার নিয়েই একটা আনন্দ উৎসব না করলেই তাঁর চলে না। ফলে শ্রীজহরলালের কৃপায় ভারতের রাজনীতি আজ এক সেরিমনিয়াল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফাউণ্ডেশন স্টোন লেয়িং সেরিমনি, ওপেনিং সেরিমনি, ডেথ সেরিমনি, বার্থ সেরিমনি, উঠতে সেরিমনি, বসতে সেরিমনি, দাঁড়াতে সেরিমনি, চলতে সেরিমনি, আরও কত রকমের সেরিমনি আর সেরিমনি, শুধুই সেরিমনি। দেশটা মনে হয় আর ঠিক সে দেশ নেই, সেরিমনিয়াল দেশ হয়ে গেছে। এতে যে কি পরিমাণ টাকা খরচ হয় তার হিসাব কে রাখে ; রাখতে দেয়ই বা কে! দেশটা দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু নেতা ত আর দরিদ্র নন যে, মাগ্‌না কাজ করে বেড়াবেন, একটু রস আনন্দ তাকে দিতেই হবে! আর যত সেরিমনি হবে তার প্রায় সবটাতেই শ্রীজহরলালের চরণধূলি পড়া চাই। অবশ্য তিনি না থাক্‌লে পরে ত সেরিমনিরই দরকার হ'ত না; তাই সেরিমনি মানেই তিনি, আর তিনি মানেই সেরিমনি।

তবে শ্রীজহরলাল যে প্রগতিশীল, একথা অস্বীকার করবার কোন উপায়

নেই। তিনি সব সময়েই কয়েক ধাপ এগিয়েই আছেন। কথাবার্তায়ও অনেক জায়গায় বলেই রেখেছেন যে তাঁর মনটা ইউরোপীয় ধাঁচের; তাই মাঝে মাঝে ইউরোপ ভ্রমণ করে না এলে তাঁর মেজাজ সরিফ থাকে না। তাঁর প্রগতিশীলতার সৌজন্যেই আজ ভারতে মেয়েরা অনেক ব্যাপারে এগিয়ে গেছেন, মেয়ে মন্ত্রী, মেয়ে গভর্ণর, মেয়ে এম্বেসাডর এসব কীর্তি তাঁরই। হিন্দুদের সমাজ-ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে প্রগতিশীল ইউরোপীয় ধাঁচে গড়ে তোলবার জন্যও তিনি কতকগুলো আইন পাশ করেছেন। তারপর তাঁর নয়া পইসা আবিষ্কার, মেট্রিক হিসাবে ওজন ব্যবস্থা চালু করবার ইচ্ছা বা ইংরেজী ধাঁচে ক্যালেণ্ডার তৈরী করা, এই সবই তাঁর প্রগতিশীলতার পরিচায়ক। ক্যালেণ্ডারটি যে তিনি তাঁর নিজের রাজত্বের তারিখ থেকে আরম্ভ করেননি, এইটুকুই যা একটু অপ্রগতিশীল হয়েছে, ওটুকু করলে আর কারও কোন দুঃখ থাকত না! তিনি প্রগতিশীল এবং বিশ্বপ্রেমিকও বটেন, তাই বিশ্বরাষ্ট্রের কথা হামেশাই বলেন,—তাঁর কল্পনায় বিশ্বরাষ্ট্রই হচ্ছে আগামী কালের সত্যিকারের রাষ্ট্র। তবে তাই বলেই তিনি জাতীয়তাবাদকেও মোটেই বরবাদ করে দেননি, এবং সেই জন্যই বিশ্বরাষ্ট্র কল্পনা করেও বিশ্বের প্রধান ভাষাটিকে ভারতে প্রাধান্য দিতে নারাজ। ভারতের ভাষা অবশ্যই হতে হবে হিন্দী। তা না হলে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হবে কি উপায়ে? হিন্দি সাহিত্য ত জাতীয়তাবাদের ভাবধারায় একেবারে ঠাসা রয়েছে কিনা! এইভাবেই তাঁর বৃহৎ বৃহৎ চিন্তাধারা ক্রমেই প্রগতি থেকে আরও প্রগতির পথে ধাবিত হচ্ছে এবং ভারতকেও টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে, বোধ হয় কোন অজানার উদ্দেশ্যেই।

তবে শ্রীজহরলাল যে ভীষণ কিছু নন বা অন্তত খানিকটা অতিমানবও নন, তাও অস্বীকার করা কঠিন। শ্রীজহরলালের অতশত কার্যকলাপ দেখে,—তাঁর বিদেশে ভ্রমণ, স্বদেশ চষে বেড়ান, শত শত সেরিমনিতে যোগদান, এবং সহস্র সহস্র ময়দানে বক্তৃতা করা, এসব দেখে অনেকেরই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে। এত কর্মক্ষমতা একটা লোকের কি সম্ভব! তারপরও যদি কল্পনায় বুঝে নিতে হয় যে তিনি তাঁর নিজের বৃহৎ দায়িত্বের কাজগুলোও করেন,—মানে তাঁর প্রধান মন্ত্রীর, পররাষ্ট্র মন্ত্রীর, প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যানের কাজ বা কংগ্রেসের ডিক্টেটারীর কাজও তিনি করেন, তাহলে তাঁকে অতিমানব ভাবা ছাড়া আর গত্যন্তরই বা কি? কেউ যদি প্রমাণ করে দিতে পারেন যে তিনি ঐ কাজ-গুলোও করেন তাহলে আমারই বা তাঁকে অতিমানব বলে স্বীকার করে

নিতে আপত্তি করলে চলবে কেন! তবে গোপালস্বামী আয়েঙ্গার বেঁচে থাকতে শুনতাম যে তিনিই শ্রীজহরলালের সব কাজের ফাইল দেখেন; এখন যে কে দেখেন বা আদৌ কেউ দেখেন কিনা তা অবশ্য জানা নেই। এইভাবেই, এই অতিমানব পন্থায়ই শ্রীজহরলাল ভারতকে উর্ধ্বে থেকে আরও উর্ধ্বে ঠেলে নিয়ে চলেছেন। ভয় শুধুই যে অধিক উর্ধ্বে উঠে ভারত একেবারেই শূন্যে মিলিয়ে না যায়।

যদিও শ্রীজহরলাল যে সব কাজ কর্ম করছেন এবং যেভাবে চলা ফেরা করছেন, তার তুলনা বর্তমান পৃথিবীতে খুবই বিরল; তাঁর এধরণের কাজ কারবার একমাত্র মধ্যযুগেই কল্পনা করা সম্ভব ছিল বলে মনে হয়। তবুও তাঁর ঐ সব যে এখনও এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যিখানেও সম্ভব হয়েছে তার কতকগুলো কারণও আছে। কারণ, প্রধানত ভারতীয়েরা এখনও অনেকটা সেই মধ্যযুগের অবস্থায়ই পড়ে রয়েছে,—শিক্ষা দীক্ষা অনেক ব্যাপারেই তাদের অবস্থা আজও মধ্যযুগের চেয়ে খুব বেশী অগ্রসর হয়েছে মনে করবার বিশেষ সুযোগ নেই। চিন্তাধারায় ত তারা আরও অনগ্রসর। আর বহুশত বৎসরের পরাধীনতার অভিশাপ তাদের মনুষ্যত্বের ঐশ্বর্য্যকে যে পর্য্যায়ে নামিয়ে এনেছে তাও মোটেই করুণা না পাবার মত নয়। তাদের ঐ যে কতকগুলো সংস্কৃতি আর দর্শন, যা তাদের ইহ জগতের চেয়ে পর জগতের উপরই জোর দিয়েছে বেশী এবং কোন দিনই জীবনের সাথে শক্তির সমন্বয় করতে সমর্থ হয় নি, যার ফলে সত্যিকারের শক্তিপূজা ভারতে খুব কমই হয়েছে—এই সবের মোট ফল মিলেই ভারত আজ যা হয়েছে, তাতেই শ্রীজহরলাল অতটা সুযোগ পেয়েছেন। মহাত্মা গান্ধীকৃত অহিংস দর্শনটিও শ্রীজহরলালের হাতে ব্রহ্মাস্ত্র হিসাবেই দেখা দিয়েছে। তাই শ্রীজহরলাল আজও ভারতের বুকে মধ্যযুগীয় বাদশাহী চালিয়ে যাচ্ছেন অতি নির্বিকারভাবেই।

তবে এগুলোও সব নয়, শ্রীজহরলালকে অত ছোট করে দেখলেও চলবে না। তাঁর নিজেরও বেশ কিছু কিছু গুণ আছে। তাঁর ঐ নাটকীয়ভাবে চলাফেরা, নিপুণ অভিনেতার মত শ্রোতাদের মন বুঝে কথা বলা, আর সর্বোপরি তাঁর বিরাট বাক্‌চাতুর্য, এগুলোও দেশের জনসাধারণকে কম বিভ্রান্ত করছে না। তাঁর আবিষ্কৃত 'ডাইনামিক' শব্দটি ম্যাজিকের মতই কাজ করছে,—তাঁর সব কিছুই ডাইনামিক বা গতিশীল, অতীতের সাথে বর্তমানের সামঞ্জস্য রাখবার তাই তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর দেশের লোকদেরও বুঝিয়ে ছেড়েছেন

যে, এই ডাইনামিক পন্থায় কাজকর্ম করাই হচ্ছে সবচেয়ে প্রগতিশীলতার লক্ষণ। যদিও আসলে তিনি মধ্যযুগীয় বাদশাহীই এঁটে বসেছেন মাথায় কোন রাজমুকুট না এঁটেই। তফাতের মধ্যে শুধুই,—মধ্যযুগের বাদশাহরা সোজাপথে প্রজাসাধারণের রক্ত শোষণ করে তাজমহল গড়ে তুলতেন বিশ্বের সেরা প্রেমিক সাজবার জন্যই, আর শ্রীজহরলালকে বিশ্বপ্রেমিক সাজতে হয় একটু ঘোরা পথে, ঐ ফরেণ ডিপার্টমেন্টের লুটপাটের পথেই। গরীব সাধারণের রক্ত শোষণ মধ্যযুগের চেয়ে কিছু কম হচ্ছে না, বোধ হয় অনেকটাই বেশী হচ্ছে। আর গরীব সাধারণের স্বার্থের সঙ্গে এসব কার্যকলাপের সংস্রব তখনও যেমন ছিল না এখনও তেমনি নেই।

শ্রীজহরলালের তুলনা মধ্যযুগেই সম্ভব ছিল, আজ আর নয়—একথাটাও বোধ হয় খুব সত্যি নয়। খেলোয়াড় লোক থাকলে তিনি খেলবেনই, তাঁকে আটকান কঠিন। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থাতেই নির্ধারিত হবে যে সে খেলা কতদূর এগোবে। ইদানীংকালের আর এক মহাপুরুষের কার্যকলাপ পৃথিবীর সংবাদপত্রগুলোতে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে; অবশ্য তাঁর মহাপুরুষত্ব শেষ হবার পরেই। যাঁরা সংবাদ রাখেন তাঁরাই জানেন যে তিনি হচ্ছেন অর্জেন্টিনার ভূতপুর্ব ডিক্টেটর পেরন সাহেব। মিলিটারী কোঁদেতা করে ক্ষমতায় আসীন হলেও পেরন সাহেবের অনেক গুণ ছিল। তাই তিনিও আর্জেন্টিনাতে শ্রীজহরলালের মতই জনপ্রিয় নেতা হিসাবেই নিজেকে প্রমাণ করে ছেড়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী ইভা পেরন ছিলেন ঐ দেশের মস্তবড় শ্রমিক-নেত্রী, ফলে সুবিধাও হয়েছিল ভাল রকমেরই। এই সুবিধার সুযোগেই তাঁরা দুজনে বেশ জমিয়ে বাদশা বেগমের পার্ট করছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চড়তি বাজারও তাঁরা পেয়েছিলেন। খাদ্যসম্ভার যা হচ্ছে কিনা আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বড় বিক্রয়যোগ্য পণ্য, তা বিক্রী করে লাভও হচ্ছিল প্রচুর; তাই শ্রমিকদের বাড়তি দাবি মাঝে মাঝে পূরণ করে তাঁরা আরও বিরাট, বিপুল, মহিমান হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তারপর, যুদ্ধের কয়েক বছর পরে যখন বাজার পড়তে থাকল, শ্রমিকদের আরও দাবি মেটান কঠিন হয়ে দাঁড়াল, তখন তাঁরা বিভিন্ন ডাইনামিক পন্থা অবলম্বন করে আরও কিছুদিন কাটালেন। এই ডাইনামিক পন্থার দেশের অনেক বড় বড় ব্যবসা বাণিজ্য এবং সংবাদপত্রগুলো ত প্রায় সবই বেমালুমে বাদশাহের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হল। যখন অন্য কোন জীবিকার পন্থা

থাকেনা; তখন প্রচারকার্যের কাজটিই হয়ে উঠে প্রধান। আর্জেন্টিনাতেও তার কমতি হল না। আর ঐ প্রচার কার্যটি বেশী হলে যে মাথার ঠিক থাকে না, সেটাও হল। পেরন সাহেব প্রায় আর কি জহরলালের মতই আল্লা ব'নে গেলেন; চলতেও থাকলেন সেই চালেই। এমন কি ধর্ম রিফর্ম কার্যেও হাত দিলেন। কিন্তু আসল আল্লা বোধকরি অতটা চ্যালেঞ্জ সহ্য করতে রাজী ছিলেন না। তাই আবারও এক মিলিটারী কোদেতা করেই পেরন সাহেবকে লাথি মেরে বিদায় করলেন। নূতন সরকার আর্জেন্টিনার রাজধানী বুনেসএঁয়রস্ শহরে একটা প্রদর্শনী খুলে ভূতপূর্ব বাদশাহ এবং বেগমের নিত্যব্যবহার্য জিনিষ-পত্র সাধারণকে দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন,—ঐ জিনিষপত্রগুলোর বাজার মূল্য নাকি কম করেও চল্লিশ কোটি টাকা,—একেবারে বাদশাহী ব্যাপার কিনা! শ্রীজহরলাল কত কোটি টাকার জিনিষপত্র ব্যবহার করেন জানা যায়নি, তবে অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর বাদশাহীও পেরন সাহেবের বাদশাহীর চেয়ে বিশেষ তফাৎ কিছুই নয়।

ইদানীং আর একজন মহাপ্রভুও শ্রীজহরলালের সঙ্গে দোস্তি পাকিয়ে বেশ জাঁকিয়ে উঠেছিলেন, বিরাট, বিপুল, সুমহান হিসাবে বেশ নামডাকও হয়েছিল। কথায় কথায়ই দুনিয়া মাৎ করে বেড়াচ্ছিলেন। তবে কিনা একটু বেশী বাদশাহী করতে গেলে অনেক সময় যা হয়—নাসের মিয়ার কপালেও তাই হয়েছে। তাঁকে ঠাণ্ডা করে দেয়া হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মিশর দেশটাও পেছিয়ে গেছে বোধহয় পঞ্চাশ বছর। (তবে মার খেয়ে নাসের মিয়া যে বেশ খানিকটা অভিজ্ঞ হয়েছেন, তা তাঁর কার্য্যকলাপে এবং কথাবার্তায় ইদানীং বেশ বুঝা যাচ্ছে—তিনি অনেকটাই ভোল পাল্টেছেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতা মিসরের ভবিষ্যতের পক্ষে ভালই হতে পারে। জহরলালের কিন্তু কিছু দেখেই কিছু শেখবার অভ্যাস নেই।) শ্রীজহরলালের বেশী বাহাদুরীর ফলে ভারতের কপালেও মিশরের মত ঠাণ্ডা হাওয়া আছে কিনা জানিনা, তবে আপাতত তিনি যে ভারতকে সেই পথেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন, তা বুঝতে একটুও ভুল নেই।

শ্রীজহরলাল যে ভারতের কি এবং কতখানি, সোজাভাবে সেটা বুঝবার মত বিদ্যে আমার নেই। তবে প্রচার যা হচ্ছে তাতে ত শুনতে পাই যে তিনিই নাকি ভারত। তাঁকে বাদ দিয়ে ভারতের কথা ভাবাই যায় না, তিনি না থাকলে ভারত একেবারেই অচল হয়ে যাবে ইত্যাদি, আরও অনেক কিছু। তাঁর পরে ভারতের বাদশাহ কে হবেন সে নিয়েও ভারতের নাকি খুবই চিন্তার

কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জানিনা, ভারতের ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করবার মত এত লোক সত্যিই আজও ভারতে আছেন কিনা! কিন্তু শ্রীজহরলাল না থাকলে কি হবে একথা নিয়ে মাথা ঘামাতে কাউকে দেখেছি বলে মনে হয় না। তবে কেউ ওসব নিয়ে মাথা ঘামাক আর নাই ঘামাক, শ্রীজহরলাল নিজেই ও-বিষয়ে খুবই মাথা ঘামাচ্ছেন বলেই মনে হয়। আজকাল তিনি যেখানে সেখানে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন, "জহরলালের পর কে হবেন এনিয়ে চিন্তা করবার কোন মানে হয় না" ইত্যাদি। শ্রীজহরলালের পরে কি হবে এ হেন বিরাট সমস্যা নিয়ে কে যে কোথায় মাথা ঘামাল তা কেউই জানেনা, অথচ শ্রীজহরলালের শ্রীমুখ থেকেই আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে, কোন ভয় নেই। ব্যাপার কি? ভয়টাই বা কিসের আর ভয় নাই-ই বা কিসের? তবে হ্যাঁ, আশ্বাসের সঙ্গে একটা দামী কথা শ্রীমুখ থেকে শোনা গেছে ঠিকই, "ভারতের অবস্থা স্থিতিশীল হয়ে গেলেই জহরলাল না থাকলেও কোন অসুবিধা হবে না"। কথাটা খুবই দামী, এবং মানে যদি ঠিক মত বুঝে থাকি, তাহলে নিশ্চয়ই বুঝা উচিত যে ভারতের অবস্থা স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত শ্রীজহরলালকেই থাকতে হবে; বোধ হয় শ্রীজহরলাল তাই থাকবেনও, এবং যে কোন উপায়েই। শুধু আভাষটুকু দিয়ে জনসাধারণকে তৈরী করে রাখছেন। স্থিতিশীল কথাটির মানে যে কি তাও ঐ শ্রীজহরলালই মাত্র জানেন, আর কবে যে দেশ ঠিক স্থিতিশীল হবে সেটাও নিশ্চয়ই তাঁরই বিচার্য; এবং এই জন্যই তাঁর থাকা একান্তই দরকার।

কথাটা শুনে আমি একেবারেই থ মেরে গেছি। জহরলাল যে-কোন উপায়ে থাকতে চান সে কথা ভেবে অবশ্যই নয়। শুধু শুনে যে, ভারত নাকি এখনও স্থিতিশীলই হয়নি, এবং ঐ স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত শ্রীজহরলালের থাকা দরকার। ব্যাপার কি? যে দেশ পৃথিবীর নেতা হয়ে গেছে, পৃথিবী যার পানে তাকিয়ে আছে, যার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ হয়ে গেছে, সেই ভারত নাকি এখনও স্থিতিশীলই হয়নি! শ্রীজহরলালের শ্রীমুখ থেকেই একথা বের হচ্ছে। তাই আবারও জিজ্ঞেস করি, ব্যাপার কি? এ রহস্যের উত্তর কে দিতে পারে জানিনা। তবে শ্রীজহরলালের প্রচারকার্য এইভাবেই হয়। শ্রীজহরলালের পরে কি হবে, এ প্রশ্নও যেখান থেকে ওঠে, উত্তরও সেখান থেকেই আসে; এবং সেই সঙ্গেই জানিয়ে দেয়া হয় যে 'দেশ স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত জহরলালকেই থাকতে হবে'।

এসবই খুব প্ল্যানমাফিকই করা হয়, তাই সাধারণের পক্ষে বোধগম্য নয় কখনই। অনেক বেশী বুদ্ধি আছে বলেই বাদশাহরা বাদশাহ আর অন্যেরা মূর্খ-সাধারণ। তাই ভারতে আজ কেউ নেই যে বলে দিতে পারেন, জহরলালের পরে কি হবে সেকথা নিয়ে মাথা ঘামাবার চেষ্টা করে শ্রীজহরলাল যেন তাঁর ঐ অতি-দামী মাথাটির অসদ্ব্যবহার না করেন। তিনি দুনিয়ার মালিক ঠিকই, কিন্তু এখনও ত্রিভুবনের মালিক হতে পারেন নি, তাই তাঁর পরলোকে যাবার পরে ভারতের কি হবে সে চিন্তায় তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। পরলোকে গিয়ে তিনি কি করে সেখানেও বাদশাহ হতে পারেন সেই চিন্তাই বরং তিনি যেন করেন। বাদশাহী তিনি যা করেছেন ভালই করেছেন, আর সেটাকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখলের চেষ্টা যেন না করা হয়; কারণ সেটা আর কখনই সম্ভব হবে না, শুধুই লোক হাসান হবে। তাঁর অবর্তমানে বা ভোটযুদ্ধে পরাজয়ে ভারত কিছুমাত্র অসুবিধায় পড়বে না; কারণ, যে কেউই যে কোন উপায়েই ঐ সিংহাসন নামক বিশেষ আসনটিতে আসীন হয়ে বসবেন, ভারতের জনসাধারণ তাঁকেই বাদশাহ বলে মেনে নেবে। এবং শ্রীজহরলাল আজ যেমন স্তুতি বন্দনা পাচ্ছেন, তিনিও সেইরকমই পেতে থাকবেন; আর ভারত তখনও আজকের মতই এগিয়ে যেতে থাকবে—বাদশাহের মর্জিমতই। তবে হ্যাঁ, যদি সত্যিই ভারতের এমন দিন আসে যেদিন ভারতীয়েরা যে কোন লোক যে কোন উপায়ে সিংহাসন দখল করে বসলেই তাঁকে বাদশাহ বলে মেনে নেবে না, তার মর্জিমত চলবে না, সেদিনের ভারতের কথা ভেবেও শ্রীজহরলালের কোন লাভ হবে না, বরং সেদিন ভারতে শ্রীজহরলালদের কি হবে, সেকথা ভেবেই, আজ শ্রীজহরলাল তাঁর পথ চিন্তা করুন। এসব কথা শ্রীজহরলালকে বলবার আজ আর কেউ নেই। যা কিছু বলবার তা সবই শ্রীজহরলালের। প্রশ্নও তিনিই তুলছেন, উত্তরও দিচ্ছেন তিনিই। তিনিই বলছেন ভারত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে নিয়েছে, আবার তিনিই বলছেন ভারত এখনও স্থিতিশীলই হয়নি, এবং ঐ জন্যই তাঁকে থাকতে হবে। তিনি থাকবেন, এটাই হচ্ছে আসল কথা। পেরন সাহেবের মতই সবরকমের শেষ চেষ্টা না করে ছাড়বেন না।

অন্যান্য নেতারা ও দল সমূহ

শ্রীজহরলাল বাদে ভারতের রাজনীতির রঙ্গভূমিতে আর যাঁরা আছেন তাঁদের কথা বেশী বলে লাভ নেই। শ্রীজহরলাল থাকতে তাঁদের বিশেষ কোন মূল্যও নেই। তবুও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা পূর্ণ কয়েকজনের কথা একটু বলাই বোধ হয় ভাল। ডাঃ প্রসাদ, মৌলনা আজাদ (মৃত), শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ (মৃত), শ্রীরাজাগোপালাচারী (কংগ্রেস ছেড়ে নূতন দল করেছেন) এঁরা বেশী প্রবীণ। তাই অদল বদল করে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করবার সম্ভাবনা থাকলেও সত্যিকারের নেতৃত্বের সম্ভাবনা বিশেষ নেই। এঁদের সমসাময়িক বা পরের কংগ্রেসী উপরতলায় বিশিষ্ট আর যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের নাম, শ্রীজহরলাল যখন মাঝে মাঝে প্রধান মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেওয়ার ইঙ্গিত করেন, তখনই শোনা যায়। তবে বোধ হয় ঐ শোনা পর্যন্তই। শ্রীজহরলাল ঐ চাকরিটি ছেড়ে দিয়ে আত্মহত্যা করবেন এ বিশ্বাস কেউ আর করে না। তবে বৈজ্ঞানিক, নেতা এবং কর্মী হিসাবে ডাঃ বিধান রায়ের তুলনা ভারতে কেন, ভারতের বাইরেও খুব বেশী আছে বলে জানিনা। তিনি একাধারেই অনেক কিছু এবং খাটতেও পারেন প্রচুর, আর তাঁর উপর জনসাধারণের আস্থাও আছে যথেষ্ট। (বর্তমানে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তাঁর উপর যে আর খুব বেশী লোকের আস্থা আছে তাও মনে হয় না, কারণ বাংলার স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে তিনি এ পর্যন্ত একবারও শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারেননি। অথচ তিনি শক্ত হয়ে দাঁড়াবেন এইটুকুই সবাই আশা করেছিল।) তিনি সত্যিই বিরাট। তবে তাঁর কয়েকটি বিশেষ দুর্বলতাও যে নেই, তাও নয়। তিনিও প্রবীণ; আর চেনা জানা বন্ধু-বান্ধবদের টেনে তোলবার চেষ্টা তিনি যেভাবে করেন, তা মোটেই তাঁর উপযোগী নয়। চেনা এবং খাতিরের পদ্মজা নাইডুকে বাঙ্গলার গভর্নারীতে বসাবার তাল তাঁর যতটা, হিন্দী কুচক্রের বিরুদ্ধে বাংলার স্বার্থরক্ষায় তাঁর চেষ্টা সে তুলনায় একেবারেই নেই। এবং বোধ হয় এই সব দুর্বলতার কারণেই তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে যতটা প্রতিপত্তি হওয়া উচিৎ ছিল, ততটা প্রতিপত্তি খাটাতে পারেন নি কখনও। আর মোরারজী ভাই স্ট্রংম্যান হিসাবে যতটা নাম করেছেন, ম্যান হিসাবে তাঁর অন্তত কিছুটা থাকলেও অনেক কিছুই আশা করতে পারতেন। শ্রীজহরলালের প্রীতিই আজ তাঁর রাজনীতির প্রধান পুঁজি; তাই তাঁর আশা করবার খুব বেশী কিছুই নেই।

শ্রীজহরলালের প্রীতিধন্য আর একজন হচ্ছেন শ্রীকেষ্ট মেনন। লাঠি হাতে করে দুনিয়া টহল দিয়ে তিনি খুবই নাম করেছেন। তবে তাঁর চাল চলন দেখে যেরকম মনে হয়, তাতে তিনি যে লাইন ভুলেই রাজনীতিতে এসেছেন সে বিষয়ে কোন ভুলই নেই। ঠিক লাইনে গিয়ে খেলা দেখাতে শুরু করলেও তিনি বিনা মেকআপেই একটা খুব ভাল পার্ট করতে পারতেন; তাতেও তাঁর কিছু কম নাম হ'ত না (কেষ্ট মেনন যে কি চীজ তা মৌলনা আজাদ তার 'India Wins Freedom' বইখানিতেও খুবই পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। মৌলনা আজাদ বলেছেন, "জীবনে কোন ব্যাপারেই আমি আর সর্দার প্যাটেল একমত হতে পারিনি, শুধু একটা বিষয় বাদে; এবং তা হচ্ছে যে শ্রীকেষ্ট মেনন অতি বদলোক")। শ্রীনেহেরুর প্রীতিধন্য না হয়েও আর একজন আছেন কংগ্রেস নেতা যাঁর ভবিষ্যৎ একেবারে তুচ্ছ বলে মনে হয় না। কর্মী এবং নেতা হিসাবে তিনি তাঁর স্থান ভালভাবেই করে নিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন মারাঠী শ্রীপাতিল। তিনি একজন স্ট্রংম্যানও বটেন। তবে ইদানীং নেহেরু প্রীতিলাভের সহজ পন্থা হিসাবে বোম্বাইয়ের ব্যাপারে তিনি যে মারাঠীদের স্বার্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, তার ফল তাঁকে অনেক দিন ভুগতে হবে। কংগ্রেসের অন্য নেতাদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে, মাদ্রাজের শ্রীকামরাজ নাডার, মহীশূরের শ্রীনিজলিঙ্গপ্পা এবং অন্ধ্রের শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী আর শ্রীগোপাল রেড্ডী এঁরা কয়জনই বেশ একটু বিশিষ্ট। নেতা হিসাবে এঁদের কিছু কিছু গুণও আছে; এঁদের ভবিষ্যৎও একেবারে ফেলনা মনে হয় না। আর উড়িষ্যার শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাবও অনেক দিক থেকেই বেশ একটু বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। তাঁর যে কতকগুলো সৎগুণ আছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। ডাঃ বিধান রায়ের পরে বাংলার কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে আজ মাত্র এক-জনেরই নাম করা যায়, তিনি হচ্ছেন মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ (ইনিও ইতিমধ্যেই মারা গেছেন)। সত্যিকারের বড় নেতা হবার মত অনেকগুলো গুণই তাঁর আছে। কিন্তু বড় রাজনৈতিক নেতা হতে হলে যেসব ঢং এবং ন্যাকামি রপ্ত করা একান্তই দরকার, সেগুলোতে তার দখল বিশেষ নেই। তাই তাঁর ভবিষ্যৎও বিশেষ উজ্জ্বল মনে করবার কোন কারণ নেই। কংগ্রেসী মহলের আর যে সব নেতারা রয়েছেন তাঁদের নেতৃত্ব দানা বাঁধতে আরও অনেক দেরী আছে, শ্রীজহরলাল থাকতে আর কারুর নেতৃত্ব দানা বাঁধার সুযোগও নেই।

আর কংগ্রেসের বাইরে বিরোধী পক্ষে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যেও

সেরকম শক্তিশালী নেতা বিশেষ কেউ আছেন মনে হয় না। বিরোধী পক্ষে সেরকম্ শক্তিশালী নেতা যে নেই, শ্রীজহরলালের কার্যকলাপই ত তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় রাজনীতিতে বিরোধীদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে এসেছে। তবে প্রজা সোসালিস্ট পার্টির জয়প্রকাশ নারায়ণের ব্যাপারটা বেশ একটু কিরকম কিরকম মনে হয়। তিনি প্রজা সোসালিস্ট দলে আছেনও, আবার নেইও। ভূদান, জীবন দান করে বেড়াচ্ছেন, আবার মাঝে মাঝে নানা রকম মন্তব্য প্রচার করে বাহাদুরীও দেখাচ্ছেন। শ্রীজহরলালের সাথে তাঁর মহব্বতিরও অন্ত নেই অথচ মাঝে মাঝে শ্রীজহরলালের কোন কোন বিশেষ দুর্বলতার সমালোচনা করে খবরের কাগজে বড় বড় শিরোনামার খবরও হচ্ছেন। শ্রীজহরলাল এবং ভারতীয় সংবাদপত্র যেভাবে তাঁর মতামতের গুরুত্ব দিচ্ছেন, এবং তিনিও যেভাবে শ্রীজহরলালের সমালোচনা করার পর মুহূর্তেই আবার শ্রীজহরলালকে ভারতের এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নেতা বলে প্রশংসা করে ধন্য হচ্ছেন, তাতে কেবলই কেমন কেমন মনে হয়। মনে হয় তাঁর বিষয়ে বাজারে গুজব যেটি প্রচারিত হয়েছে সেটি সত্যি। বাজারের গুজব মতে তিনিই হচ্ছেন ভারতের প্রধান মন্ত্রীর পদে শ্রীজহরলালের উত্তরাধিকারী। শ্রীবিনোবা ভাবের অলৌকিক কার্যকলাপের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাঁকেও কিছুটা অলৌকিক ছাপ দেবার চেষ্টা হচ্ছে; আর জায়গামত শ্রীজহরলালের সমালোচনা করে তাঁকে তাঁর ব্যক্তিত্ব জাহির করবারও সুযোগ দেয়া হচ্ছে। জানিনা এ গুজব কতটা সত্যি, তবে অবিশ্বাস করবার মত কিছু নেই; ভারতীয় রাজনীতিতে সবই সম্ভব, আর এই ধরণের ব্যাপার ত খুবই সম্ভব। সোসালিস্ট পার্টির রামমনোহর লোহিয়া কিছুদিন খুবই প্রচার পেয়েছিলেন, বর্তমানে কিছুটা পেছিয়ে গেছেন মনে হয়; তবে প্রজা সোসালিস্ট পার্টির গ্যারাকল থেকে বেরিয়ে এসে নূতন দল গঠন করে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন। প্রচারকার্য লাভে বঞ্চিত হবার কথা জেনেও তিনি অতটা ঝুঁকি নিয়েছেন, সেটাই তাঁর বাহাদুরী;—সত্যিকারের সমালোচনা করবার ক্ষমতা তাঁর খানিকটা আছেও। নিজ দলের ভিতরে খুব প্রতিপত্তি না থাকা সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট পার্টির শ্রীহীরেন মুখার্জী নেতা হিসাবে একটু বিশিষ্ট তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর মধ্যে বেশ কিছু নেতাসুলভ গুণও দেখতে পাওয়া যায়। জনসংঘের শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ যে শুধুই বিরাট বিদ্বান ব্যক্তি নন, রাজনৈতিক নেতা

হিসাবেও বেশ বড় তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। মহারাষ্ট্রের এইচ, ভি, কামাথ আর বাঙ্গলার শ্রীসৌম্যেন ঠাকুর দুজনেই কৃতিপুরুষ, অনেক গুণাবলীও আছে। তাহলেও তাঁদের দলের অবস্থা যে রকম তাতে উন্নতির আশা করা কঠিন। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের বাঙ্গালী আর মারাঠী পরিচয়ও তাঁদের বিপক্ষেই। হিন্দুমহাসভার শ্রীনির্মল চ্যাটার্জীর অনেকগুলোই গুণ ছিল, চেষ্টা করলে তিনিও শ্যামাপ্রসাদের মতই সত্যিকারের বড় নেতা হতে পারতেন; কিন্তু আলস্যপরায়ণতাই তাঁর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। তাঁর আর বেশী কিছু আশাও নেই, ঐ দুর্বলতার জন্যই (ইনি বর্তমানে স্বতন্ত্র দলে গেছেন)। ঐ মহাসভারই আর এক নেতা দেশপাণ্ডেও অনেক গুণের অধিকারী, কর্মী পুরুষও, কিন্তু মারাঠী আর মহাসভাই তাঁর দুর্বলতা। বাংলার আর একজন, শ্রীত্রিদিব চৌধুরীও ইদানিং কিছু নাম করেছেন,—গোয়া স্বাধীনতা আন্দোলনে সত্যাগ্রহ করতে গিয়ে তিনি পর্তুগীজ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। অল্প কিছুদিন হয় মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরেছেন, এতে তাঁর নামডাক আরও বেড়ে গেছে; আর তাঁর যে অনেকগুলো ভাল গুণও আছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তবে তাঁর পেছনেও দলের যে অবস্থা তাতে খুব বেশী আশা করবার কিছু নেই। মোট কথা, ছোট ছোট অনেকগুলো দল একসাথে না হতে পারলে বিরোধীদের মধ্যে কারও বিশেষ আশা কিছুই দেখা যায় না।

দলগত রাজনীতির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক না রেখেও দু'চার জন যাঁরা ভারতে স্বাধীন চিন্তাধারার উন্মেষে সাহায্য করছেন, তাঁদের মধ্যে বাঙ্গালার শ্রীদেবজ্যোতি বর্মন, শ্রীবিবেকানন্দ মুখার্জি এবং শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, আর বোম্বাইয়ের ডি, এফ, কারাকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে ভারতে স্বাধীন চিন্তাধারা যেভাবে নির্মূল হয়েছে, তাতে তাঁদের সমঝদারদের সংখ্যা যে খুব বেশী নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য।

আর দল হিসাবে ভারতে কংগ্রেস দলই যে সর্বপ্রধান এবং অন্যগুলোর চেয়ে অনেকটাই বড় তাতেও কোন সন্দেহ নাই। তবে এক কথায় বলতে গেলে, কংগ্রেসের আজ অন্তিম অবস্থাই বলতে হয়। শুধু শাসন ক্ষমতা হাতে আছে বলেই এক বিরাট দল হিসাবে চলে যাচ্ছে; ক্ষমতাটুকু হাতছাড়া হলে চুরমার হতে এক মুহূর্তও লাগবে না। শ্রীজহরলাল সমেত অনেকেই আর তখন কংগ্রেসের হাঙ্গামে থাকতে চাইবেন না। গত দশ বৎসরে কংগ্রেস দল

তাঁদের গুণাবলীর নমুনা যা দেখিয়েছেন, তাঁদের আদর্শবাদিতার যে পরাকাষ্ঠা তাঁরা দেখিয়েছেন, তাতে একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে ওটির আর বেঁচে থাকার কোন সৎউদ্দেশ্যই থাকতে পারে না। দু'চারজন সত্যিকারের ভাল মানুষও যে দলটিতে নেই তাও নয়; কিন্তু যত রকমের সুবিধাবাদীরা ওটিকে যেরকমভাবে পকেটস্থ করে বসে আছেন, তাতে ওটিকে আর সংশোধন করা সম্ভবও মনে হয় না। তাই ওটি যত তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, ভারতের পক্ষে ততই মঙ্গল বলেই মনে হয়। তবে ভারতীয় কংগ্রেসের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী ঐ ডিক্টেটর শ্রীজহরলাল ভিন্ন আর কেউ নন। যদিও শ্রীজহরলালকে মাথায় চেপে বসে থাকতে দিয়ে কংগ্রেসীরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরেছেন। কংগ্রেসের দোস্ত মুসলিম লীগের কর্ম ত পাকিস্থানে হয়ে গেছে; —বিরোধীরা নিজেদের মধ্যে একটু কম মারামারি করলে ভারতেও কংগ্রেসের হয়ে যেতে মোটেই বেশী সময় লাগবে না।

প্রজা সোসালিস্ট দল নামে যে দলটি ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গভূমে বিচরণ করছেন, তাদের বিশেষ কোন সত্তা নেই। কংগ্রেসের রাজত্বে গদিতে স্থান না-পাওয়া গোসা-করা রাজনীতিকদের নেতৃত্বেই ওটির কাজ চলছে; তাই যে কোন মুহূর্তেই ওটি উপে গেলেও আশ্চর্যের কিছুই থাকবে না।

কমুনিস্ট পার্টিই সত্যিকারের দল হিসাবে ভারতের দ্বিতীয় দল। এই দলের নেতাদের মধ্যে খুব উঁচুদরের বিশেষ কেউ না থাকলেও, কর্মীদের মধ্যে বেশ কিছু উঁচুদরের কর্মী রয়েছেন। এই পার্টির গঠনসংস্থাটিও ভাল। তবে এটির আসল দোষ হচ্ছে যে এটিকে একটি ভারতীয় রাজনৈতিক দল বলা কঠিন,—রাশিয়াবাজী করাই এঁদের রাজনীতির সব চেয়ে বড় দুর্বলতা। আর একটা খুব বড় দুর্বলতা হচ্ছে যে এঁদের নীতির কোন বালাই নেই,— রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করাটাই হচ্ছে তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর সেই উদ্দেশ্য সাধনে তারা যে-কোন পন্থা অবলম্বন করতে একটুও দ্বিধা করেন না। এবং এই কারণেও এই দলটিকে একটি সত্যিকারের রাজনৈতিক দল হিসাবে গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সম্ভবও নয়। শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার উপর ভরসা রেখেই এঁদের রাজনীতি চালাতে হয়; তাই রাশিয়ার দুর্বলতায় তাঁদেরও দুর্বলতা এসে গেছে। মনে হয় এঁরা আর বেশী এগোবার সুবিধা কখনই পাবেন না।

জনসংঘ হচ্ছে আর একটি পার্টি যেটি হচ্ছে কিনা নিখিল ভারত রাজনৈতিক পার্টি হিসাবে সরকারীভাবে স্বীকৃত। ৺শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই দলটিকে

গঠন করে মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই যেরকম এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সে খুবই অদ্ভুত। তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম দিকে দলটি বেশ খানিকটা পেছিয়ে পড়লেও আবার ধীরে ধীরে এগোতে সুরু করেছে। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এবং আরও কয়েকজন সত্যিকারের পুরুষ এই দলের নেতৃত্বে রয়েছেন বলেই যে ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কি! উত্তর এবং মধ্য ভারতের অনেক জায়গাতেই দলটির প্রভাব আজ খুবই প্রকাশ্য। এমন কি খাস বাদশাহ জহরলাল পর্য্যন্ত দলটিকে যথেষ্ট ভয় করতে সুরু করেছেন।' কমুনিস্ট পার্টি বা প্রজা-সোসালিস্ট পার্টির চেয়ে আকারে এখনও ছোট হলেও এই দলটিই ভারতের সত্যিকারের বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছে। জাতীয় স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে এঁরা কাউকে খাতির করে চলে না,—এবং সম্ভবত বর্ত্তমান ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এই গুণটি একমাত্র এই দলটিরই বিশেষত্ব। বাংলাদেশে দলটির এখনও বিশেষ প্রতিপত্তি না থাকলেও শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেই যে আজ এই দলটির কথাই ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন তাতে বোধ হয় বিশেষ ভুল নেই। তাই আগামীতে দলটি আরও উন্নতি করবে বলেই মনে হয়।

হিন্দু মহাসভাও একটি বড় দল। এ দলে অনেক বিদ্বান বুদ্ধিমান এবং প্রতিপত্তিশালী লোকেরাও আছেন। এরা সচরাচর পাকিস্থানের বিরুদ্ধে কড়া কড়া কথা বললেও দেশে বিশেষ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেন না। তবুও ঐ নামটির জন্যই তাদের অনেক অসুবিধা আছে, বেশীদূর অগ্রসর হওয়া খুবই কঠিন।

সারা ভারতে আরও অনেক অসংখ্য ছোট ছোট রাজনৈতিক দল আছে। এই ছোট দলগুলির বিষয় 'আবোল তাবোলের' প্রথম এবং দ্বিতীয় সংস্করণে যে আশা প্রকাশ করা হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ-ই ব্যর্থ হয়েছে। তাই তাদের বিষয় মত বদলাবার প্রয়োজন হয়েছে। অবশ্য কিছু না উল্লেখ করে পাশ কাটিয়ে গেলেও হয়ত চলতে পারত,—অন্ততপক্ষে আরও কতকগুলো লোককে চটাতে হ'ত না। তবুও তাদের বিষয় উল্লেখ করতে হচ্ছে এই জন্যই যে, কার্যকলাপ দেখে যেটুকু বুঝা গেছে তাতে ঐ ছোট দলগুলির বেশীর ভাগই শুধু আকারেই নয়, কার্যকলাপে এবং আদর্শে আরও ছোট; এবং ভাল করবার ক্ষমতা এদের কিছুমাত্রও না থাকলেও খারাপ করবার ক্ষমতা রয়েছে প্রচুর। অনেকগুলিই, বিশেষভাবে বামপন্থী নামে পরিচিত প্রায় সবগুলিই কমুনিস্ট পার্টির লেজুর ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। কমুনিস্ট পার্টির পদলেহন করে কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করাই,

—মানে আইন সভায় এক আধটি আসন সংগ্রহ করাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য; ফলে নিজেরা কমুনিস্ট না হয়েও এদের সব সময়ই কমুনিস্ট পার্টি কিংবা রাশিয়া বা চীনের বদামীকে ডিটো দিয়ে চলতে হয়। এমন কি চীনের ভারত আক্রমণের খবর প্রকাশিত হবার পরও এরা চীন বা রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটাও কথা বলবার সাহস রাখে না, অথচ কিছুদিন আগে, লেবাননের হাঙ্গামার সময় আইনসঙ্গত ভাবে সরকার কর্তৃক আহুত হয়ে যখন আমেরিকান সৈন্য লেবাননে উপস্থিত হয়েছিল, তখন এরাই কলকাতা এবং ভারতের আরও বহুস্থানে আমেরিকান এম্বেসি বা কানসাল অফিস আক্রমণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। এদের রাজনীতির উদ্দেশ্য বা দৌড় বুঝতে এর চেয়ে বেশী বোধ হয় আর কিছু প্রয়োজন নেই। আর এই দলগুলোর যারা নেতা, মানে দলগুলো যাদের পকেটস্থ হয়ে বসে রয়েছে, তাদের বেশীর ভাগ ত বটেই, প্রায় সবই অতি বাজে লোক,—রাজনৈতিক ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। তাই ঐসব দলের কোনই ভবিষ্যৎ নেই। শুধু তাই নয়, অনেকে যেমন ধারণা করেন যে ঐগুলো সব এক হলে অনেক কাজ হ'ত, তারও কোনই মানে নেই—কিছুই হ'ত না। অনেকগুলো শূন্য যোগ করলে ঠিক যেমন এক বা অন্য কিছুই কখনও হয় না।

আসলে ভারতে দলের কোন অভাব নেই—দলাদলির দেশই ত হচ্ছে ভারত। তা না হলে পরে যুগ-যুগান্তর ধরে ভারতের এ দুর্দ্দশাই বা হবে কেন? তবে আর যাই হোক দলেরা যে ভারতের দুর্দ্দশামোচন করতে পারবে না তাও আজ খুবই পরিষ্কার। ভারতের দুর্দ্দশা মোচন হতে যা প্রয়োজন তা দল নয় একজন শক্তিমান পুরুষের, যিনি সকল ক্ষুদ্র এবং ইতর স্বার্থকে লাথি মেরে এগিয়ে যেতে পারবেন। যদি সেই রকম একজন কেউ এসে দাঁড়ান তাহলে অনেক কিছুই ভেঙ্গে চুরে নূতন করে গড়ে উঠতে পারে। 'সব দল এক না হলে', 'দেশের লোক এককাট্টা না হলে', কিছুই হবে না, এই ধরণের যে শ্লোগান চালান হচ্ছে সেগুলো অতিমাত্রায় দুষ্ট বুদ্ধিপ্রণোদিত,—ওগুলির কোনই মানেই নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও কোন ব্যাপারে দেশের সব লোক এক হতে পেরেছে, এ কেউই দেখাতে পারবে না। তবুও বহু দেশে বহু বড় কাজ হয়ে গেছে কারণ একজন শক্তিমান পুরুষ সম্মুখে এসে কিছু সংখক determined কর্মী তৈরী করে নিতে পেরেছিলেন। যত বড় বড় কাজ পৃথিবীতে হয়েছে তার সবই হয়েছে ঐ determined few-দের দ্বারাই। অবশ্য অনেক সময়ে শেষ পর্য্যন্ত দেশের অনেকেই হয়ত তাঁদের সাহায্য করেছেন, কারণ

ঐ determined few-রা তাদের কার্য্যকলাপ দ্বারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে অন্য সকলের আর তাদের সমর্থন করা ছাড়া গত্যন্তরও থাকেনি। আজ কাছারের কংগ্রেস নেতারা যে ভাষা আন্দোলনকে সাহায্য করবার জন্য কংগ্রেস ছাড়তেও দ্বিধা করেন নি তারও কারণ, ঐ determined few-এর কার্য্যকলাপ। তাঁরা কাছারে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন, যে কাছারে থেকে অন্যের দালালি করা আজ আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আপাতত ঐ অনাগত শক্ত পুরুষের আশায় থাকা ভিন্ন ভারতের সম্মুখে আর উপায়ও নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেরকম পুরুষের আবির্ভাব যে খুবই দুঃসাধ্য তাও খুবই সত্যি—কংগ্রেসী রাম রাজত্বে মানুষের বিবেক এবং মনুষ্যত্বকে যেভাবে বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসাবে তৈরী করা হচ্ছে, সেই পরিস্থিতিতে শক্ত পুরুষ পাওয়া অতি কঠিন। তবুও শ্যামাপ্রসাদ যে এর ভেতরই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সেটুকুও ইতিহাস ; এবং ভারতের আশাও ঐটুকুই।

[ইদানিং শ্রীরাজাগোপাল আচারীর নেতৃত্বে স্বতন্ত্র পার্টি নামে যে দলটি গঠিত হয়েছে তার ভবিষ্যৎ খুব ভাল বলেই মনে হয়। ইতিমধ্যেই দলটি বেশ এগিয়েছে এবং আশা করা যায় আগামী সাধারণ নির্বাচনে এটি কংগ্রেসকে (অন্তত দক্ষিণ ভারতে) ভালভাবেই ঘায়েল করবে। খুবই ঐতিহাসিক মুহূর্তে এই দলটি জন্মগ্রহণ করেছে।]

পাকিস্থানের রাজনীতিতে এ পর্যন্ত কেউই অতি-মানব বলে নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা করেন নি। হয়ত পাকিস্থানে ওটা সম্ভবও নয়। অতি-মানববাদ, ঐ পরলোকে বিশ্বাসী এবং পৌত্তলিক হিন্দুদের মধ্যে চালু করা যতটা সোজা মুসলমানদের মধ্যে তা মোটেই নয়। মূর্তি পূজার মতই ব্যক্তিপূজা জিনিসটিও মুসলমানদের ধাতে বোধ হয় ঠিক সয় না। তবে অতি-মানব না হলেও অতি বড় নেতা হওয়াতে পাকিস্থানেও বোধ হয় কোন বাধা ছিল না ; কিন্তু পাকিস্থানে সেটাও খুব সম্ভব হয়নি। পাকিস্থানের নেতাদের মধ্যে এক জিন্না সহেব ছাড়া অতি বড় নেতা হিসাবে আর কেউই বিশেষ স্থান পাননি। লিয়াকৎ আলী সাহেবও অবশ্যই অন্য সব নেতাদের চেয়ে অনেকটাই বড় ছিলেন, তবু তাঁকেও অতি বড় নেতা বলে অভিহিত করলে বোধহয় ভুল হ'ত। জিন্না সাহেবের ভগ্নী মিস ফতিমা জিন্নারও বেশ ভালই প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু বর্তমানে তিনি রাজনীতির প্রায় বাইরে। লিয়াকৎ আলি সাহেবের পরে

আর যাঁরা পাকিস্থানে রাজত্ব করে গেছেন বা করছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ ছোটবড় কেউই নন, সবাই প্রায় একই ক্যালিবারের ; আর সে ক্যালিবারও বিশেষ বড় কিছু নয়। তবে কিছুদিন আগে যাঁরা পাকিস্থানের রাষ্ট্র-তরণী চালাবার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে ডাঃ খানসাহেব (বর্তমানে মৃত) আর সরোয়ার্দি সাহেব দুজনেই অন্য অনেকের চেয়ে একটু বিশেষ ধরণের তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। ডাঃ খানসাহেব পুরানো কর্মী এবং নেতা, তাঁর সততা এবং কর্মক্ষমতা পরীক্ষিত ; সত্যিকারের সুযোগ পেলে যে তিনি ভাল কাজই করতেন এ আশা করা বোধহয় ভুল হ'ত না। আর সারোয়ার্দি সাহেবের আগের আমলে অনেক কিছু বদনাম থাক্‌লেও, তাঁর বুদ্ধি বা কর্মক্ষমতার বিষয়ে কারও সন্দেহ ছিল না। উপরন্তু তিনি প্রায় দশটি বছর সরকার-বিরোধী নেতা হিসাবে কাজ করে অনেক রকমের জ্ঞানলাভের সুযোগ পেয়েছেন ; যদি তাতে তাঁর সত্যি কিছু জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই আশা করলে ভুল হবে না যে তিনিও ভালই কাজ করবেন। তবে সবই নির্ভর করছে সত্যিকারের সুযোগ পাবেন কিনা তারই উপরে। আজ পাকিস্থানে যে অবস্থা চলছে তাতে ঐ সুযোগের অভাবই সবচেয়ে বেশী। কাশ্মীরের, বা ভারতের বিরুদ্ধে জিগির তুলেও আজকাল বিশেষ সুবিধা হচ্ছে না। তাই সরোয়ার্দি সাহেবেরও যে শেষ পর্যন্ত খুব কিছু আশা আছে, এরকম আশা না করাই ভাল।

সভাপতি ইস্কান্দার মির্জা সাহেব মিলিটারীর লোক, অনেক ব্যাপারে মেজাজটাও মিলিটারী মার্কা ; তবে মনে হয় ঐ কারণেই, অনেক রকমের ছোট ব্যাপারের একটু উর্ধ্বেই তিনি থাকেন। ক্ষমতার আসনে আসীন না হয়েও আরও দুজন নেতা পাকিস্থানে আছেন—তার একজন হচ্ছেন সীমান্তের খান আব্দুল গফ্‌ফার খান আর অন্যজন পূর্ববাংলার মৌলানা ভাসানী। এঁরা দুজনেই রাজনীতিক হিসাবের চেয়েও মানুষ হিসাবে অনেকটাই বড়, তাই ক্ষমতায় থাকুন আর নাই থাকুন, পাকিস্থানের রাজনীতিতে খানিকটা প্রতিপত্তি অবশ্যই বিস্তার করবেন। বাংলার ব্যাঘ্র ফজলুল হক সাহেব অতি বৃদ্ধ। আর আবুহোসেন সরকারের পেছনে কোন সুসংবদ্ধ দল নেই। হামিদুল হক চৌধুরীরও ঐ একই অবস্থা। নূতনদের মধ্যে বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবুল মনসুর সাহেবের সুনাম ছিল অনেক ব্যাপারেই ; আর একেবারে অল্পবয়স্ক হলেও নেতা হিসাবে পূর্ববাংলার মুজিবর রহমানও বেশ নাম অর্জন করেছেন।

তবে পাকিস্থানের রাজনীতিতে ব্যক্তিবিশেষের গুরুত্ব কখনই খুব বেশী নয়; অবশ্য কি যে খুব গুরুত্বপূর্ণ তাও এখনও বুঝা কঠিন। তাই পাকিস্থানের রাজনীতি বুঝা আরও কঠিন।

আর দল হিসাবে পাকিস্থানে ইদানিং প্রধানত দুটি দলেরই উল্লেখ করা চলত। পশ্চিম পাকিস্থানে রিপাব্লিকান দল আর পূর্ববাংলায় আওয়ামী লীগ। কিন্তু এ দুটি দলের কোনটিই বিশেষ সুসংবদ্ধ দল নয় (ইতিমধ্যেই আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে দুটো হয়েছে)। রিপাব্লিকান দল গঠিত হয়েছিল পুরোনো আমলের মুস্লিম লীগ ভেঙ্গে গিয়ে, এবং সেই মুস্লিম লীগের লোকদের দ্বারাই—নূতনত্বের মধ্যে শুধুমাত্র ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্ব। আর পূর্ববাংলার আওয়ামী লীগ প্রথমত গঠিত হয়েছিল ক্ষমতা-বিচ্যুত মুসলীম লীগারদের দ্বারাই; পরে আরও অনেক ধরণের রাজনৈতিক কর্মীরাও এই দলে যোগ দিয়েছেন; সবারই যে খুব সৎ উদ্দেশ্য তাও বলা চলে না। অনেক কমুনিস্টও বেনামীতে কাজ চালাবার জন্য ঐ দলের মধ্যেই ঢুকে রয়েছেন। তাই ঐ দুটো দলেরই উপর খুব বিশেষ ভরসা করে পাকিস্থানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বিষয়ে কিছু বলা কঠিন।

অন্য যে সব ছোট খাট দল আছে তারও কোনটিই খুব বেশী সুসংবদ্ধ নয়। পূর্ববাংলার কৃষক-শ্রমিক দল আইন সভার আসনের অনুপাতের চেয়ে দল হিসাবে আরও অনেক ছোট। আর মুস্লিম-লীগ দল বর্তমানে ভেঙ্গে গেলেও আবার যে কিছুটা গুরুত্ব ফিরে পাবে না, তাও মনে হয়না; কারণ শিক্ষিত এবং ধনিকশ্রেণীর মধ্যে বেশ কিছু লোকের মুস্লিম-লীগের নেশা এখনও কেটেছে বলে মনে হয় না। তবে পাকিস্থানে দলের অভাবই আসল নয়, আসল অভাব হচ্ছে কর্মীর। সত্যিকারের ভাল রাজনৈতিক কর্মী পাকিস্থানে এখনও দু'চারজনের বেশী আছে বলে মনে হয় না। কমুনিস্ট পার্টি বলে পাকিস্থানে কোন পার্টি না থাকলেও পাকিস্থানেও কমুনিস্ট আছে। তাদের মধ্যে দু'একজন ভাল কর্মীও দেখা যায়। আর পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেস নামে দলটি আসলে হিন্দুদের একটি দল, যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হবার ফলে লিকুইডেশনে গেছে ধরে নিলে বিশেষ ভুল হবে না। (বর্তমানে পাকিস্থানে সামরিক শাসন চলছে। এই শাসনের অধীনে সকল রাজনৈতিক দলকেই বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে, তাই আজ পাকিস্থানে কোন রাজনৈতিক দল নেই।)

ভাষা সাম্রাজ্যবাদ

গত দশ বৎসরে স্বাধীনতার অধীনে ভারত এবং পাকিস্থানেও বহু বহু উন্নতি বা অধোন্নতিমূলক কাজ কারবার হয়েছে বা হচ্ছে, যাদের কিছু কিছু ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। উন্নতিমূলক কাজও যে হচ্ছে, সে ত প্রচার-কার্য মারফত সহস্র সহস্র বার শুনতে শুনতেই লোকের মাথা খারাপ হবার উপক্রম হতেই বেশ বুঝা যায়। কিন্তু অধোন্নতিমূলক যেগুলো হচ্ছে এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণভাবেই হচ্ছে সেগুলিই বুঝা একটু কঠিন। আর বুঝতে পারলেও তার উদ্দেশ্য যে ঠিক কি তা ধরা আরও কঠিন; অথচ এই কাজ কারবারগুলিকে ঠিক মত জেনে নিতে না পারলে ভারত এবং পাকিস্থানের রাজনীতিকে বুঝবার চেষ্টা করাই যে বৃথা, সেকথাও বেশী না বললেও বুঝা যায়।

এক বৈজ্ঞানিক বন্ধু রাজনীতিকদের ঐ সব কাজ কারবারের গতি প্রকৃতি বুঝবার সুবিধার জন্য একটা থিওরী আবিষ্কার করেছেন, যার মূল কথাই হচ্ছে যে, যখনই কোন কার্যের প্রয়োজনকে 'বৃহত্তর' শব্দটির দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছে তখনই ধরিয়া লইতে হইবে যে, ঐ কার্যটি কাহারও বিশেষ স্বার্থের খাতিরেই করা হইতেছে এবং ঐ কার্যটি কখনই উন্নতিমূলক নহে, অতি অবশ্যই অধোন্নতিমূলক। মানে, যখনই শোনা যাইবে 'ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে' বা 'পাকিস্থানের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে' অমুক কার্যটির নিতান্ত প্রয়োজন তখনই বুঝিতে ভুল করিলে চলিবে না যে ঐ কার্যটি ভারত বা পাকিস্থানের স্বার্থের সহিত কোনই সম্পর্ক রাখেনা; অবশ্যই বিশেষ কাহারও স্বার্থের খাতিরেই করা হইতেছে। আর যদিই বা কোন সম্পর্ক থাকে তাহা হইলে, সে সম্পর্ক অতি অবশ্যই ভারত বা পাকিস্থানের স্বার্থের প্রতিকূলে। জানিনা, ঐ বৈজ্ঞানিক বন্ধুর এই থিওরিটি ঠিক কতখানি বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে মোটামুটিভাবে এই মূলসূত্রটি ধরেই যে আজ রাজ-নৈতিক নেতাদের অনেক কিছু কাজ কারবারকেই ঠিক মত বুঝে নেয়া যায়, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

ক্ষমতা হাতে পেতেই মাথার যখন আর ঠিক থাকে না, কেবল ইচ্ছে হয় সবটা একাই খাব, যা ইচ্ছে তাই করব, আমার রুচিমত সাজাব, ভাব মত চালাব, যাকে যা ইচ্ছে হবে তাকে দিয়ে তাই করাব, ইত্যাদি এই ধরণের আরও অনেক কিছু।* তখন রাজনীতিকরা নানা রকমের কাজ কারবার আরম্ভ করে দেন, তাঁদের খেয়ালখুসী মতই। তবে যুগটা হচ্ছে কিনা গণতন্ত্রের, তাই সব

সময়েই একটা অজুহাতের ঠাট বজায় রাখতে হয়, কেন করা হচ্ছে বুঝাবার জন্য। আর শয়তানেরই যদি অজুহাতের অভাব না হয়, তাহলে রাজনৈতিকদেরই বা হবে কেন? সব কাজেরই একটা অজুহাত দেখান হয়। কিন্তু যখন জায়গা বিশেষে শত শয়তানের অজুহাতেও কুলোয় না, তখন তারা একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেন যেটি হচ্ছে কিনা 'বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে'। এই শব্দের ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েই তাঁরা তাঁদের কাজ হাসিল করবার তালে থাকেন।

এই 'বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে' ভারত এবং পাকিস্থানে বহু বহু কাজ কারবার হচ্ছে এবং নির্বিকারভাবেই যে হচ্ছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এসবের আলোচনা আর কখনই সম্ভব নয়। একবার আরম্ভ করলে শেষও করা যাবে না, তাই ও চেষ্টা আর করা হচ্ছে না। তবুও একটি 'বৃহত্তর স্বার্থের' কাজ যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণভাবেই হচ্ছে এবং দুদেশেই হচ্ছে ; এবং ঐ কর্মটি করতে গিয়েই দেশ দুটোর কর্মও প্রায় শেষ করে আনা হয়েছে তারই বিষয় বোধ করি কিছু না বললেও অন্যায় হবে। এই কর্মটি হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা নামে দুটি ভাষাকে ভারত এবং পাকিস্থানে একচেটে ভাবে চালাবার চেষ্টা। যার ফলে ভাষা-সাম্রাজ্যবাদের এক নূতন বিভীষিকা দুটো দেশেই আজ বেশ মূর্ত হয়ে উঠেছে, এবং দেশ দুটোকে অন্তর্বিপ্লবের ধ্বংস পথে বেশ দ্রুতগতিতেই এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

ভারত এবং পাকিস্থানের এই ভাষা-সাম্রাজ্যবাদের একটা মজার কথা এই যে, ভাষা দুটি অভিন্ন নয়, যদিও দুটো ভিন্ন নামে পরিচিত এবং ভিন্ন ভিন্ন হরফে লিখিত হয়। ভাষা দুটিই ভারতের উত্তর প্রদেশের ভাষা—হিন্দি আর উর্দু—যাদের দুটিকে মিলিয়ে আগে বলা হ'ত হিন্দুস্থানী ভাষা। আরও অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, ভারত আর পাকিস্থানের মধ্যে এত বিষয়ে এত খোঁচাখুঁচি বা মতের অমিল থাকলেও এই ভাষাটির ব্যাপারে দু'দলের নেতারাই প্রায় একদিল। অবশ্য দুদেশেরই সত্যিকারের ক্ষমতাবানেরা যে ভারতের ঐ একটি প্রদেশেরই লোক তাতেও কোন সন্দেহ নেই। আর সন্দেহ নেই যে হিন্দি আর উর্দু ভাষা দুটি, বা দুয়ে মিলে হিন্দুস্থানী ভাষাটি, ভাষা হিসাবে অতিমাত্রায় ভাসা ভাসা, কোন রকম পাত্তা পাবারই যোগ্যতা রাখে না। ঐ ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন বা অন্য কিছুই প্রায় নেই। মনের একটি বিশেষ ভাব বাদে, অন্য কোন ভাব প্রকাশ করবার মত যথেষ্ট শব্দসম্ভারেরও খুবই অভাব রয়েছে। তবুও রাষ্ট্রভাষা হিসাবে

একচেটে স্থান করে দিতেই হবে তাদের; ভারত এবং পাকিস্থানের 'বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরেই'।

'বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে' কথাটির যে কি মানে তা ঐ ক্ষমতাসীন রাষ্ট্র-নেতারাই জানেন, আর সে বৃহত্তর স্বার্থ যে উপায়ে সাধিত হবে, তাও তাঁদেরই বিচার্য। তাই ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরেই নাকি আজ আর ইংরেজী ভাষাকে রাখা চলে না। ইংরেজিকে হটিয়ে দিয়ে একটি ভারতীয় ভাষাকেই একচেটে স্থান করে দিতে হবে। সে ভাগ্যবান ভাষাটিকে খুঁজে বের করতে দেরীও হয়নি। ভারতের গঠনতন্ত্র মারফৎই করা হয়েছে, এবং আগেই বলেছি যে সেই ভাষাটি হচ্ছে হিন্দী। ভাষা হিসাবে যতই ভাসা ভাসা হোক না কেন, বিশেষ এক শ্রেণীর শব্দসম্ভারে হিন্দী শুধুমাত্র ভারতের কেন পৃথিবীর অন্য সব ভাষাদের মধ্যেও যে শীর্ষস্থানীয়, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। ঐ বিশেষ শব্দসম্ভারের জন্যই হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা করা হয়েছে তাও বলি না। তবে স্বাধীনোত্তর ভারতে যে সব কার্যকলাপ হচ্ছে এবং যেভাবে হচ্ছে তার অনেক কিছুকেই যে প্রকাশ করতে হলে হিন্দীর ঐ বিশেষ শব্দসম্ভারের সাহায্যেই করতে হয়, সে ত এই আলোচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে। অন্তত এই একটি ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃত্ব হিন্দীভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে গ্রহণ করে তাদের নিজেদের কার্যকলাপের সঠিক সমালোচনার যে সুযোগ দেশের লোককে দিয়েছেন, তা তাঁদের উদারতারই পরিচায়ক। আর তাঁদের কার্যকলাপের সঠিক বিশ্লেষণ করতে গিয়েই যে বহু অহিন্দিভাষীরাও আজ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভারতের রাষ্ট্রভাষার অন্তত ঐ বিশেষ শব্দসম্ভারগুলো আয়ত্তে এনে ফেলেছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

তবে তাঁদের এই উদারতার জের হিসাবেই হিন্দি ভাষাকে তাঁরা জোর করে চালাবার যে অনুদার কার্যকলাপ শুরু করেছেন, সেটাই আসল ভয়ের কথা। রাষ্ট্রভাষা হিন্দিকে চালু করতে গিয়ে তাঁরা যে ভারতের অন্য ভাষাগুলোকে ভাসিয়ে দেবারই চেষ্টা করছেন তাও আজ খুবই পরিষ্কার। অহিন্দীভাষীদের কাছে তাই হিন্দি ভাষাকে চালু করবার চেষ্টা আজ শুধু অন্যায় বা নীতিবিরুদ্ধ বলেই নয়, রীতিমত হিন্দীসাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা হিসাবেই দেখা দিয়েছে। আর সাম্রাজ্যবাদ চালাতে হলে যে সব বদামির সাহায্য নিতে হয়, হিন্দীসাম্রাজ্যবাদীরাও তার কোনটাকেই বাদ দিচ্ছেন না। (১৯৬০ সালে আসামে এবং ১৯৬১ সালে কাছারে তারা যা করেছে তার তুলনা সাম্রাজ্য-

বাদীদের ইতিহাসেও অনেক নেই)। হিন্দি ভাষার কোন গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, আজ ভারতে সবাইকে হিন্দি শিখতেই হবে, তা না হলে নাকি ভারতের একতা গড়ে উঠবে না, ভারত আবার ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ধ্বংস থেকে ভারতকে বাঁচাবার জন্যই আজ ভারতে অন্য সব ভাষার ধ্বংসের আয়োজন হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরী করতে হলে আজ সবাইকে হিন্দি শিখতে হবে, হিন্দি পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। এই সব নিয়ম-কানুনের ফলে অ-হিন্দিভাষীদের উপর যে অন্যায় করা হচ্ছে, সেকথা বলে আর বিশেষ লাভ নেই—ক্ষমতা প্রায় সবই হিন্দীভাষীদের দখলেই চলে গেছে। কেউ যদি এরকম প্রস্তাব করেন যে অ-হিন্দিভাষীরা হিন্দি পরীক্ষা দিতে অবশ্যই প্রস্তুত আছে, কিন্তু হিন্দীভাষীদেরও অন্য আর একটা ভারতীয় ভাষার পরীক্ষা দিতে হবে—দুপক্ষের সমান সুযোগ সৃষ্টি করবার জন্যই এবং ভারতের অন্যান্য ভাষাদের সম্মান রক্ষার্থেই—তাও কেউ শুনতে রাজী নয়। হিন্দী আজ ভারতের রাজভাষা এবং হিন্দীভাষীরা সবাই বাদসাজাতির লোক, তাই হিন্দিভাষীদের পক্ষে আর অ-হিন্দিভাষী মূর্খসাধারণের পর্যায়ে নেমে আসা কখনই সম্ভব নয়। অ-হিন্দি-ভাষীদেরই তাই শুধু হিন্দী শিখতে হবে; হিন্দীভাষীদের কিছুই শেখবার নেই, তাঁরা সব কিছুই শিখে বসে আছেন। এই ধরণের অতি-শিক্ষা এবং ন্যায়-নীতির মাধ্যমেই আজ ভারতের বিরাট মহান-নেতারা দেশকে একতাবদ্ধ করবার চেষ্টায় আছেন।

একতাবদ্ধ করতে হবে, ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে করতে হবে, এসব বড় বড় বুলি কপচিয়ে ভারতে এপর্যন্ত অনেক কিছুই করা সম্ভব হয়েছে বা এখনও করা হচ্ছে। কিন্তু এক ঐ বুলিবাজিতেই সব মাৎ হয়ে যাবে; সব কিছুই করা সম্ভব হবে, অতটা স্থিরনিশ্চয় না হলেই বোধহয় ভারতের বাদশাহরা বুদ্ধিমানের কাজ করতেন। ইতিমধ্যেই যেরকম সব ভাবগতিক দেখা যাচ্ছে তা মোটেই শুভ বলে মনে হয় না। অ-হিন্দিভাষী ভারতীয়রাও আজ হিন্দি শিখছে ঠিকই, বাধ্য হয়েই শিখছে; কারও প্রেমে পড়ে নয়। ঘৃণা করেই শিখতে বাধ্য হচ্ছে এবং ক্ষমতা হাতড়াবার জন্যই শিখছে। এই ঘৃণাই যে শেষ পর্যন্ত ভারতকে শেষ করবে না, তার গ্যারান্টি দেওয়া আজ আর মোটেই সম্ভব নয়। হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী লোভ এবং নির্লজ্জ ক্ষুধার বিরুদ্ধে অসন্তোষ এখনই যে আকারে দেখা দিয়েছে, তাতে মনে হয় না যে ভারতের হয়ে যাবার দিন খুব বেশী দূরে।

গঠনতন্ত্রে যেদিন ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলে হিন্দিকে গ্রহণ করা হয়েছিল সেদিন ভারতের সকল অ-হিন্দিভাষী গণপরিষদ সদস্যরাই তাতে সায় দিয়েছিলেন না। (প্রথম বারের ভোটে হিন্দির পক্ষে এবং বিপক্ষে সমান ভোটই হয়েছিল। পরে অবশ্য কোন কোন নেতার ব্যক্তিগত প্রতিপত্তির ফলে হিন্দির পক্ষে আরও একটি ভোট জুটিয়ে হিন্দিকে পাস করা সম্ভব হয়েছিল।) আজ যদি আবার হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা বলে গ্রহণ করবার জন্য ভোটাভুটির প্রয়োজন হয়, তাহলে হিন্দি যে আর মেজরিটি ভোটের ধোপে টিকবে না, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার মত কেউই নেই। আর অবস্থা যদি এইভাবেই এগোতে দেয়া হয়, হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত যদি এইভাবেই চলতে থাকে, তাহলে আগামী পাঁচ কিংবা দশ বৎসরের মধ্যেই যে হিন্দিকে লাথি মেরে রাষ্ট্রভাষার সম্মানিত পদ থেকে বিতাড়িত করা হবে, কিংবা ভারত হিন্দিভাষী আর অ-হিন্দিভাষী এলাকা হিসাবে ভাগ হয়ে যাবে, সে বিষয়ে বোধ হয় কোন ভুল নেই।

তবে এই ব্যাপারে সব চেয়ে মজার কথা হচ্ছে এই যে, যে অজুহাতটির সাহায্যে ভারতে হিন্দি ভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে, সেই অজুহাতটি যে কত খেলো, অবান্তর এবং দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত তাও আর বলে শেষ করা যায় না। কারণ ভারত একটি বহুভাষী দেশ। ভারতের ঐক্য যে বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে, এবং ঐটিই ভারতের বিশেষত্ব, তাও কোথাও অস্বীকার করা হয়নি। ভারতীয় গঠনতন্ত্রেই সেটা স্বীকার করা হয়েছে। স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে চৌদ্দটি প্রধান ভারতীয় ভাষাকে জাতীয় ভাষা বলে। তবে আবার হিন্দিকে চাপাবার এই অপপ্রয়াস কেন? অন্তঃপ্রাদেশিক ভাষার প্রয়োজন মেটাবার জন্যই কি হিন্দিকে চাপাতে হবে নাকি? অন্তঃপ্রাদেশিক, অফিসী কাজ কারবারের বা উচ্চ শিক্ষার ভাষা ইংরেজী ত রয়েছেই। ভারতীয় গঠনতন্ত্র মারফৎই আপাতত ইংরেজীকে রাখাও হয়েছে। ইংরেজী আজ শুধু ভারতের অন্তঃপ্রাদেশিক ভাষাই নয়, আন্তর্জাতিক ভাষাও বটে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা, জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাষা। শুধু তাই নয় ইংরেজী ভাষা ভারতীয় জনসাধারণের এক অংশের মাতৃভাষাও বটে। তাই ইংরেজীকে ভারতের আর একটি জাতীয় ভাষা বলে স্বীকৃতি দানে কোন অসুবিধাই থাকতে পারে না। কিন্তু তাও হবার নয়, হিন্দিকে চাপাতেই হবে। এইসব কারণেই ইংরেজীকে

হটিয়ে খিস্তিসর্বস্ব হিন্দি ভাষাকে ভারতের স্কন্ধে চাপাবার চেষ্টাকে যুক্তি দিয়ে বুঝান সম্ভব হবে না কোনদিনও।

ইংরেজীর উৎপত্তি অ-ভারতীয় এই অজুহাতেই যদি আজ ইংরেজীকে বরবাদ করতে হয়; তাহলে অতি-অচিরেই ভারতের য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজকেও বরবাদ করতে হবে, ঐ একই কারণে। তারপর ঐ যুক্তির জের টানতে হলে, বরবাদ করতে হবে আরও অনেককেই—অ-ভারতীয় উৎপত্তিসম্পন্ন উর্দু ভাষা এবং ভাষীদেরও ভারতে থাকা অসম্ভব হতে বাধ্য। আর ভারতীয় জাতীয়তা এবং একতার এই অহেতুক আগ্রহকে যদি এই ধরণের যুক্তির পথে আরও অগ্রসর হবার সুযোগ দেওয়া হয়, এবং যদি কর্মকর্তারা ভাষা ছেড়ে ধর্ম, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য বিষয়েরও উৎপত্তি সন্ধানে ব্যস্ত হন; তাহলে কি অবস্থা হবে? অ-ভারতীয় উৎপত্তিসম্পন্ন মুসলমান এবং খৃষ্টধর্মাবলম্বীদেরও কি ভারত ছাড়তে হবে নাকি? মোটকথা হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা যে সব অজুহাতে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ চালাতে চাচ্ছেন তার ভেতর কোনই যুক্তি নেই। সংকীর্ণ বর্জনপন্থী জাতীয়তাবাদ যা শতাধিক বৎসর পূর্বে পৃথিবীর কোন কোন অংশে উগ্র আকারে প্রকাশ পেয়েছিল, আজ ভারতে সেই ধরণের জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়েই হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। হিন্দিওয়ালারা যে ভারতের অনেক অংশের তুলনায় প্রায় শত বৎসর পেছনেই রয়েছেন সে বিষয়ে হয়ত কোন ভুল নেই। তবুও হিন্দিওয়ালাদের ঐ ন্যাকামির জাতীয়তাবাদের মধ্যেও যে সততার লেশমাত্রও নেই, সেটি আরও বড় সত্য। কারণ, তাঁদের ঐ উগ্র জাতীয়তাবাদী সম্মানবোধ, আজও ভারতকে বৃটিশ কমনওয়েলথ থেকে বের করে আনতে পারেনি। একান্ত বিপরীত অবস্থা বর্তমান থাকা সত্বেও ভারতে বৃটিশ পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসির অনুকরণ করতেও তাঁরা লজ্জাবোধ করেন না। আরও শত উপায়ে তাঁরা ইংরেজী সংস্কৃতির পদলেহন করছেন প্রতিনিয়তই। শুধু তাই নয়—ঐ বিলাতী কায়দা নকল করতে গিয়েই উৎকট বিদেশী সামাজিক ব্যবস্থা সমূহও প্রবর্তন করছেন তাঁরাই, আইন করে এই ভারতের মাটিতেই। এসবে তাঁদের কোন লজ্জা নেই, তাদের লজ্জা শুধুই ইংরেজী ভাষায়। আজ আণবিক বিজ্ঞানের যুগে তাদের আপত্তি শুধুই ঐ বিদেশী ভাষায়। নিশ্চয়ই ত! তা না হলে তাঁরা ভারতকে আবার রামরাজ্যে ফিরিয়ে নেবেন কি উপায়ে! ভারত যে ইতিমধ্যেই রামরাজ্যের পথে অনেকটাই এগিয়েছে তাতেও কোন ভুল নেই। • এইভাবেই

ভারতে রামভক্তদের সাম্রাজ্য পরিকল্পনা চলছে—চলছে অযোধ্যা এবং কিস্কিন্ধার পথেই !

ভারতের অতি-বুদ্ধিমান নেতারা অনেক রকম বোল-চালের সাহায্যেই ভারতের অনেক ভীষণ সমস্যাকে কলা দেখিয়েছেন, মানে সমস্যার ধারে কাছেও যাননি, স্রেফ পাশ কাটিয়েছেন। এই কারণেই হয়ত তাদের নিজেদের বুদ্ধিমত্তার উপর আস্থা এতটা বেড়ে গেছে যে, তাঁরা ঐ পন্থাতেই হিন্দিসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছেন। একটা জিনিষ শুধু তাঁরা বুঝতে ভুল করেছেন যে কিছু না করে নেতিবাচক পন্থায় শুধু বোলচালের সাহায্যে অনেক ধরণের নেতিবাচক বাহাদুরী অর্জন করা সম্ভব হলেও, বোলচালের ভরসার একটা কিছু করাটা ঠিক তত সহজ মোটেই নয়। আর যদি সে কাজটি জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়, তাহলে ত নয়ই। ভাষা জিনিষটি আবার এমন একটি জিনিস যার উপর আঘাত কেউই নির্বিবাদে হজম করবে না। আর যদি সেই ভাষা-গুলো আবার সমৃদ্ধশালী হয়, তাহলে ত কথাই নেই। ভারতের অনেকগুলো ভাষাই যে হিন্দির চেয়ে অনেকটাই বেশী সমৃদ্ধশালী তাতেও কোন সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রপতির পুরস্কার বিতরণ মারফৎ হিন্দি সাহিত্যিক আর কবিদের বছর বছর কতকগুলো প্রাইজ আর মেডেল গছিয়ে দিতে পারলেই হিন্দিভাষাটি যে ঐ ভাষী নেতাদেরই মত বিরাট, বিপুল, সুমহান হয়ে যাবে তারও নিশ্চয়ই কোন সম্ভাবনা নেই। তাই মনে হয় ভাষা নিয়ে অতটা বাড়াবাড়ি না করলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। **আসলে মাতৃভাষাই বড়, না মাতৃভুমিই বড় এ প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয়নি। মাতৃভুমি সত্যিই বড়, কিন্তু মাতৃভাষাও তার চেয়ে কিছু কম নয়। উপরন্তু মাতৃভাষা কথাটিতে যেমন স্থির নিশ্চয় একটি জিনিসকেই বুঝা যায় মাতৃভুমি কথাটিতে তা মোটেই নয়। দশ (চৌদ্দ) বৎসর পূর্বে ভারতীয়দের মাতৃভুমি বলতে যে ভুমিকে বুঝা যেত আজ আর তা বুঝে লাভ নেই। কিন্তু বাংলা বাঙ্গালীর মাতৃভাষা, তা সে পূর্ব বাংলায়ই হোক আর পশ্চিম বাংলাই হোক। মোটকথা মাতৃভাষা না মাতৃভুমি—কে যে বেশী বড় তার মীমাংসা আজও হয়নি।** চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। অনেক জায়গায় অনেকবারই ও চেষ্টা হয়েছে, রক্তের পথেই হয়েছে। হয়ত হিন্দির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহে আবারও হবে। তখন আবারও জানা যাবে কোনটি বড়। তবে সেদিন ভারতের কি অবস্থা হবে সেটাই হচ্ছে আরও বড় প্রশ্ন।

এইভাবেই ভারতের স্বাধীনতা আরও বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। কারও কারও স্বাধীনতা যে বাকী সকলের পরাধীনতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সহানুভূতির সঙ্গে সেটুকু বুঝবার প্রয়োজন কারুর আর নেই। ভারতীয় নেতারা অতি উর্ধ্বমার্গে বিচরণ করেন, তাই আশে-পাশের ঘটনাগুলো দেখে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবার মত সুস্থ মানসিক পরিবেশ তাঁদের আর নেই। তা না হলে পূর্ববাংলার ভাষা-বিদ্রোহটা অবশ্যই তাঁদের চোখে লাগত। তাঁরা বুঝতে পারতেন যে আইন করে একটা অপদার্থ ভাষাকে দেশের উপর চাপাতে গেলে শেষ পর্যন্ত কেউই সেটা বরদাস্ত করবে না।

এ ব্যাপারটাকে যে বরদাস্ত করা হবেনা তাও ইতিমধ্যেই অতি প্রকাশ্য-ভাবেই প্রকাশ পেয়ে গেছে। মাত্র কয়েকদিন আগে ('৫৭' ডিসেম্বরের মাঝা-মাঝি) রাজাজীর নেতৃত্বে দক্ষিণভারতীয় নেতারা প্রায় আর কি চরম পত্র দিয়েই জানিয়ে দিয়েছেন যে, ওসব ন্যাকামি চলবে না। বাংলার জ্ঞানী-গুণীদের নেতৃত্বে পূর্বভারতীয় চিন্তাশীল গোষ্ঠীও ঐ একই ধরণের প্রতিবাদ জানিয়ে দিয়েছেন; এবং দুজায়গাতেই ঐ হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধ করে কর্মপন্থা গ্রহণের ব্যবস্থাও হয়েছে। তবে শ্রীজহরলালও চুপ করে বসে নেই। তিনিও ইতিমধ্যেই তাঁর কথা বলে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন "যত সব nonsense"। অতি স্বাভাবিক কারণেই শ্রীজহরলালের শালীনতা বোধ যে ক্রমশই শূন্যমাত্রায় নেমে আস্‌ছে তা ত তাঁর কার্যকলাপে এবং কথাবার্তায় প্রতিদিনই আরও ভালভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে। তাই তিনি সব কিছুকেই 'nonsense' বলে শেষ করে দিতে চাচ্ছেন। এসব প্রতিবাদ যে শুধুই 'nonsense' তাতে কোনই সন্দেহ নেই, এবং যত কিছু sense, তার সবটুকুই যে শ্রীজহরলালের ট্যাকস্থ হয়ে বসে আছেন, তাতেও কোন সন্দেহ করা চলতে পারে না, কারণ আজ তিনিই হচ্ছেন বাদশা, দুনিয়ার মালিক। কিন্তু এই 'nonsense' এর সাথে বেফাঁসভাবে তিনি যে একটু sense এর কথা বলে ফেলেছেন সেইটিই হচ্ছে আসল এবং তত্ত্বকথা—বেফাঁস তত্ত্বকথা। তিনি বলেছেন "সাহিত্যের যাই হোক-না-কেন ভারতের একতার জন্য হিন্দি চাই"। ভারতের একতার জন্য আজ আর সাহিত্যের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধুই হিন্দির। হিন্দি আর সাহিত্য যে একসাথে চলেনা তা ত দেখে দেখেই শেখা গেছে। আর সাহিত্য থাকলে যে জহরলালদের থাকা কঠিন হয়, তাও না বুঝবার মত নয়; তাই আজ ভারতে সাহিত্যের প্রয়োজন নেই,

প্রয়োজন শুধুই হিন্দির। তবে হিন্দিকে এবার সম্মুখসমরে জয়ী হয়েই টিকতে হবে, এইটুকুই যা আশার কথা।

হিন্দি ভাষা একটি ভাসা-ভাসা ভাষা হলেও ভারতে হিন্দিসাম্রাজ্যবাদ আর ঠিক ভাসা-ভাসা অবস্থায় নেই, (ভারতের সভাপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ পর্যন্ত এই ভাষা সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে কিভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন, তাও 'যুগান্তরের' নেপথ্যদর্শনে একখানি গোপন চিঠি প্রকাশ মারফৎ প্রকাশ হয়ে গেছে)। ভাষা সাম্রাজ্যবাদ আজ ভারতের মাটিতে মূল ভালভাবেই বসিয়েছে, এবং তার ফলে প্রাদেশিকতাও বেড়ে যাচ্ছে দিন দিনই। প্রাদেশিকতা বেড়ে যাচ্ছে কথাটা বলাও বোধ হয় ঠিক নয়, প্রাদেশিকতাকে বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে ঐ সব কারণেই। বিভিন্ন প্রদেশ এবং ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে যদি মারামারি না থাকে তাহলে হিন্দিসাম্রাজ্যবাদ চালান কখনই সম্ভব হবে না, এই জন্যেই। এই জন্যই আজ বাঙ্গালী-বিহারী, বিহারী-উড়িয়া, আসামী-বাঙ্গালী বা মারাঠি-গুজরাটি গণ্ডগোলগুলো মিটিয়ে ফেলতে সাহায্য না করে আরও বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে, অতি প্রকাশ্যভাবেই। এর ফল যে শেষ পর্যন্ত কি হতে পারে তা বলা কঠিন নয়, সাধারণের তা বুঝতে কষ্টও হয় না। তবে কিনা যাঁরা অসাধারণ তাঁদের কথাই আলাদা: ভারতের 'বৃহত্তর স্বার্থের' খাতিরেই তাঁরা সব কিছু করছেন, এটাও বা বাদ দেবেন কেন! আগুন নিয়ে খেলা আর কাকে বলে, জানি না!

ভারতের এই ভাষাসাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্ব, সময় এবং সুযোগমত যে এক একটা ভাষাগোষ্ঠীকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টাও না করছেন, তাও নয়। বাংলা-বিহার মার্জার প্ল্যান ত তারাই এঁটেছিলেন,—এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনেই। শেষপর্যন্ত নেহাৎ সাহসে কুলালো না, তাই আপাতত এ যাত্রা বাংলা রক্ষা পেয়ে গেল। তবে তাই বলেই তাঁদের প্ল্যান যে একেবারেই ভেস্তে গেছে তাও নয়। বাংলাকে রাজ্যপুনর্গঠন ব্যাপারে ঠকাতে অনেকটাই সাহায্য করেছে। এসব ব্যাপারে চক্ষুলজ্জার ধার তাঁরা ধারেন না। আর বড় বড় ন্যায়নীতির কথা ত ওঠেই না কারণ এ সবই হচ্ছে ঐ ভারতের 'বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে'। হঠাৎ করে বাংলা-বিহার মার্জার প্ল্যান নেয়া হয়েছিল, বোধ হয় সেইজন্যই ওটা সফল হওয়া কঠিন হোল। ধীরে সুস্থে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্ল্যানটির কাজ করা হলে কি অবস্থা হ'ত বলা কঠিন। এই ধীরে সুস্থে এগোবার প্ল্যানও যে হচ্ছেনা তাও নয় এবং তার ফলে, বাংলা না হোক,

অন্য কোন ভাষা যে অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না, তাও বলা কঠিন।

আসামে এই প্ল্যানটির কাজ এমন ধীরে সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় করা হচ্ছে যে ব্যাপারটা বুঝাই কঠিন। এত কঠিন যে, খাস আসামেও মাত্র দু'একজনের বেশী কারও মাথায় ওটি ঢোকেই নি। তাই তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কথা এখনও উঠতেই পারে না। মোটামুটি ব্যাপারটা হচ্ছে যে আসাম একটি উপজাতি-প্রধান প্রদেশ, অনেকগুলো ভাষাগোষ্ঠির লোক সেখানে বাস করে। আগাততঃ যাঁরা আসামের নেতৃস্থানীয় এবং সরকার দখল করে বসে আছেন, তাঁদের ভাষা আসামী, তাই তাঁরা সেই ভাষাটিকেই সেখানের প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে চালাবার চেষ্টায় আছেন। জনসাধারণের মধ্যে ঐ ভাষা প্রচারের ব্যাপারে তাঁরা কতটা সফল হয়েছেন জানিনা, কিন্তু আইন সভায় যে তাঁরা এ পর্যন্ত ঐ ভাষাটিকে প্রদেশের ভাষা হিসাবে চালাবার চেষ্টায় সফল হননি, সেটা ত জানা কথা (১৯৬০ সালে জুলাই মাসে এক মহা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে বাঙ্গালীদের উৎখাৎ এবং কোণঠেসা করবার পর অসমীয়াকে আসামের রাজ্যভাষা করে আইন পাশ হয়েছে)। আসামে আসামীভাষীদের সংখ্যার চেয়ে বাঙ্গালা-ভাষীদের সংখ্যা কিছু কম নয়, বরং হয়ত কিছু বেশীই হতে পারে,—আর আসামী ভাষা বাংলা ভাষা থেকে বিশেষ তফাৎও কিছু নয়, প্রায় একই বলা চলে। অথচ বাঙ্গালীদের সাথেই আসামীদের সম্পর্কটা সবচেয়ে বেশী তিক্ত। স্বার্থের সংঘাত যখন রয়েছে তখন আসামী বাঙ্গালী সম্পর্ক তিক্ত হওয়াটা খুব যে অস্বাভাবিক তাও বলা চলেনা। কিন্তু ঐ আসামী বাঙ্গালী তিক্ত সম্পর্কের সুযোগে আসাম থেকে যে বাংলা, এমন কি আসামী ভাষাকেও বিদায় অভিনন্দনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, সেটা অনেকেই বুঝেও বুঝেন না। (গোবিন্দবল্লভ পন্থ ফর্মুলা পাবার পর কিছু কিছু অসমীয়াও যে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি তাও নয়, তবুও বাঙ্গালীদের সাথে মারামারি বন্ধ করা সম্ভব আজও হয় নি। সম্ভব একদিন অবশ্যই হবে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে সেদিনটা একটু বেশী দেরীতে না হয়!)

আসামের উপজাতি এলাকায় শিক্ষা-ব্যবস্থা বলতে গেলে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ইউরোপীয় মিশনারীদের হস্তগত। উপজাতিরা ঐ মিশনারীদের নেতৃত্বেই এগিয়ে চলেছে; আর মিশনারীদের নেতৃত্বে যে আসামী নেতৃত্বের অনুকূলেই কাজ করছে না, তাও অজানা নয়। ঐ মিশনারীদের বিষয় কিছু খবর যাঁরা

রাখেন তাঁরাই জানেন যে বর্তমানে ইউরোপীয় বা আমেরিকান মিশনারীদের কাজ করবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে প্রধানত একটি মাত্র সর্তে, যেটি হচ্ছে কিনা, হিন্দির মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে উপজাতিদের সব হিন্দিভাষী তৈরী করে দিতে হবে; হচ্ছেও তাই। উপজাতিদের গর্ব করবার মত নিজস্ব ভাষা কিছুই নেই। আগামী দশ কিংবা পনের বৎসর যদি ঐ উপজাতিদের মধ্যে হিন্দির মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু থাকে, তবে অবশ্যই হিন্দি বেশ ভালভাবেই তাদের মধ্যে চালু হবে। তারপর হিন্দিই যখন ভারতের রাষ্ট্রভাষা, তখন উপজাতিরা অতি অবশ্যই আসামী ভাষাকে বিশেষ কোন সম্মান দেখাবার প্রয়োজন মনে করবে না; এবং এক শুভদিনে তাদের এবং চা বাগানের হিন্দুস্থানী কুলিদের মিলিত মেজরিটি ভোটের জোরে আসামের রাজ্য ভাষা হিসাবে হিন্দীকেই স্বীকার করে নিয়ে আইন পাশ করবে। তখন আসামের কলহপরায়ণ আসামী আর বাঙ্গালী বন্ধুদের ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ভিন্ন আর যে কি উপায় থাকবে তা বলা কঠিন।

একজন বিশিষ্ট অসমীয়া বন্ধুর সাথে আলাপ করেই প্রথমে এই ধারণাটি আমার মাথায় ঢুকেছিল। আসাম যে ঠিক হিন্দুস্থানী কুলিসহ উপজাতি মেজরিটি এখনও নয়, সে প্রশ্নের উত্তরও তিনিই দিয়েছেন;—"বাঙ্গালী এলাকাগুলি বা আরও কিছু বেশী বাংলায় ঢুকিয়ে দিলে বা অন্য একটি প্রদেশ হিসাবে গঠন করলেই আসামকে হিন্দুস্থানী কুলিসহ উপজাতি মেজরিটি তৈরী করতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। তবে আপাতত আসামী-বাঙ্গালী খোঁচাখুঁচি ঠিক ঠিক রাখবার জন্য ওগুলো আসামে রাখতেই হবে।" পরে আরও দু'একজন বন্ধুর কাছ থেকেও ধারণাটির সমর্থন পেয়েছি, তাই উল্লেখ না করে পারলাম না। এই কারণেই আসামী-বাঙ্গালী কলহ মেটাবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। নেই এই জন্যই যে ভারতে হিন্দি-সাম্রাজ্যবাদ বেশ গেড়ে বসেছে এবং সেই স্বার্থের খাতিরেই অ-হিন্দি-ভাষীদের মধ্যে নানারকমের স্বার্থের সংঘাত জিইয়ে রাখতেই হবে। এইভাবেই ভারতের স্বাধীনতা আর হিন্দি-সাম্রাজ্যবাদ বেশ তাল রেখেই এগিয়ে চলেছে, চলতে থাকবেও; যতদিন পর্যন্ত না তাল কেটে ভারত আবার বেতালে পড়ে খাবি খায়।

এই হিন্দি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ক্ষমতা হাতে থাকবার সুযোগ নিয়ে ভারতের হিন্দি-সাম্রাজ্যবাদী নেতারা, কতকগুলো হিন্দি সংস্কৃতি এবং বেশ-ভূষাকেও ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি বা বেশভূষা বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টায়

আছেন। সরকারী ক্ষমতার দাপটে কিছু কিছু ইতিমধ্যেই বেশ চালু করে ফেলেছেনও। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল যাত্রাদলের মন্ত্রীদের মত যে পোষাকটি পরেন, সেটিই হচ্ছে আজ ভারতের অফিসিয়াল জাতীয় পোষাক। কি কারণে বা কি উপায়ে যে ঐ অদ্ভুত ধরণের পোষাকটি ভারতের জাতীয় পোষাক বলে চালু করা হল, তা আজও কেউ জানেনা; তবুও সরকারীভাবে স্বীকৃত জাতীয় পোষাক ঐটিই। ঐ পোষাকটি যে আদৌ ভারতীয় পোষাক নয়, বা অতি নগণ্য সংখ্যক ভারতীয়দের মধ্যেই ওটি এখনও সীমাবদ্ধ রয়েছে, সে প্রশ্ন তুলেও লাভ নেই,—স্বয়ং জহরলালের যখন ওটি পোষাক এবং জহরলালই যখন ভারত, তখন জ্যামিতির সংজ্ঞা অনুযায়ীই ঐটিই হচ্ছে ভারতের জাতীয় পোষাক। হিন্দি ভাষার কোন গুণ না থাকা সত্ত্বেও ভারতে হিন্দিকেই জাতীয় ভাষা বলে চালান হয়েছে এই অজুহাতে যে, হিন্দি ভাষাটি ভারতে বহুলপ্রচলিত ভাষা—মেজরিটির না হলেও একটি বড় অংশের ত বটেই। জহরলালের ঐ পোষাকটির ব্যাপারে আর বহুলপ্রচলিত অজুহাতটির প্রয়োজন নেই। ওটি শ্রীজহরলাল একলা ব্যবহার করেন তাতেই যথেষ্ট। জহরলাল একাই একশো বা একাই যথেষ্ট, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। আর সন্দেহ নেই যে তাঁর একার কার্যকলাপই ভারতকে ধ্বংস করবার পক্ষেও যথেষ্ট।

এই ভাষাসাম্রাজ্যবাদের রসিকতা বেশ সরস-ভাবেই পাকিস্থানেও আরম্ভ করা হয়েছিল, এবং কিছুটা যে এখনও চলছে না, তাও নয়। পাকিস্থান সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গেই, অন্য সব বৃহৎ বৃহৎ সমস্যাকে দূরে সরিয়ে রেখে পাকিস্থানে ভাষা সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল সবচেয়ে প্রথমে। সারা পাকিস্থানে এক উর্দু ভাষা চালু করতে না পারলে নাকি পাকিস্থানের ঐক্য গড়ে উঠবে না, ফলে পাকিস্থান ধ্বংস হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। তাই পাকিস্থানের 'বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরেই' উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে একচেটেভাবে চালাবার বিরাট প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ভারতেরই মত বেশ বৈজ্ঞানিক পন্থায়ই অন্য সব ভাষাদের কোণঠেসা করে উর্দুকে কায়েম করবার কাজ এগিয়েও যাচ্ছিল বেশ দ্রুত গতিতেই।

তবে পূর্ববাংলার বাঙ্গালরা যে রগচটা গোঁয়ারের জাত তাতে আর সন্দেহ কি! রসিকতাটুকু তারা ঠিক বুঝতে না পেরে আরম্ভতেই এক লাথি হেঁকে বসল, যার ফলে পাকিস্থানের উর্দুওয়ালা মিয়ারা বেশ একটু থমকে দাঁড়িয়েছেন।

এবং শেষপর্যন্ত বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু পাকিস্থানের সব ক্ষমতা এখনও ঐ উর্দুওয়ালাদের হাতেই, তাই খেলা এখনও শেষ হয়নি। সোজাপথ ছেড়ে ঘোরাপথ ধরেছে,—পূর্ববাংলায় উর্দু চালাবার চেষ্টা এখনও বিপুলভাবেই হচ্ছে, অথচ পশ্চিম পাকিস্থানে বাংলা শেখাবার কোন চেষ্টা হয়েছে বলে এখনও জানি না। তবে যত কায়দা করেই আবার চেষ্টা হোক না কেন উর্দুকে আর একচেটে করে চালান যে কখনই সম্ভব হবে না, তা খুবই পরিষ্কার। তাই মনে হয় ভাষা সমস্যা বা ভাষা সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা আজ আর পাকিস্থানে খুব বেশী ভয়ের কারণ হবার সুযোগ পাবে না। উর্দু সাম্রাজ্যবাদ যে সুযোগ পেয়েছিল, তা বাঙ্গালদের গোঁয়ার্তুমির সম্মুখে বেশীদূর এগোতে পারেনি। গোঁয়ারদের কাছে যে 'বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে'-ওয়ালারাও কাবু থাকেন তা প্রমাণ হয়ে গেছে। আর ভারতের অহিন্দি-ভাষীরাও যে এর থেকে কিছু জ্ঞানলাভ করেন নি তাও নয়। তাই ভাষা-সাম্রাজ্যবাদের ভয় আজ ভারতেরই আসল ভয়।

শেষ ভাগ

মোট ফল

এই ত হচ্ছে ভারত এবং পাকিস্থানের গত দশ বৎসরের ইতিহাস। গত দশ বৎসরে দেশে কি কাজ হয়েছে, সাধারণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কতখানি পূরণ হয়েছে, শিক্ষায় সংস্কৃতিতে দেশ কতখানি এগিয়েছে, মনুষ্যত্বের ঐশ্বর্যই বা কতখানি বেড়েছে, ভাত-কাপড়ের সমস্যাই বা কতখানি মিটেছে, নেতারা কতখানি বা কি ধরণের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তারই ইতিহাস। ডিটেল না হোক মোটামুটি ত বটেই। এই ইতিহাসকে দেখবার চেষ্টা হয়েছে সত্যিকারের পথেই,—মানে খালি চোখেই। রঙ্গিন চশমা পরে নয় বা ভাবাবেগেও নয়। সমঝদার যাঁরা, তাঁরা এ থেকেই তাঁদের মতামত ঠিক করে নিতে পারবেন, বুঝে নিতে পারবেন যে, দেশে কাজ আর ইয়াকি কি অনুপাতে হচ্ছে; কোন্‌টা বেশী হচ্ছে, তাও। তবুও মোটামুটিভাবে ভারত আর পাকিস্থান এই দশ (চৌদ্দ) বৎসরে কতটা উন্নতি করেছে বা অধোন্নতির পথে এগিয়ে গেছে এবং কেন, সে বিষয়ে আরও একটু আলোচনা করেই শেষ করব।

আগেই বলেছি যে, স্বাধীনতা জিনিসটি ঠিক কি বস্তু সে বিষয়ে ভারত বা পাকিস্থানে আমাদের কারুরই কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। ধারণা ছিল না ও বস্তু দিয়ে সত্যি সত্যি আমরা কি কাজ করতে পারি বা ওটি আমাদের কি কাজে লাগে। ফলে বিদ্যা বুদ্ধি, চিন্তাধারার প্রভেদে আমরা অনেকে স্বাধীনতার অনেক রকম মানে বুঝে নিয়েছিলাম। আর শেষ পর্যন্ত যে আমাদের সকলের ধারণাই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে তাতেও সন্দেহ নেই। শুধুমাত্র আমাদের শাসনকর্তাদের ধারণা—ইংরেজ চলে গিয়ে তাদের হাতে ক্ষমতা এলেই স্বাধীনতা হল—এটাই হচ্ছে সত্যিকারের স্বাধীনতার ধারণা, তাও ভালভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। গত দশ বৎসরের স্বাধীনতার ইতিহাস আলোচনা করে যদি কিছু প্রমাণিত হয়ে থাকে তাহলে শুধুই প্রমাণিত হয়েছে যে, ইংরেজ চলে যাওয়ায় আমাদের শাসনকর্তারা স্বাধীন হয়েছেন। ফলে তাঁরা নানা ধরণের কাজ কারবার অতি স্বাধীন ভাবেই করে চলেছেন।

কিন্তু কেন এমন হল, একমাত্র শাসনকর্তাদের ধারণা ছাড়া আর কারুর

ধারণার সাথেই ভারত বা পাকিস্থানের স্বাধীনতার কোন মিল নাই কেন? এ প্রশ্নের আজ আর কোন উত্তর নেই; কিংবা হয়ত খুবই সোজা উত্তর। আমাদের নেতারা যে আমাদের চেয়ে অনেকটাই বেশী বুদ্ধিমান ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; তার প্রমাণও দরকার হয় না। আর ক্ষমতা হাতে পেতেই তাঁরা যে আরও অনেকটাই বেশী চালাক হয়ে গেছেন, সে বিষয়েও সন্দেহ তুলে কোন লাভ হবে না; কারণ ক্ষমতা হাতে পেলে চালাকি খাটাবার যত সুযোগ হয়, তা আর কখনই নয়। তাই স্বাভাবিক উপায়েই আমাদের নেতাদের ধারণাটাই সফল হয়েছে, আর আমরা শুধুই বোকা বনেছি। সেই জন্যই আবারও প্রশ্ন জাগে যে আমাদের বোকা বানানোর মধ্যেই কি নেতাদের স্বাধীনতার সব সফলতা নাকি? না, তাও ঠিক নয়। দেশের লোককে বোকা তৈরী করবার প্রয়োজন শুধুই, যাতে কেউ কোন প্রশ্ন করতে না পারে। স্বাধীনতা দান ত নেতারা করছেনই বা করবেনই, তাঁদের সুযোগ সুবিধা আর রুচি মর্জিমত। কেউ যেন তাঁর নিজের রুচিমত বা তাড়াতাড়ি মত কিছু স্বাধীনতা চেয়ে হাঙ্গামা না বাধায়, তাই তাদের বোকা বানাবার প্রয়োজন। স্বাধীন ভারত এবং পাকিস্থানে আজ এই বোকা বানানোর খেলাই চলেছে।

আর শুধু আমাদের নেতারাই বেশী চালাক তাও নয়, আমরাও যে অতি অপদার্থ, মনুষ্যত্বের শেষ সীমা ছাড়িয়ে আরও অনেক নীচে নেমে গেছি, সে কথাটাও ভুললে চলবে না। যদি আমাদের মনুষ্যত্ব কিছুমাত্রও থাকৃত, যদি আমাদের বিদ্যেবুদ্ধি একেবারে নিরেট না হ'ত, তাহলে এ ধরণের খেলা যে খুব জমত না, সেও খুবই সত্যি কথা। স্বাধীনতার কাজ যে হচ্ছে না সেকথা কখনই বলা চলে না। কাজ হচ্ছে, অনেক বড় বড় কাজও হচ্ছে; ভারতে ত বটেই, পাকিস্থানেও হচ্ছে। আমি নিজেই দেখেছি; এবং দেখেছি যে কাজগুলো সেখানে ঠিক ততখানিই ভালভাবে হচ্ছে, যে জায়গার অধিবাসীরা যতখানি বিদ্যাবুদ্ধি এবং মনুষ্যত্বের অধিকারী। দক্ষিণ ভারত সাধারণত উত্তর ভারতের চেয়ে বেশী অগ্রসর, সেদিকের কাজগুলোও তাই অনেকটা ভালভাবেই হচ্ছে। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অগ্রসর, সেখানের কাজও হচ্ছে সবচেয়ে ভালভাবেই। পশ্চিম বাংলা উত্তর ভারতের অন্য সকলের চেয়ে অগ্রসর, পশ্চিম বাংলার কাজও তাই অন্য সব উত্তর ভারতীয় প্রদেশের চেয়ে অনেক ভালভাবেই হচ্ছে। পাকিস্থানের জনগণ যতখানি অগ্রসর, পাকিস্থানের কাজগুলোও হচ্ছে সেই অনুপাতেই। মোটকথা, ব্যাপারটি ঠিকমত বুঝতে

গেলে, আমাদের সব চেয়ে আগে বুঝতে হবে আমাদের নিজেদেরই; বুঝতে হবে আমরা মনুষ্যত্বের কোন্ পর্যায়ে। ঐ জিনিসটিকে বাদ দিয়ে কিছুই বুঝা যাবে না।

ক্ষমতা হাতে পেয়ে বেশী চালাক হবার পর যাঁরা আমাদের কলা দেখাচ্ছেন, তাঁরা ত আমাদেরই নেতা; তাই আমাদের পর্যায়ের মনুষ্যত্বের অধিকারী ভিন্ন অন্য কিছুই নন। তাই তাঁদের পক্ষে ঐ কলা দেখানটাই স্বাভাবিক। আর দুটো দেশের চল্লিশ পঞ্চাশ কোটি লোক যদি তাঁদের কার্যকলাপ দেখে কিছুই বুঝতে না পারে, কিংবা যদি বুঝেও অন্তত একজনও বাধা দেবার জন্য সাহস নিয়ে এগিয়ে না আসে, তবে তাদের কলা দেখাবার অধিকারকে তাদের জন্মগত অধিকার বলে মেনে নেওয়াই ভাল। ভারত এবং পাকিস্থানে আজ এই বোকা বানানোর খেলাই চলছে। কাজে যা হচ্ছে তা ঐ নেতাদের সুযোগ-সুবিধা, খেয়াল-খুশী বা রুচি এবং মর্জিমতই। কাজের সঙ্গে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন সম্পর্ক নেই—নেতাদের রুচি মর্জিই হচ্ছে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্ট্যাণ্ডার্ড।

ফলে আজ দশ (চৌদ্দ) বৎসর স্বাধীনতার অধীনে বাস করবার পরও জনগণ যে তিমিরে সেই তিমিরে। পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, রোগে ঔষধ নেই, শিক্ষার সুব্যবস্থা নেই এবং আরও অনেক কিছুই আজও তাদের নেই। তবে এই যে নেই বলছি, তা শুধুই প্রত্যক্ষ করার ভিত্তিতেই। নেতাদের জিজ্ঞেস করলে তক্ষুনি জান্‌তে পারবেন, এসবই অতি মিথ্যে কথা। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা সংখ্যাতত্ত্বের দ্বারা জানিয়ে দেবেন গত দশ বৎসরে দেশে পয়েণ্ট কতভাগ ধান বেশী উৎপন্ন হয়েছে, কত পয়েণ্ট কাপড়, কত ঔষধপত্র এবং কত স্কুলের দালান হয়েছে। আর এজন্য ব্যয়ই বা হয়েছে কত শত কোটি টাকা। তবুও সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থেকেই যা হয় কিছু বলতে হবে, কারণ সাক্ষাৎভাবেই দেশের জনসাধারণ দুর্দশায় তলিয়ে যাচ্ছে, এবং রাস্তা ঘাটে পড়ে মারাও যাচ্ছে। (ঠিকমত খবর রাখলে আজকাল যেকোন দিনই যে কলকাতার রাস্তায় একাধিক মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যেতে পারে তা বোধ হয় কোন 'ক্যালকেসিয়ানের' পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়।)

বেকারীর সংখ্যা যে গত দশ বছরে কি পরিমাণ বেড়েছে, তার সঠিক হিসাব রাখবার কোন ব্যবস্থা ভারত বা পাকিস্থানে নেই; তবে একটা চাকরি খালির বিজ্ঞাপন কাগজে বের হলে দরখাস্তকারীর সংখ্যা যে পরিমাণ

দেখা যায়, তা শুধুই অভূতপূর্ব নয়, ভয়াবহও বটে। প্রতিকার কিছুই নেই, চেষ্টাও নেই। ধীরে সুস্থে একদিন যখন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে সেদিন অবশ্যই বেকারীর সমস্যাও থাকবেনা। আজ তাই সেই ভরসায়ই বসে থাকা ভিন্ন অন্য উপায়ও নেই।

ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন দিন যে হারে বেড়ে যাচ্ছে, সে আরও ভয়াবহ। আর দশ বৎসর এই হারে বাড়তে থাকলে যে দেশটা ভিক্ষুকের দেশেই পরিণত হবে, তাতেও সন্দেহ করবার বিশেষ কিছুই নেই। শুধু উদ্বাস্তুদের জন্যই যে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাও মোটেই নয়। ভিক্ষুকদের মক্কা কলিকাতা মহানগরীর দিকে তাকালেই দেখা যায় যে, বিহার উড়িষ্যা বা অন্ধ্র এলাকা থেকে আগত ভিক্ষুকদের সংখ্যাও আগের চেয়ে অনেক অনেক বেড়েছে। কলকাতার অনেক রাস্তা ত আজ ভিক্ষুক কলোনীতেই পরিণত হয়েছে। অথচ আজ কলকাতা শহরের রাস্তা থেকে ভিক্ষুকদের সরিয়ে রাখবার জন্য বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক বিরাট প্রচেষ্টাও চলেছে।

ভিক্ষুকদের শ্রেণী-বিভাগ করে দেখা গেলে নূতন নূতন যে জিনিসগুলি আজ চোখে পড়ে, তা আরও ভীষণ সাংঘাতিক। যে সব শ্রেণীর লোকেরা আগে কখনই ভিক্ষা করে জীবনধারণ করত না বর্তমানে তারাও ঐ লাইন ধরতে বাধ্য হয়েছে। বাঙ্গালী ভিক্ষুকদের সংখ্যা যে আজ পূর্বের চেয়ে অনেকটাই বেড়ে গেছে সেটা যে কেউই দেখতে পাচ্ছে। আর পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তরাই যে বাঙ্গালীদের এই অপমানকর অবস্থার প্রধান কারণ, তা আরও সত্যি। কিন্তু অনেক বাঙ্গালী মধ্যবিত্তেরও যে আজ ঐ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারাই বেঁচে থাকতে হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এবং স্বাধীনতার সফলতার নমুনা। বাঙ্গালী মধ্যবিত্তদের যে একটা 'সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স' ছিল, তা আজ শেষ হয়ে গেছে, ভারতের স্বাধীনতার সফলতা প্রমাণ করবার জন্যই,—সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশে।

আমার মত উল্টো দিক থেকে যাঁদের চিন্তা করার অভ্যাস, তাঁরা অনেকেই বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাবার অন্তত একটা সুফল আশা করেছিলেন। ভেবেছিলেন যে ঘরকুনো বাঙ্গালী ঘর ছেড়ে বের হতে বাধ্য হলে একটা সুফল অবশ্যই হবে যে, তারা বিভিন্ন শ্রমকার্যে খেটে খেতে শিখবে। তাতে তাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা আলস্যপরায়ণতা দূর হবে। আজ বাঙ্গালী যে অনেক নূতন নূতন কাজে হাত দিয়েছে, অনেক নূতন পরিবেশের মধ্যে নিজেদের

তৈরী করে নিতে বাধ্য হয়েছে, তাও অবশ্যই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কাজের অভাবে বা সুযোগের অভাবে যে তারা আরও অনেক বেশী পরিমাণে ভিক্ষুকে পরিণত হচ্ছে, সেটা আরও বড় সত্যি কথা। স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালীদের ভিক্ষাবৃত্তিতে বিহারীদের সঙ্গে কমপিট করতে হবে, এটা নিশ্চয়ই কারও স্বাধীনতার কল্পনায় ছিল না। কিন্তু বিনা কল্পনাতেই আজ যা মূর্ত হয়ে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি, তা ঐ ভিক্ষাবৃত্তিতে কমপিটিশন ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

তবে স্বাধীনতার দাপটে যে অলস বাঙ্গালী বা উদ্বাস্তু বাঙ্গালীকেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছে, তাও নয়। কর্মী জাতি হিসাবে বিশেষ এরিস্টোক্রাট— যাদের কেউ কখনও ভিক্ষে করে খেতে দেখেনি, সেই সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডাদেরও আজ অনেক জায়গায় ভিক্ষে করে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। মাত্র কয়েকদিন আগে (ডিসেম্বর ১৯৫৬) পশ্চিম দিনাজপুরে বালুরঘাটে গিয়েছিলাম। বালুরঘাট যে পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে বাড়তি ধান্য এলাকা হিসাবে বিশেষ খ্যাত তা নিশ্চয় অনেকেরই অজানা নয়; অথচ সেখানে ভিক্ষুকের সংখ্যা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। গত বৎসর (১৯৫৫) বিরাট দুর্ভিক্ষের সময়ও পূর্ববাংলায় অত ভিক্ষুক দেখেছি বলে মনে হয় না। ব্যাপার কি, কিছুই বুঝতে না পেরে বয়োবৃদ্ধ একজনকে জিজ্ঞেস করতে তিনি দুঃখ করে বললেন, "দেশের কি আর কিছু আছে, শেষ করে এনেছে! ভিক্ষুকদের অর্ধেকই প্রায় উদ্বাস্তু; কিন্তু যে সাঁওতালদের জীবনে কখনও ভিক্ষা করতে দেখিনি, আজ তারাও ভিক্ষায় নেমেছে। সাঁওতালদের সংখ্যাও শতকরা পনের কুড়ি ভাগের কম হবে না।" দেখলামও তাই, বহু সাঁওতাল ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। এইভাবেই ভারতের স্বাধীনতা ক্রমেই মূর্ত হয়ে উঠছে; আর ভাবনা নেই!

ভিক্ষে করে জীবনধারণ করাটা অবশ্য ভারতীয় জীবন দর্শনে খুব একটা অপমানকর কিছুই নয়, বরং বোধ হয় বেশ উচ্চস্থানই পেয়ে থাকে। তা হলেও আজ যাঁরা নূতনভাবে ভিক্ষাবৃত্তিতেই নেমে আসছেন তাঁরা যে ঐ উচ্চ জীবন আদর্শের অনুরাগেই আসছেন, তাও নিশ্চয়ই নয়। আর নেতারাও যে সেই উচ্চ আদর্শের দিকেই দেশকে পরিচালিত করে নিয়ে যাচ্ছেন, তাও বলেন না। তবে কিছুদিন পরে যখন ভিক্ষুকের সংখ্যা আরও অনেক বেড়ে যাবে তখন যে নেতারা কি করবেন, তা আজই বলা কঠিন। দুনিয়ার যত ক্লৈব্যতা আর কাপুরুষতাকেই যদি আদর্শ অহিংসা বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা হতেপারে,

তবে ভিক্ষা অন্নে জীবনধারণের মহৎ আদর্শটি এমন কি আর দোষ করল! আর যাই হোক, ভবিষ্যতে ভারতীয় নেতারা ভিক্ষাবৃত্তিকে একটা বৃহৎ আদর্শ বলে দেশে বা বিদেশে চালাবেন কিনা সেটা ভবিষ্যতের কথা হলেও, বর্তমানে যে তাঁরা দেশে ভিক্ষাবৃত্তি কমাবার বা আরও বেড়ে যেতে না দেবার কোন চেষ্টা করছেন না, সে ত যে কেউই দেখতে পাচ্ছে। ভিক্ষুকেরা না খেয়ে রাস্তায় মরে পড়ে থাকলে বা বেকারেরা আত্মহত্যা করে মুক্তিলাভ করলে ভারতীয় নেতারা কিছুই লজ্জা অনুভব করেন না; আর মন্ত্রিত্ব ছেড়ে নীচে নেমে আসবার কথা ত উঠতেই পারেনা। ভারতের স্বাধীনতা এবং মনুষত্ববোধ এতই উর্ধ্বে উঠে গেছে। ভারতীয় নেতাদের এসব ব্যাপারের জন্য কোন দুঃখও নেই। শুধু ভারতের বড় বড় এই আদর্শগুলো গলাধঃকরণ করে কেউই যে ভারতের পর্যায়ে নেমে আসতে চাচ্ছেন না, এইটুকুই যা দুঃখ!

এই ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীন ভারতে আর একটি জীবনধারণকারী বৃত্তিও খুবই প্রসারতা লাভ করেছে, এবং ভারতের স্বাধীনতা আজ কোন্ পথে তারই ইঙ্গিত দেখাবার জন্যই। আজ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে যে কত মেয়েকে তাদের দেহ বিক্রয়ের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে হচ্ছে তার হিসাব কেউ রাখেনা ঠিকই; তবে তাদের সংখ্যা যে সীমা ছাড়িয়ে অসীমের দিকেই এগিয়ে চলেছে, তা চোখ থাকলে দেখতে কারুর অসুবিধা নেই। স্বাধীনতার দশ বৎসরে, কত অদ্ভুত অদ্ভুত সেবামূলক কাজের মাধ্যমে মেয়েদের দেহ বিক্রয়ের বাজার সৃষ্টি করা হয়েছে বা হচ্ছে, তার খবর ঐ বাজারের খরিদ্দার না হয়েও কারুর জানতে বিশেষ অসুবিধা নেই। কলকাতার বা কলকাতার আশে পাশে মেয়েদের পরিচালিত নূতন ধরণের অনেক ব্যবসায়ের দিকে তাকালেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝা যায়। মাতৃজাতির এই অতি-অপমানকর দুর্দ্দশার বিষয় বেশী আলোচনা করে আমি তাদের অপমানের বোঝা আর বাড়াতে চাই না; চাইনা আমি তাদের এই লজ্জার বোঝা বাড়াতে প্রতিকার ভিক্ষা করে। এ দুরবস্থার অবসান প্রতিকারেও নয়, প্রতিশোধে।

তবে সর্বসমস্যা প্রতিকারের চেষ্টা যে একেবারেই হচ্ছে না তাও নয়; সে অতি অবশ্যই হচ্ছে, অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব-অনুপ্রাণিতভাবেই হচ্ছে। স্বাধীন হবার পর ভারত এখন কোন্ পথে যাবে, কি আদর্শ গ্রহণ করবে, কিভাবে সকলের সুখ দুঃখ সমান করে তোলা যাবে, মানে সুখদুঃখের অবসান করে দেয়া যাবে, এসব ভারতে অতি ভীষণভাবেই চিন্তা করা

হচ্ছে। তাই কখনও শোনা যাচ্ছে ভারত একটা 'ওয়েলফেয়ার স্টেট।' এই নামটি কিছুদিন চালু থাকবার পর একটু পুরোন হলেই নূতন আর একটি কথা পয়দা করে আনা হল, 'সোসালিস্টিক প্যাটার্ণ। আবার কিছুদিন না যেতেই ও কথাটিকে চেপে দেবার জন্য আর একটি নূতন কথা আবিষ্কার করা হল, 'কো-অপারেটিভ কমনওয়েল্থ'। বারে বারে এধরণের নূতন নূতন শব্দ আবিষ্কারের মানে কি কেউ জিজ্ঞেস করবেন না। এসবই অতি উচ্চ সূক্ষ্মতত্ত্ব-অনুপ্রাণিত কথাবার্তা, সাধারণের জন্য নয়, আমার মত মূর্খদের জন্য ত নয়ই ; বুঝিওনি কিছু। তবে মোটা কথা যা আগেও বুঝেছি বা এখনও বুঝি সে অতি সোজা এবং পরিষ্কার কথা, কারুরই বুঝতে ভুল করবার কোন কারণই নেই, এবং তা হচ্ছে যে, ভারত সব বিষয়ে এত বেশী পেছনে পড়ে রয়েছে যে, তার অগ্রগতির কর্মসূচী ঠিক করতে হলে কোন সূক্ষ্মতত্ত্ব-অনুপ্রাণিত দর্শনের প্রয়োজন হয় না। যে কোন কানা, মূর্খ বা আমার মত অপগণ্ডও তাকে পথ দেখিয়ে দিতে পারে ; প্রয়োজন যেটুকু তা শুধুই হচ্ছে সততার, অন্য কিছুরই নয়।

আমেরিকা, ইংরেজ, জার্মানী এরা সব আজ উন্নতির যে পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তাতে তাদের হয়ত কিছুটা তত্ত্ব চিন্তা করেই এগোতে হবে। শিল্প বা বাণিজ্যের উপরে রাষ্ট্রের কন্ট্রোল কতটা থাকলে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি না করে সমভাবে ধন বণ্টনের সুবিধা হবে, বা শিক্ষাদান কার্যটি রাষ্ট্রের কন্ট্রোলে থাকলেই সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে, না সাধারণের স্বাধীনতার মাধ্যমেই ভালভাবে সম্পন্ন হবে, এসব প্রশ্ন ওসব দেশে আজ ওঠাই সম্ভব। বৈদেশিক রাজনীতিতে তাঁরা কিসের উপর জোর দেবেন, আণবিক বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক বিজ্ঞান, না দার্শনিক আদর্শের উপর, এসব প্রশ্নও তাদের হয়ত আজ ভেবে দেখতে হচ্ছে। ঐ সব সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রয়োজন হতে ভারতে আরও অনেক অনেক অনেক দেরী আছে ; কিন্তু তবুও ঐসব বড় তত্ত্ব নিয়েই ভারতে ভাবা হচ্ছে বেশী এবং অনেক তত্ত্বর মীমাংসা না হবার ফলেই অনেক কাজও আরম্ভ করা সম্ভব হচ্ছেনা। শুধুই শোনান হচ্ছে, 'ওয়েলফেয়ার স্টেট,' 'সোসালিস্টিক প্যাটার্ণ,' কো-অপারেটিভ কমনওয়েলথ,' আরও এই ধরণের অন্য অনেক কিছু।

এই সব তত্ত্ব আলোচনায় আর কিছু না হোক ভারতে সরকারীভাবে তত্ত্বজ্ঞান ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, যার ফলে সরকার বুঝে ফেলেছে যে সব কিছুই তাদের নিজেদের তাঁবে না রাখতে পারলে দেশের উন্নতি হওয়া কখনই সম্ভব নয় ;

এবং হচ্ছেও তাই। সব কিছুই আজ সরকারী তাঁবে নিয়ে যত্ন করে রেখে দেওয়া হচ্ছে—কাজ কিছু হোক আর নাই হোক। এইভাবেই স্বাধীনতাকে আরও ভালভাবে ভোগ করবার উদ্দেশ্যেই বহু শিল্প ও বাণিজ্যের উপর একচেটে অধিকার ঘোষণা করে সরকারী তাঁবে সিকেয় তুলে রাখা হয়েছে। অন্য কতক-গুলো চালু শিল্প এবং বাণিজ্যকে সরকারের হাতে নেওয়া হচ্ছে, শুধুমাত্র সরকারী বাহাদুরী দেখাবার জন্যই। এমনকি আজ স্বাধীন ভারতে জনসাধারণের জীবন-যাপন প্রণালীও সরকারী আইনের দ্বারাই কণ্ট্রোল করা হচ্ছে। আজ সামাজিক আইনের আর কোন মূল্য নেই।

আসলে সরকারী ক্ষমতা যাদের হাতে এসেছে তাদের ভাবটা হচ্ছে এই যে, সবটা আমি একলাই খাব বা খাওয়াব, আমি যা বলে দেব সবাইকে ঠিক সেইমত চলতে হবে, একটুও এদিক ওদিক নয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যার কাছে যা ট্যাক্স চাইব দিতে হবে, কথা বলা চলবে না। সরকারী ক্ষমতার এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধাই আজ ভারতের স্বাধীনতাকে পেয়ে বসেছে। স্বাধীনভাবে আজ আর কারুর কিছুই করবার ক্ষমতা নেই। যত ভাল কাজই করতে চাওয়া হোক না কেন, সরকারের বিনা অনুমতিতে আজ আর কিছুই করা সম্ভব নয়। গ্রামের ছেলেদের লেখা পড়া শেখাবার জন্য একটা স্কুলও যদি কেউ খুলতে চায়, তাহলেও তাকে বহু আইন কানুন মেনে চলতে হবে; নিদেন পক্ষে স্কুলের বাড়ী তৈরীর সময় লোহা আর সিমেণ্টের পারমিটের জন্য বহু বহু বার সরকারী অফিসে ধর্ণা দিতে হবে এবং বোধ হয় কর্তাদের খুসী করবার জন্য বেশ কিছু খরচাও করতে হবে।

এইভাবেই ভারতের স্বাধীনতা ক্রমেই এগিয়ে চলেছে, সাধারণের স্বাধীনতাকে গ্রাস করতে করতেই। প্রতিবাদও কিছুই নেই, থাকা সম্ভবও নয়, দশ বছরের স্বাধীনতাতেই ভারতবাসী প্রতিবাদের স্তরের চেয়ে অনেকটাই নীচে নেমে গেছে। সমাজের উপর তলার আর মধ্যবিত্তরা যারা প্রতিবাদ করার ক্ষমতা রাখে, তারা আর নেই, স্বাধীনতার খপ্পরে সব শেষ হয়ে গেছে। উপর তলার অনেকেই ত আজ কর্তৃপক্ষ বা তাদের পৃষ্ঠপোষক; তাদের কাছে কিছু আশা করা একেবারেই ভুল। অন্য যারা আছেন তাঁদের বেশীর ভাগ অন্ধকারের লুকোচুরি খেলোয়াড়, তাদের পক্ষে প্রতিবাদ করতে যাওয়াই ভুল। আর অবশিষ্ট দু'একজন যাঁরা আছেন তাঁরা ব্যাপার দেখে থ মেরে গেছেন, নয়ত মিশন কমিশন করে পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছেন। মধ্যবিত্তদের বেশীর ভাগই

স্বাধীনতার চাপে চেপ্টে গেছেন। অল্প কিছু অতি-চালাকেরা জায়গা মত জুটে গিয়ে উচ্ছিষ্ট খুঁটবার তালে আছেন, আর অল্পচালাক দু'চারজন, ঐ অতি-চালাকদের হিংসে করে ঝগড়া করে মরেছেন। আসল জায়গায় দৃষ্টি দেবার সময় কারুর নেই। মূর্খ সাধারণ ত সব সময়েই ওসব বাদ প্রতিবাদের বাইরে।

লেখক, সাহিত্যিক, কবি নামে একদল লোক সবদেশেই থাকেন ; যাঁরা সুন্দরকে আরও সুন্দর করে তোলেন নূতনতর অনুভূতির সৃষ্টি করে। জীবনকে মহিমান্বিত করে করেন কাম্যতর। কুৎসিৎ এবং অসৌন্দর্যের বিরুদ্ধে সৃষ্টি করেন ঘৃণা। রূপ দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন মানুষের সুখ দুঃখের ইতিহাসকে। জনমত সৃষ্টি করেন অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে, এবং প্রয়োজন হলে রুখে দাঁড়াতে পরামর্শ দিতেও পেছপা হন না। ভারতে আজ সেরকম কোন দলেরও অস্তিত্ব দেখা যায় না। ইংরেজ আমলেও একদল ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ ত ছিলেনই আরও অনেকে ছিলেন ; কিন্তু আজ আর তাঁরা নেই। অন্তত এটুকু ঠিক যে, আজ ভণ্ডামি, বিশ্বাসঘাতকতা বা অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

তবে হ্যাঁ, ইংরেজ আমলে এই প্রতিবাদ হ'ত আরও একটা বিশেষ জায়গা থেকে, যাকে বলে কিনা খবরের কাগজ। আজ ভারতে সেই খবরের কাগজও আর নেই। যা আছে তা শুধুই ঐ খবরের কাগজ বিক্রীর ব্যবসাটুকু। আজ স্বাধীন ভারতের খবরের কাগজওয়ালারাও বুঝে ফেলেছে যে, তাদের ঐ ব্যবসাটিও ব্যবসা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়,—টাকা রোজগারের একটি পন্থা মাত্র। তাঁরা বিড়ি তৈরী করে বাজারে বিক্রী করবার চেষ্টা না করে খবরের কাগজ তৈরী করে বিক্রী করছেন বলেই তাদের নিজেদের বিষয় বিশেষ কোন ধারণা থাকবার কোন মানে নেই। তাই তাঁরা ব্যবসাই করছেন, শুধু কিভাবে সবচেয়ে বেশী টাকা রোজগার করা যায় সেই কথা ভেবেই। কার ছবি এবং বক্তৃতা দৈনিক কখানা করে ছাপলে টাকা সবচেয়ে বেশী আসবে, সেই হচ্ছে তাঁদের হিসাব, এবং কাজও হচ্ছে সেই আদর্শেই। তাই আজ যখন পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের আগমন বন্ধ করবার জন্য ভারত সরকার নানা রকমের ফাঁকিবাজীর তাল খুঁজছেন, মাইগ্রেশান সার্টিফিকেট দেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছেন, পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে জোর গলায় হেঁকে জানাচ্ছেন 'অনন্তকাল ধরে পূর্ববঙ্গ উদ্বাস্তুদের টেনে বেড়ান আর কখনই সম্ভব নয়'। আজ যখন শতে শতে সহস্রে সহস্রে উদ্বাস্তু রাস্তা-ঘাটে শেয়াল কুকুরের চেয়েও অধম অবস্থায় মারা পড়ছে, আর কথায় কথায়

তাদের উপর গুলি চালান হচ্ছে, তখনও ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীরা নীরবই রয়েছেন। এমন কি কলকাতার সংবাদপত্রসেবীরাও আজ আর ও নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছেন না। ঘামাবার মত মাথা যে তাঁদের এখনও আছে তাও বলি না; ও জিনিসটি বিক্রী হয়ে যথাস্থানে পৌছে গেছে। তবে তাঁরা যে কোন রকম সমালোচনাই করেন না তাও নয়। সমালোচনা করেন অনেক দুর্বলতাকে নিয়েই এবং কর্তাকে বাঁচিয়েই করেন। আর ঠিক ব্যবসাটুকু বজায় রাখতে হলে যতটুকু দরকার ততটুকুই করেন, একটুও বেশী নয়।

ভারতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শেষ হয়ে গেছে, প্রতিবাদ করবার ক্ষমতাও আজ আর অবশিষ্ট নেই। ফলে যা হওয়া সম্ভব, হচ্ছেও তাই। সব কিছু ন্যায় কাজই শুধু সেখানে হচ্ছে; অন্যায় বলে আর কিছু নেই। কর্তারা আজ যা করছেন তা সবই ভাল, ন্যায়, দেশের 'বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে' বা ঐ ধরণেরই কিছু; শুধু অন্যায় কিছুই নয়।

আর অবস্থা যখন এই পর্য্যায়েই আসে কর্তাদের পক্ষে ন্যায় ভিন্ন অন্য কিছু করা সম্ভবই হয় না, মানে কর্তারা যখন ন্যায় অন্যায়ের উর্ধ্বে উঠে যান। তখন স্বাভাবিক উপায়েই, ন্যায় অন্যায় বিচার না করেই—মানে নির্বিচারেই, তাঁরা এমন অনেক কাজ করে যান যা শুধুমাত্র তাঁদের পক্ষেই সম্ভব, অন্য কোথাও নয়। অনেক সময়েই দেখা যায় যে তারা স্রেফ নিঃস্বার্থেই কিংবা হয়ত শুধুমাত্র ডাট দেখাবার জন্যই এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করেন, যার তুলনা কোন সভ্য দেশে ত নয়ই, অসভ্য দেশেও সম্ভব বলে মনে হয় না; এমন কি পাকিস্থানেও এরকম কখনও দেখিনি। ভারতের এক এবং অদ্বিতীয় নেতা শ্রীজহরলাল সব সময়েই গোটা দেশটা চষে বেড়াচ্ছেন। তিনি যখনই যেখানে যাচ্ছেন আশে পাশের লোকেরা শুধু দর্শন লাভ করে ধন্য হচ্ছেন তা মোটেই নয়। তারা তাদের অন্তরে অন্তরে অনুভব করছে যে, তাদের অন্তরের নেতা শ্রীজহরলাল তাদের মধ্যে এসেছেন! কলকাতার রাস্তায় যখনই তাঁকে দেখা যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে তাঁর যাতায়াতের পথকে সুগম রাখবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা মহানগরীর বিশেষ বিশেষ রাস্তাগুলি সাধারণের যাতায়াতের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ফলে বহু জায়গায় ট্রাফিক জাম হয়ে গেছে,—লক্ষ লক্ষ লোকের দুরবস্থার অন্ত নেই। তখনই জনসাধারণ যে তাদের অন্তরের নেতাকে তাদের অন্তরের অন্তস্থলেই অনুভব না করে পারে না, তাতে আর ভুল কি! এমন ব্যাপারও হয়েছে, শ্রীজহরলালের পথ সুগম রাখতে গিয়ে সাধারণের

পথে কাঁটা দেবার ফলে, আসন্ন-প্রসবা মহিলা প্রসূতি সদনে না পৌছুতে পেরে রাস্তার মধ্যেই সন্তান প্রসব করেছেন। ঘটনার কথা শ্রীজহরলালকে জ্ঞাতও করা হয়েছে (ইতিপূর্ব্বে শ্রীগণেশ ঘোষ এম, এল, এ, চিঠি দিয়ে এরূপ একটা ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন) কিন্তু কিছুতেই শ্রীজহরলালের আক্কেল উৎপাদন করা সম্ভব হয় নি। আর হবেও না।

এইভাবেই জনগণের হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবেশ করেই ভারতের এক্ এবং অদ্বিতীয় নেতা শ্রীজহরলাল দেশে স্বাধীনতা দান কার্য করে চলেছেন। এই ভাবেই ক্রমে ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতার কল্পনার রূপ আর স্বরূপে মিশে যে অপরূপের স্থষ্টি হয়েছে, তা মোটেই ইয়ার্কি নয়, অতি উচ্চ মার্গের। তাই সাধারণের নাগালের একেবারেই বাইরে। সাধারণেরা তার ধারে কাছেও যেতে পারে না। ভারতের উচ্চমার্গে বিচরণকারী ভাগ্যবান দু'চারজন যাঁরা আছেন তাঁরা অবশ্যই স্বাধীনতাকে অতি নিজস্ব ভাবেই উপভোগ করে চলেছেন। লক্ষ লক্ষ বেকার, আর কোটিতে কোটিতে ভিক্ষুক এবং অনশনক্লিষ্টদের পাশাপাশিই ভারতে তৈরী হচ্ছে আর একটি শ্রেণী —শুধুমাত্র ঐ অপরূপ স্বাধীনতাকে উপভোগ করবার জন্যই। তাই স্বাধীন ভারতের অতি-স্বাধীনতার ফলেই ধনী আর দরিদ্রের মধ্যের ব্যবধান আজ আর সেই আস্মান জমীনের তুলনা দিয়ে ঠিক মত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিসের সঙ্গে যে তুলনা করা যায় তাও জানা নেই—মনে হয় একেবারেই অতুলনীয়।

ভারতের স্বাধীনতাওয়ালাদের নূতন মক্কা দিল্লী নগরীতে গড়ে উঠছে নূতন নূতন হোটেল,—ঐ স্বাধীনতা পরিবেশনের উদ্দেশ্যেই। দিল্লীর কোন কোন হোটেলের চার্জ নাকি দৈনিক ১৭৫৲ টাকা থেকে ২৫০৲ টাকা। এই নূতন স্বাধীনতা পরিবেশনের ব্যাপারে দিল্লী যে কলকাতা এবং বোম্বাইকে অনেক অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে তাতে আশ্চর্য হবারও কিছুই নেই। আজ ভারতের স্বাধীনতার যা কিছু তা ত ঐ দিল্লীওয়ালাদের পকেটেই কিনা, তাই! সঠিকভাবে জানিনা যে এই ১৭৫৲ টাকা আর ২৫০৲ টাকা চার্জের হোটেলে কোন্ শ্রেণীর স্বাধীনতা ভোগীরা বাস করেন। তবে সেসব হোটেলে যে জায়গা পাওয়া খুবই কঠিন, তা অবশ্যই শুনেছি। পৃথিবীর অন্য কোথাও দিল্লীর পর্যায়ের হোটেল আর আছে কিনা তাও জানা নেই; বোধ হয় অন্য কোথাও এরকম সম্ভবও নয়। কারণ স্বাধীনতাকে এরকম প্ল্যান করে মাত্র কয়েকজনের পকেটস্থ করা অন্য কোথাও আজও সম্ভব হয়নি।

যাঁরা বুঝে নিয়েছেন আমেরিকান পর্যটকেরাই ঐ সব হোটেলের খরিদ্দার, তাঁরা শুধু ভুলই বুঝেছেন তাই নয়, তাঁরা ঠিক উল্টোটাই বুঝেছেন। আমেরিকানদের টাকা অত সস্তা নয়। কালোবাজারীরাও ওসব হোটেলে উঠতে ভয় পায়—কালোবাজারে পয়সা রোজগার করতেও অনেক হাঙ্গাম পোয়াতে হয়; তাই টাকার উপর তাদেরও কিছুটা দরদ থাকাই স্বাভাবিক। তবে উপায়ও নেই, ট্যাক্স্ ফাঁকি দিয়ে টাকাটা যে পকেটে পকেটে নিয়েই ঘুরতে হয়, পকেট সব সময়ই অতিমাত্রায় গরম থাকে, এবং সেইজন্যই হয়ত তাদেরও মাঝে মাঝে ওসব যায়গায় যেতে হয়, ঐ গরম কমাবার জন্যই। আসলে কালোবাজারীদের চেয়েও অনেক সস্তায়, অনেক বেশী গরম পকেটওয়ালারাই ঐসব হোটেলের খরিদ্দার, এবং তাঁরা হচ্ছেন ভারতের অতি বিশিষ্ট লোক, যাঁরা আজ সব মিশন, কমিশন হয়ে বসে আছেন, দেশময় চষে বেড়াচ্ছেন, পৃথিবীতে টহল মেরে এসে রিপোর্ট লিখছেন—তাঁদেরই পকেট আজ সবচেয়ে বেশী গরম এবং অতি সোজা উপায়েই গরম। ওসব হোটেল তাঁদেরই উপযোগী, তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যই আজ সৃষ্টি হয়েছে ঐসব হোটেল—ভারতের স্বাধীনতার রূপকে অপরূপে পরিণত করবার জন্যই!

দিল্লীতে রাজকীয় অতিথিদের আদর আপ্যায়ন এবং সম্মান দেখাবার জন্য প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একাধিক রাজকীয় ভোজসভার আয়োজন হচ্ছে। ভোজ সভার আয়োজন আর সে আয়োজন যদি হয় অতি সস্তা পয়সায়, তাহলে যে, সে অতি বিরাট ব্যাপার হবে তাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু সে বিরাট যে কত বিরাট, সেইটেই হচ্ছে আসল কথা। রাজাজী যখন গভর্ণর জেনারেল ছিলেন তখন শুনেছি, রাজকীয় ভোজসভায় আয়োজন অতি সামান্যই থাকত; কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। ভারত এখন জগৎসভার শ্রেষ্ঠ আসন পেয়ে গেছে, এবং সেটা প্রমাণ করবার জন্যই, আজকাল যে সব ভোজের ব্যাপার হচ্ছে তারও ব্যবস্থা হচ্ছে ঐ জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাই। অবশ্য ঠিক কি কি জিনিস যে সেসব সভায় ভোজ্য দ্রব্য হিসাবে পরিবেশিত হয়, তা আমার অনেকেরই মত জানবার সুযোগ হয়নি; শুধু যেটুকু জানি তাহচ্ছে যে ঐ সব এক একটা ভোজে প্লেটপ্রতি খরচ হয় কমপক্ষে ৫০৲ টাকা উপরে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

দিল্লীর পাঠান-মোগল বাদশাহরা অনেক ফুর্তি করে গেছেন, কিন্তু তাঁদের ফুর্তিও বর্তমান দিল্লীর বাদশাহদের ফুর্তির কাছে যে কিছুই ছিল না, তা ত দেখাই যাচ্ছে। তবে বিরুদ্ধ সমালোচনা করবারও কিছু নেই, দেশকে শুধুই রাজনীতির

চালবাজী মারফৎ জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে হলে এ ধরণের ফুর্তিটা আসটা জমাতেই হবে,—রাজনীতিই ত ফুর্তি! দেশের জনসাধারণ দরিদ্র, তাদের পেটে ভাত নেই, এসব বাজে কথা বলে বিরক্ত করবারও কোনই মানে নেই। জনসাধারণের ভোটের নেতারাই যখন এসব করছেন, তখন জনসাধারণের যে এ সবকিছুতেই পুরো সম্মতি রয়েছে সে ত ধরেই নেয়া যায়।

আর সব রস যে মাত্র কয়েকজনেই খেয়ে নিচ্ছেন তাও নয়। জনসাধারণ, যাদের ভোটে নেতারা নেতা হয়েছেন, তারাও কিছু কিছু অবশ্যই পাচ্ছে। দিল্লীর আশেপাশে যাঁরা থাকেন তাঁরা ত দৈনিক সেরিমনির উৎসব-আনন্দ দেখেই ভরপুর। দেশময় অন্য সকলে হামেশাই নেতাদের সেরিমোনিয়াল দেশ-ভ্রমণ, আর দর্শন দান দেখে ধন্য হচ্ছেন—প্রায় বিনি পয়সায় এ ধরণের উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখা কি কম ভাগ্যের কথা! ভারতবাসী আজ সত্যিই ভাগ্যবান। তার উপরে দেশে আজ সর্ব রসের রাণী সিনেমা রসকে অতি সস্তা দরে এবং সস্তাভাবে পরিবেশনের যে ব্যবস্থা হয়েছে, সেও ত ঐ মূর্খ সাধারণদের জন্যই। সিনেমারাই আজকাল দেশকে সবই দেখাচ্ছে—মানে প্রায় কিছুই আর ঢেকে দেখাচ্ছে না। রসে রসে দেশকে প্রায় ডুবিয়ে দিয়েছে; ভুলিয়ে দিয়েছে দেশের ক্ষুধা তৃষ্ণা। তাই ভারতে আজ কোন ভাবও নেই, অভাবও নেই, অভিযোগ ত নয়ই। অভাব যদি কিছু থাকে, তা হচ্ছে ঐ সিনেমায় যাবার পয়সার। স্বাধীনতার কল্যাণে সিনেমাটা আর একটু বিনি-পয়সার হলে বলার আর কিছুই থাকবে না; দেশ হয়ে যাবে এক অখণ্ড প্রেমের রাজত্ব। প্রেমা-প্রেমির মাধ্যমেই গান্ধী নেতৃত্ব ভারতে রাজনীতি আরম্ভ করেছিলেন, এগিয়ে গিয়েছিলেনও ঐ প্রেমের পথেই, প্রেম করেই স্বাধীনতার নামে ক্ষমতা আহরণ করেছিলেন। আশা করা যায় দেশে অখণ্ড প্রেমের রাজত্ব সৃষ্টি করেই ঐ প্রেমের রাজনীতির অবসানও হবে। দেশেরও অবসান ঐ সঙ্গেই কিনা, তাই শুধু প্রশ্ন!

মোটকথা, ভারতের মাটিতে সিরিয়সনেস্ কথাটি আর নেই, গুরুত্বপূর্ণ বলেও কিছু নেই, নেই কিছু কঠিন কাজ। সবই অতি হাল্কা, সোজা এবং রসের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের নেতাদের কথাবার্তায়, চালচলনে, তাঁদের রাজ-নীতিতে সিরিয়াসনেস্ বলে কিছু নেই। প্রাণে যা চাচ্ছে তাঁরা তাই করছেন, মুখে যা আসছে তাই বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন, সব সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছেন

তাঁরা বক্তৃতা দিয়েই। জনসাধারণের অবস্থাও ঠিক সেই রকমই। কোন সিরিয়াসনেস নেই তাদের জীবনে,—হারিয়ে ফেলেছে তারা জীবনের সিরিয়াসনেস। সব কিছুই দেখছে, শুনছে অথচ কিছুই যেন বুঝতে পারছে না; যেন নেশার ঘোরে চলে বেড়াচ্ছে। তাদের অভাব অভিযোগ সব শেষ হয়ে গেছে; সুখ দুঃখের অনুভূতিটুকুও আছে কিনা বলা কঠিন। রুখে দাঁড়ান ত দূরের কথা, প্রতিবাদ করতেও তারা আর চায় না—এক দারুণ অবসাদ এসেছে তাদের জীবনে। কোন রকমে কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই হয়ে যাবে, সকলেরই শুধু এইটুকুই আশা। এই আশা নিয়েই তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনন্ত দুর্দশার পথে। বেঘোরে মারাও পড়ছে কতশত, কেউ তার হিসাবও রাখে না। মনুষ্যত্ব শেষ হয়ে গেছে, ভারতে মনুষ্যত্বের অবশেষ আর কিছু নেই। দুশো বছরের ইংরেজ শাসন এবং শোষণের পরেও যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, দশ বৎসরের গান্ধী-বাদী শোষণে সেটুকু মনুষ্যত্বও শেষ হয়ে গেছে।

দেশে দশ বিশটা নূতন কলকারখানা, গোটা কয়েক বড় বড় ড্যাম বা ব্যারেজ, কয়েক শত মাইল রাস্তা বা অনেকগুলি দালান কোঠা দেখেই যাঁরা অন্ধ হয়েছেন তাঁদের ত কথাই নেই, তাঁদের বিষয় কিছু বলবারও নেই। আর যাঁরা অন্ধ না হয়েও সব বুঝে ফেলেছেন যে দেশ ভীষণ এগিয়ে যাচ্ছে, কোন ভয় নেই, তাঁরা অতি মূর্খ, আমার চেয়েও বড় মূর্খ। কারণ তাঁরা শুধুই ঐ বাইরের বাজে জিনিসগুলোই দেখেছেন, ভেতরের আসল কিছুই দেখেননি, দেখবার ক্ষমতাও নেই তাঁদের। তাঁরা শুধু দেখতে ভুল করেছেন যে তাঁরা নিজেরা কি হয়েছেন, কার গর্ব করছেন! তাঁদের ছেলেমেয়েরা আত্মীয়-স্বজনেরা কি হয়েছে! আজ ভারতে তাদের বেঁচে থাকতে কতখানি ঘুষ দিয়ে বা ঘুষ নিয়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে, কিংবা কতখানি ভিক্ষা দিয়ে বা নিয়েই তাঁদের দিন গুজরান করতে হচ্ছে সেটা কেউই ভেবে দেখছেন না। ঝুটো মিথ্যা বোলচাল ঝেড়ে হয়ত সারা দুনিয়ার সব লোককে ঠকান যেতে পারে, কিন্তু লক্ষ কোটি মিথ্যা কথা বলেও নিজেকে আশ্বাস দেয়া কখনও সম্ভব নয়। তাই বাইরের দিকে নয়, নিজের দিকে চোখ ফেরালেই আজ যে কেউই দেখতে পাবে, সে আজ কোথায়, কোন্ স্বাধীনতার খপ্পরে পড়ে শেষ হতে চলেছে।

ভারতীয় রাজনীতি যে আজ কোন পর্য্যায়ে নেমে এসেছে, ভারতবাসী আজ কোন পর্য্যায়ে? এক বন্ধু সেই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন,

কারণ ব্যাপারটা তিনি ঠিক বুঝতে পারছিলেন না, তাই। গত ৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৫৭) তারিখের 'যুগান্তরে' বড় হরফের শিরোনামায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, শিয়ালদহ ষ্টেশনে অবস্থানকারী উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনশনজনিত মৃত্যুসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, বাড়তে বাড়তে বর্তমানে দৈনিক গড়ে ১০ থেকে ১৫ জন মারা যাচ্ছে। পরের দিন ৬ই তারিখ ইংরেজী Statesman কাগজও ঐ খবরটি পরিবেশন করেন এবং বলেন যে উদ্বাস্তুদের মধ্যে সাহায্য দানের কাজ করছে এমন একটি সমিতির হিসাব মতে বর্তমানে উদ্বাস্তুদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা দৈনিক গড়ে ১২ জন। তার পরের দিন ৭ই তারিখ Statesman একটা সম্পাদকীয় লেখেন ঐ ব্যাপারটির উপরে,—জনসাধারণের এবং রাজনৈতিক দলদের ঐ ব্যাপারের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই। বন্ধু ঐ খবরগুলো কাগজে দেখেছিলেন, এবং শিয়ালদহের উদ্বাস্তুদের চরম দুর্দশা খানিকটা স্বচক্ষেও দেখে এসেছিলেন, তাই। তাই বন্ধু বুঝতে পারেননি যে ব্যাপারটি কি! যে স্বাধীনতার ফলে ভারত দশ বছরেই পৃথিবীর নেতা হয়ে গেছে, যার ফলে পৃথিবীতে ভারতের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ হয়ে গেছে, ভারত পৃথিবীর সবার এক মরাল গার্জিয়ান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই আদর্শ স্বাধীনতার সাথে এই দৃশ্যটিকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না বন্ধুবর। তাই প্রশ্ন করেছিলেন, সত্যি সত্যি ভারতের স্বাধীনতার আজ কি অবস্থা? স্বাধীনতার দশ বৎসর পরে তিনি আজ এ কি সব দেখছেন? আর শিয়ালদহ ষ্টেশন ছাড়াও অন্যান্য সব স্থানেই যে অবস্থা ঐ একই পর্য্যায়েই চলছে এবং খবরের কাগজেরা সে সবের কোন খবরও ছাপছেন না, সেটুকুও বুঝতে ভুল করেন নি বন্ধু। দণ্ডকারণ্যের পরিকল্পনা যে খবরের কাগজে খবর প্রকাশ বন্ধ করবারই পরিকল্পনা তাও বন্ধুর মাথায় সেদিন খুব পরিষ্কার ভাবেই প্রবেশ করেছিল। তাই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন; বুকের ব্যাথায়ই প্রশ্ন করেছিলেন, আজ আমরা কোথায়? আজ আমরা কোন পর্য্যায়ে? তার এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হয় নি, বন্ধু নিজেই দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে, যে পর্য্যায়ে মানুষ এসব ব্যাপার চোখে দেখে, কানে শুনে বা খবরের কাগজে পড়ে পাগল হয়ে যায় না, স্থির মস্তিষ্কে বিচরণ করতে পারে, ভারতবাসী আজ দশ বৎসরের স্বাধীনতাতেই সে পর্য্যায়ে পৌঁছে গেছে। ভারতের আর কোন ভয় নেই।

পাকিস্থানেও স্বাধীনতার কল্পনা আর স্বরূপে মিলিয়ে যা দাঁড়িয়েছে তা

ভারতের থেকে অভিন্ন কিছুই নয়। বেকারী আর ভিক্ষুকত্ব পাকিস্থানেও ক্রমবর্ধমান। ছোটখাট, মাঝারি, বড় নানারকমের দুর্ভিক্ষ ত লেগেই আছে, ভারতেরই মত; কিছু বেশীও হতে পারে। ধনী আর দরিদ্রের ব্যবধানও বেড়ে চলেছে ভারতেরই হারে। দেশের রাজনীতির সাথে জনগণের আশা-আকাঙ্খার সম্পর্কও বিশেষ কিছুই নেই; আর প্রতিবাদ করবার ক্ষমতাও প্রায় শেষ সীমায়। প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা শেষ সীমায় হলেও একেবারে লোপ পেয়েছে তা নয়; এবং এই ব্যাপারেই ভারতের সঙ্গে পাকিস্থানের স্বাধীনতার যা একটু তফাৎ। চুরি, জোচ্চুরী, ঘুষ বা কালোবাজারী পুরাদমেই চলছে, এবং ক্রমেই আরও বেড়ে যাচ্ছে খুবই সত্যি কথা। তবুও পাকিস্থান ভারতের মত অতি-মানবত্বে কিছু কম বিশ্বাসী বলেই বোধ হয় অন্তত রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিবাদ কার্যটি একেবারেই লোপ পেয়ে যায়নি। কাশ্মীর সমস্যার ভাঁওতা দেখিয়ে পাকিস্থানে অনেক কিছুই অকর্ম বা কুকর্মকে চাপা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে ঠিকই, তবুও পাকিস্থানে ঐ 'বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে'র চাল মেরেই একেবারে সব কিছুই চালিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি কখনও। সরকারী নেতাদের ঘন ঘন পরিবর্তন যেভাবে হয়েছে বোধ হয় সেই জন্যেই কারুর পক্ষে অতিমানব সেজে বসে দেশের সকলের মস্তক ক্রয় করাও সম্ভব হয়নি। আর পাকিস্থানের খবরের কাগজগুলোর খবরের মান যতই দরিদ্র হোক না কেন, খবরের-কাগজী সম্মান ভারতের থেকে অনেক উঁচুতেই আছে। কারুর ম্যাজিক দেখে বা অতি-মানবত্ব দেখে তাদের চোখ ঝল্‌সে যায়নি কখনও, মনও বিকল হয়নি, কিংবা তারা নিজেদের মস্তকগুলো বিক্রয় করে বসে রয়েছে, তাও বলা যায় না।

মোটকথা, কলকারখানা, রাস্তাঘাট স্কুল-কলেজ, হাঁসপাতাল ইত্যাদি অনেক জিনিসের ব্যাপারেই ভারতের চেয়ে অনেক পেছিয়ে থাক্‌লেও মনুষ্যত্বের ব্যাপারে পাকিস্থান এখনও ভারতের উপরেই আছে বলে মনে হয়। অন্তত, পাকিস্থানে প্ল্যান করে মানুষকে অমানুষ তৈরী করবার প্রত্যক্ষভাবে কোন চেষ্টা হয়নি। এই না-হওয়ার কারণটিও হচ্ছে এই যে, পাকিস্থানে অতি-মানবিক কাণ্ডকারখানার মাধ্যমে রাজনীতিকে ম্যাজিক খেলায় পরিণত করা সম্ভব হয়নি কখনও। দেশের মধ্যে মিথ্যা প্রচারকার্যও ভারতের চেয়ে অনেকটাই দুর্বল; এবং সব কিছুই শুধু যে প্রপাগাণ্ডার উদ্দেশ্যেই করা হয়, তাও নয়। ডাইনামিক তত্ত্বের সোরগোল পাকিস্থানে নেই। পূর্ব-ঘোষিত

আদর্শের বিরুদ্ধতা করতে হলে পাকিস্থানে আজও কোনও মানবিক কারণই খুঁজে বের করে দেখাতে হয়, ডাইনামিক তত্বেরও বোলচালেই ভণ্ডামিকে আদর্শ বলে চালিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। ভণ্ডামিও তাই কম, নপুংসকতা ত অনেকটাই কম। পাকিস্থান তার অপদার্থ নেতাদের যে বহুবার লাথি মারতে পেরেছে, সেটাই হচ্ছে ভারতের উপর পাকিস্থানের সবচেয়ে বড় বাহাদুরী, এবং একান্ত নিরাশার মধ্যে আশার আলোকও ঐখানেই। (বর্তমানে পাকিস্থানে মিলিটারী শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। এই শাসনের ফল ভাল হবে কি মন্দ হবে সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়েও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই পরিবর্তনটিও পাকিস্থানের জীবনীশক্তিরই পরিচায়ক।)

কেন?

কেন এমন হোল? এত সাধের স্বাধীনতা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল কেন? কি ভাবেই বা মাত্র দশবছরের মধ্যেই সব কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা একেবারে ম্যাজিক হয়ে উড়ে গেল? এ প্রশ্ন আজ অনেকেই করেন, নিজের কাছেও করেন। উত্তরও যে না পান তাও নয়। উত্তর খুব কিছু কঠিনও নয়। বহুশত বৎসরের পরাধীন একটা অতি-দরিদ্র, দুর্বল এবং মনুষ্যত্বের শেষ সীমায় পৌছে যাওয়া আত্ম-বিস্মৃত জাতি, স্বাধীনতার নামে ক্ষমতা আহরণ করেছিল, আরও অতি-দুর্বল, মনুষ্যত্ববিহীন এবং নপুংসক পন্থায়। আর ক্ষমতা পেয়েও তারা শক্তির পথে এগোতে সাহস করেনি, অহিংসার নামে যত কাপুরুষতা এবং ক্লৈব্যতাকেই তাদের আদর্শ বলে মেনে নিয়ে সেই পথে চলতে চেষ্টা করেছে। ফল যা পেয়েছে, তাই হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপ।

ভারতবাসী যে স্বাধীনতাই চেয়েছিল, সেকথাও বলা কঠিন। কি যে ঠিক চেয়েছিল তা বলা আরও কঠিন। অন্ততপক্ষে আজ বিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা বলতে যা বুঝা যায়, তা যে ভারতবাসী কখনই চায়নি, সেটা খুবই পরিষ্কার। বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ভারতের রক্তে, ভারতের ভাবধারায় কখনই ছিল না, বা থাকা সম্ভবও নয়। বিদেশীদের সংস্রবে এসে সত্যিকারের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যেটুকু ফুটে উঠেছিল ভারতের মাটিতে এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই, এবং শক্তির থেকে আরও শক্তির পথে ক্রমেই এগিয়েও যাচ্ছিল যে আকাঙ্ক্ষা; গান্ধীবাদী অহিংসানীতি তাকে একেবারেই শেষ করে দিয়েছে। ইংরেজ শাসন বর্তমান থাকতেই প্রায় শেষ করে এনেছিল সে

শক্তি এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে। আর ইংরেজ শাসন শেষ হতেই, মাত্র দশ বছরেই ঐ সত্যিকারের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার শেষ মূলটিকেও বোধ হয় নির্মূল করে দিয়েছে তারা। গান্ধীইজম ভারতকে আবারও ঠেলে নিয়ে গেছে সেই হাজার বছর পূর্বেকার অবস্থায়।

এমনিতেই ত ভারতের মাটিতে, ভারতীয়দের রক্তে, তাদের ভাবধারায় এমন কতকগুলো দর্শন বা আদর্শ মূল গেড়ে বসেছিল যার সঙ্গে সত্যিকারের স্বাধীনতার কল্পনা শুধুই সামঞ্জস্যবিহীনই নয় প্রায় উল্টোউল্টি ব্যাপার। যাদের থেকে ভারতীয়েরা নিজেদের কখনই মুক্ত করতে পারেনি। তার উপর গান্ধীবাদের অহিংসা ধর্ম তাদের আরও পরাধীনতার পথেই এগিয়ে দিয়েছে। "যুক্তির পরিবর্তে অন্ধ বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাই গান্ধীবাদের উদ্দেশ্য" (রবীন্দ্রনাথ)। গান্ধীবাদ যে ভণ্ডামি এবং বিশ্বাসঘাতকতার দুই বেদীস্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত এক অতি-সাংঘাতিক নপুংসকবাদ; মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে দিয়ে আধামানুষ আধা জানোয়ারে পরিণত করে, তাদের কাছ থেকে অবাধ আনুগত্য আদায় করাই যে গান্ধীবাদের উদ্দেশ্য। এটুকু আজও ভারতে অনেকেই ঠিক বুঝতে পারেন নি। পৌত্তলিক ভারতে এটুকু বুঝতে পারা সত্যিই কঠিন বৈকি! তাই ভারতে আজও গান্ধীধর্ম প্রচার অবাধেই চলছে।

উপরন্তু ভারতীয়দের অল্পে সন্তুষ্ট হবার মহৎ আদর্শ, তাদের ইহকালের চেয়ে পরকালের উপর বেশী আকর্ষণ, তাদের জীবনে যুক্তির চেয়ে অন্ধ বিশ্বাসের প্রাবল্য, শক্তির সাথে জীবনের সমন্বয় সাধনে তাদের বিফলতা, এ সবই ছিল ভারতীয়দের পক্ষে সত্যিকারের স্বাধীনতার কল্পনার পরিপন্থী, আর গান্ধীবাদের সুযোগ। তাই সুকৌশলে ঐ অহিংসাধর্ম প্রচার আরম্ভ হতেই ভারতবাসী লুফে নিয়েছিল অহিংসাবাদকে। ইংরেজ দেশ ছেড়ে যেতেও অহিংসাকে তারা আর ছাড়াতে পারেনি; ক্রমেই ডুলিয়ে যাচ্ছে ঐ নপুংসকতায়। শান্তিই আজ ভারতের একমাত্র কাম্য, অন্য কিছুই নয়। অতি সহজ পন্থায়ই তারা শান্তি আন্‌বার চেষ্টা করছে। অশান্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেই তারা শান্তি পেতে চাচ্ছে,—স্বাধীনতার সঙ্গে শান্তির সমন্বয় করে নয়। ভারতে আজ বিরাজও করছে সেই শ্মশানের শান্তিই।

তবে শুধু যে ভারতের পুরাতন ভাবধারাগুলো আর মহাত্মা গান্ধী কৃত অহিংসা ধর্মই ভারতের স্বাধীনতার সর্বনাশ করেছে, তাও বলা উচিত নয়। কমুনিজমের আদর্শটিও বা কমুনিস্টদের সস্তা রাজনীতিও ভারতের জাতীয়

জীবনে কিছু কম উচ্ছৃঙ্খলতা আনেনি। কমুনিজম যে কি চায় বা তার উদ্দেশ্যই যে কি, তা আজও পর্যন্ত কেউই জানে না। অন্ততপক্ষে, ভারতে কমুনিজম বলে যা প্রচারিত হচ্ছে তা যে 'বিশ্বাসঘাতকতা এবং অশালীনতার দর্শন' (philosophy of treachery and debauchery) ভিন্ন অন্য কিছুই নয়, তাও যেন কেউই দেখেও দেখতে পান না। ফলে কমুনিজমের গড্ডালিকা প্রবাহও আজ ভারতকে ভালভাবেই পেয়ে বসেছে। একটা জাতির পক্ষে সম্মুখে এগিয়ে যাবার পাথেয় হিসাবে সব চেয়ে বেশী যে জিনিসটির প্রয়োজন হয়, সেই জাতীয়তাবাদকে ত একেবারেই শেষ করে দিয়েছে ঐ কমুনিজম।

তার উপর সস্তা আমোদ আনন্দ যা আজ সিনেমার ছবি হিসাবে দেখা দিয়েছে ভারতীয়দের জীবনে, তাও করে দিয়েছে তাদের একান্তই লঘু এবং হাল্কা। কোন কাজেই আজ আর ভারতীয়দের কোন সিরিয়াসনেস নেই। শেষ হয়ে গেছে তাদের সত্যিকারের আনন্দ এবং আনন্দ উপভোগের ক্ষমতাও। কায়ার চেয়ে ছায়ার উপরই তাদের আজ আকর্ষণ বেশী; পাচ্ছেও সেই ছায়াকেই। ভারতের স্বাধীনতাও আজ তাই ছায়াবাজীতেই শেষ হতে চলেছে।

অবস্থা পাকিস্থানেও ঠিক এই রকমেরই। মুসলমান ধর্মে ঐ ভারতীয় বৃহৎ আদর্শগুলোর স্থান না থাক্‌লেও ভারতীয় মুসলমানদের উপর ওগুলির প্রভাব কিছু কম ছিল না। আর অন্যান্য কতকগুলো ব্যাপারে তারা যে আরও বেশী পেছিয়ে ছিল, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কমুনিজম, সিনেমা বা ঐ ধরণের অন্য সব ব্যাপারগুলো ত পাকিস্থানেও রয়েইছে। ফলে পাকিস্থানেও স্বাধীনতার প্রকাশ হচ্ছে ঐ ছায়াবাজীর মধ্যেই, অন্য কিছুতেই নয়। স্বাধীনতার স্বরূপ প্রকাশে ভারত এবং পাকিস্থানে কোন ভেদ নেই। এ ব্যাপারে ভারত এবং পকিস্থান একেবারেই অখণ্ড।

শেষ কথা

যদি এই একান্ত এবং কলঙ্কময় মৃত্যুর কবল থেকে এই অখণ্ড ভারতকে রক্ষা করতে হয়, তবে দূর করে দিতে হবে ঐ দুর্বল আর ক্লীবের জীবন, আদর্শগুলোকে। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে জীবনে যুক্তিকে অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে। হাটিয়ে দিতে হবে অহিংসার ভণ্ডামী আর কমুনিজমের নষ্টামিকে। লাথি মেরে শেষ করতে হবে সিনেমাওয়ালাদের সস্তা প্রেমের ছায়াবাজীকে।

ফিরিয়ে আন্‌তে হবে আবার সেই শক্তির মন্ত্রকে, মনুষ্যত্বের শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে দেশকে। এই উদ্দেশ্য সাধনে, কোন সূক্ষ্মতত্ত্ব-অনুপ্রাণিত দর্শনের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধুই কর্মের। পথ বাৎলেই রাখা হয়েছে, "তমগুণে আচ্ছন্ন এই জাতিকে রজগুণের পথে নিয়ে যাও; জাতি তার পথ নিজেই করে নিতে পারবে," স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণীই পথ দেখিয়ে রেখেছে। প্রয়োজন শুধুই এই পথে এগিয়ে যাওয়া, প্রয়োজন শুধুই সততা, ঘর্ম, অশ্রু আর ত্যাগের—যে পাথেয় সাহায্যে এই পথে চলা সম্ভব, তারই। অন্য কিছুই নয়।

এ পথে দেশকে পরিচালিত করবার জন্য আবার কোন্ শক্তিধর আবির্ভূত হবেন জানিনা। সেরকম শক্তিধরের আবির্ভাবের সম্ভাবনাও খুব বেশী দেখা যাচ্ছে না। তবুও বিশ্বাস রাখি যে ভারত কখনই একেবারেই শেষ হয়ে যাবে না; আবারও বেঁচে উঠবে। অখণ্ডভাবেই আবারও মূর্ত হয়ে উঠবে। হয়ত সেই জীবনের পথে বহু দুঃশাসনের রক্ত পান করেই এগোতে হবে তাকে,—দুঃশাসনের রক্তেই আসবে তার শক্তি, প্রতিষ্ঠিত হবে মনুষ্যত্ব। ভারত যে আবারও বেঁচে উঠবে, ফিরে দাঁড়াবে তাতে কোন ভুল নেই। ঠিক যেমন কোন ভুল নেই বুঝতে যে আপাতত তার গতি নীচের দিকেই; আরও নীচে অবশ্যই নামবে। এক অখণ্ড ভারত, মানুষের ভারত সৃষ্টি হবার আগে ভারত যে ভেঙ্গে আরও অনেক টুকরো হবে, পাকিস্থানও টুকরো টুকরো হবে তাতেও বোধহয় কিছু ভুল নেই। যে ছায়া আজ ভারত আর পাকিস্থানের আকাশে দেখা যাচ্ছে, তা ভারত আর পাকিস্থানের বহু টুক্‌রোরই ছায়া। বৃহৎ রাজনীতি আর ক্ষুদ্র মন যে একসাথে চলে না, সেই মহাসত্যকে নূতন করে প্রমাণিত করবার জন্যই ভারত আর পাকিস্থান মহাপ্রকৃতির নির্দেশিত পথেই এগিয়ে চলেছে। প্রকৃতির পথেই আবারও তারা মিলিত হবে, অতি নিঃসন্দেহে। তবে সেদিন কত দূরে সে প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা আজ আর কারুর নেই।

—শেষ—

পরিশিষ্ট

জহরলাল ও বাঙ্গালী

দ্বিতীয়ভাগের শেষে 'পাকিস্থান ও ভারতের শেষের পরের অবস্থা' লেখাটির মধ্যেই সর্ব্বশেষ পরিস্থিতির আলোচনা শেষ করবার চেষ্টা হয়েছিল; কিন্তু সম্ভব হয়নি, কারণ ঐ লেখাটি ছাপা হয়ে যাবার অল্প পরেই আরও একটি ঘটনা এমন ভাবে ঘটে গেছে যে ঐ বিষয়ে কিছু আলোচনা না করলে বোধ হয় ভুল হবে। ঘটনাটি অবশ্য মস্ত কিছুই নয় খুবই সামান্য—তবুও খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। ঘটনাটি অন্য কিছুও নয়—কাছাড় সত্যাগ্রহকে বানচাল করবার উদ্দেশ্যে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে হাইলাকান্দি সহর বিধ্বস্ত করবার পর দিল্লীতে বাদশাহ জহরলালের আবারও বিশ্বরূপ প্রদর্শন। তাঁর এই নূতনতম বিশ্বরূপে যে সংহাররূপ প্রকাশ পেয়েছে, সেই রূপ যে বাংলা এবং বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের সম্মুখে কত ভীষণ সাংঘাতিক, তাও সবম্ভত এবার অনেকেই কিছুটা বুঝতে পেরেছেন। তবুও আলোচনা করতে হচ্ছে এই জন্যই যে বুঝতে পেরেও হতাশা প্রকাশ করা ভিন্ন অন্য কিছুই কেউই প্রকাশ করতে সমর্থ হননি। আর বাংলার রাজনৈতিক দলেরা ত ইলেকশান নিয়েই ব্যস্ত—বাংলা এবং বাঙ্গালী থাক বা রসাতলে যাক!

নূতনতম বিশ্বরূপটি অবশ্য খুব নূতনও কিছুই নয়। গত বৎসর আসামী লঙ্কাকাণ্ডের পরও শ্রীজহরলাল ঐ ধরণের কথাই বলেছিলেন। কথাটিও নূতন কিছুই নয়, "কলকাতার খবরের কাগজেরাই সব নষ্টের মূল। তারাই মিথ্যা এবং বাড়িয়ে খবর প্রকাশ করে যত হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছে।" গত বৎসরও তিনি এই ধরণের কথাই বলেছিলেন। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময়ও তিনি এবং একজন সাগরেদ—শঙ্কর রাও দেও, এই একই কথা বলেছিলেন কলকাতার খবরের কাগজদের বিষয়। খবরের কাগজদের খারাপ কথা বলেছেন বলেই ব্যাপারটা মস্ত, তাও নয়। খবরের কাগজেরা স্বাধীন ভারতে যেভাবে, যে বৃত্তি অবলম্বন করে টাকা রোজগারে মত্ত হয়েছেন, তাতে তাদের এ ধরণের পদাঘাতলাভ অস্বাভাবিকও কিছুই নয়। খবরের কাগজেরাও যে ব্যাপারটিকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে তাও বুঝতে কষ্ট নেই, কারণ তারা বেশ চুপ মেরে গেছেন। যদি তারা ব্যাপারটাকে সত্যিই সিরিয়াস হিসাবে গ্রহণ

করতেন তাহলে তারাও নিশ্চয়ই সিরিয়াস হয়েই resolution পাস করতেন যে ঐ কথা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তারা বাদশাহের ছবি কিংবা বক্তৃতা আর ছাপবেন না বা ঐ ধরণেরই কিছু করতেন, চুপমেরে যেতেন না। তবুও ব্যাপারটা যে খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ তাতেও কোনই ভুল নেই কারণ, শ্রীজহরলাল আজ আক্রমণ করাই আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হিসাবে বেছে নিয়েছেন। আর তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যই হচ্ছে কলকাতার খবরের কাগজ, বাংলা এবং বাঙ্গালী। তিনি যে একটি বিশেষ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তাঁর যে অনেক দায়িত্ব আছে, এসব ভাববার আজ আর তাঁর অবসর নেই,—তাঁর দিন যে প্রায় ফুরিয়ে এল! তাই তিনি এবার একান্ত নগ্ন এবং উলঙ্গ হয়েই রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। সিংহাসন ছেড়ে যাবার আগে বাঙ্গালীকে শেষ করে যেতে হবে, এই আজ তার পণ।

বাঙ্গালীর উপর আক্রোশ তাঁর বহুকালের। ছাত্রজীবনে বিলেত থাকবার সময় up start ব্যবহার এবং চালচলনের জন্য তিনি যে বিদ্রূপ লাভ করেছিলেন তা বাঙ্গালী ছাত্রদের কাছ থেকেই, পরাজয়ও বরণ করতে হয়েছিল তাকেই বহুবার এবং বহু ব্যাপারে ঐ বাঙ্গালী ছাত্রদের কাছেই; তাঁর আক্রোশের সূত্রপাতও ঐখান থেকেই। পরে দেশে ফিরে এসে ডবল পিতৃ-গৌরবের সুযোগে নেতা সেজে বসবার পরও যা কিছু বাধা বা বিদ্রূপ তিনি লাভ করেছেন তা ঐ বাঙ্গালীদের কাছ থেকেই। ফলে যৌবনে inferiority complex এর দুর্ব্বলতায় যে হিংসার সূত্রপাত হয়েছিল, জীবন-মধ্যাহ্নে সেই হিংসাই শত্রুতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। আরও পরে দেশ বিভাগ করে ক্ষমতায় আসীন হবার পরও তিনি আজ পর্য্যন্ত যেটুকু বাধা বা বিদ্রূপ লাভ করেছেন তাও ঐ বাঙ্গালীদের কাছ থেকেই। তাই ব্যক্তিগতভাবে বাঙ্গালীকে শেষ করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিকও কিছুই নয়। উপরন্তু ক্ষমতা হাতে পাবার আগে বা পরে যখন থেকেই ভারতে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাঁর মাথায় ঢুকেছে, সেই দিন থেকেই তিনি বাঙ্গালীকে তাঁর একমাত্র শত্রু হিসাবেই দেখতে সুরু করেছেন, কারণ বাঙ্গালীকে শেষ করতে না পারলে হিন্দী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব হতে পারে না। তার উপর তাঁর মানস পিতা গান্ধী মহাত্মাও যে তাঁর নিজ বাঙ্গালী-বিদ্বেষ মানসপুত্রে সঞ্চারিত করে গেছেন, তাতেও সন্দেহ করবার কিছুই নেই।

এইভাবেই আর বাঙ্গালী বিদ্বেষ-বহ্নি ক্রমেই উত্তেজিত হতে হতে আজ যে অবস্থায় এসেছে, তা অবশ্য অনেকেই প্রত্যক্ষ করতে পারছেন। বাঙ্গালীকে

ঠকাতে গিয়ে তিনি যে কতবার বৃহত্তর ভারতের স্বার্থ এবং সম্মান ক্ষুণ্ণ করতেও দ্বিধা করেন নি তাও হয়ত অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। 'অন্যান্য দেশীয় রাজ্যদের মত সিকিমকেও যদি ভারতের মধ্যে মিশিয়ে দেয়া হ'ত তাহলে তাকে বাংলাতেই দিতে হ'ত, তাই সিকিমের রক্ষিতা পদপ্রাপ্তি', তা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু আজ চীনা আক্রমণের মুখে সিকিমের রক্ষিতা পদ যে ভারতের পক্ষে কতখানি অসুবিধার কারণ হয়েছে তা হয়ত অনেকেই এখনও বুঝতে পারেন নি। স্বাধীনতার প্রথম আমলে ভারতীয় পার্লামেণ্টে একটি প্রস্তাব আনা হয়েছিল যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ Mount Everest-এর নাম পালটিয়ে Mount Shikdar করা হোক, কারণ রাধানাথ সিকদারই হচ্ছে ঐ শৃঙ্গের আবিষ্কর্তা। কিন্তু রাধানাথ সিকদার যে বাঙ্গালী আর ভারতের প্রধান মন্ত্রী যে জহরলাল তা সম্ভবত প্রস্তাবকারীদের জানা ছিলনা, তাই ঐ পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়েই শ্রীজহরলাল বিরক্তি এবং রাগত স্বরে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তা কখনই সম্ভব নয়, কারণ রাধানাথ সিকদার একাই নয়, আরও অনেকে মিলে Mount Everest আবিষ্কার করেছেন। যদি ক্ষমতা থাকৃত এবং কলম্বসের উপর আক্রোশ থাক্‌ত তাহলে নিশ্চয়ই জহরলাল তাঁকেও আমেরিকা আবিষ্কারের বাহাদুরী থেকে বঞ্চিত না করে ছাড়তেন না, কারণ কলম্বস একলাই আমেরিকা গিয়েছিলেন না, তার সঙ্গে আরও অনেকে ছিল। এইভাবেই জহরলাল তার বাঙ্গালী বিদ্বেষ চরিতার্থ করে চলেছেন, যার ফলে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ আজও এক ৪২০ ইংরেজের নামই বহন করে চলেছে। এসব উদাহরণের সংখ্যা বাড়িয়েও কোন লাভ নেই, এ বইতেই অনেক রকমের আলোচনা ইতিপূর্বেই হয়েছে।

মোটকথা জহরলাল তার জীবনে যখন যে দায়িত্বেই অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, তার সেই inferioriy complex উদ্ভুত বাঙ্গালী-বিদ্বেষ ভুলতে পারেন নি; এবং শেষ পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি কেবলই ঐ হিংসা প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবার চেষ্টা করে এসেছেন,—কখন প্রকাশ্যভাবে আর কখনও বা অপ্রকাশ্যভাবে, এই যা তফাৎ। গত বৎসরের আসামী লঙ্কা-কাণ্ডের পর থেকে তিনি নিজেকে একেবারেই উলঙ্গ করে দিয়েছেন—আজ তাঁর কিছুতেই লজ্জা নেই। আসাম থেকে হাজারে হাজারে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিম বাংলায় ডোল খেতে থাকলেও আজ তাঁর কিছুই এসে যায় না। কেন্দ্রীয় শাসন ত দূরের কথা আসামের দাঙ্গাহাঙ্গামার বিষয় কোন Enquiry Commission বসাতেও তিনি রাজী হননি। বরং আসামের সবাইকে

সৎচরিত্রের সার্টিফিকেট দান করে দাঙ্গাকারীদের কয়েকজন নেতাকে দিল্লীতে চায়ের নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত করেছেন। আর এবার, কাছারে ভাষা সত্যাগ্রহীদের উপর যেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগের কায়দায় গুলি চালান হয়, সেদিন তিনি গৌহাটিতেই ছিলেন, জনসভায় বক্তৃতাও করেছেন, কিন্তু ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ত দূরের কথা, নিহতদের সহানুভূতি জানিয়েও একটি কথা উচ্চারণ করা দরকার বোধ করেন নি ; বরং ভাষা নিয়ে আন্দোলন করে যে অন্যায় কাজই করা হচ্ছে সেটুকুই শুধু জানিয়েছিলেন। তারপর দিল্লী ফিরেই তিনি ছুটি উপভোগের উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি হিমালয়ের এক নিভৃত কোণে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর কর্মকর্তারা কাছারের ভাষা আন্দোলনকে বানচাল করবার সব রকমের চেষ্টা—এমনকি সাম্প্রদায়িক বিভেদেরও চেষ্টা শেষ করে, তাদের শেষ অস্ত্র হিসাবে বাঙ্গালীদের উপর মুসলমান এবং হিন্দুস্থানী গুণ্ডাদের লেলিয়ে দেন। ফলে হাইলাকান্দি সহর সহ বহু চা বাগানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহ বিধ্বস্ত হয়। এবং তারপরই দিল্লী ফিরে এসে বাদশাহ জহরলাল কলকাতার খবরের কাগজদের গালাগালি করে তার কর্তব্য শেষ করেন। এই ত হচ্ছে তাঁর সর্বশেষ বিশ্বরূপ।

জালিয়ানওয়ালাবাগ ষ্টাইলে গুলি চালান বা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ইংরেজ যেভাবে চট্টগ্রাম সহর বিধ্বস্ত করেছিল, সেই ষ্টাইলে হাইলাকান্দি সহর বিধ্বস্ত করবার প্ল্যান এবং প্রোগ্রাম যে খাস বাদশাহ জহরলালেরই মস্তিষ্ক-প্রসূত সেটুকু বুঝতে ভুল করবার কোনই মানে নেই। তাঁর গৌহাটির বক্তৃতা, পরে আসামের অবস্থা একান্ত উত্তেজনাপূর্ণ থাকা সত্বেও সময় বুঝে তাঁর হিমালয়ে আত্মগোপন, তার পর দিল্লীতে ফিরে এসেই কলকাতার কাগজদের উপর আক্রমণ ; এবং বিশ্বস্ত অনুচর—যাদের দিয়ে তিনি এসব করিয়েছেন, তাদেরকে সৎচরিত্রের সার্টিফিকেট দান,—এসবই তার গোপন হস্তের প্রমাণ। মোটকথা আজ যে কোন উপায়েই হোক বাঙ্গালীকে তিনি দেখে নেবেন।

বাঙ্গালীকে দেখে নেবার এই মহৎ আকাঙ্ক্ষাটিকে তিনি আজ নগ্ন ভাবে প্রকাশ করে ফেল্লেও তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাটি যে মোটেই আজকের নয়, তাও অনেকেই ভালভাবেই জানেন। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগেও তিনি যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই বাঙ্গালীকে একটা পদাঘাত করতে কখনই দ্বিধা করেন নি। 'বাঙ্গালী স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য কিছুই করেনি,' এধরণের কথাও তিনি বহুবার বহু জায়গায় বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন। বাংলা **Problem province,**

বাঙ্গালী অলস, বাঙ্গালী কর্মবিমুখ ইত্যাদি অনেক ধরণের কথা বলেও তিনি বহুকাল থেকেই বাংলা এবং বাঙ্গালীকে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করে আসছেন। তার এ চেষ্টা যে অনেকটাই সফল হয়েছে, বাকি ভারতের সম্মুখে যে আজ বাংলা এবং বাঙ্গালী অনেকটাই ছোট হয়ে গেছে তাতেও ভুল নেই। বাংলা এবং বাঙ্গালীকে শেষ করবার যে চরম খেলা আজ সুরু হয়েছে, বাকি ভারতে তার কোনই reaction নেই। বাঙ্গালীর জন্য বাকি ভারতে আজ আর কোন সহানুভূতি নেই। বাকি ভারতের সহানুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাঙ্গালীকে কোণঠাসা করবার ব্যাপারে বাদশাহ জহরলাল সত্যিই সফল হয়েছেন। তাঁর এই সফলতাই তাকে উলঙ্গ হবার সাহসও দিয়েছে। বাংলার করুণতম আর্ত চীৎকারও যেন আর কাউকে উত্তেজিত করতে না পারে, সেই জন্যই তাঁর আক্রমণ করবার প্রয়োজন হয়েছে কলকাতার খবরের কাগজদের। বাঙ্গালী আর বাদশাহ জহরলাল এবার সামনা সামনি।

"কলকাতা মৃত সহর" কথাটি বলবার ভেতরে বাদশাহ জহরলালের মনের গোপনতম যে আকাঙ্ক্ষাটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, আসামে ঐ বাদশাহেরই দালাল বিনোবা ভাবের "বাঙ্গালী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে" ভবিষ্যৎবাণীটির মধ্যেও ঐ একই আকাঙ্ক্ষার ছবি ফুটে উঠেছে। তবে আকাঙ্ক্ষাটি যে আর গোপন নেই, বাদশাহ যে উলঙ্গভাবেই প্রকাশ পেয়েছেন ; সেইটুকুই বাঙ্গালীর একমাত্র আশা।

স্বাধীনতার চৌদ্দ বৎসরে কিভাবে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে বাঙ্গালীকে ঠকাবার চেষ্টা হয়েছে, কত নীচ এবং শঠ উপায়ে বাঙ্গালীকে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা হয়েছে ; কিভাবে বাংলাকে সর্বভারতীয় লুঠের বাজারে পরিণত করা হয়েছে। তার অনেক কিছুই এই 'আবোল তাবোলে'ই নানারকম ভাবে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা হয়েছে, তাই সেগুলোর পুনরাবৃত্তির এখানে আর কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধুই এইটুকু বলবার যে, আসামে আজ বাঙ্গালীর যে অবস্থা হয়েছে তা শুধু আসামেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। কারণ আসামী-বাঙ্গালীর স্বার্থ বা ভাষার সাংঘর্ষই এর মূল কারণ নয়—এর মূল বহু সুদূরে। তাই আগামীতে ঐ একই অবস্থায় পড়তে হবে বাঙ্গালীকে আরও বহু জায়গায়। এমন কি খাস বাংলা দেশ বা কলকাতা সহরেও যে অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর ঐ আসামী অবস্থা হবে না তারও কেউই আজ গ্যারান্টি দিতে পারে না—বাংলার Police

administration আজও চলছে ঐ হিন্দুস্থানীদের দ্বারাই। বাঙ্গালীকে শেষ করবার কাজের প্ল্যান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় না থাকলেও, কাজ চলে আসছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অনেক আগে থেকেই এবং বেশ প্ল্যান মাফিকই।

বাঙ্গালী ধ্বংসের প্ল্যানের কাজ যে এত সফলতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে তার কারণও অবশ্য বাঙ্গালীরাই। বাঙ্গালীর চরম অধঃপতনই হচ্ছে ঐ প্ল্যানের সুযোগ। আর বাঙ্গালী হয়েও ঐ প্ল্যানের কাজের সহায়তা করছে এমন বাঙ্গালী পঞ্চমবাহিনীরও আজ বাংলাদেশে কোন অভাব নেই। গান্ধীবাদী কংগ্রেসী দালালরা ত রয়েছেই; উপরন্তু কমুনিস্টরাও ঐ ব্যাপারে কম সাহায্য করছে না। বরং মনে হয় অনেকটা বেশীই করছে। বাংলাদেশে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় দালাল সম্ভবত কমুনিস্টরাই। 'হিন্দীকে একমাত্র জাতীয়ভাষা হিসাবে মেনে নিতে হবে' এ শ্লোগান ত তাদের আছেই। উপরন্তু বাঙ্গালীরা বা অন্য যে কেউই যখনই হিন্দী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করেছে, তখনই কমুনিস্টরা লাফিয়ে এসে সে চেষ্টাকে বাধা দিয়েছে। দার্জ্জিলিংকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করবার হিন্দী সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষার সাহায্যকারী একমাত্র ঐ কমুনিস্টরাই—অতি প্রকাশ্যভাবেই তারা বহুদিন থেকে সে চেষ্টা করে আসছে। বিদেশী গুপ্তচরের দল বলে বিদ্রূপ করা হলেও কমুনিস্টদের যে আজও ভারতে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়নি, তার কারণও ঐ। কমুনিস্টরা বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ হতে না দিয়ে, বাংলার বিরোধীতাকে দুর্বল রেখে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীতার পক্ষে যে সাহায্য করছে; তারই পুরস্কার হিসাবেই কমুনিস্ট দল আজও ভারতে একটি আইন সঙ্গত দল,—এমন কি চীনা আক্রমণের খবর প্রকাশ পাবার পরেও। চীনা আক্রমণের সংবাদ প্রকাশ পাবার পর থেকে অনেকেই আজ জহরলালকে প্রচ্ছন্ন কমুনিস্ট হিসাবেই দেখতে শুরু করেছেন। কমুনিস্টদের বেআইনী না করবার ব্যাপারটিকেও তারা তাদের যুক্তির সমর্থন হিসাবেই কাজে লাগিয়েছেন; কিন্তু আসলে ঐ ধারণাটি একেবারেই ভুল। অবশ্য বেকায়দায় পড়লে, ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য জহরলাল যে, যে কোন অকাজ করতেই পেছপা হবেন না, তাতে কোনই ভুল নেই; তবুও তিনি কমুনিস্ট কখনই নন। আর তার ঐ কমুনিস্ট প্রীতির অন্য কোন কারণও নেই, এক ঐ বাংলাকে দুর্বল এবং মেরুদণ্ডহীন করে রাখবার আশা ভিন্ন। এমনকি, গত কয়েক বৎসরে পশ্চিম বাংলা সরকারও একাধিকবার কমুনিস্টদের বেআইনী ঘোষণা করতে গিয়েও আটকে গেছেন ঐ জহরলালের বিরোধীতায়।

বাঙ্গালী যে আজ অধঃপতনের শেষ সীমায় তাতে কোনই সন্দেহ নেই ; কিন্তু তাই বলেই কি বাঙ্গালীকে একেবারে শেষ হয়ে যেতে হবে নাকি ? আর যারা আজ বাঙ্গালীকে শেষ করবার ফিকিরে রয়েছেন, তারাই কি সব উত্থানের সু-উচ্চ শিখরে আরোহণ করে বসে রয়েছেন নাকি ? বরং শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে-কলায়, এমনকি আদর্শেও বাঙ্গালী যে এখনও ভারতে শীর্ষস্থানীয় সে বিষয়ে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী বা তাঁদের দালালরা ভিন্ন অন্য কেউই সন্দেহ প্রকাশ করে না। তার প্রমাণেরও খুব অভাব হয় না। I. A. S. পরীক্ষায় কটি বাঙ্গালীকে পাশ করান হোল, সেটাই মাপকাঠি নয়। বাইরের পৃথিবীতে কে কতখানি recognition পেল, সেটাই মাপকাঠি। আর সেই মাপকাঠিতে প্রায় একমাত্র বাঙ্গালীকেই আজও মাপা হয়। ইদানীং অবশ্য এক আধজন দক্ষিণ ভারতীয়ও ঐ মাপকাঠির আওতায় এসেছেন ; কিন্তু হিন্দি এলাকার একজনও আজও নয়। তাই প্রশ্ন, বাঙ্গালীকে শেষ করে দেয়া হলে ভারতে থাকবে কি ?

বাংলাকে হিংসা করবার যথেষ্ট রসদ যে বাংলাতেই রয়েছে তাতেও কোন ভুল নেই। বাংলাকে হিংসা করবার কারণ রয়েছে বাংলার ভূগোলে, বাংলার ইতিহাসে, বাংলার জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে-কলায়, আরও রয়েছে বাংলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনায়। বাংলাই ভারতের একমাত্র প্রদেশ পৃথিবীতে যার পরিচয় বহন করে এক বিরাট সমুদ্র—বঙ্গোপসাগর। ফলে একমাত্র বাঙ্গালীকেই বাইরের পৃথিবীতে তার নিজ পরিচয়ে যে কেউই চিনতে পারে। বাংলাই ভারতের একমাত্র প্রদেশ যার সমুদ্র এবং হিমালয় দুইই রয়েছে। ভারতের দুই মহান নদী গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রও মিলিত হয়েছে এসে ঐ শ্যামল বাংলা দেশেই। বাংলা দেশের জলবায়ু এবং মাটি যেমন কৃষিকার্যের পক্ষে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালদের অন্যতম ; বাংলাদেশের শিল্প সম্ভাবনার অবস্থাও তারচেয়ে খারাপ কিছুই নয়। বাংলার বন্দর কলকাতা ভারতের বৃহত্তম বন্দর—ভারতের মোট বাণিজ্যের অর্দ্ধেকেরও বেশী হয় কলাকাতার মাধ্যমেই। শুধু তাই নয় আজও এই খণ্ডিত বাংলা ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করে, এবং ভারত সরকারের ট্যাক্সও যোগান দেয় সবচেয়ে বেশী। ইতিহাসেও বাঙ্গালীর স্থান কম বিশেষত্ব পূর্ণ নয়। ভারতের পুরাকালের রাজনৈতিক ইতিহাসে বাংলার স্থান কোথায় কত উচ্চে সে নিয়ে হয়ত তর্ক উঠতে পারে, কিন্তু পুরাকালে বহির্বিশ্বে ভারতের পরিচয় যে

বাঙ্গালীরই কৃপায়, পুর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব এশিয়ায়—তিব্বত, চীন এবং জাপানে, ভারতীয় সভ্যতা যে বাঙ্গালী সভ্যতা ভিন্ন অন্য কিছুই নয় সে বিষয়ে কোন তর্ক নেই। আর আধুনিককালে, ইংরেজ আমলেও বাঙ্গালীই যে সবচেয়ে বেশী এগিয়েছিল, বাঙ্গালীই যে ইংরেজের ভারতভূমি ত্যাগে বাধ্য হবার মূল কারণ—ক্ষুদিরাম থেকে নেতাজী সুভাষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার জন্য রক্ত দানের ইতিহাস যে প্রায় সবটাই বাঙ্গালীরই ইতিহাস ; সে বিষয়েও তর্ক করবার বিশেষ স্থান নেই। তার উপর একমাত্র বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান বা সাহিত্যই যে আজ পর্য্যন্ত বাইরের পৃথিবীতে recognition পেয়েছে তাও অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। তাই বাংলাকে হিংসা করবার বহু বহু রসদ বাংলাতেই রয়েছে। আর সেই হিংসাকে চরিতার্থ করবার রসদও রয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে থাকায়। সেই কারণেই বাংলার আজ শেষ হওয়া ভিন্ন অন্য উপায়ও বোধ হয় কিছু নেই। ভরসা শুধু এইটুকুই যে বাদশাহ জহরলাল উলঙ্গ হয়েই এবার সম্মুখে এসেছেন। আর সেই সঙ্গে ভরসা কাছাড়ে বাঙ্গালী ছেলেরা রুখে দাঁড়াতে পেরেছে। কলকাতায়ও 'জাগো বাঙ্গালী' আন্দোলন শুরু হয়েছে। তবে জাগবার আগেই যদি বাঙ্গালী শেষ হয়ে যায় তবে জাগান হবে কাকে, সেটাই প্রশ্ন। প্রশ্ন, বাঙ্গালী থাকবে না সন্ত বিনোবাভাবের ভবিষ্যৎবাণী সফল করতে 'পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে' ?

বইটি সম্বন্ধে সুধীজনের মতামত :—

"তথ্যবহুল রচনার সরসতায় এবং নির্ভীক সমালোচনায় যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি।"

—অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ। (সভাপতি, জনসঙ্ঘ)

"দেশের লোক যাহাদের হাতে নিজেদের ভাগ্য বিধানের ক্ষমতা নির্বিবাদে তুলিয়া দিয়াছিল, তাহারা দেশবাসীর সঙ্গে কি ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন তাহার প্রমাণ বইটির পাতায় পাতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।......বইটির প্রায় সবটাই উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। গত দশ বৎসরের ঘটনার ইতিহাস একজন প্রকৃত দরদী স্বাধীনতা সৈনিকের কলমে ছবির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বই প্রচারের প্রয়োজন আছে।

—শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ। (যুগবাণী)

"এ 'আবোল তাবোল' মোটেই আবোল তাবোল নয়। বইটির যেমন ভাব তেমনি ভাষা। একবার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে ছাড়া যায় না।......ইংরেজ অধীনতা থেকে মুক্ত হয়েও আমরা স্বাধীন হতে পারিনি, আবোল তাবোল হয়ে গেছি। ঘটনা পরম্পরার ভেতর দিয়ে এই নির্ভুল সত্যটি প্রমাণ করাই বইটির উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে।"

—অধ্যাপক শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তী।

"এই বই প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির অবশ্য পাঠ্য।"

—অধ্যাপক শ্রীগোপাল মজুমদার।

"উচ্চবর্গ নেতৃত্বের কঠোর সমালোচনায় তার কলম কোথাও কাঁপেনি।... ঐতিহাসিক উপজীব্যের দিক থেকে তিনি নিঃসন্দেহে একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ পরিবেশন করেছেন।" —যুগান্তর। ১।৯।৫৭)

"বইটি যথেষ্ট মূল্য বহন করে।" —বসুমতী (মাসিক)

"স্বাধীনতার আবোল তাবোল" একখানি ইতিহাস।......কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত যাহাদের যোগাযোগ ছিল না, বা যাঁহারা একেবারে তরুণ তাঁহারা এই একখানি পুস্তক পাঠ করিলে অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাইবেন। "স্বাধীনতার আবোল তাবোল" ভারতবর্ষের বিগত ৫০ বৎসরের সংক্ষিপ্ত হইলেও একটা পরিচ্ছন্ন চিত্র। এই পুস্তকে তথ্যানুসন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় আছে। এই গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল

নির্ভীক ও নিরপেক্ষ স্বমত প্রকাশের ঋজু প্রচেষ্টা। সুনীল বাবু গান্ধীনীতি তথা কংগ্রেসের গত ৪০ বৎসরের নীতি, কর্মধারা ও দেশবাসীর প্রতি তাহার বিশ্বাসঘাতকতা, আন্তরিকতা ও দেশপ্রীতি লইয়া উন্মুক্ত করিয়াছেন, এবং সেগুলির চুল চেরা ও ব্যাপক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সকলেরই বিশেষতঃ একটু চিন্তাশীল ও তথ্য সন্ধানী লোকের পাঠ করা উচিত।"

—'প্রভাত' (মাঘ ১৩৬৪)

"বইখানি নামে আবোল তাবোল হইলেও কাজে তাহা নয়। স্বাধীনতার পূর্ব্বে ও পরে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে প্রগতির নামে অধোগতির যে শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছিল এবং ঘটিতেছে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে পদে পদে যে পর্ব্বতপ্রমাণ ভুল করিয়াছেন এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও দেশের পুনর্গঠনের নামে স্থানে স্থানে অদ্যাপি যে প্রহসন চলিতেছে, লেখক সর্ব্বপ্রকার ভাবালুতা, চাটুকারিতা ও অন্ধবিশ্বাসের উর্দ্ধে থাকিয়া অতীব বলিষ্ঠ ভাষায়, অপূর্ব্ব সাহসিকতার সহিত উহারই বাস্তব চিত্রসমুদয় অতি পরিষ্কারভাবে জনসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। আমরা কি স্বাধীনতার নামে ইহাই চাহিয়াছিলাম? এই জিজ্ঞাসাই পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে সূক্ষ্ম বিচারশৈলী ও অনৃত সাহসিকতার বীর্য্যে ছন্দায়িত হইয়া উঠিয়াছে গ্রন্থখানিতে। ভুক্তভোগী লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনা যেন বাণীরূপ পাইয়াছে গ্রন্থখানির মধ্যে।......জটিল রাজনৈতিক বিষয়ক আলোচনা পড়িতে পড়িতে বিরক্তি বা ক্লান্তি অনুভব হয় না। গোড়া হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া গ্রন্থ ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। সাহিত্যোচিত রসে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণমূলক এই গ্রন্থখানি সকলেরই পড়িয়া দেখা উচিত।"

—"প্রণব" (চৈত্র ১৩৬৬)

এই বইখানির সমালোচনা করিতে যাইয়া কলিকাতার সরকারী মুখপত্রেরা বেসামাল উত্তেজনা প্রকাশ করিয়া নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। এবং ঢাকার সরকারী মুখপত্র সংবাদপত্র 'ইত্তেফাক', পাকিস্থান নাগরিক লেখককে কোতল করিবার ব্যবস্থা বাৎলাইয়াছেন।